শ্রীরামকৃষ্ণমঙ্গল

আদিলীলা

পবিত্রকুমার ঘোষ

সারদা প্রকাশালয়

Sri Ramakrishna Mangal

a philosophical biography of Sri Ramakrishna

by Pabitra Kumar Ghosh

প্রকাশক : রমলেন্দু সরকার
সারদা প্রকাশালয়
পি ৬৬ লোয়ার রেঞ্জ
পোঃ সার্কাস এভিনিউ
পার্কসার্কাস
কলকাতা-৭০০০১৭

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭[illegible]

[illegible] : শ্রীমতী অঞ্জলি ঘোষ

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

মুদ্রাকর : সুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ মনোমোহন বসু স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০[illegible]

বাইণ্ডার : জে. কে. বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৪২এ বিডন রো
কলকাতা-৭০০০০৬

দাম : পঁয়ত্রিশ টাকা [illegible]

উৎসর্গ

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা

সপ্রণতি

এই লেখকের

লোকায়ত রামকৃষ্ণ
সুভাষচন্দ্র (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)
রুশ-চীন-যুদ্ধ ?
কফিহাউস
বাংলাদেশ : অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যা
বাংলার রেনেশাঁস : স্বপ্ন, মায়া না মতিভ্রম
বাংলার ইতিহাস-জিজ্ঞাসা
বাংলায় জাতিগঠনের সমস্যা
মধুসূদন : ভ্রান্ত যাত্রা
সত্যামিথ্যায় রবীন্দ্রনাথ
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
বুদ্ধদেব বসু
বিষ্ণু দে
পূর্বাপর রেখাচিত্র
নতজানু : শিল্পবিচার
এ নদী পারাপারে
প্রথমা : তোরই কাছে চেয়েছিলাম
বারোমাস্যা : একটি অন্তরঙ্গ সমীক্ষা
টলস্টয় : শিল্পীর সংগ্রাম

নিবেদন

বিষয়গৌরবই এ বইয়ের প্রাণবস্তু। বিষয়মহিমাবশত এ বই পড়া ও শোনা মঙ্গল। গ্রন্থোক্ত বিষয়ের চিন্তা ও ধ্যান আরও মঙ্গলের হেতুস্বরূপ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাবের সার্ধ শতবার্ষিকী উৎসবের সময়ে এ বই প্রকাশিত হল। তাঁর চরণে এ আমাদের প্রণতি-নিবেদন।

অদ্যাবধি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেসব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এ বই। দৃষ্টিকোণ, রচনাভঙ্গী, উদ্দেশ্য—সবই এর স্বতন্ত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর যে নতুন তত্ত্বোদ্ভাস এ বইয়ে হয়েছে তা লেখকের বিদ্যাবুদ্ধিজাত নয়। লেখকের ধারণা বা মতবিশেষের আরোপণও নেই এ বইয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, সার্জন সাহেব তাঁর হাতের আলোয় জগৎ দেখান। সার্জনের আপন মুখখানি দেখতে হলে ঐ আলোটি তাঁরই মুখের ওপর নিবদ্ধ করতে অনুরোধ জানাতে হবে। এ বইয়ে ঈশ্বরের নিজস্ব আলোয় ঈশ্বরের মুখকমল উদ্ভাসিত হয়েছে।

ঈশ্বর বিদ্যা-অবিদ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার। অবিদ্যা যেমন তাঁকে পায় না, বিদ্যাও তেমনই তাঁকে পায় না। বিদ্যাসঞ্চয়ের পরিমাণ যার যেমনই থাকুক ঈশ্বরোপলব্ধির পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। পুঁথিপড়া বিদ্যা ঈশ্বরোপলব্ধির ক্ষেত্রে অচল।

কৃপাপরবশ ঈশ্বরের প্রসন্ন করুণাদৃষ্টিই সম্বল। তাঁর করুণাস্পর্শে সিক্ত এ বই, এ বইয়ের পাঠক ও লেখক।

দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য পীঠে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাপূত পঞ্চমুণ্ডি তথা বেলতলায় এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি ভক্তজনদের পাঠ করে শোনানো হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরের সারদা মঠের পূজনীয়া অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা পুস্তক রচনার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত স্নেহ, সমাদর, প্রেরণা ও আশীর্বাদ দানে ধন্য করেছেন লেখককে।

বইয়ের যিনি বিষয়, এই রচনাও মূলত তাঁরই প্রেরণায়। তিনিই উজ্জ্বল আলোয় পথ দেখিয়েছেন প্রতি পদক্ষেপে। ঈশ্বর পরমরসিক। তিনিই রস। তিনিই রসস্রষ্টা। তিনিই রস-আস্বাদক।

সূচনা হয়েছিল দীন লেখকের যৌবনকালে। তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এ বই লেখার দায়িত্ব বর্তায়। আজ পঞ্চাশোত্তীর্ণ জীবনে ব্রত উদযাপনে অপার্থিব শান্তিলাভ।

পিতৃপুরুষ

শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার লিখেছিলেন যে রামকৃষ্ণ [illegible] ভগবান ও মানুষের মিশ্রিত সত্তা।[1] আর একজন [illegible] রোলাঁ।—তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে জন্মেছেন [illegible] অনেক বছর পর লিখেছিলেন যে এই মরমী পুরুষ ছিলেন দিব্যত্ব ও [illegible] সমন্বিত রূপ।[2] আরও পরে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-দার্শনিক মনীষী ডঃ আর্ণল্ড টয়নবি লিখেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো [illegible] বড় আধ্যাত্মিক [illegible] আর জগতে জন্মাননি এবং বর্তমান বিশ্বের মুক্তির ইঙ্গিত আছে তাঁর [illegible] সে বাণী ভারতেরই বাণী।[3] আরও একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যিক [illegible] ক্রিস্টোফার ইশারউড বলেছেন, রামকৃষ্ণ এক অসাধারণ ও রহস্যময় [illegible] রহস্যময় কিন্তু বাস্তব।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আরও বহু মনীষীর, ভারতীয় ও বিদেশী তাঁ[illegible] বাণী উদ্ধৃত করা যেত কিন্তু বস্তুত তার প্রয়োজন নেই। এটুকু শুধু লক্ষ্য [illegible] যে রামকৃষ্ণ যে একজন 'আশ্চর্য' পুরুষ ছিলেন, নিরুপম মানুষ, অচিন [illegible] —আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা-ছাপানো, যেন কোনো অজ্ঞাত [illegible] আগত আগন্তুক, অনেকেরই মনে এই প্রতীতি জন্মেছে।

আমরা অবশ্য তাঁকে অবতার বলে প্রণতি জানিয়েছি। 'অবতার' শব্দটি আমরা সহজে বুঝি, শাস্ত্রে ও ইতিহাসে অবতার-কাহিনী অনেক আছে। গীতায় কৃষ্ণমুখে অবতারের আবির্ভাব-রহস্য প্রকাশিত হয়েছে খুবই সরল ও স্পষ্ট ভাষায়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন যে যুগে যুগে তিনিই অবতীর্ণ হয়ে থাকেন;—জন্মশূন্য অবিনশ্বর তিনি লোককল্যাণার্থে, যুগযুগের প্রয়োজনে, আপন মায়াশক্তিকে আশ্রয় করে লোকসমাজে আবির্ভূত হন মানবী গর্ভের সাহায্যে মানব তনু ধারণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ পুরুষ, আপন আবির্ভাবের সকল সূত্র ও তাৎপর্য তাঁর আপন হাতেই বিধৃত। কিন্তু তাঁর জীবনকথা যতটুকু জানা যায়, তিনি নিরালম্ব নন, মহাশূন্যে জন্মাননি। তিনি এক বিশাল ও দূরপ্রসারী সাধনার

ফসল। এই কথাটা না স্বীকার করলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়, সত্য হয় অবহেলিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে বংশে জন্মেছিলেন তার পরিচয় নেওয়া তাই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। খুব দূর অতীতে যাবনা, তাঁর পিতামহ মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ দিয়েই সুরু করি।

মানিকরাম বাস করতেন আঠারো শতকের মধ্যভাগে[৫] দেরেপুর গ্রামে। কামারপুকুর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে পাশাপাশি তিনটি গ্রাম বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। হুগলি জেলার জমি উর্বর, ভালো ফসল হয়, সমৃদ্ধির সেটা একটা কারণ। আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলা দেশে কলকাতার মতো কোনো মেট্রোপোলিস ছিল না যা মফস্বলের সম্পদ ও রক্ত শুষে নিতে পারে। তখনকার শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে বা প্রবাসে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বাস করতনা। আর বাংলা তখন কৃষি ছাড়াও শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল।

দেরে ও কামারপুকুর দুটি গ্রামই হুগলি জেলায় অবস্থিত। প্রাচীন সুহ্ম বা রাঢ়ের অন্তর্গত হুগলি। রামায়ণ ও মহাভারতে পাই সুহ্ম দেশের উল্লেখ। প্রাচীন কালেই এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল আর্য জনপদ। সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল এই এলাকা। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে এসেছিলেন তখনই সপ্তগ্রাম একটি বড় বন্দর ও সমৃদ্ধ নগর। দেরে-কামারপুকুর সপ্তগ্রাম বন্দরের নিকট পশ্চাৎ ভূমি। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্লিনি লিখেছিলেন যে বড় বড় বাণিজ্য জাহাজ টেনিনগেল বা ত্রিবেণী পর্যন্ত আসত। ত্রিবেণী হুগলি জেলায় অবস্থিত। বৌদ্ধ ও জৈনরাও এই এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের মতোই গুপ্ত সাম্রাজ্যেরও অধীন হয়েছিল সুহ্ম দেশ। সপ্তম শতকে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক সুহ্মদেশকে নিজের রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। বৌদ্ধ ও হিন্দু প্লাবনের পর এখানে প্রবেশ করেছিল ঐস্লামিক সংস্কৃতি। মুসলিম শাসন কালের অসংখ্য স্মারক এখনো ছড়িয়ে আছে হুগলি জেলায়। সপ্তগ্রামের বণিক সমাজ শুধু হুগলি জেলাকে নয়, সারা বাংলাকেই সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। 'মনসা-বিজয়' কাব্যে বিপ্রদাস লিখেছেন: "অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি প্রতি ঘরে কনকের বারা।" এ হল ষোলো শতকের গোড়ার সপ্তগ্রামের বর্ণনা। ঐশ্বর্যের আকর্ষণে বিদেশীরাও এখানে

এসে বসতি স্থাপন করেছিল। বাঙালী সদাগর তার পণ্য নিয়ে তখন চলে যেত কান্দাহার, কাবুল, বালখ, বুখারা, কাশগড়, সিরাজ, ইস্ফাহান, মেশাদ, বাকু, অস্ট্রাখান, নিজনি নোভোগোরোডে—বার্মা মালয় ইন্দোনেশিয়া চীন ও জাপানে।

প্রভু নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের বণিকদের আহ্বানে ছুটে এসেছিলেন। তিনি তাদের ঘরে ঘরে প্রচার করেছিলেন বৈষ্ণব ধর্ম। তারপর একদিন সরস্বতী নদী মজে গেল, পতন হল বন্দর সপ্তগ্রামের। তখন হুগলি বন্দর গড়ে তুলেছিল পর্তুগীজরা। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেই পর্তুগীজরা হুগলিতে বন্দর ও বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল। পর্তুগীজ পেড্রো-তাভারেশ খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারের অনুমতিও নিয়ে এসেছিলেন। ১৫৭৯ সালে গড়ে উঠেছিল হুগলির পর্তুগীজ উপনিবেশ ও ১৫৯৯ সালে ব্যাণ্ডেলের গির্জা স্থাপিত হয়েছিল। বস্তুত হুগলির শহরগুলি বহু বিচিত্র বৈদেশিক প্রভাবের অধীন হয়েছে। যেমন হুগলিতে ছিল ইংরেজদের প্রতিপত্তি ও প্রভাব, চুঁচুড়ায় ছিল ওলন্দাজদের, চন্দননগরে ফরাসীদের, ব্যাণ্ডেলে পর্তুগীজদের, শ্রীরামপুরে দিনেমারদের, [illegible] গ্রীকদের এবং ভদ্রেশ্বরে জার্মান ও অস্ট্রিয়ানদের। বাংলার আর কোনো জেলা পাশাপাশি এতগুলি বিদেশী প্রভাবের অধীন হয়েছে কিনা জানি না। এই বিদেশীরা নদীপথে ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে এনেছিল সম্পদ ও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি।

দেরে-কামারপুকুর প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি, কেননা বিদেশীদের গমনাগমনের পথ থেকে কিঞ্চিৎ দূরেই এই গ্রামগুলি অবস্থিত ছিল। কিন্তু আপন অঙ্গনের কাছেই এই যে বিচিত্র সংস্কৃতির সমাবেশ তার আমন্ত্রণ বৃথা যায়নি গ্রামীণ মানুষের মানসচেতনায়। রাধানগরের রামমোহন তাঁর উদার মানসিকতার লক্ষণগুলি সঞ্চয় করেছিলেন এই মানব সংস্কৃতি-মেলার শেষ রেশ থেকে। মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়েছিল রামমোহনের আগে, পলাশি যুদ্ধেরও আগে। তিনি পর্তুগীজ-দিনেমার-গ্রীক-জার্মাণ-ওলন্দাজ-অস্ট্রিয়ানদের জীবনচর্যা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন বেশি। শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মানবতাবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি ইতিহাসের কালাবর্তে হুগলি জেলায় বহুদিন আগেই রচিত হয়েছিল। অবতারের আবির্ভাবও শূন্যে ঘটে না।

প্রাগিতিহাসের কাল থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত হুগলি জেলায় নানা সংস্কৃতির

পলি জমেছিল। ঐতিহাসিক কালে কিভাবে এই সব সংস্কৃতির ধারা এখানে এসে মিলেছিল তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছি। সর্বধর্ম ও সর্বভাব সমন্বয়ের উদার বাণী এই বহু বিচিত্র সংস্কৃতির অনুলেপন-ধন্য জনপদের কোনো মানব কণ্ঠ থেকে যদি উচ্চারিত হয়ে থাকে তবে তা কোনোমতেই অস্বাভাবিক নয়।

হুগলি জেলার জনসংখ্যার গঠন বিচার করলেও এই জেলার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। কৈবর্ত ও বাগদি জাতির লোকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারপর ব্রাহ্মণ। কায়স্থ ও তেলি জাতির লোক এখানে সংখ্যালঘু।

হুগলি জেলার আদিম অধিবাসীরা হল বাগদি এবং মূলে তারা অনার্য। ভাগবতে সুহ্মবাসীকে বলা হয়েছে পাষণ্ড—বাগদিরা সম্ভবত তাদেরই দলে। কারণ তারা আর্য নয়। এই অঞ্চলের লোকরা রাঢ় বা চুয়াড় নামেও খ্যাত হয়েছিল। খ্রীস্ট-পূর্ব ছয় শতকে জৈনগুরু মহাবীর এখানে ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন— চুয়াড়রা তাঁকে লাঞ্ছিত করেছিল, লেলিয়ে দিয়েছিল পোষা হিংস্র কুকুর তাঁর দিকে। হুগলি জেলার অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের এখনও লোকে রাঢ়-চুয়াড় বলে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন :

অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥

মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের বংশ অতি উচ্চ—তাঁরা আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। কিন্তু রাঢ়-চুয়াড়দের সঙ্গে তাঁদের কোনো সংঘাত ছিল না, তাদের কাছে তাঁরা পেতেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। এই রাঢ়-চুয়াড়দের স্নেহ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা শ্রীরামকৃষ্ণও পেয়েছিলেন। চট্টোপাধ্যায়রা রাঢ়-চুয়াড়দের অর্থাৎ নিচু তলার সাধারণ মানুষদের জীবন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেননি।

হুগলি জেলাকে গঠন করেছে গঙ্গা-ভাগীরথী ও দামোদর। গঙ্গা নদীয়ার ভিতর দিয়ে হুগলি / চব্বিশ পরগণা ডাইনে ও বামে রেখে চলে এসেছে দক্ষিণে। কিন্তু গঙ্গার প্রবাহ পথ আগে ভিন্ন ছিল। দেরে-কামারপুকুরের কাছের নদী দ্বারকেশ্বর। নদীটি মানভূম জেলা থেকে বেরিয়ে বর্ধমান জেলার রায়না থানার মধ্য দিয়ে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার মধ্যে প্রবেশ করেছে। আরামবাগ থানা ও গোঘাট থানার মধ্য দিয়ে নদীটি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার রূপনারায়ণ নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

দামোদর নদীও দেরে কামারপুকুর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আরামবাগ ও শ্রীরামপুর মহকুমার সীমানা রচনা করেছে এই নদী। আরও একটি নদী আছে কামারপুকুর অঞ্চলের কাছাকাছি—মুণ্ডেশ্বরী। তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ যাবার পথে পড়ে এই নদী।

হুগলি জেলার সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। হুগলির জমি যে কত উর্বর ছিল সেকথা প্রমাণ করে গিয়েছেন উইলিয়াম উইলকক্স। তিনি বলেছেন ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের আগে, অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের কুফলগুলি ফুটে ওঠার আগে পর্যন্ত সারা ভারতে বর্ধমান-হুগলি ছিল কৃষিতে প্রথম, দ্বিতীয় স্থান ছিল মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলার। হুগলি-বর্ধমান ছিল তখন খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। রেলপথ তৈরী হবার পর উঁচু রেলপথ ও তার জন্য নির্মিত বাঁধ জলস্রোতের পথ অবরুদ্ধ করে দেয়। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে বাঁধ কেটে জল নেওয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকার আইন তৈরী করেন। এরই ফলে সুরু হয় এখানকার দুর্দশা। জমিতে দেখা দেয় সেচের অভাব। ম্যালেরিয়ায় গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হয়ে যায়। এমন কি গ্রামে গ্রামে দেখা দেয় পানীয় জলের অভাব। হুগলি জেলার কৃষি-সমৃদ্ধি এই সব ঘটনায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মানিকরাম চট্টোপাধ্যায় এ সব দেখে যাননি। তিনি রেল লাইন দেখেননি। বাঁধ দেখেননি। বনবাদাড় সাফ করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটাবার বৃটিশ নীতি দেখেননি। তিনি ম্যালেরিয়া, দারিদ্র্য ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ও দেখেননি। তাঁর সময়ে হুগলি জেলায় অন্ততঃ একশো বিভিন্ন রকম ধান উৎপন্ন হত—দাদখানি, হাতিশাল ঝিঙ্গেশাল বাঁকতুলসী কাটারিভোগ নাগরা ইন্দ্রশাল কার্তিকশাল রামশালী বাঁশফলি সিতাহার পিঙ্গাশোল কর্ণশাল কাশফুল ইত্যাদি। বর্ধমান-হুগলি থেকে চিরকালই চাল রপ্তানী হত। ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজার কুঠির কর্তা মিঃ জন কার হুগলি থেকে কোন মাসে কোন জিনিস সুবিধা দরে কিনতে পাওয়া যায় তার একটি তালিকা পাঠিয়েছিলেন। এই জেলায় বণিকগণ জুলাই ও আগষ্ট মাসে একবার ও ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে আর একবার ধান কিনে নিত বলে ঐ তালিকা থেকে জানা যায়।

এখানে সব রকম ফসল খুব সস্তা দেখে ইংরেজ বণিক সভা বলেছিলেন, হুগলি বাংলার চাবিকাঠি লর্ড ক্লাইভ বলেছিলেন বর্ধমান-হুগলি অঞ্চল বাংলার শস্যাগার। চন্দননগর-শ্রীরামপুর-চুঁচুড়া অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল

চীন-তিব্বত পারস্য ব্রহ্মদেশ ও ইয়োরোপের দেশগুলির সঙ্গে। কলকাতা তখনো বড় কিছু হয়নি। কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি সবে সুরু হয়েছে। কিন্তু চন্দননগর এলাকা তখনো উজ্জ্বল রোশনাই জ্বেলে রেখেছে।

সাধারণ লোকের অন্নাভাব ছিল না। এখনকার নয়া পয়সার হিসাবে মানিকরামের সময়ে ধানের দাম ছিল পঁচিশ পয়সায় মণ—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে দাম বেড়ে হয় এক টাকা ত্রিশ পয়সায় মণ। গরীব লোকরা রাতের আহার অনেক সময় সারত খিচুড়ি দিয়ে—তাও ঘি মাখন সহযোগে।

গ্রামাঞ্চলে সাধারণ লোক জামা কাপড় বেশি গায়ে দিত না; অনাবৃত দেহে থাকতে ভালোবাসত। জুতার ব্যবহার বেশি ছিল না। পাকা বাড়ি গ্রামে দেখা যেত না। ঘরে আসবাব-বাহুল্য বেশি ছিল না। লোকের প্রয়োজনবোধ বেশি ছিল না। জীবন-সংগ্রাম কথাটাই তখন লোকে শোনেনি।

মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের ছিল পঞ্চাশ একর ধানী জমী। এ ছাড়াও তাঁর নগদ আয় ছিল। তিনি খুবই স্বচ্ছল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, ভোগ-বিলাস থেকে দূরে থাকতেন। পার্থিব উচ্চাশা তাঁর ছিল না। তাঁর পরিবারও বৃহৎ ছিল না। সাংসারিক উদ্বেগ তাঁকে বিশেষ বহন করতে হয়নি। তাঁর নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ জীবনের সকল অবকাশ তিনি ভরিয়ে তুলেছিলেন অপার্থিবের ধ্যানে। বাস্তব জগতের পীড়ন থেকে মুক্ত থাকায় তিনি অধিকাংশ সময়টাতেই বাস করতে পারতেন ভাবলোকে।

তিনি কবি-সাহিত্যিক ছিলেন না, পাড়ার যাত্রা থিয়েটারেও অংশ নিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। তাহলে কোন সাধনায় সময় কাটত তাঁর? ভগবানের ধ্যান, পরলোকের চিন্তা, ঈশ্বরের আরাধনা, গৃহদেবতা রঘুবীরের সেবা-পূজায় তিনি আনন্দে দিন কাটিয়েছেন।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি বাংলার ভাব জগতে দুটি কণ্ঠ দুটি পৃথক সুর তুলেছিল। একটি কণ্ঠ ভারতচন্দ্রের, আর একটি রামপ্রসাদের। তাঁদের উভয়েরই পশ্চাৎপটে ছিল বৈষ্ণব যুগের অবশেষ। মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-ভাবনারও ঐ একই প্রেক্ষাপট, কারণ তিনিও ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সমসাময়িক।

কবি জয়দেব যে বৈষ্ণব গীত উচ্চারণ করেছিলেন তাতে লৌকিক কামনা ও প্রেম অলৌকিক ভক্তি ও ভাবের রাজ্যে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। এই খাতেই দীর্ঘকাল বাংলার ভাব সাধনা চলেছে তারপর। আঠারো শতকে প্রাকৃত শৃঙ্গার

রস নিজস্ব স্বভাবে স্ফূর্তি পেতে চাইল,—বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলনের প্লাবন তখন অবসিত হয়ে এসেছে। রসিকসমাজ কাব্যের কাছে নতুন দাবী জানাল। ধর্মীয় রীতি প্রথা বজায় রাখা হল! কিন্তু কাব্যদেহ থেকে উদ্গত হল তীব্র মধুর কটু ভাষায় বাস্তব জীবনসম্ভব রস। ভারতচন্দ্র যুগের এই দাবীটি পরিপূরিত করতে পেরেছিলেন। তিনি ভারভক্তির দৃষ্টিতে জগৎকে দেখেননি: দেখেছেন প্রাকৃত দৃষ্টিতে, আর সে দৃষ্টি কৌতুকমিশ্রিত। ভারতচন্দ্র তাঁর কালের একজন সেকুলার-আরবান মানসপ্রকৃতিযুক্ত মানুষ। তাঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতা তীক্ষ্ণ, তাঁর ওষ্ঠাধরে ব্যঙ্গ, শব্দ ও ছন্দের সঙ্গীতের প্রতি তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ, লঘুতরল ও সপ্রতিভ তিনি। যুগ-সঙ্কটের রূপটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ও তাঁর কাব্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সে রূপ। তিনি প্রাচীন কালকে বিদায় দিচ্ছেন, নতুন কালের চরিত্রলক্ষণের প্রাগুদ্ধার করছেন। আসন্ন সে নব কাল প্রাকৃত ভূমিতে মানুষের প্রতিষ্ঠা দাবী করবে —সে মানুষ দেবতা নয়, দিব্যভাবমণ্ডিত নয়, ক্ষুধাতৃষ্ণাকামকাতর সে পার্থিব মানুষ।

রামপ্রসাদ অন্য এক মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে মানুষ চৈতন্যময়। ক্ষুধা ও অভাব তাঁর অজানা ছিলনা, জীবিকার সন্ধান তাঁকেও করতে হয়েছে, কিন্তু অন্তরের গভীরে এই আশ্বাস তাঁর সদা বর্তমান ছিল যে জগৎটাই চৈতন্যময়; —সে চৈতন্যও মানবিক প্রয়োজন ও আবেগ-অনুভূতি নিরপেক্ষ নয়। হাসি অশ্রুতে, মিলন বিরহে, উল্লাসে অভিমানে সে পরম চৈতন্যও তীব্র সংবেদনশীল হতে পারে—ক্ষুদ্র মানবিক চেতনাজাত স্পন্দন-কম্পন মহাচৈতন্যসমুদ্রে আবেগ-তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। রামপ্রসাদের বিশ্ব করুণাময়ী বিশ্বজননীর কোল মাত্র—সেখানে মর্ত্য মানুষের জন্যও আশ্রয় ও প্রশ্রয় আছে, কান্নাহাসির দোল দোলানো একটা ভূমি আছে, রস রহস্য কোন্দল সবেরই অবকাশ আছে— কিন্তু সেই ভূমিতে মানুষ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ চৈতন্যময় পরম মৌলিক হয়ে যায়। যুগ বলতে যদি শতাব্দী ধরি তাহলে রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের মতো যুগন্ধর কবি নন—কিন্তু বাহিরের যুগাবরণের নিচে স্রোতস্বিনীর মতো গূঢ়ভাবে বহমান শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী যদি আর একটি যুগপ্রবাহ আবিষ্কার করি তাহলে রামপ্রসাদ তার কবি।

মানিকরাম চট্টোপাধ্যায় কতদুর শিক্ষিত ছিলেন জানা যায় না, যুগের ভাবতরঙ্গ তাঁকে কতখানি স্পর্শ করেছিল তাও জানিনা। তবে তাঁর বংশ

শিক্ষাবর্জিত বংশ নয়, সেকালের সৎ ব্রাহ্মণের চরিত্রগুণে ভূষিত ছিলেন তাঁরা। লেখাপড়া সেকালে বাংলায় ভদ্র বংশের সবাই করতেন, প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ছিল, পাঠশালা সব গ্রামেই ছিল, টোল চতুষ্পাঠীর কোনো অভাব ছিল না। উইলিয়াম কেরির শ্রীরামপুর মিশন পরিচালিত এক সমীক্ষার রিপোর্টে জানা যায় যে ইংরেজ শাসন আরম্ভ হবার সময় প্রাথমিক শিক্ষা বাঙালী মাত্রেই লাভ করত।

চট্টোপাধ্যায়রা ছিলেন ধর্মভীরু, পরম নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে প্রতিটি ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুষ্ঠান মানতেন। বংশ পরম্পরায় তাঁরা দেরেগ্রামে বাস করে এসেছেন—তাঁরা ছিন্নমূল ছিলেন না, ঐতিহ্যশাসিত ছিল তাঁদের জীবনযাত্রা। গ্রামের লোকরা তাঁদের সততা, ধার্মিকতা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য সম্মান করতেন। তাঁরা ব্রাহ্মণোচিত জীবনযাপন করতেন। বিবেক ও শাস্ত্রের বাণী কখনো তাঁরা লঙ্ঘন করেননি। সেকালের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলন তাঁদের করারই কথা। যুগের ভাবান্দোলনগুলি শিক্ষিত সংস্কৃতিবান সৎ মানুষকে স্পর্শ করে যাবে এটাই স্বাভাবিক

মানিকরাম কবে মারা যান তা ঠিক জানা যায়নি, তবে উনিশ শতকের আবির্ভাব-লগ্নেই সম্ভবত। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষুদিরাম তখন পূর্ণ যুবক।

মানিকরামের তিন ছেলে ও একটি মেয়ে। বড় ক্ষুদিরাম, জন্ম ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দ। তারপর মেয়ে রামশীলা। তারপর নিধিরাম ও রামকানাই।

সেকালে অল্প বয়সে বিয়ে হত; ক্ষুদিরামেরও হয়েছিল। প্রথমা পত্নী বালিকা বয়সেই মারা যায়। তারপর চব্বিশ বছর বয়সে তিনি আবার বিয়ে করেন। পত্নীর বয়স আট। নাম চন্দ্রমণি—ডাকনাম চন্দ্রা। চন্দ্রার বাপের বাড়ি সরাটিমায়াপুর গ্রামে। ১৭৯৮ সালে এ বিয়ে হয়। তখনো মানিকরাম বেঁচে আছেন। ক্ষুদিরাম-চন্দ্রাই শ্রীরামকৃষ্ণের জনক-জননী।

মা-বাবা কেমন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণই সে বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন: "আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চলতেন, গাঁয়ের দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠত। বলত, ঐ তিনি আসছেন। যখন হালদার পুকুরে স্নান করতে যেতেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। খপর নিত, উনি কি স্নান করে গেছেন? 'রঘুবীর রঘুবীর' বলতেন আর তাঁর বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত।

বাবা কখনো শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই। পূজা জপ ধ্যানে দিনের মধ্যে

বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। রোজ সন্ধ্যা করবার কালে 'আয়াহি বরদে দেবি' এইসব গায়ত্রীর আবাহন উচ্চারণ করতে করতে বুক রক্তবর্ণ হত, দুচোখ জলে ভেসে যেত। আবার যখন পূজাদি না করতেন তখন তিনি রঘুবীরকে সাজাবার জন্যে সূচ সূতো ও ফুল নিয়ে মালা গেঁথে সময় কাটাতেন। মিথ্যাসাক্ষ্য দেবার ভয়ে তিনি পৈতৃক ভিটে ছেড়েছিলেন। গ্রামের লোক ঋষির মতো তাঁকে মান্যভক্তি করত:

আমার মা ছিলেন একেবারেই সরল। সংসারের কোনো বিষয় বুঝতেন না; টাকা পয়সা গুণতে জানতেন না। কাকে কোন বিষয় বলতে নাই তা না জানাতে নিজের পেটের কথা সকলের কাছেই বলে ফেলতেন, তাই লোকে তাঁকে 'হাউডো' বলত। তিনি সবাইকে খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন।"

ক্ষুদিরাম তখন বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁর বাবা মানিকরাম মারা গিয়েছেন চন্দ্রমণি ঘরে আসার দু বছরের মধ্যে। কিন্তু তার আগেই, চন্দ্রমণি চট্টোপাধ্যায়-বাড়িতে আসার আগেই, রামশীলার বিয়ে হয়েছে সেলিমপুর গ্রামের ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেলিমপুর কামারপুকুর থেকে আঠারো কিলোমিটার পশ্চিমে—খুব কাছে নয়। রামশীলার একটি ছেলে হয়েছে, নাম রামচাঁদ। এক মেয়ে হয়েছে, নাম হেমাঙ্গিনী। মামার বাড়িতেই হেমাঙ্গিনী জন্মায়, মামাদের বড়ো আদরের ধন। রামচাঁদও কম আদরের ছিল না।

চন্দ্রা যখন বধূ রূপে ঘরে আসেন আট বছর বয়সে তখন শ্বশুর জীবিত, দুই দেওর বর্তমান, ভাগ্নের বয়স ছয়, ভাগ্নীর বয়স এক। দেওর দুজন তখনো অবিবাহিত। দেরে গ্রামের সংসার সুখের সংসার। মানিকরাম এই সুখের সংসার রেখে মারা যান।

ক্ষুদিরাম দীর্ঘদেহী ও সবল পুরুষ ছিলেন। গায়ের রঙ ফরসা, সুদর্শন যুবক। তিনি শিক্ষিত, সৎ, আনন্দময় মানুষ ছিলেন। ক্ষমা ও ত্যাগ ছিল তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। বাবা যখন মারা গেলেন, উনিশ শতকের সেই প্রবেশ-দ্বারে, ক্ষুদিরাম নিজের কাঁধে সংসার ও বিষয়ের ভার তুলে নিলেন স্বচ্ছন্দে। রাষ্ট্রীয় ভাঙা গড়ায় তিনি মনোনিবেশ করেননি। গ্রাম সীমানায় সন্তোষের সঙ্গে বাস করে বংশের ঐতিহ্য বহন করেছিলেন তিনি—সেই গরীব ও অন্ত্যজদের সেবা, আর গৃহে শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য পূজা-বন্দনা-আরাধনা। রামভক্ত পরিবার—এদের বংশের সকলের নামের সঙ্গে 'রাম' শব্দটি যুক্ত

থাকত। এমনকি হেমাঙ্গিনীর পুত্রেরও নাম হয় হৃদয়রাম। হেমাঙ্গিনীর অগ্রজের নাম তো রামচাঁদ ছিলই। শ্রীরামকৃষ্ণের 'রাম' বংশজ ধারায় এসেছে।

ক্ষুদিরাম ন্যায় ও ধর্ম পথে, পরিবার ও গ্রামবাসীর শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত থেকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। সরল বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখতেন—ঘোরপ্যাচে যেতেন না। কিন্তু তিনি বোকা, অলস, অকর্মণ্য ছিলেন না। বাবার বিষয় সম্পত্তি তিনি নষ্ট করেননি, বরং তাঁর ধন সম্পদ বেড়েই গিয়েছিল।

প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে নিত্যকৃত্য ও সন্ধ্যাবন্দনা; পূজার ফুল তোলা; রঘুবীরের পূজা—তারপর প্রাতরাশ। শূদ্রের বাড়ি তিনি পূজা করতে যেতেন না, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ নিতেন না, যে সব ব্রাহ্মণ মেয়ের বিয়েতে পণ নিত (পাত্র পক্ষকেই পণ দিতে হত) তাদের হাতের জলও পান করতেন না। নির্লোভ ও আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

রাজা রামমোহনের সমবয়সী তিনি, কিন্তু প্রকৃতিতে কতই না ভিন্ন তাঁরা! ক্ষুদিরাম ও তাঁর বংশ কখনো রাজ-সন্নিধানে আসেননি। তাঁরা রাষ্ট্রতন্ত্রের লোক নন। পার্থিব উচ্চাশার সংক্রাম ঘটেনি তাঁদের চিত্তে। এমনকি সংস্কৃতি-জগতেও এঁরা নেতৃত্ব কামনা করেননি। পণ্ডিত বা কবি হবার বাসনা তাঁদের ছিল না।

আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও—কয়টা বাগান, কয়টা গাছ, কত ডাল পালা—অত খবরে দরকার কী? এ যেন ঐ চট্টোপাধ্যায় বংশেরই মনোভঙ্গী। মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ—এও যেন ঐ বংশেরই কথা।

মানিকরাম বা ক্ষুদিরাম যে জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তাতে ভেজাল ছিল না। ঈশ্বরের উপাসনাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ—তাঁদের জীবন ছিল ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে আবর্তন। নিয়মে বাঁধা ছিল তাঁদের জীবন যাত্রা, পরম্পরা দ্বারা শাসিত, ঐতিহ্যের আবেষ্টনীতে ধৃত। কিন্তু সংযত, শুদ্ধ ও তপোময়—গ্রাম্য নিম্নরুচির দ্বারা আবিল নয়। আবার দেখি, মানবিক তাঁরা, সদয়, প্রেমপ্রীতিময়—কর্তব্যবোধকে লঙ্ঘন করেননি, দায়িত্বকে করেননি অস্বীকার। সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণ—না করেছেন বহু বিবাহ, না করেছেন পত্নী-নিপীড়ন। এঁদের বংশে সহ মরণের স্মৃতিও নেই। আচারনিষ্ঠ কিন্তু মানুষের মাথায় পা তোলেননি—ভূস্বামী কিন্তু প্রজাপীড়ক নন। অর্থ-

লোভে যথাতথা পূজো দিতে ছোটেননি যেমন, তেমনি গরীব ও অন্ত্যজদের ভালোবেসেছেন, সাহায্য ও খাদ্যবস্ত্র জুগিয়েছেন।

এই চট্টোপাধ্যায় বংশ ধর্মপ্রাণ, কিন্তু বৈরাগী নন। বিষয়কে এঁরা বিষবৎ পরিত্যাগ করেননি। বৈদান্তিক মায়াবাদে এঁরা আশ্রয় নেননি। বিষয়ের অসদ্ব্যবহার করেননি—বিত্ত স্বাচ্ছন্দ্য আনেনি এঁদের মনে অহঙ্কার, আনেনি বিকার। ভক্তিমান, কিন্তু ভক্তির উদ্বেলতায় আত্মহারা হননি; এঁরা কোনো ব্যাপারেই ভেসে যাননি। শান্ত, সংযত, শ্রীময় এঁদের জীবনযাত্রা; সহজ আড়ম্বরশূন্য মানবিকতা এঁদের বৈশিষ্ট্য। দেশোদ্ধারে যেমন এঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েননি, তেমনই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাঁধেনি এঁদের স্বার্থ সংঘাত। আত্মীয়রা তো আত্মীয়ই; গ্রামের লোকজনও পর নয়।

ক্ষুদিরাম এমন ভাবেই এক সর্বতোভদ্র জীবন যাপন করছিলেন,—সুখে সন্তোষে শান্তিতে নিরবচ্ছিন্ন আত্মিক সাধনায়। দুই ভাইকে বিয়েও দিয়েছিলেন। ঘর ভরা লোক, গোলা ভরা ধান, ব্যসনহীন নৈরাশ্যহীন জীবন। ক্ষুদিরামের খরচ হত তীর্থ ভ্রমণে। বিয়ের পর বালিকা বধূকে ঘরে রেখেই তিনি কাশী অযোধ্যা বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। তারপর প্রথম পুত্রের জন্ম—নাম রাখলেন রামকুমার। এর অনেক দিন পর তিনি আবার গিয়েছিলেন সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও দক্ষিণ ভারতের তীর্থ সমূহে। তারপর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম—নাম রাখেন রামেশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের আগে ক্ষুদিরাম গয়াধাম যান। সেকালে তীর্থযাত্রা হত পায়ে হেঁটে, খরচ খুব বেশি হত না।

এই সম্পূর্ণ আত্মপ্রকৃতিস্থ নির্বিবাদী মানুষটি রূঢ় জগতের কাছ থেকে একটি নিষ্ঠুর আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর ধর্মপরায়ণতাই তাঁর বিপদের হেতু হয়ে দাঁড়াল। ধর্মই তাঁকে পরীক্ষা করছিলেন—তাঁকে ওজন করে নিচ্ছিলেন নিখুঁত তৌলদণ্ডে। ক্ষুদিরামের ধর্মবল পরীক্ষা না করে নিয়ে ভগবান তাঁর ঘরে লীলাবিগ্রহ ধারণ করে মানব তনুতে আসবেনই বা কেন? ভক্তের প্রতি, উপাসকের প্রতি রঘুবীর রামচন্দ্র লীলাকৌতুকপরায়ণ হলেন। এক মুহূর্তে ক্ষুদিরামের জোত জমি মায় বসত বাড়ি উধাও হয়ে গেল।

দেরে গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায়। তিনি বাস করতেন পাশের গ্রাম সাতবেড়েয়। প্রজাপীড়নের জন্য কুখ্যাত এই জমিদার রেগে গেলে প্রজাকে সর্বস্বান্তও করতেন। লোকপ্রবাদ এই যে ইনি নির্বংশ হয়েছিলেন ও এঁর মৃত্যুর পর জমিদারিও পরহস্তগত হয়।

দেরে গ্রামের একজন লোকের ওপর রামানন্দ রায়ের ক্রোধ জন্মে। লোকটির বিরুদ্ধে আদালতে তিনি মিথ্যা অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করলেন। সেজন্য একজন ভালো সাক্ষীর দরকার হয়ে পড়ল তাঁর। আদর্শ সাক্ষী ক্ষুদিরাম, ধর্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, নির্লোভ। ক্ষুদিরামকে সবাই জানে ও শ্রদ্ধা করে—উপরন্তু আদালতে তিনি কখনো যাননি, যেতেন না প্রয়োজনেও। রাজা ও আদালত দুই-ই তাঁর কাছে দূরের জিনিস—এড়িয়ে থাকাই ভালো মনে করতেন। কিন্তু ঐ সব কারণেই আদালতে তাঁর দাম ছিল—তিনি পেশাদার সাক্ষী নন, তাঁর নির্মল চরিত্র, তাই তাঁর সাক্ষ্যের দাম অনেক। আদালতে সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে রামানন্দ রায় ক্ষুদিরামকে নিজ পক্ষে সাক্ষ্য দিতে বললেন। অনুরোধের পিঠোপিঠি ছিল হুমকি: কথা না রাখলে বিপদ হবেই।

ক্ষুদিরাম সবই জানলেন, বুঝলেন। শান্তিপ্রিয় মানুষ যেচে বিপদ ডেকে আনছেন তাও বুঝলেন। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন না। সত্য ত্যাগ করলেন না। প্রলোভন অথবা ভয় ব্যর্থ হল। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলেছিলেন মাকে সব দিয়েছি কিন্তু সত্য দিই নাই—সত্য গেলে মা দাঁড়ান কোথায়? তিনি যখন বলতেন, সত্য কথাই কলিযুগের তপস্যা, সত্যকে আঁট থাকলেই ঈশ্বর লাভ হয়—তখন মনে পড়ে এ তাঁর পিতৃ-ঐতিহ্য, সত্যনিষ্ঠ পিতার মহৎ উত্তরাধিকার। বড় বেশি মূল্য দিয়ে ক্ষুদিরাম সত্যটুকু রক্ষা করেছিলেন—বিচারক ধর্ম হার মেনেছিলেন এই গ্রামীণ সরল মানুষটির কাছে। নিরপরাধকে বিপদে ফেলতে আঙুল তুলেও সাহায্য করেননি ক্ষুদিরাম—মানবতার পরীক্ষায়ও সমর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন তিনি। এমন বাবা না হলে এমন ছেলে হয়?—শ্রীশ্রীসারদা দেবী নিজেই একথা বলেছেন।

রামানন্দ রায় ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধেই আদালতে মামলা দায়ের করলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা—ইংরেজের আইন-কানুন ও আদালত দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। সেই আইন মতে সেই আদালত নির্দ্বিধায় রায় দিয়ে দিল সম্পত্তিতে ক্ষুদিরামের অধিকার নেই, তাঁর বহু পুরুষের বাস্তু ভিটাও তাঁর নয় —সবই নিলামে চড়ানো হল ও নিলামে বিক্রী হয়ে গেল। দেরে-সাতবেড়ে-নারায়ণপুরের লোকরা ধার্মিকের এরকম অন্যায়ভাবে সর্বস্বান্ত হওয়ায় চোখের জল ফেলল, কিন্তু আইনের শাসনের কাছে তারা অসহায়, আদালত ছোট হলেও প্রবল রাজশক্তি তার পিছনে দণ্ডায়মান—মানুষ রইল অধোবদন হয়ে। জয় হল রামানন্দের।

ক্ষুদিরাম ছোট আদালত থেকে নালিশ নিয়ে বড় আদালতে গেলেন না, রামানন্দ রায়ের সর্বনাশ কামনা করলেন না, ভুলেও কোনোদিন প্রতিশোধের কথা তিনি ভাবেননি। আদালত ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহভাবও তাঁর মনে জাগেনি—ইংরেজ রাজত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছিল না। তিনি জানতেন উপাস্য যখন রঘুবীর তখন দুঃখই তাঁর পূজার ফুল। ভক্তের অশ্রুমুকুল তিনি বড় ভালোবাসেন। ভক্তই বা কেন? যেখানে তাঁর আবির্ভাব সেখানেই দেখা দেয় বিপদ ও সর্বনাশ। বাবা দশরথের কী হয়েছিল? মা কৌশল্যার? পত্নী সীতা রয়ে গেলেন জনমদুঃখিনী। স্বর্ণ-লঙ্কা হয়েছে ছারখার—রাবণ রাজা নির্বংশ। সুখের দেবতা তিনি নন—তিনি আসেন দুঃখে ও ঝঞ্ঝায়, বেদনার বালুচরে তাঁর আসন পাতা। দেরে গ্রামের পুরুষানুক্রমিক ভিটায় দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা সম্পূর্ণ করলেন। সর্বস্ব নিবেদন করে পূর্ণাঙ্গ হল তাঁর আরতি।

ক্ষুদিরাম উদ্বাস্তু হলেন। তাঁর সংসারে তখন লোক কম ছিল না। পুত্র রামকুমার, বয়স নয় বছর; কন্যা কাত্যায়নী, বয়স চার বছর; দুই ভাই নিধিরাম ও কানাইরামও বিবাহিত, বয়স ত্রিশ ও পঁচিশ। তাঁদের ছেলে মেয়ে তখন ছিল কিনা জানিনা। ক্ষুদিরামের বয়স তখন উনচল্লিশ, পত্নী চন্দ্রমণির বয়স তেইশ।

ক্ষুদিরাম এ বিপদপাতে স্থির রইলেন। তিনি দুর্জনসংসর্গ ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে দেরে গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তিনি চাকরির খোঁজে বেরোলেন না, বাণিজ্যাভিসারীও হলেন না, সাহায্য ভিক্ষাও করলেন না কারও কাছে। যে মারে সেই রাখে। রঘুবীর না চাইলে রামানন্দ রায়ের সাধ্য ছিল কি তাঁকে গৃহচ্যুত করার? ধর্ম স্বয়ং বিধান না করলে আদালত ও আইন কি পারত তাঁর সম্পত্তি হরণ করতে?

এ জীবনসঙ্কটে সব অবলম্বন ছেড়ে ক্ষুদিরাম রঘুবীরের শরণাগত হলেন। শরণাগতি, শরণাগতি—শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিতেন। এসো আমরা দুহাত তুলে নাচি—বগলে সুতোর পুঁটুলি না রেখে—হরিপাদপদ্মে শরণ নিই। ক্ষুদিরামের জীবনে এ তত্ত্ব পরীক্ষিত হয়েছিল—পুত্রের বাণীর পশ্চাতে পিতার উপলব্ধি বিদ্যমান ছিল।

ঝড়ের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভালো জায়গায় গিয়ে পড়ল—কখনও বা ঝড়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ল—ঝড় যে দিকে লয়ে যায়!

তাঁতি বললে, রামের ইচ্ছায় ডাকাতি হোলো, রামের ইচ্ছায় আমাকে পুলিসে ধরলে—আবার রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলে!

হনুমান বলেছিল—হে রাম, শরণাগত ;—এই আশীর্বাদ কর যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!

কোলা ব্যাঙ মুমূর্ষু অবস্থায় বললে—রাম, যখন সাপে ধরে 'তখন রাম রক্ষা কর' বলে চীৎকার করি। কিন্তু এখন রামের ধনুক বিঁধে মরে যাচ্ছি, তাই চুপ করে আছি।

১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল, প্রাণকৃষ্ণ ও মাস্টারমশাই প্রমুখকে এই উপদেশগুলি যখন দিচ্ছিলেন তখন শ্রোতারা কেউ জানতেন না যে সত্তর বছর আগে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নিজের জীবনে এই কথাগুলি ধারণ করে গিয়েছেন—ওগুলি কথা মাত্র নয়, চট্টোপাধ্যায় বংশের রাম-উপাসনার নির্যাস!

উল্লেখপঞ্জী

১। He was a wonderful mixture of god and man.
Prof F. Max Muller :
Ramkrishna, His Life and Sayings. Advaita Ashram, 1951 Edition, p. 68

২। Romain Rolland : The life of Ramkrishna, Prelude অংশ দ্রষ্টব্য। এই অংশের ২ নং পাদটীকায় রলাঁ তাঁর ভাবটি পরিস্ফুট করেছেন।

৩। Sri Ramkrishna's message was unique in being expressed in action. The message itself was the perennial message of Hinduism....... His religious activity and experience were, in fact, comprehensive to a degree that had perhaps never before been attained by any other religious genius, in India or elsewhere......, Sri Ramkrishna made his appearance and delivered his message at the time and the place at which he and his message were needed....... At this supremely dangerous moment in human history, the only way of salvation for mankind is an Indian way.

Swami Gahanananda : Sri Ramkrishna and His Unique Message, 1970 Edition—এ ডঃ আর্নল্ড টয়নবি লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪। A phenomenon is often something extraordinary and mysterious: most of all to those who were best fitted to understand him. A phenomenon is always a fact, an object of experience. That is how I shall try to approach Ramkrishna,—Christopher Isherwood : Ramkrishna and His Disciples, p. 1

৫। Life of Sri Ramkrishna, published by Advaita Ashram

৬। Moreland : India at the Death of Akbar, p. 271 ঐ পৃষ্ঠায় মোরল্যাণ্ড স্বীকার করেছেন : the lower classes were better off as consumers.

৭। সুধীরকুমার মিত্র : হুগলী জেলার ইতিহাস।

৮। সারদানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ।

৯। শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

১০। অক্ষয়কুমার সেন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি

২

কামারপুকুর

বাস্তুচ্যুত, উদ্বাস্তু, শরণার্থী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে এখন আমরা সুপরিচিত—বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। কিন্তু প্রাচীন কালেও এরকম লোক ছিল। প্রাচীন মিশরে ইহুদী ধর্মগুরু মোজেজের অনুগামীরা ছিলেন বাস্তুহারার দল।

প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বাস্তুচ্যুত লোকদের বলতেন de'racine। অনিকেত তারা। টয়নবি বলেন, এমন লোকদের ভিতর থেকেই আবির্ভূত হন প্রফেট বা ধর্মস্থাপক।

সপরিবারে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় বাস্তুহারা হলেন। তাঁর দুই অনুজ নিধিরাম ও রামকানাই নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ির সাহায্যে নতুন পারিবারিক প্রতিষ্ঠার পথে চলে গেলেন। কোথায় তাঁদের শ্বশুরবাড়ি ছিল সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক, কেননা তাঁদের সমস্যার সমাধান সহজে হল বলেই তাঁরা বর্তমান কাহিনীবৃত্তের বাইরে চলে গেলেন। রামকৃষ্ণমণ্ডলে তাঁরা বা তাঁদের সন্ততিরা আর ফিরে আসতে পারেন নি। তবে কানাইরামের পুত্র রামতারক বা হলধারী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রামকৃষ্ণ—সঙ্গে কাটিয়েছেন কিছুকাল।

অভিশপ্ত হল দেরে গ্রামও। অপরিচিতির মধ্যেই সে তলিয়ে গেল। কোনো তীর্থপথিক সেখানে যায় না।

নিরাশ্রয় ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবীকে সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে স্থান দিয়েছিল কামারপুকুর। সেও একখানি গ্রাম—দেরে গ্রামের অনতিদূরেই অবস্থিত। সজ্জন, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগত, ধর্মের ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়েই বাস্তুচ্যুত, সত্যপরায়ণ একজন মানুষকে সাদরে ও শ্রদ্ধায় আহ্বান করে ঠাঁই দেবার পুণ্যে কামারপুকুর আজ বিশ্বখ্যাত। বহু দূর দেশের তীর্থযাত্রীর সমাগমে নিত্যই মুখর।

কামারপুকুর একখানি ছোট গ্রাম। কামারদের একটি বড় পুকুর থাকায় গ্রামটির ঐ নাম। পুকুরটি এখনো আছে—জল পরিচ্ছন্ন নয়। স্নান করা চলে, পান করা যায় না।

আসলে তিনটি গ্রামের সমষ্টি কামারপুকুর—শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দপুর। কামারপুকুরে জমিদার গোস্বামীরা ও পরে লাহাবাবুরা থাকতেন বলে ঐ গ্রামটির প্রাধান্য হয় ও বাকি দুটি গ্রাম যেন দুটি পাড়ার মতো ঐ গ্রামের সঙ্গে মিশে যায়।

হুগলি জেলার উত্তর-পশ্চিমে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর যেখানে এসে মিলেছে তার কাছেই কামারপুকুর অবস্থিত। পাঁচ কিলোমিটার দূরে জয়রামবাটি বাঁকুড়ার অন্তর্ভুক্ত।

কামারপুকুর থেকে বর্ধমান শহর ৪৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বর্ধমান শহর থেকে একটি পাকা রাস্তা এসে কামারপুকুরকে অর্ধ-বেষ্টন করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পুরী ধামের দিকে সেকালেই চলে গিয়েছিল। এখন তো পিচ রাস্তা হয়েছে। এখন ক্ষণে ক্ষণে বাস ছুটে চলে কামারপুকুরের বড় রাস্তা দিয়ে, দোকানপাট হোটেল অফিসে স্থানটি সরগরম। পুরনো কামারপুকুরের মুখশ্রী বেমালুম পালটে গিয়েছে—এখন নিওন আলোর রোশনাই। বেশ তেজী ব্যবসা-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে কামারপুকুর, যাতায়াত সুগম।

ক্ষুদিরামকে যখন বুক পেতে নিয়েছিল কামারপুকুর তখন বর্ধমান মহারাজের গুরুবংশীয় গোস্বামীদের লাখেরাজ জমিদারিভুক্ত ছিল গ্রামটি। জমিদার ছিলেন গোপীলাল ও সুখলাল গোস্বামী। গোপীলাল গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ শিবলিঙ্গ গোপীশ্বর শিব নাম নিয়ে আজও আছেন। গোপীলাল সুখলালের পূর্বপুরুষ—কিংবা একই ব্যক্তির ঐ দুই নাম, গ্রাম্য প্রবাদ থেকে তা উদ্ধার করা যায় না। তবে সুখলালের ছেলে কৃষ্ণলাল গোস্বামীর কাছ থেকে লাহাবাবুরা গ্রামের অধিকাংশ জমি কিনে নেন।

কামারপুকুরে এখন যাবার পথ হাওড়া থেকে ট্রেণে তারকেশ্বর হয়ে বাসে আরামবাগ ও আরামবাগ থেকে বাসে কামারপুকুর। কলকাতার চৌরঙ্গি থেকে সরকারী বাসেও ঐ পথেই কামারপুকুর যাওয়া যায়—এতে ট্রেণ ও বাস বদলের হাঙ্গামা নেই। তারকেশ্বর থেকে কামারপুকুর ৩০ কিলোমিটার দূর। কামারপুকুর থেকে ২৭ কিলোমিটার দক্ষিণে ঘাটাল—ঐ পথেও আসা যায়। ৩৯ কিলোমিটার পশ্চিমে বন বিষ্ণুপুর—সে পথেও আসা যায়।

কাছাকাছি কিছু ঐতিহাসিক স্থান আছে—যথা গড় মান্দারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পটভূমি। কামারপুকুরের দক্ষিণ-পুব কোণে বর্ধমান সড়কের পাশেই মান্দারণ গ্রাম। সেখানে গড় ও শৈলেশ্বর মন্দিরের

ভগ্নাবশেষ ছিল—বঙ্কিম তাকেই ভিত্তি করেছেন। দামোদর নদীর গতি পাল্টে ঐ গড়ের পরিখা তৈরী হয়েছিল। মোগলমারি যুদ্ধক্ষেত্রও বর্ধমানের পথে পড়ে।

কামারপুকুরের দেড় কিলোমিটার উত্তরে ভূরস্থবো গ্রাম। সেখানে বাস ক'রতেন মানিক রাজা। রাজা নাম দিয়েছে স্থানীয় জনসাধারণ সাদরে। সুখসায়ের, হাতীসায়ের—এসব বড় বড় দীঘি কাটিয়েছিলেন তিনি জনকল্যাণে। ছিল তাঁর একটি মস্ত আম বাগান। লক্ষ ব্রাহ্মণকে অনেকবার নিমন্ত্রণ করে সযত্নে খাইয়েছেন—অব্রাহ্মণরাও বাদ পড়েনি। মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লোকমুখে হয়েছেন মানিক রাজা। তার চেয়েও বড় পুরস্কার তাঁর মিলেছিল। এই জনকল্যাণব্রতী দরদী মানুষটির পরিবারে শিশু ও বালক গদাধর বারবার এসেছেন—তাঁদের সেবা নিয়েছেন, দিয়েছেন অনাবিল আনন্দ। ভগবান রামকৃষ্ণের বাল্যলীলায় মানিকরাজার বাড়ি ও আমবাগান স্থান পেয়েছে। সৎ মানুষ ভগবানের দ্বারাই সম্বর্ধিত হন। ঈশ্বরস্বরূপের আদিলীলায় মানিকের পরিবার অঙ্গীকৃত হয়েছিলেন—তাঁরা শিশু গদাধরকে কোলে করেছেন, সোহাগে মুখে চুমো দিয়েছেন, খাইয়েছেন তাঁকে যত্ন করে।

কামারপুকুর গ্রামে কৃষি ছিল, আজও আছে। কিন্তু অনতিদূরের জয়রামবাটি গ্রামে ঢুকলে যেমন লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্ন মনে হয় সেখানকার কৃষি জমি, কামারপুকুরে ঠিক তেমনটি চোখে লাগে না। এ এক আশ্চর্য কথা। যাহোক, সেকালে কামারপুকুরে শিল্প কাজও যথেষ্ট ছিল। কাপড় তৈরী হত, আবলুস কাঠের ভালো হুঁকার নল তৈরী হত, নামকরা জিলাপি, মিঠাই ও নবাত হত। কলকাতায় এখানকার জিনিস চালান যেত। রামকৃষ্ণ হুঁকা আর জিলাপি দুয়েরই অনুরক্ত ছিলেন। কামারপুকুরের বড় আকারের অমৃততুল্য জিলাপি সস্তা দামে আমরাও খেয়েছি—এখন আকার ছোট হয়েছে, তেমন স্বাদযুক্ত জিনিসটিও নেই।

সেকালে কামারপুকুরে শনি মঙ্গলবারে বসত হাট। চারদিকের গ্রাম থেকে সুতা, কাপড়, গামছা, হাঁড়ি, কলসী, কুলা, চেঙ্গারি, মাদুর, চেটাই, ফল ও ফসল নিয়ে আসত। এখন কামারপুকুর যেন পাইকারী ব্যবসার একটি কেন্দ্র।

গ্রামে দুটি শ্মশান ছিল—ঈশান কোণে বুধুই মোড়ল শ্মশান ও বায়ু কোণে ভূতির খাল শ্মশান। ফকিরচন্দ্র হালদার হালদারপুকুরটি কাটান—আজও তা

আছে : ঘাট-বাঁধানো, স্বচ্ছ জল, স্নানে আরাম। রামানন্দ যুগী নির্মাণ করেছিলেন একটি শিবমন্দির, যা যুগীদের শিবমন্দির নামে এখনও বর্তমান। এই মন্দিরটির পাশ দিয়েই বাস্তু দপ্তর পিচ রাস্তা করে দিয়েছেন। লাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ এখনও আছে। মানিক রাজার আম বাগানটি কিন্তু নেই।

সব বর্ণের লোকই এখানে ছিল ও আছে। চৈত্রে মনসা পূজা ও শিবের গাজন, বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে চব্বিশপ্রহরীয় হরিবাসর ছিল—নিম্ন বর্ণের লোকরাই শুধু নয়, ব্রাহ্মণরাও করতেন সে পূজা। বৌদ্ধ ত্রিশরণ—ধর্ম, সংঘ ও বুদ্ধ—এর ভিতর থেকে ধর্মটিকে আঁকড়ে রেখেছিল জনসাধারণ, তার রূপ দিয়েছিল কূর্মের। এক এক গ্রামে এক এক নামের ধর্মঠাকুর আছেন। কামারপুকুরে ছিলেন রাজাধিরাজ ধর্ম, শ্রীপুরে যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্ম, মধুমাটি গ্রামে সন্ন্যাসীরায় ধর্ম। কামারপুকুরে ধর্মঠাকুরের মন্দির ছিল। তাঁর বড় রথও ছিল—রথযাত্রাও হত। এখন এসব নেই। মন্দির ভেঙে গেলে ধর্মপণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর তাঁর বাড়িতে ধর্মঠাকুরকে নিয়ে যান।

এই কামারপুকুর এখন জগতে বিখ্যাত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান বলে। শ্রীশ্রীসারদা মা বলেন—ঠাকুরের জন্মস্থান, পুণ্যস্থান, মহাপীঠস্থান, তীর্থভূমি।

এখন সেখানে উঠেছে রামকৃষ্ণ-মন্দির। বিশাল ও জমকালো নয়, উদ্ধত নয় তার চূড়া, কাউকে সে স্পর্ধিত চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে না। রামকৃষ্ণের জন্ম-কালীন স্মৃতি আছে রক্ষিত, যে ঢেঁকিশালে জন্মেছিলেন, যে ঘরে বাস করতেন, বৈঠকখানা—সব রক্ষিত আছে; তিনি নিজের হাতে যে আমের চারাটি পুঁতেছিলেন এখনও তা আছে, কত কালের পুরনো বড় গাছটি হয়ে। মন্দিরে পাথরে নির্মিত রামকৃষ্ণ-বিগ্রহ—সমাধিমগ্ন, আসীন। সামনে নাটমন্দির—রামকৃষ্ণ লীলাচিত্র ও তাঁর পার্ষদদের ছবিতে সুশোভিত।

রামের অযোধ্যাভূমি থেকে রামকৃষ্ণের কামারপুকুর কত না পৃথক! বাল্মীকি লিখে গিয়েছেন : "স্রোতস্বতী সরযূর তীরে প্রচুর ধন-ধান্য-সম্পন্ন আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ অতি সমৃদ্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোক-প্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য। ......প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রুমিত্র উভয়েরই একান্ত দুরধিগম্য।" রাজপুরুষ-

সৈন্যদল-বণিক-বারাঙ্গনা শোভিত ঐশ্বর্যময় অযোধ্যা—কিন্তু দুর্গম পাচিলে ঘেরা, প্রহরী অস্ত্র হাতে সর্বদা পাহারা দেয়, প্রবেশাধিকার নেই সর্বসাধারণের। আর কামার-কুমোর-তাঁতি-শাঁখারি-ডোমদের গ্রাম কামারপুকুর—কামারদের পুকুরের নামেই যার নাম—রাজবৃত্ত থেকে তা কত দূর! সে সাধারণের জন্য অবারিত স্থান, তাদেরই স্থান।

তবু তা চিন্ময় ধাম! ভগবানের আবির্ভাব ভূমি, লীলাভূমি! প্রবেশমুখে জলজলে দোকান পাট, আর ভিতরে গরীব লোকদের বসবাস, অশিক্ষিত গ্রাম্যজনের কর্কশ কলহ ইত্যাদি দেখে শুনে প্রতারিত হোয়ো না। ভাব-দৃষ্টিতে কামারপুকুরকে দেখতে হবে—তার বাহ্য রূপটাই সব নয়। ঐ তাঁর বাল্যলীলাক্ষেত্র, তাঁর আত্ম-উন্মেষের ক্ষেত্র। ওখানকার সরল নরনারীরা তাঁকে নিয়ে আনন্দ করেছিল, তাঁকে চিনেছিল, তাঁকে অন্তরের প্রণতি জানিয়েছিল, পূজা করেছিল। বিশ্ব তাঁকে জানার বহু আগে ঐ গ্রামের নিরক্ষরা রমণীরা তাঁকে দেবতার নৈবেদ্য এগিয়ে দিয়েছিলেন—এ কথা জেনেই যে আমাদের গদাই পরম ঈশ্বর! তখন প্রচারের ঢাক বাজেনি, পণ্ডিতদের বিচার সভায় রামকৃষ্ণকে অবতার ঘোষণা করা হয়নি, মথুরামোহনের মতো ধনবান প্রতাপবান মানুষ পিছনে দাঁড়াননি।

বাংলার সুদূর নিভৃত কামারপুকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব-সৌরভে আমোদিত হয়েছিল। তারও আগে এক ব্যথিত, deracine দম্পতিকে,—ক্ষুদিরাম-চন্দ্রমণিকে দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়ে ঈশ্বরের আবির্ভাব-আসন পেতেছিল ধন্য কামারপুকুর।

৩

আবাহন

শাস্ত্র বলেন, ভক্তজনের আকুল আহ্বান ও প্রার্থনায় ভগবান নর জন্ম অঙ্গীকার করেন। রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের আগে ভক্ত কণ্ঠে উচ্চারিত তেমন প্রার্থনা ও আহ্বানের কথা জানা যায় না। কেউ কি সেদিন চেয়েছিলেন মানব তনুতে ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম?

চৈতন্য ভাগবতে দেখি:

এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি, ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমতে এসব জীব পাইব উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥
স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণের কথন॥
সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্বাদ।
"শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র করো সভারে প্রসাদ।"

নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ সমকালীন মানুষদের দুঃখে কাতর হয়ে, তাদের ঈশ্বর-বিমুখতা দেখে ভগবানের কাছে সপ্রেম প্রার্থনা জানিয়েছেন. তিনি যেন এদের প্রসাদ করেন, কৃপা করেন। এই ভক্তদের মধ্যে একজন মহা জ্ঞানী-প্রেমিক ছিলেন: অদ্বৈত আচার্য। তিনি সদয় হৃদয়ে জীবের উদ্ধার চিন্তা করে সিদ্ধান্ত করলেন:

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥
তবে ত 'অদ্বৈত সিংহ' আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ-বল্লভ যদি দেখাম্‌ এথাঞি॥

আনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্বজীব উদ্ধারিয়া॥

এরূপ সংকল্প করে একচিত্ত হয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করতেন অদ্বৈত—এইভাবে কেটেছে বহু বছর। তিনি একা ছিলেন না, তাঁর একটি গোষ্ঠী ছিল। নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁর তিন ভাই, চন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ, মুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস প্রমুখ বেশ কয়েকজন ছিলেন সেই গোষ্ঠীতে। সকলেই ভক্ত; সকলেই জগৎ বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখে ব্যথিত, কৃষ্ণভজনায় সকলেই মগ্ন। নবদ্বীপের লোকরা এঁদের বিদ্রূপ ও বিরোধিতা করলে আচার্য অদ্বৈত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন:

শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব-নয়ন-গোচর॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ, আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লইয়া॥

ভগবান অবতীর্ণ হবেন, সকলে তাঁকে দেখতে পাবে, তিনি নিজেই সকলকে কৃষ্ণভক্তি শেখাবেন। অদ্বৈত ভক্তিসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এতদূর বললেন যে যদি তা না হয় তবে তিনি নিজ দেহ থেকে নারায়ণকে প্রকাশ করবেন—পাষণ্ড দলন ও ভক্তরক্ষাকল্পে।

বলেই শেষ হল না; সগোষ্ঠী অদ্বৈত একচিত্ত হয়ে নিরবধি কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণ-ধ্যান, কৃষ্ণকথা আলাপ ও চোখের জলে প্রার্থনা জানানোয় দিন পাত করতে লাগলেন। চৈতন্যাবির্ভাবের জন্য আহ্বান ও প্রস্তুতি নবদ্বীপের ভক্ত সমাজে ছিল।

স্বয়ং কৃষ্ণের জন্মও অনুরূপ পটভূমিতেই হয়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই, দর্পিত দৈত্যসেনাদের ভারে আর্ত পৃথিবী গাভীর রূপ ধরে কাঁদতে কাঁদতে ব্রহ্মার কাছে আপন দুঃখ জানিয়েছিলেন। ব্রহ্মা দেবতাদের নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গেলেন। সেখানে তাঁরা এক মনে ভগবানের উপাসনায় মগ্ন হলেন। ব্রহ্মা তখন পরমপুরুষের আশ্বাস বাণী শুনলেন: ঈশ্বরের ঈশ্বর শ্রীহরি নিজের কাল শক্তি দিয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন।

স্বয়ং পৃথিবীর আর্ত ক্রন্দনে ও ঈশ্বরভক্তদের প্রার্থনায় কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল। পৃথিবীর সে ক্রন্দন বিশ্ববাসীরই ক্রন্দন। বিশ্ববাসী ভগবানকে চেয়েছে, দেবতারা তাদের সহায় হয়েছেন, তাই ভগবানকে নররূপে তারা পেয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক কালের পুরাণ-কল্পনা বলে একে উড়িয়ে দিলেও ঐতিহাসিক

কালে, ভিন্ন দেশের ভিন্ন প্রেক্ষাপটেও একই ঘটনা দেখি। যীশুর অবতরণের আগে, পুরাতন বাইবেলেই বারবার এ প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছিল : ঈশ্বর আবির্ভূত হোন, ধরা তলে নেমে আসুক ভগবানের রাজ্য। পুরাতন বাইবেলের শেষ অংশে—মালাচিতে—দেখি ভগবান আশ্বাস দিচ্ছেন : তোমাদের প্রভু আমি আসছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত কই ? শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, মুরারি, জগদীশ, যবন হরিদাসরা কই ? পৃথিবীর ক্রন্দন কি শ্রুত হয়েছিল, ব্রহ্মা ও দেবগণ কি পরমপুরুষের ধ্যান করেছিলেন উনিশ শতকের বাংলায় ? মালাচির মতো কি কেউ জোড় করে যেচেছিল ভগবানের আবির্ভাব ?

রামকৃষ্ণ-অবতারে প্রাক-বন্দনা, ভজনা, সাধনা, প্রার্থনা, আবাহনের কথা শুনি না। কিন্তু কেউ কি ডাকেনি সত্যই তাঁকে ?

সকলের হয়ে একটি দীন সরল সাধারণ মানুষ একান্তে সেদিন ভগবানকে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর জীবনটাই হয়ে উঠেছিল দেব-আবাহনের নির্বাক আরাধনা। বিশ্ববাসীর হয়ে, কিন্তু লোকদৃষ্টির অন্তরালে, তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভগবানকে ডেকেছিলেন। তিনি ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়।

মধ্য বয়সে ক্ষুদিরাম যখন সর্বস্বান্ত হলেন অথচ পরিবার রক্ষা ও নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কোনো চেষ্টাই করলেন না তখন কামারপুকুরের জমিদার সুখলাল গোস্বামী ক্ষুদিরামকে আমন্ত্রণ জানালেন সপরিবারে কামারপুকুরে চলে আসতে। সুখলাল ক্ষুদিরামের বন্ধু ছিলেন—সজ্জন মানুষ বলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। নিজের বাড়ির একাংশের কয়েকখানি চালাঘর তিনি বন্ধুর বাসের জন্য ছেড়ে দিলেন। ক্ষুদিরামের পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য এক বিঘা দশ ছটাক ধানের জমিও তাঁকে বিনাসর্তে দিলেন সুখলাল। যাঁর দেড় শত বিঘা ধানের জমি ও বড় বাড়ি ছিল তাঁর পক্ষে এ সামান্য সম্পত্তি—কিন্তু দুঃসময়ে বন্ধুর শ্রদ্ধার দান বলেই সে সম্পত্তি মহান সম্পদ হয়ে উঠেছিল ক্ষুদিরামের চোখে। তিনি স্পষ্ট দেখলেন বন্ধু সুখলালের ভিতর দিয়ে পরমবন্ধু আশীর্বাদের হাতটি বাড়িয়েছেন। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং···তুমি রুদ্র হয়েই আসো বটে তবু তোমার দক্ষিণ মুখ যে আমি সদা দেখতে পাই। যিনি হরণে তিনিই ভরণে। যিনি বিনাশে তিনিই বিকাশে। ঘটনার আকস্মিক আঘাতে ক্ষুদিরাম পরাভূত হওয়া দূরে থাকুক, বিমূঢ়ও হননি—তিনি সব ঘটনাই আরাধ্য রঘুবীরের লীলা বলে মেনেছিলেন।

কামারপুকুরের স্বল্প আয়োজনে ধর্মের সংসার গড়ে উঠল। ক্ষুদিরাম সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর-নির্ভর হলেন। এক বিঘা জমিতে কতটুকু ধান হতে পারে? সেকালে রাসায়নিক সার, কীটনাশক বা বহুফলনশীল ধানের বীজ ছিল না। তায় ক্ষুদিরামও কৃষক নন—কৃষির উন্নতি সাধনের বিদ্যা তাঁর জানা ছিল না, সে বিষয়ে ভাবেনও নি। তিনি অপর কোনো বৃত্তি নেননি—যজমানীও নয়। ভাবলেন, সংসার তাঁর নয়, রঘুবীরের। রঘুবীরই যা করণীয় তা করবেন। আর তিনি নিজে শুধু একটা কাজই করবেন—রঘুবীরের স্মরণ-মনন, ধ্যান-উপাসনা।

রঘুবীর তাঁকে দেখা দিলেন। দিনের বেলা, মাঠের মধ্যে। ক্ষুদিরাম কোনো কাজে ভিন্ন গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। পথের পাশে এক গাছতলায় বসলেন। গ্রামের পথ লোকবিরল, মাঠও জনশূন্য। সময়টা গ্রীষ্মকাল—কৃষির সময় নয়। অন্ততঃ সেকালে ছিল না। প্রচণ্ড রোদে গাছের ছায়া মধুর লাগে, বাতাসও মিষ্ট মনে হয়। মাটি ভিজে নয়, শুকনো; ক্ষুদিরাম শুয়ে পড়লেন। তন্দ্রা নামল চোখে। তন্দ্রার মাঝে স্বপ্ন।

নবদূর্বাদলশ্যাম রাম দিব্য বালকের বেশে হাজির। কাছেই একটি জায়গা দেখিয়ে বললেন: আমি এখানে অনেকদিন অযত্নে অনাহারে আছি। তোমার বাড়ি আমায় নিয়ে চলো ক্ষুদিরাম, তোমার সেবা নিতে বড় ইচ্ছা আমার।

ক্ষুদিরাম বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ইষ্ট দর্শন দিয়েছেন। অযত্ন ও অনাহার-ক্লেশের কথা বলছেন। তিনি ভক্তের বাড়ি যেতে চাইছেন। ভক্তের সেবা পেতে চাইছেন।

কিন্তু ভক্ত বড় কঠিন ঠাঁই। যে খাঁটি ভক্ত সে মনের জোর হারায় না। তার ব্যক্তিত্ব অপরাজেয় থাকে। ভগবানকে সে আপনার বলে জেনেছে বলেই আপন জনের মতোই তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করে। ক্ষুদিরাম তাই আনন্দে-দুঃখে অধীর হলেও কাণ্ডজ্ঞান হারাননি। মনে রাখলেন একথাটি যে সেবা ভালো, সেবাপরাধ ভালো নয়। রামচন্দ্র রাজপুত্র, গরীব ব্রাহ্মণ তাঁকে সেবা করবে কিভাবে? যোগ্য সেবা না হলে সেবাপরাধ হবে যে!

ক্ষুদিরাম বললেন: প্রভু, আমি ভক্তিহীন ও অতি গরীব। আমার ঘরে আপনার যোগ্য সেবা সম্ভব হবে না ঠাকুর! বরং সেবাপরাধী হয়ে আমাকে নরকে যেতে হবে। কেন আপনি এমন অন্যায় অনুরোধ করছেন আমাকে?

ভগবান অনুরোধ করছেন; তাও অন্যায় অনুরোধ—ভক্তির এত জোর ছিল ক্ষুদিরামের যে ভগবানের বিচার তাঁর সামনে দাঁড়িয়েই করে ফেললেন এবং মুখের ওপরই রায় ঘোষণা করে দিলেন—তাঁর গলা ভয়ে বা সংকোচে কাঁপল না। ভক্তের কাছে ভগবানের পরাজয় চিরদিনই ঘটে আসছে। রাজপুত্র রাম ক্ষুদিরামের সাফ জবাবে প্রসন্ন হলেন। খসে পড়ল তাঁর রাজবেশ, ধূলায় লুটাল ভগবানের আভিজাত্য। বালক মধুর স্বরে বললেন: তোমার সেবা পরাধ আমি কখনো নেব না, তুমি আমাকে নিয়ে চল।

গরীবের ঘরে গরীব সেজে যেতে ভগবান পা বাড়ালেন। কেঁদে ফেললেন ক্ষুদিরাম। দয়াল, তোমার এত দয়া? এত অযাচিত করুণা দীন জনে? চোখের জলে ভিজে ক্ষুদিরামের ঘুম ভাঙল।

তাহলে এ সবই স্বপ্ন? মায়া? ঘুমের মধ্যে ইচ্ছাপূরণ? বাস্তব নয়? ক্ষুদিরামের চোখ পড়ল মাঠের মধ্যে একটি স্থানে—ঠাকুর স্বপ্নে তাঁকে ঐ স্থানটিই দেখিয়েছেন। শুয়ে বা বসেই স্থানটি দেখছিলেন তিনি, উঠে দাঁড়ালেন। কাছে গিয়ে দেখলেন একটি সুন্দর শালগ্রাম শিলা। তার ওপর ফণা মেলে রেখেছে একটি জ্যান্ত সাপ। আরও কাছে যেতেই সাপটি চলে গেল—একটি গর্তে। গর্তের মুখেই শালগ্রামটি রয়েছে। সাপ ও শালগ্রাম তো স্বপ্ন নয়—প্রখর দিবালোকে দৃষ্ট বাস্তব। রামচন্দ্রও তাহলে স্বপ্ন নয়, আবেশে দেখা পরম পুরুষ। ইষ্ট দর্শন হয়ে গেল ক্ষুদিরামের।

'জয় রঘুবীর' বলে সোল্লাসে ধ্বনি দিলেন ক্ষুদিরাম। সব হারিয়ে সব পাওয়া হল তাঁর আজ। তিনি শাস্ত্র জানতেন। আনন্দেও বুদ্ধি বিচলিত হল না তাঁর—বোঝা যায় ধীর স্থির দৃঢ়চিত্ত মানুষ ছিলেন তিনি। ভাবোদ্বেল হয়েও ভাবভাসিত হতেন না তিনি। শালগ্রাম শিলা হাতে তুলে খুঁটিয়ে দেখলেন। শাস্ত্রলক্ষণ মিলিয়ে বুঝলেন, সত্যই ওটি 'রঘুবীর' শিলা। সব সংশয় ছিন্ন হয়ে গেল। আমি ইষ্টের কৃপা ও আদেশ পেয়েছি।

এবার বিস্ময় ও আনন্দ রাখার আর জায়গা নেই ক্ষুদিরামের। হে রাম, তুমিই রামানন্দ রায় হয়ে আমাকে গৃহচ্যুত করে পথে নামিয়েছ। পথে আমাকে স্বরূপে দেখা দেবে বলে। তুমিই আমার সম্পত্তি হরণ করেছ, কাঙাল বেশে আমার গলা জড়িয়ে আদর করবে বলে। নিঃস্বের সেবা তুমি বড় ভালবাস যে!

চালাঘরে ভগবান অধিষ্ঠিত হলেন। ক্ষুদিরাম বাড়ি ফিরে শালগ্রাম

শিলার শাস্ত্রসম্মত সংস্কার কার্য করলেন। গৃহদেবতা রূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন পূজা করতে লাগলেন। রামচন্দ্রের পূজা তিনি আগেও করতেন—ঐ তাঁর ইষ্ট ঘটে শীতলাদেবীর পূজা করতেন—সে দেবীও রইলেন। আর্য ভারতের দেবতা রামচন্দ্র ও বাঙালীর লৌকিক দেবী শীতলা ক্ষুদিরামের গৃহবেদীতে একত্রে অবস্থানে কোনো প্রশ্নই ওঠেনি—ওঠেনা বাংলার কোনো ঘরে। এ হল আর্য-অনার্যের মিলনভূমি।

ভগবান লাভ হলেই কি গরীব ধনী হয়ে যায়? না। তা নির্ভর করে ভক্তের আকাঙ্ক্ষার ওপর। সকাম ভক্ত ঐশ্বর্য চায়—অভ্যুদয় যাচঞা করে। তার ধন-পরিজন লাভ হয়। হয়তো সে সোনার থালায় ভাত খায়। কিন্তু নিষ্কাম ভক্ত তা চায় না। সে চায় ঈশ্বরের পাদপদ্মে অহেতুক ভক্তি। ভালবাসাতেই ভালবাসার পুরস্কার—আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। কয়েদী জেল থেকে ছাড়া পেলে তার সিংও গজায় না, ধেই ধেই করে সে নাচেও না—আবার আপন কাজ কর্মে মন দেয়। ক্ষুদিরাম ইষ্ট দর্শন পেয়ে জীবন্মুক্ত হলেন—কিন্তু নেচেও বেড়ালেননা, তাঁর চালাঘর দালান বাড়িতেও রূপান্তরিত হয়ে গেল না।

বরং দারিদ্র্য চেপে বসল। পরিবারের লোক সংখ্যা বাড়ছে, ছেলে মেয়েরা আসছে। গৃহীর ধর্ম অতিথি-আত্মীয় পরিচর্যা—ক্ষুদিরাম-চন্দ্রমণি তা বাতিল করে দেননি। অথচ আয়ের উৎস ঐ এক বিঘা দশ ছটাক জমির ধান—তাও পরের হাল-বলদে ও মুনিষ রেখে চাষ। কী থাকে!

কোনো কোনোদিন ঘরে চাল থাকে না। চন্দ্রা ব্যাকুল হয়ে ক্ষুদিরামকে বলেন—কী খেতে দেব ছেলমেয়েকে? ক্ষুদিরাম বিশ্বাসে ও নির্ভরতায় পাথরের মতো স্থির। বলেন: ভয় কি, রঘুবীর যদি উপোস থাকেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে উপোস করব।

রঘুবীর উপোস করেননি। যে সত্যই ঈশ্বরের ওপর সব ভার ছেড়ে দেয় ঈশ্বর তার ভার নেন। যোগক্ষেম বহাম্যহম্—আমি ভক্তের জন্য যোগক্ষেম বহন করে নিয়ে যাই। যোগক্ষেমের অর্থ আবশ্যকীয় যা কিছু।

ওই সামান্য জমিতেই রঘুবীরের হাতের ছোঁয়া লাগল। উপছে পড়ল ধান। জমিটির নাম ছিল লক্ষ্মীজলার জমি। লক্ষ্মী যেন আসন পেতে দিলেন। এত ধান উঠতে লাগল যে সম্বৎসরের খোরাকি, চিঁড়ে মুড়ির অভাব রইল না। সংসারের অন্যান্য তৈজস, কাপড় ইত্যাদিও ধানের টাকায় কেনা সম্ভব হল।

জমি চাষ হবার পর ক্ষুদিরাম 'জয় রঘুবীর' বলে কয়েক গুছি ধান নিজের হাতে রুইতেন—তারপর তাঁর কৃষাণরা রুইত। খরা, শুখা, হাজা বা বন্যার কবলে পড়েনি তাঁর জমি। কৃষাণরা ঠিক মতো মজুরি পেত।

সম্পূর্ণ ঈশ্বর-নির্ভর হয়ে সংসার চালানোকে আকাশবৃত্তি বলে। ক্ষুদিরামের তাই-ই অবলম্বন ছিল। মোটা ভাত কাপড়ের অভাব তাঁর সংসারে রইল না।

বিশ্বাসে বিশ্বাস বাড়ায়। ঈশ্বরবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে গেলেন ক্ষুদিরাম। তিনি গৃহী হলেও সম্পূর্ণ বিষয়-বিরাগী হয়ে রইলেন। ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা, ধ্যান, পূজায় সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে গেলেন তিনি। অন্তর্মুখ অবস্থায় নানা দিব্য দর্শন হত তাঁর। ব্রাহ্মণ; প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যা ও গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যান অবশ্য কর্তব্য ছিল। ঐ সময় তাঁর বুক লাল হয়ে উঠত, প্রেমাশ্রুতে দুই গাল ভেসে যেত। ভোরে সাজি হাতে পূজার ফুল তুলতে যেতেন। একটি আট বছরের মেয়ে—গায়ে নানা অলঙ্কার ও লাল শাড়ি—হাসতে হাসতে যেত তাঁর সঙ্গে। সে গাছের ডাল নুইয়ে ধরত—ফুল যাতে সহজে তুলতে পারেন ক্ষুদিরাম। শুধু ক্ষুদিরামই মেয়েটিকে দেখতেন—আর কেউ না। বালিকা বেশে শীতলা। দেবী স্বয়ং ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন। স্নেহময়ী, আদরিণী রূপে। রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধার সময় সেই সাহায্যকারিণী বালিকাকে মনে পড়ে! কালিকা-শীতলায় তফাৎ কি আছে জানি না, কিন্তু ভক্তের কাছে সে মা বটে, মেয়েও বটে।

ক্ষুদিরাম এখন অন্য মানুষ। দেরে গ্রামের সেই স্বচ্ছল সজ্জন মানুষটি মাত্র আর নেই। এখন তিনি দিব্যভাবে ভরা, অন্তরে আনন্দ ধারা, মুখ এক অপার্থিব আলোয় উদ্ভাসিত! হোক তারা অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ, কিন্তু গ্রামবাসীর চোখে ক্ষুদিরামের এ রূপান্তর ধরা পড়েছে। তারা তাঁকে ঋষির মতো শ্রদ্ধা করতে লাগল। কামারপুকুরে যেন পুরাণ-যুগের ঋষিই এসে দাঁড়িয়েছেন।

ক্ষুদিরামকে আসতে দেখলে গ্রাম্য জটলা থেমে যেত; তামাসা-পরিহাস স্তব্ধ হয়ে যেত; সবাই উঠে দাঁড়াত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে। তিনি পুকুরে স্নানে নামলে আর কেউ সে পুকুরে নামত না, তাঁর স্নান সমাপনের জন্য অপেক্ষা করত তীরে দাঁড়িয়ে। তাঁর পায়ের খড়মের শব্দ শোনা মাত্র সবার মুখে চোখে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাই ছড়িয়ে পড়ত—সে শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত গ্রাম্য কথা

কেউ উত্থাপন করতেই পারত না। আবার বিপদে ও শুভকর্মে তাঁর আশীর্বাদ নিতে যেত সকলে। বিফল হত না তাঁর আশীর্বাদ।

ক্ষুদিরামের মতোই পবিত্র, সরল ও উন্নত চরিত্রবতী ছিলেন চন্দ্রাদেবী। কামারপুকুরে অল্প দিনে তিনি হয়ে উঠলেন সবার মা—যেন দয়া ও ভালবাসায় গড়া সত্তা তাঁর। হৃদয়ের খাঁটি সহানুভূতি ছিল তাঁর সবার প্রতি—ধনী গরীব নির্বিশেষে। গরীবরা তাঁর বাড়িতে আহার পেত—স্নেহ ও যত্নে সিক্ত সে খাদ্য। খাদ্যে পেট ভরে, কিন্তু চন্দ্রাদেবীর স্নেহ সমাদরে অধিকন্তু ভরে যেত সবার মন! সে বড় শান্তির তৃপ্তির আহার। সাধুরা ভিক্ষায় আসত। জানত যে এ বাড়ির দরজা তাদের জন্য নিত্যদিন খোলা। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা জানত, চন্দ্রামার কাছে আবদার জানালে তা অপূর্ণ থাকবে না—তা সে যে আবদারই হোক। তাই পল্লীজনরা সর্বদাই আসত ক্ষুদিরাম-চন্দ্রার পর্ণ-কুটিরে: ও ছিল তাদের প্রাণ জুড়াবার জায়গা। গেলে শান্তি, ভরসা, প্রাণে নতুন বল পাওয়া যায়।

সাধ্বী রমণী চন্দ্রাদেবীর চরিত্র-পরিচয় আমরা আরও গ্রহণের সুযোগ পাব, কেননা তিনি দীর্ঘজীবিনী হয়েছিলেন। মথুরামোহন বিশ্বাস অনেক অনুরোধ করেও তাঁকে কোনো ভোগ্যবস্তু দিতে পারেননি—এক পয়সায় গুল তামাক ছাড়া। কারখানার সিটিতে তিনি শুনতেন শ্যামের বাঁশি! রামকৃষ্ণ ছিলেন মাতৃঅন্ত প্রাণ—তা অনেকটা মায়েরই গুণে।

ক্ষুদিরাম একদিন মেদিনীপুর যাচ্ছিলেন। সেখানে তাঁর এক ভাগ্নে রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তারি করত। ক্ষুদিরামের পাঁচ বছরের ছোট বোন রামশীলার ছেলে রামচাঁদ। দেরে গ্রামে মামার বাড়িতে রামচাঁদ ও তাঁর বোন হেমাঙ্গিনী বহু আদর-ভালবাসা পেয়েছেন—হেমাঙ্গিনীর জন্মই দেরে গ্রামে মামার বাড়িতে! দেরে গ্রামে মামাদের পাট চোকার সময় রামচাঁদের বয়স ছিল একুশ, হেমাঙ্গিনীর ষোলো। ক্ষুদিরামই ভাগ্নী হেমাঙ্গিনীর বিয়ে দিয়েছিলেন শিহড় গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কৃষ্ণচন্দ্র-হেমাঙ্গিনীর চার ছেলে—রাঘব, রামরতন, হৃদয়রাম ও রাজারাম। হৃদয়রামের কথা এ কাহিনীতে অনেকটা অংশ পাবে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ের নাম হয় রামশীলা; মেয়েপক্ষের নাতি ও নাত্নীপক্ষের প্রপৌত্রদেরও নাম হয়েছিল রামযুক্ত; রাঘবও রামেরই নাম। রামকৃষ্ণ যে বংশের রীতি অনুসারী নাম এতে সন্দেহ নেই।

মামারা সর্বস্বান্ত ও উদ্বাস্তু হলে রামচাঁদ ব্যথিত হয়েছিলেন। মামাদের স্নেহ তিনি ভোলেননি। বড় মামা ক্ষুদিরামও ভাগ্নের খবর না পেলে উদ্বিগ্ন হতেন—মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটে যেতেন তাঁর মেদিনীপুরের বাসায়। সেখানে দুচার দিন কাটাতেন। তার প্রতি ক্ষুদিরামের স্নেহ মায়িক ছিল না, ছিল স্বতোৎসারিত। এরই ঘরে দেহ রেখেছিলেন ক্ষুদিরাম, অন্তিম লগ্নের সেবাযত্নটুকু স্বীকার করে।

কামারপুকুর থেকে প্রায় চুয়ান্ন কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর শহর। রামচাঁদের খবর সেখান থেকে সহজে আসে না। অনেকদিন খবর না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন ক্ষুদিরাম একদিন সকালে বাড়ি থেকে রওয়ানা হলেন। তখন বসন্ত কাল—ফাল্গুন মাস। ভোর থেকে বেলা দশটা পযন্ত তিনি হাঁটলেন। যে গ্রামে তখন পৌঁছেছেন, দেখলেন সে গ্রামের বেলগাছগুলিতে কচি বেল-পাতা রাশি রাশি। এ সময় বেলপাতা ঝরে যাবার সময়—নতুন বেলপাতা ওঠার সময় নয়। বেলপাতার অভাবে এ সময়ে শিবপূজায় অসুবিধা হয়। ক্ষুদিরাম সে অসুবিধা ভোগ করছিলেন বাড়িতে। নতুন বেলপাতা দেখে তাঁর মন আনন্দে নেচে উঠল। মেদিনীপুর যাবার কথা ভুলে গেলেন। ঐ গ্রাম থেকে একটি নতুন ঝুড়ি ও একটি গামছা কিনলেন। পুকুরে ভালো করে ধুয়ে নিলেন ঝুড়ি-গামছা। কচি বেলপাতায় ভর্তি করলেন ঝুড়ি—ভিজে গামছা চাপালেন তার ওপর। মাথায় ঝুড়ি বয়ে ফিরে এলেন বাড়ি। বেলা তখন তিনটে। স্নান করে মহানন্দে শিব ও শীতলাদের পূজা করলেন তিনি।

পূজা-সমাপনান্তে অপরাহ্নে আহারে বসলে চন্দ্রা দেবী জানতে চাইলেন মেদিনীপুর না গিয়ে বাড়ি ফেরার হেতু। শিবপূজার লোভে এত পথ হাঁটা-হাঁটি করেছেন স্বামী, শুনে চন্দ্রা থ। পরদিনই ভোরে আবার মেদিনীপুরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন ক্ষুদিরাম। ভক্তির আনন্দের কাছে পরিশ্রমের বোধ ঠাঁই পায় না।

কামারপুকুরে ক্ষুদিরামের বাস ছয় বছর হয়ে গেলে তাঁর বাড়িতে শুভকর্ম উপস্থিত হল। এখন তাঁর ছেলে রামকুমারের বয়স ষোলো ও মেয়ে কাত্যায়নীর বয়স এগারো। সেকালের প্রথামতো ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবার সময় হয়েছে। রামকুমারও সুঠাম প্রিয়দর্শন বিদ্বান যুবক। ইংরেজি শিক্ষা গ্রামে যায়নি তখনো, শ্রীরামপুর-কলকাতা অঞ্চলেই তা সীমাবদ্ধ। ইয়ং বেঙ্গলের

আলোড়ন আসেনি। Damn Hinduism শোনা যায়নি। রামকুমার ব্রাহ্মণোচিত পথে কাছের গ্রামের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠ শেষ করেছেন। এখন স্মৃতিশাস্ত্র পড়ছেন।

কামারপুকুরের তিন কিলোমিটার উত্তরে আনুড় গ্রামে কেনারাম বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাত্যায়নীর বিয়ে হল। পালটি বিয়েতে কেনারামের বোনকে বিয়ে করলেন রামকুমার। বন্ধুর ঘরে বৌমা এল, বন্ধুর মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেল, বন্ধু এখন শুধু কামারপুকুরে প্রতিষ্ঠিতই নয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী —সুখলাল গোস্বামী যেন জীবনের কর্তব্য সুসম্পন্ন হয়েছে মনে করলেন। তিনি শান্তিতে বিদায় নিলেন। দেহরক্ষা হল তাঁর।

রামকুমার স্মৃতি পাঠ শেষে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। তিনি উপার্জনশীল হলেন। সংসারের গতি আগের তুলনায় স্বচ্ছন্দতর হল। ক্ষুদিরাম পরম নিশ্চিন্তিতে সংসার থেকে মন উঠিয়ে ঈশ্বর-আরাধনায় দেহমন ঢেলে দিলেন।

ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবার তিন চার বছর পর, ১৮২৪ সালে, পঞ্চাশ-একান্ন বছর বয়সে ক্ষুদিরাম তীর্থযাত্রার মানস করলেন। রামভক্ত, তাই রামেশ্বর যাবার টান বেশি। তাছাড়া সেখানে তিনি যাননি—আগে অন্যান্য তীর্থে গিয়েছেন।

তিনি পায়ে হেঁটে বাড়ি থেকে বেরোলেন, হেঁটেই রামেশ্বর সেতুবন্ধে গেলেন। দাক্ষিণাত্যে বহু মন্দির ও তীর্থস্থান—দেখলেন অনেকগুলিই। এক বছর পর বাড়ি ফিরলেন তিনি। সেতুবন্ধ থেকে তিনি নিয়ে এলেন বাণলিঙ্গ শিব। গৃহের পূজাবেদীতে রঘুবীর ও শীতলার পাশে বাণলিঙ্গ বসালেন। বিষ্ণু শিব ও শক্তির যুগপৎ অর্চনায় আটকায়নি তাঁর। বাঙালীর ঘরে কারও আটকায় না। এটা ধর্ম-সমন্বয়েরই দেশ।

প্রৌঢ় বয়সে ক্ষুদিরামের আরও একটি পুত্র লাভ হয়েছিল। রামেশ্বর তীর্থ দর্শন করার পর পুত্রের জন্ম বলে পুত্রের নাম রামেশ্বর। রামেশ্বরের জন্ম হয় ১৮২৬ সালে, ক্ষুদিরামের বাড়ি ফেরার এক বছর পর। বড় ছেলে ও এই মেজো ছেলের মধ্যে বয়সের ব্যবধান একুশ বছর।

নবজাতকের আগমনে সংসারে কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য আসেনি বরং ক্ষুদিরামের সংসারে তখন অবস্থা কিছু উন্নতির দিকে। কারণ রামকুমার স্মৃতির বিধান দিয়ে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও পূজা করে অর্থোপার্জন করছেন। ক্ষুদিরামের

ভাগ্নে মেদিনীপুরের মোক্তার রামচাঁদ মাসে মাসে পনেরো টাকা পাঠাতে সুরু করেন রামকুমারের বিবাহের সময় থেকে। এটা মামার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার দান। রামচাঁদ মেজো ও ছোট মামাকেও মাসে দশ টাকা করে পাঠাতেন।

সংসারের আর্থিক অবস্থা যে ফিরবে সে লক্ষণ আগেই সূচিত হয়েছিল—চন্দ্রাদেবী পেয়েছিলেন এক গূঢ় ইঙ্গিত। তখনো রামকুমারের বিয়ে হয়নি ও ক্ষুদিরামও রামেশ্বর যাননি। রামকুমারের বয়স তখন পনেরো। তিনি তখন চতুষ্পাঠীর ছাত্র, কিন্তু যজমান বাড়িতে পূজাদি করেন।

আশ্বিন মাস। আশ্বিনেই সে বছর দুর্গাপূজা হয়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাও পড়েছে। কোজাগরী পূর্ণিমা। ভূরসুবো গ্রামে এক যজমান বাড়িতে লক্ষ্মী পূজা করতে গিয়েছেন রামকুমার। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে, অর্ধ রাত্রি অতিক্রান্ত; কিন্তু রামকুমার বাড়ি ফেরেননি। উৎকণ্ঠিতা চন্দ্রাদেবী ঘর-বার করেছেন, শেষে জ্যোৎস্নাস্নাত পথে এসে দাঁড়ালেন। আলোয় উদ্ভাসিত প্রান্তর, কিন্তু তখন গ্রামের পথে লোক থাকার কথা নয়। তবু দূর থেকে কেউ আসছে মনে হল। ছেলেই ফিরছে মনে করে আগ্রহে খানিক এগিয়ে গেলেন চন্দ্রা। কিন্তু তাঁর ছেলে নয়, যে এল সে একটি মেয়ে—পরমাসুন্দরী রমণী। দিব্য বসনে-ভূষণে সজ্জিতা। চন্দ্রকিরণে ঝকঝক করছে তাঁর গায়ের অলঙ্কার। এত রাতে কে এই অভিজাত বরবর্ণিনী সে কথা ভাবলেন না চন্দ্রা; পুত্রসংবাদব্যাকুলার মনে কোনো চিন্তা ঠাঁই-ই পেল না। সরাসরি প্রশ্ন করলেন; মা, তুমি কোথা থেকে আসছ? রমণী বললেন: ভূরসুবো থেকে। চন্দ্রা জানতে চাইলেন: আমার ছেলে রামকুমারকে কি সেখানে তুমি দেখেছ? সে কি বাড়ি ফিরছে? রমণী বললেন: হাঁ, যে বাড়িতে তোমার ছেলে পূজা করেছে সে বাড়ি থেকেই আমি আসছি। ভয় নেই, তোমার ছেলে এখনই ফিরবে।

আশ্বস্তা হলেন চন্দ্রা দেবী। ফলে এতক্ষণে তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে এল। সম্মুখের নারীটিকে ভালো করে দেখলেন। এত রূপ, এত অসামান্য বস্ত্রালঙ্কার আর নির্জন গ্রাম্যপথে এত রাতে ভ্রমণশীলা, আবার কণ্ঠস্বরও এত মধুর—এ যুবতীর বিপদ হতে কতক্ষণ? চন্দ্রা বললেন: মা, তোমার অল্প বয়স, গায়ে এত গয়না-গাঁটি, এত রাতে যাচ্ছ কোথায়? চন্দ্রার মনে নারী-সুলভ কৌতূহলও উঁকি দিল। বললেন: মা তোমার কানে ও কি গয়না?

রমণী মৃদু হাসলেন। বললেন: ওর নাম কুণ্ডল। আমি এখনও অনেক দূর যাব। চন্দ্রা মনে করলেন তবে তো বিপদ হতে পারে ওঁর। বললেন: আজ রাতটা আমাদের ঘরেই তুমি থাকো মা, কাল দিন হলে তুমি চলে যেও। রমণী বললেন: না মা, আমাকে এখনই যেতে হবে। তোমাদের বাড়ি আর এক সময় আসব।

রমণী চন্দ্রার কাছে বিদায় চাইলেন, কিন্তু কাছেই জমিদার লাহাবাবুদের ধানের মরাইয়ের দিকে চলে গেলেন। যাবার কথা পথ বেয়ে, কিন্তু গেল ধানের মরাইয়ে—চন্দ্রা ভাবলেন, নিশ্চয়ই ও পথ ভুল করেছে। নিজেই এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে খুঁজলেন ধানের মরাইয়ে চন্দ্রা দেবী; অনেক খুঁজলেন; কিন্তু পেলেন না। কোনো চিহ্নই নেই।

এ আমি তবে কাকে দেখলাম—চোখের পলকে যে অদৃশ্য হয়ে যায়? আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার রাতে এ কী তবে স্বয়ং লক্ষ্মী? পথভ্রান্তা তিনি, নাকি এসেছিলেন আমাকেই দেখা দিতে?

উদ্বেল-উদ্বিগ্ন চিত্তে দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরলেন চন্দ্রা। স্বামীকে সব কথা বললেন। ক্ষুদিরাম শান্ত প্রগাঢ় গলায় আশ্বস্ত করলেন: শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীই কৃপা করে তোমাকে দেখা দিয়েছেন।

রামকুমারও একটু পরেই ঘরে ফিরলেন। মায়ের কাছে শুনলেন বিবরণ। আমার পূজা তবে মা নিয়েছেন,—পূজারীর এত বড় সার্থকতা আর কিসে?

কামারপুকুরের ধর্মের সংসারে এমনই করে মানুষ ও দেবতা মেশামিশি করে ছিল। তারা যেন সহচর। দেবদেবীদের দেখতে পাওয়া যেন সেখানে অস্বাভাবিক কিছু নয়, বড় ঘটনাও নয়। ক্ষুদিরাম-চন্দ্রাদেবীর দেবদর্শন নিয়ে তাই গ্রামে হুলুস্থুল পড়েনি। সেকালের পল্লীতে নাস্তিক বা সংশয়বাদী মানুষ ছিল না, এসব ঘটনায় সহজেই বিশ্বাস জন্মাত মানুষের। তবু ক্ষুদিরাম-চন্দ্রাকে নিয়ে সোরগোল হয়নি। লোকেরা দলে দলে তাঁদের দেখতে আসেনি—তাঁদের বাড়িতে হাটবাজার বসে যায়নি, পয়সা পড়েনি। ওঁদের চরিত্রের পবিত্রতার জন্যই ওঁরা শ্রদ্ধা পেয়েছেন, কোনো অলৌকিক কাণ্ডের জন্য নয়। ওঁরাও অলৌকিক কাহিনী প্রচার করতে বসে যাননি।

কারণ অলৌকিকই বা কোথায়? ক্ষুদিরাম দিনদুপুরে পথে শুয়ে স্বপ্নে বালক রামচন্দ্রকে দেখলেন। পথেই অর্ধরাতে পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় জাগ্রত দৃষ্টিতে চন্দ্রা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দেখলেন। নিজ গৃহপ্রাঙ্গণে প্রতিদিন জোরের

আলোয় বালিকারূপিণী শীতলা দেবীকে দেখতেন ক্ষুদিরাম—প্রত্যক্ষ সাহায্য পেতেন তাঁর। সবই এত স্বাভাবিক, দৈনন্দিন জীবনের অংশগত, যে এ নিয়ে না জাগে মনে সংশয়, না উত্তেজনা।

লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য ক্ষুদিরামের সংসারে এসেছিল। বছর খানেকের মধ্যেই রামকুমারের বিয়ে হল। নব বধূ যেন লক্ষ্মীময়ীই ছিলেন। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রামচাঁদের নিয়মিত টাকা পাঠানো: রামকুমারও ক্রিয়াকর্মে দক্ষ ও যজমানের প্রিয় হলেন। একমাত্র মেয়ে কত্যায়নী শ্বশুর ঘরে যাওয়ায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তাও পূরণ করে দিলেন বৌমা। বাড়িতে খুশির, স্নেহের, আদরের হাওয়া বইল।

এমন শান্তির সংসারে, যেখানে সত্য ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষিত, পারস্পরিক বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও স্নেহ বর্তমান, যেখানে সরলতা ও করুণায় যেন মাখানো সবাই সেখানে ভগবানের আসন পাতা হয়। ভগবান সেখানে আসেন। আর ওই প্রৌঢ় পরিণত ক্ষুদিরাম, পণ্ডিত নয়, আচার্য নয়—কিন্তু শাস্ত্রবিচারাভিজ্ঞ, শুদ্ধা ভক্তির আধার, স্থির অকম্পিত ঈশ্বরানুরাগী—প্রতিদিন প্রতি ক্ষণে ঈশ্বরকে আহ্বান করেছেন, ধ্যানে ও চোখের জলে পরিশুদ্ধ সে আহ্বান—ভগবান কি তাতে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন? আর মাতা চন্দ্রাদেবী—লক্ষ্মী তাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে আর এক সময় তাঁরই ঘরে তিনি আসবেন—ধনরত্নের সিন্ধুক নিয়ে নয়, স্বয়ং নারায়ণকে নিয়ে। যেখানে নারায়ণ সেখানেই লক্ষ্মী থাকেন। ক্ষুদিরাম-চন্দ্রার ঘরে নারায়ণের আগমন-সম্ভাবনাই কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে লক্ষ্মীবাণীর নিগূঢ় ইঙ্গিত ছিল।

৪

জন্ম

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

হে অর্জুন, যিনি আমার এরূপ দিব্য জন্ম ও কর্ম যথার্থ রূপে জানেন এ দেহ ত্যাগ করে তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। তিনি আমাকেই পান।

ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অনেকে অবতারকে সাধারণ মানুষ জেনে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, আবার অনেকে তাঁর জীবনে অলৌকিক ঘটনার আরোপ করে তাঁকে সিদ্ধ সাধক বা ঈশ্বর রূপেও পূজা করেন। তাতে তাঁকে যথার্থ জানা হল না। অবতারের দিব্য জন্ম ও কর্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানলে অবতারের ভাগবত জীবনের অনুসরণ করা সম্ভব হয় নিজ নিজ জীবনচর্যায়। তখন অবতারের লীলাসঙ্গী হওয়া যায়। যে উদ্দেশ্যে তাঁর আসা সে উদ্দেশ্য সফল করতে সহযোগিতা করা যায়। তাঁর সহকর্মী হওয়া যায়। অজ্ঞানতা পার হয়ে ভাগবত জীবনে উত্তরণ ঘটে, তাই আর অজ্ঞানতায় আবৃত হতে হয় না। হয় না আবার এ তমোজন্ম।

ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্বিকার, নিরঞ্জন, সর্বব্যাপ্ত। শক্তি তাঁর মধ্যে অন্তর্লীন অবস্থায় থাকেন, শক্তির বহির্বিকাশ ব্রহ্মে নেই—তাই ব্রহ্মকে নিঃশক্তিকও বলে। শক্তির বিকাশ জনিত কোনো বিশেষত্ব নেই বলে তিনি নির্বিশেষ, আকার নেই বলে নিরাকার, বিকার ও দাগ নেই বলে নির্বিকার ও নিরঞ্জন।

মুণ্ডকোপনিষদে ব্রহ্মের একটি স্বরূপ মূর্তির কথাও পাই—যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি। এই স্বরূপ মূর্তি রুক্মবর্ণ; স্বর্ণবর্ণ। পুণ্য-পাপবিশিষ্ট সংসারী লোকও এঁর দর্শন মাত্রে পুণ্যপাপাদি পূর্বসঞ্চিত কর্মফল থেকে সম্যক রূপে মুক্ত হয়ে পরম সাম্যাবস্থা লাভ করে। সাম্যাবস্থাই মুক্তির অবস্থা—সাম্যাবস্থায় সত্ত্ব রজ তম গুণের কোনো বন্ধন আর থাকে না।

ব্রহ্মের এ স্বরূপ মূর্তি স্বরাট—স্বেনৈব রাজতে ইতি স্বরাট; তিনি নিজের দ্বারাই নিজে বিরাজিত; স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেকসহায়ঃ—একমাত্র তাঁর স্বরূপশক্তিই

তাঁর সহায় ; স্বরূপ-শক্তি ভিন্ন আর কোনো শক্তির অপেক্ষায় তিনি থাকেন না ; আর কোনো শক্তির সাহায্য ছাড়াই তাঁর কাজ হয়। স্বরূপ-শক্তি তাঁর স্বরূপভূতা বলে তার সহায়তায় তাঁর স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না। তিনি স্বতন্ত্র—নিজের দ্বারাই, স্বীয় স্বরূপভূতা শক্তিদ্বারাই, তিনি তান্ত্রিত।

চৈতন্যময় আনন্দবিগ্রহ তিনি—সচ্চিদানন্দ পুরুষ। তাঁর বিগ্রহ নয়, তিনিই বিগ্রহ। তাতে ও তাঁর বিগ্রহে ভেদ নেই—উভয়ে অভিন্ন। মানুষের দেহ ও আত্মায় ভেদ আছে—কারণ দেহ প্রাকৃত বস্তুতে গড়া, অচেতন বা স্বল্পচেতন। সচ্চিদানন্দবিগ্রহে দেহ ও আত্মায় ভেদ নেই, কারণ তাঁর দেহ প্রাকৃত নয়, আনন্দস্বরূপে গড়া : আনন্দস্বরূপই আত্মা। ব্রহ্মসংহিতা বলেন—আনন্দ-চিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। তিনি আনন্দচিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহ, তাঁর বিগ্রহ হচ্ছে চিন্ময় আনন্দ—অচেতন প্রাকৃত বস্তু তাঁর বিগ্রহে বা দেহে নেই বলে সে দেহ সদুজ্জ্বল—উত্তম উজ্জ্বল।

যিনি সর্বব্যাপ্ত নির্বিকার নিরঞ্জন তাঁর বিগ্রহের প্রয়োজন কী? ব্রহ্ম সর্বদাই আছেন—(সৎ), চৈতন্যময় (চিৎ) ও আনন্দময় (আনন্দ) এ কথা বলেও তৃপ্তি হয়নি। তিনি রসস্বরূপ—রসো বৈ সঃ। রস শব্দের দুই অর্থ। রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ—যা আস্বাদ্য বা আস্বাদনবস্তু, যেমন মধু—তা রস। আবার রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ—যিনি আস্বাদন করেন, রসিক—তিনিও রস। আস্বাদ্য বস্তু মাত্রেই কিন্তু রস নয়। যার আস্বাদনে অপূর্ব চমৎকারিত্ব আছে তাই-ই রসশাস্ত্রসম্মত রস। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ" (অলঙ্কার-কৌস্তুভ)। ঐ চমৎকারিত্ব যোগ না হলে রস হয় না। ঐ চমৎকারিত্ব এমন যে তাতে সব ইন্দ্রিয় নিবিষ্ট হয়ে যায়, আর কোনো দিকে লক্ষ্য থাকে না—তখনকার আনন্দই রস।

অসমোর্ধ—অর্থাৎ যার সমান নেই, উর্ধও নেই—সেই শ্রেষ্ঠ রসই ব্রহ্মবিগ্রহ। রসের পাত্র চাই, আধার চাই। সর্বব্যাপী নিরাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম আধার হতে পারেন না। তাই রসের আস্পদ হবার প্রয়োজনে বিগ্রহ ধারণ। ভাগবতী তনু রসস্বরূপ, রসবিগ্রহ।

অসমোর্ধ রসিকও তিনি। রসিকের রাজা তিনি—রসিকেন্দ্রশিরোমণি। উপনিষদ তাঁকে বলেছেন সর্বরসঃ। তাতে কেবল এক রকম রস নেই—অনন্ত রস, রসবৈচিত্র্য আছে। রসিক তিনি এক রসের ভোক্তা নন—অশেষ রসবৈচিত্র্য

আস্বাদন করেন তিনি। কিন্তু সব রসবৈচিত্র্যই আসলে তাঁরই স্বরূপানন্দ ও শক্ত্যানন্দ।

রসাস্বাদনের জন্যই লীলা প্রয়োজন। লীলা মানে খেলা। কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কোনো প্রয়োজনে বা কর্তব্যবশত যখন কাজ করি তখন তাতে আনন্দ থাকলেও সে আনন্দ সংকুচিত থাকে— আনন্দের অবাধ উল্লাস তাতে থাকে না। কিন্তু খেলা প্রয়োজনহীন, উদ্দেশ্যবিহীন কাজ বলে আনন্দ তাতে উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে। অধুনা খেলাকে বাণিজ্যের উপকরণ করায় অবশ্য খেলার ধর্মচ্যুতি ঘটেছে—খেলোয়াড়রা এখন পেশাদার ও অর্থ উপার্জনের জন্য খেলেন। ক্রীড়াকর্তারাও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত। বাণিজ্যিক খেলা লীলার তাৎপর্য বহন করতে পারে না।

লীলার লক্ষ্য রস। ব্রহ্ম সর্বব্যাপ্ত—তাঁর ভিতর-বাহির নেই। তাঁর রসাস্বাদন তাই তাঁর অন্তর্গুহাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না—স্বস্বরূপ ও স্বশক্তি আস্বাদন করেন বলে সবই তাঁর রসপাত্র, লীলাগার—স্বয়ং তিনিও যুগপৎ রস ও রসিক। ব্রহ্মসূত্র বলেন "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"—কেবল লীলার জন্যই এই লোকসৃষ্টি, লোকসৃষ্টি লীলাই।

নিরাকার নির্বিশেষ সর্বব্যাপ্তের লীলা ঘনীভূত হতে হলে নির্দিষ্ট রসপাত্র চাই, আবার রসিকেরও অন্তর বাহির চাই। ভূবা আনন্দ বোধে বোধ হয় বটে, প্রশান্ত সমাহিত নিস্তরঙ্গ আনন্দভাব থাকে বটে, কিন্তু আনন্দ যেন জমে না। নিথর নিরবয়ব জলরাশিতে ঢেউয়ের ওঠা-পড়া হলে, চাঞ্চল্য ও গতি এলে তবে তো হিল্লোল-কল্লোল জাগবে, আনন্দের উল্লাস-উন্মাদনা আসবে, বেদনার আলিম্পনে আনন্দ বিদ্যুৎ বল্লরীতে ঝলকিত হবে। তাই ব্রহ্ম বিগ্রহবান হন, দেহ অঙ্গীকার করেন, অসীমের গায়ে যেন সীমার একটা পাড় টেনে দেওয়া হয়। রসস্বরূপ করচরণযুক্ত হন। তিনি শিশু হয়ে খেলেন, কিশোর হয়ে ফচকিমি করেন, যুবক হয়ে কখনো বা যুদ্ধ করেন শত্রুর সঙ্গে—শত্রুও তিনিই—কখনো বা স্বীয় ভুজবল্লরীতে ভক্তের গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খান। পা আছে, তাই নাচেন। পা আছে তাই আমরা চরণে প্রণাম করি।

তবু বলেছি, তাঁর দেহ ও আত্মায় ভেদ নেই—চৈতন্যস্বরূপ বলে তাঁর দেহ আত্মাময়, চৈতন্যময়। রসস্বরূপ তিনি, কিন্তু রস তো মধুর। তাই তিনি মাধুর্যস্বরূপ। সে মাধুর্যও সর্বোত্তম, অসমোর্ধ। তাই তাঁর "আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন।" (চৈতন্য-

চরিতামৃত ২/৮/১১৪)। রূপ গোস্বামী এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের একটি কাহিনী ললিত মাধব নাটকে লিখেছেন। একদিন আয়নায় নিজেকে দেখে মাধুর্যহৃত কৃষ্ণ সোল্লাসে বলেন: "অপরিকলিতপূর্ব: কশ্চমৎকারকারী স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূর:। অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতা: সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।" এ তো দেখছি কোনো এক অনির্বচনীয় চমৎকারকারী মাধুর্যের গরীয়ান সমুদ্র! এরূপ মাধুর্যের কল্পনাও আমি আগে কখনো করতে পারিনি। আহা! প্রতিক্ষণে নব নব উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাধা যে ভাবে আস্বাদন করেন, প্রতিবিম্বের এই মাধুর্য দেখে, লুব্ধ-চিত্ত হয়ে এই আমারও সেইভাবে এই মাধুর্য আস্বাদনের জন্য বাসনা জাগছে।

ভগবান স্ব-মাধুর্য আস্বাদন করেন, করেই চলেছেন। মাধুর্যের চরম প্রেমে। প্রেম একা হয় না, যেমন লীলারস উচ্ছলিত হয় না একাকিত্বে। দুই চাই, বহু চাই। এই দুই বা বহুই তাঁর লীলাসঙ্গী, তাঁর ভক্ত, তাঁর পরিকর। এরাও তিনিই। তাঁরই স্বরূপভূতা স্বরূপশক্তি লীলাপরিকর হয়ে দেখা দেয়। ভগবানের শত্রুও ভগবানেরই সৃষ্টি, তাঁরই অংশজাত। কিন্তু শত্রুর মনে হিংসা আছে, দ্বেষ আছে, প্রেম নেই। আমরা যারা সাধারণ মানুষ, রাবণের মতো রামের সঙ্গে লড়িনা, আবার লক্ষ্মণের মতো রামের একনিষ্ঠ সেবাও করিনা, আমরাও তিনি—তাঁরই অংশসম্ভূত। কিন্তু আমাদের তা জানা নেই, উপলব্ধি নেই। ভগবানের প্রতি আমাদের বিরাগ-বিদ্বেষ নেই, আবার অনুরাগ-ভালোবাসাও নেই। তাঁর সম্পর্কে আমাদের অনুভূতি প্রায় মৃত। হয় আমরা তাঁর অস্তিত্বই অস্বীকার করি—তখন আমরা নাস্তিক বা সংশয়-বাদী। নতুবা মুখে তাঁকে মানলেও তা ঐ মুখেরই মানা—কার্যত আমরা উদাসীন, নিস্পৃহ; অথবা স্বার্থসিদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর দিকে তাকাই—বিপদে রক্ষা করো হে বিপত্তারণ, সম্পদে পরিবৃত করো হে ঈশ্বর!

কিন্তু যে তাঁর পরিকর ও ভক্ত সে তাঁর প্রতি বহন করে প্রেম—অহেতুক নিষ্কাম শুদ্ধ প্রেম। কামগন্ধ নেই তার ভালোবাসায়। ভগবানকে সর্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা জাগে প্রেমপ্রভাবে। ভক্তহৃদয়ের এই প্রেম যখন রস রূপে পরিণত হয় তখন ভগবান তা আস্বাদন করেন। সবচেয়ে বেশি আনন্দ তিনি পান ভক্ত হৃদয়ের প্রেমরস আস্বাদনে। এর তুলনায় তাঁর আর সব আনন্দও ফিকে হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ বলেন, তাই গাভী যেমন আপন বৎসের পিছনে

পিছনে ধায়, স্নেহকারুণ্য বশতঃ ভগবানও তেমনই ভক্তের পিছনে পিছনে ছোটেন। ভক্তের দ্বারে ভগবান বাঁধা থাকেন।

তখন ভক্ত ও ভগবান সমান হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কখনো আবার ভগবান বড় হচ্ছেন, ভক্ত ছোট। কখনো তার বিপরীতে, ভক্তই বড়, ভগবান ছোট হয়ে যান। কখনো আবার গলা ধরাধরি। এমনই লীলা চলেছে অনন্ত কাল, চলবেও। আর এমন লীলাতেই ভক্তহৃদয়ের প্রেমরস ঝলকে ওঠে। আমোদে তা পান করেন সামোদ দামোদর। আবার পান করান ভক্তকে। নিরুপাধি নিরাকার অখণ্ড সর্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্য বিগ্রহবান হয়েছিলেন ;—এখন তিনি খেলুড়ে। মজার মানুষ।

লোকসৃষ্টিতে যদি তাঁর এত মজা তবে এ সংসারে এত কান্না কেন? জন্মেও কষ্ট, মৃত্যুতেও কষ্ট। মাঝখানের জীবনটি যাতনাময়। রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য শোষণ নিপীড়ন কী না আছে জগতে! লীলাময়ের লীলার প্রয়োজনে সাধারণ মানুষকে কেন এত দুঃখের মূল্য দিতে হবে? এ কী অসঙ্গত অত্যাচার দুর্বলের ওপর! প্রশ্নটি বরাবরই ছিল, আজও আছে! মানুষ কেন হতে যাবে স্রষ্টার পায়ের ফুটবল?

বাংলার বৈষ্ণব আচার্যরা এ প্রশ্নের মীমাংসা করে গিয়েছেন—দার্শনিক সব মতের মধ্যে তাঁদের মতই সর্বাধিক গ্রাহ্য মনে হয়। ব্রহ্ম দ্বিতীয়রহিত, এক—একমেবাদ্বিতীয়ম্। এক বই দুই নাই। প্রাকৃত জগৎও ব্রহ্মই—মানুষও তাই। ব্রহ্মে কোনো ভেদ নেই—তিনি দ্বৈত নন, অদ্বৈত। কিন্তু জগৎ ও মানুষকে তো ব্রহ্ম বলে মনে হয় না—উভয়েই বস্তুনির্মিত। মানুষে চৈতন্য কিঞ্চিৎ প্রস্ফুটিত—জগতে তাও নেই। বস্তু যেন ব্রহ্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

এ পার্থক্য আছে, অস্বীকার করে লাভ নেই। এ পার্থক্য মায়া নয়, অলীক নয়; এমনকি জগৎ ও জীবের অস্তিত্বও মিথ্যা নয়, মায়া নয়। তাই ব্রহ্মে ভেদ আছে। কিন্তু ভেদের অন্তরালে যা প্রবহমান তা ঐক্য—বহুর চাঞ্চল্যের নিচে স্থির হয়ে শাশ্বত বর্তমান এক, অভেদ। লীলা তাঁর, দুঃখ কষ্ট যাতনা পীড়নভোগ সবই তাঁর। পুত্রশোকাতুরা জননী তিনি, লাঞ্ছিত ভিখারী তিনি। পরস্বাপহারী তিনি। শীতার্ত ক্ষুৎকাতরও তিনি। লুচ্চারূপী নারায়ণ। গুণ্ডারূপী নারায়ণ। হন্তা ও হত, বঞ্চক ও বঞ্চিত, মত্ত ও মথিত—সবই তিনি। 'সবই তিনি' যখন দেখি তখন দুঃখ চলে যায়। অঝোর-ঝরণ শান্তি আসে নেমে। থাকেনা অন্নাভাবও। খেলাতে সুখ কষ্ট কষ্টও

আছে—আঘাত লাগে, দম ফুরোয়, মাংসপেশী ব্যাথায় টাটায়। কিন্তু যখন বুঝে ফেলি এটা খেলাই, তখন কান্না থেমে যায়। যখন খেলার মাঝে খেলার রাজাকে আবিষ্কার করে বসি তখন আনন্দ। তখন শুধুই আনন্দ।

ব্রহ্ম ও মানুষে চৈতন্য আছে—তাই তারা সজাতীয়। ব্রহ্মে পূর্ণ চৈতন্য, মানুষে খণ্ড চৈতন্য—তাই ভেদ। কিন্তু চৈতন্য এক ও অখণ্ড—কোথাও তার প্রকাশ পূর্ণ, কোথাও আবৃত ও আংশিক। ব্রহ্মে ও মানুষে মৌল স্বরূপে ও সত্তায় পার্থক্য নেই, পার্থক্য আছে শুধু অনুভবে ও প্রকাশে। মানুষ এটা যখন জানতে পারে, নিজেকে যখন ব্রহ্ম বলে অনুভব করে ও জানে তখন সে ব্রহ্মই হয়ে যায়—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। তখন তাঁর চেতনায়, জ্ঞানে, আচরণে, এমনকি দেহ সৌষ্ঠবে ব্রহ্মত্ব ও ব্রহ্মভাব প্রকাশিত হয়, স্ফুট ও স্ফূর্ত হয়। স্বরূপত: সে যা, তা-ই ধরা পড়ে যায় লোকচোখেও। বৈষ্ণব বলেন, জীব ভগবান-নিরপেক্ষ হয়ে বেঁচে নেই, ভগবৎ নির্ভর হয়েই বেঁচে আছে। তাই প্রকৃত পক্ষে ভগবানে ও মানুষে সজাতীয় ভেদও নেই।

শক্তিমান ও তার শক্তি, আগুন ও তার দাহ্যতা যেমন ভগবান ও মানুষও তেমনই। শক্তিমান শক্তির অপেক্ষা রাখে, দাহ্যতা আগুনের অপেক্ষা রাখে। মানুষ ভগবানের শক্তি, তাই সে ভগবানের অপেক্ষা রাখে—নিরপেক্ষ হতে পারে না। জগৎ জড় বলে মনে হয়, যেন চৈতন্যহীন; তাই ব্রহ্ম ও জগৎ বিজাতীয়—একে অন্যের বিপরীত। প্রকৃতই তা নয়। জগতের অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ সৎ; পরম সৎ-এর অন্তর্গত বলেই সৎ। যা কিছু অস্তিত্বশীল তা-ই ব্রহ্ম। তিনি অস্তি ভাতি প্রিয়=সৎ চিৎ আনন্দ। অস্তিত্ব একটাই—তার বাইরে কিছু নেই। তাই ব্রহ্ম ও জগৎ আপাত বিজাতীয়, প্রকৃত বিজাতীয় নয়। তাই এই দুইয়ের মধ্যে বিজাতীয় ভেদ নেই, দুই-ই নয় এবা—কিন্তু দুই বলে প্রতীত হয়, ভেদ প্রতীত হয়। যতক্ষণ ভেদের প্রতীতি আছে ততক্ষণই ভেদ আছে—জ্ঞানের আবির্ভাবে ভেদের প্রতীতি মুছে যায়। অথবা জ্ঞান-দৃষ্টিতেও লীলাপ্রয়োজনে ভেদ থাকে। এই হল অভেদে ভেদ, ভেদে অভেদ দৃষ্টি।

লীলাকৌতুকী ভগবান জগৎ ও মানুষ সৃষ্টি করে তাদের দুঃখ দৈন্য দেখে আড়ালে বসে মজা করেন না। তিনি আড়ালে সব সময় বসে থাকেনও না। [illegible] তিনি ভেদের বুকে ক্ষণে ক্ষণে নেমে আসেন, কিংবা নেমেই আছেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, অজ (যিনি জন্মান না), অনাদি (যাঁর [illegible]

আরম্ভ নেই) অথচ সকলের আদি, অন্যনিরপেক্ষ, স্বয়ংসিদ্ধ ব্রহ্ম রসস্বরূপ ও রসিকও বটে। তিনি শুধু রসিক নন, রসিকশেখর। তিনি এক রসের আস্বাদন করে তৃপ্ত হন না, সব রসের আস্বাদন করেন। প্রত্যেক রসের আবার যত বৈচিত্র্য আছে সেসবও তিনি আস্বাদন করেন। প্রেমরসের পাঁচটি প্রধান—শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বাৎসল্য রস আস্বাদনের জন্য বাবা মা দরকার। বাৎসল্য রসের আশ্রয় বাবা মা। যিনি অজ তাঁর বাবা মা হয় না, বাৎসল্য রস ভোগ করতে পারেন না তাই। তাহলে রস-আস্বাদন তাঁর অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে—রসস্বরূপত্বই পূর্ণতা পায় না। পৃথিবীর মাটিতে তাই ভগবানকে নামতে হয় মাটির ঘরে বাবা-মার কোলে।

অজ তাহলে জন্মেন? জন্মেন, কিন্তু জীব জন্ম তাঁর নয়। বাবা মার দ্বারা তিনি জাত নন, তিনি বাবা-মাকে অঙ্গীকার করেন মাত্র। বাবা মা বাৎসল্য প্রেমের প্রভাবে ভাবেন—ভগবান তাঁদের ছেলে। পিতৃমাতৃত্বের অভিমান বা দৃঢ় প্রতীতি তাঁদের। ভগবানও প্রেমবশ—ভক্তের দ্বারে প্রেমদড়িতে বাঁধা। তিনি ভক্তের ভাবে আঘাত দেন না, ভাবের পুষ্টি করেন। গীতায় ভগবানের স্বমুখোক্তি—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। ৪/১১

যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে আমি তাকে সেভাবেই ভজনা করি (কিংবা গ্রহণ করি)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকের অনুবাদ করেছেন এই:

আমারে যে যে ভক্ত ভজে যে যে ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ চৈ. চ. ১।৪।

আগুনের স্বভাব দহন; ভগবানের স্বভাব ভক্তের ভাবানুরূপ ভালোবাসা। ভাববৈচিত্রী, রসবৈচিত্রী তিনি আস্বাদন করেন ও আস্বাদনে আনন্দ পান বলেই তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়—একটি রূপ, একটি ভাব বা একটি রসের আধিপত্য সেখানে নেই। সর্বভূতের ওপর, নিখিল মানব জাতির ওপর একটি মাত্র ভাবের আরোপ তিনি পছন্দ করেন না—যারা তা করতে গিয়েছে তারাই পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হয়েছে, সম্রাট বা ডিক্টেটর তা সে যাই হোক না কেন।

ভগবান নরদেহে যে বাবা মার ঘরে জন্মান তিনি তাঁদের পিতৃত্ব-মাতৃত্বের অভিমান ও দৃঢ় প্রতীতি এ কারণেই স্বীকার করে নেন। তাঁর পুত্রত্বও ঐ

অভিমান বা দৃঢ় প্রতীতিজাত, জন্মজাত নয়। এই সংবাদের প্রতি ইঙ্গিত করেই মহাপ্রভু বলেছিলেন :

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। চৈ, চ, ২।২০।১৩১

যখন ভক্তের পিতৃত্ব-মাতৃত্ব অভিমান স্বীকার করে তাঁদের নন্দন হয়ে ভগবান আসেন তখন তাঁর ভগবানবুদ্ধি থাকতে নেই—বাবা-মার কাছে ছোট অবোধ শিশু হয়েই আসতে হয়; নিতান্ত অসহায় ও অল্পবুদ্ধি শিশু না হলে বাবা-মার মন ভরবে কেন? ঠিক ঠিক পুত্র লাভ হয়েছে বলে মনে হবে কেন? ছোট ছেলেকেও যদি ভগবান মনে হয় তবে বাবা-মা শ্রদ্ধা ভক্তিতে তাঁর স্তব সুরু করে দেবেন, বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে যাবেন—বাৎসল্য রসের ক্ষরণ হবে না তো! তবু স্বরূপ ঢাকা পড়ে না, চেপেচুপে কত রাখা যায় নিজেকে? কারাগারে বাসুদেব-দেবকী শিশু কৃষ্ণের ভগবৎ স্বরূপ দেখেছিলেন, জগন্নাথ ও শচীদেবীও জানতেন নিমাইয়ের স্বরূপ—কিন্তু তন্মুহূর্তেই বিস্মৃত হতেন তাঁরা। যশোদা জানতেই চাননি; —তাঁর কাছে কানাই দুষ্ট মতিচ্ছন্ন বালক মাত্র, তার বেশি নয়।

তবু ভগবান মানব শিশু হয়ে যখন আসেন—সে তাঁর আসাই, জন্মানো নয়। তাঁর শাশ্বত বিগ্রহেই তিনি আসেন, নতুন দেহ ধরেন না। কেবল লোকদৃষ্টিতে তিনি ছিলেন না, এখন এলেন মাত্র। তাই তাঁর আবির্ভাব হয়, জন্ম নয়। লৌকিকী প্রতীতিতে আমরা বলি জন্ম। কেন এই প্রতীতি, কী দরকার এই প্রতীতির?

ভগবানের আবির্ভাব ও কাজ প্রাকৃত জগতে। মূলে সে সবই অপ্রাকৃত। তিনি লীলা করেন—লীলার এক অর্থ অভিনয়। মঞ্চে অভিনয় হয়, কিন্তু অভিনয়ের বিষয় ঐ মঞ্চের বিষয় নয়। নীলচাষ হয় মাঠে, নীলকর ও কৃষকদের সংঘর্ষ হয় গ্রামে। তাও এখন হয় না;—একশো দেড়শো বছর আগে হত। কিন্তু 'নীলদর্পণ' নাটক হচ্ছে কলকাতার বর্তমান কোনো মঞ্চে—মঞ্চে অভিনয়, কিন্তু অভিনয়ের বিষয় অন্য কালে, অন্য লোকালয়ে। অভিনয়ে এক স্থান কাল পরিবেশের ঘটনা আর এক স্থান কাল ও পরিবেশে পেশ করা হয়।

ভগবানের কাজকর্ম নিত্য লোকের নিত্য বিষয়। আমরা তা দেখতে পাই অল্পকালের জন্য এই অনিত্য লোকে। শিশির ভাদুড়ী রাম সেজেছিলেন মঞ্চে। আমাদের কাছে আকর্ষণ দুটি : এক রামচরিত্র; দুই, রামচরিত্রে শিশির

থাকে। ঈশ্বরাবতরণের মুখ্য হেতু আরও গোপন, মধুর, অন্তরঙ্গ। সেই হেতু বশত ঈশ্বরের ঐশ্বর্য তিনি লুকিয়ে আসেন—ঈশ্বর রূপে তাঁকে লোকে গ্রহণ করুক এ তিনি চান না। তাতে খেলা ভাঙবে যে! খেলুড়ে সঙ্গীরা যেন তাঁকে আদৌ ঐশ্বর্যবুদ্ধিতে না দেখে, ভীত ত্রস্ত, শ্রদ্ধা-সমীহাপূর্ণ না হয়—নিজেদের আপন জন বলে মনে করতে পারে! কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়:

ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনারে বড় মানে—আমারে সম হীন।
সবভাবে আমি হই তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করেন লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধভক্ত লঞা করির অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥

যারা নাস্তিক নয়, ঈশ্বরবিশ্বাসী, তারা ঈশ্বরকে মহামহিম রূপে দেখে—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পাতা অধিপতি। তাঁকে ভয় পাই, শ্রদ্ধা ও সমীহায় স্মরণ করি তাঁর নাম। কবিরাজ গোস্বামী তাই বলেছেন জগত ঐশ্বর্য-মিশ্রিত! ঈশ্বরপ্রেম এই ঐশ্বর্যবুদ্ধি দ্বারা শিথিলীকৃত। সে প্রেমের স্বাদ পানসে—সে প্রেমে জোর নেই। তা ভগবানের ভালো লাগে না। ভক্ত যখন নিজেকে হীন জ্ঞান করে ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবানকে স্তবস্তুতি করে ভগবান তার কামনা পূরণ করতে পারেন, দিতে পারেন বর, কিন্তু সেই ভক্তের প্রেমের বশীভূত হন না তিনি—কারণ তা তো প্রেমও নয়! যে ভক্ত প্রেমে এত আত্ম-

বিস্মৃত, দিকদিশাহারা, আবিষ্ট যে ভগবানের ভগবত্তা ভুলে গিয়েছে, মাতা পিতা সখা বন্ধু দয়িত এমনকি আপন সন্তান রূপে ভগবানকে দেখে—যথা রামকৃষ্ণলীলায় গোপালের মা—এবং ঐ অভিমান ও প্রতীতি এত দৃঢ় হয় যে ভগবানকে শাসন তাড়না ভর্ৎসনা গঞ্জনা করে, তাঁর কাঁধে চড়ে, নিজের ভুক্তাবশিষ্ট পর্যন্ত খেতে দেয়—তুমি কোন বড়লোক, তুমি আমি সমান, এমন বোধ করে—সেই ভক্তের ভক্তিই প্রেম। ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবান এত ঐশ্বর্যবেষ্টিত যে ঐশ্বর্যে তাঁর রুচি নেই তিনি ঐশ্বর্যহীন দীন কাঙাল-প্রেমলুব্ধ প্রেমভিখারী হতে চান। তাই মর্ত্যে নরশরীরে—রোগব্যাধিময় নরশরীরে—আসা। এই ঐশ্বর্যহীনতার চূড়ান্ত মূর্তি রামকৃষ্ণ। রাম ও কৃষ্ণ রাজবংশজাত—তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও সমর নায়ক! বুদ্ধও কুলপতিপুত্র, রাজন্যবর্গ-সেবিত-মহামহিম! চৈতন্য রূপে ও বিদ্যায় ভাস্বর, ব্যক্তিত্বে মহান—নীলাচলরাজ-পূজিত। গম্ভীরা লীলায় তিন চার জনের বেশি লোক তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারত না—এত মহিমোন্নত ব্যক্তিত্ব তাঁর। চৈতন্যাবতারেও ঐশ্বর্যভাব গোপন থাকেনি। কাঁথা করঙ্গধারী সন্ন্যাসী হলেও, 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলে আর্ত বেশে ভূমিতে লোটালেও, কাশীতে প্রকাশানন্দের সঙ্গে বিচারের আগে দীন মলিন বেশে মাটিতে বসলেও—তৃণাদপি সুনীচেন আচরণ পালন করলেও মহাপ্রভুর সত্তার উদাত্ত মূর্তিও বিস্মৃত হবার নয়। রামকৃষ্ণে শুধুই মাধুর্য, ঐশ্বর্যের লেশ নেই। তিনি যেন অনাদি কাল থেকে আমাদের হাত ধরাধরি করে নাচ গান আড্ডা দিয়েই চলেছেন—সবারই অবারিত দ্বার তাঁর কাছে, বন্ধ হয়নি সে দ্বার কখনো, এমনকি অন্ত্যলীলাতেও নয়! তিনি ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশও দিচ্ছেন ঘরোয়া গ্রাম্য ভাষায়, খিস্তি খেউড়ে সিদ্ধ, ফচকিমি করেন! ঐশ্বর্যহীন ভগবানের রূপ যদি কারও দেখার সাধ থাকে তবে রামকৃষ্ণই সে রূপের সর্বোত্তম প্রকাশ!

কবিরাজ গোস্বামী রসিক ও রসবেত্তা। তিনি একটি গূঢ় কথায় ভগবানের মর্তালীলাকে সংজ্ঞিত করেছেন—অদ্ভুত বিহার। অদ্ভুত মানে অভূতপূর্ব —আর যা হয় নি। বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার করবেন ভগবান। অর্থাৎ পাশার দান বারবারই ওলটাবেন! রামকৃষ্ণলীলায় তাই ভগবানই ভক্তের পূজা করে গিয়েছেন—গিরিশ ঘোষকে তিনিই প্রথম প্রণামটি করলেন, শেষ প্রণামটিও তাঁর। সদ্য যুবক নরেনকে তিনিই বদ্ধাঞ্জলি হয়ে স্তবস্তুতি করেছিলেন। জীবনের অন্তিম কালে আর একটি কিশোর, পূর্ণ ঘোষকেও, তিনি মানস

পূজা করেছেন দেখতে পাই। নিজ স্ত্রী সারদামণিকে ষোড়শোপচারে পূজা করেছিলেন রামকৃষ্ণ—চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে পশ্চাতে রেখে যাবার ঋণ শোধ যুগান্তরে এ ভাবেই হয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। রামকৃষ্ণ মানুষের পদাঘাত স্বীকার করেছেন অম্লান বদনে,—রাসমণি মথুরবাবুর বাড়িতেই হালদার পুরোহিত এই কাজটি করেছেন—উপেক্ষা ও অবজ্ঞা তো সারা জীবনই পেয়েছেন। অদ্ভুত বিহার! আত্মরক্ষার অস্ত্র-উপকরণ কিছুমাত্র ছিলনা তাঁর হাতে। জগাই মাধাই নিত্যানন্দের মাথায় কলসীর কানা মারলে ক্রুদ্ধ নিমাই সুদর্শন চক্রকে ডাক দিয়েছিলেন; কাজীর বাড়ি অভিযানও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিলনা! রামকৃষ্ণের অস্ত্র কোথায়! ত্রৈলোক্য মোহন বিশ্বাস দারোয়ান দিয়ে রামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে বেরিয়ে যেতে বললে, তদ্দণ্ডেই রামকৃষ্ণ বেরিয়ে গিয়েছিলেন! কোনো প্রতিবাদ নয়, প্রশ্ন নয়, সময় চাওয়া পর্যন্ত নয়। তাঁর অত কালের আবাসটুকু রক্ষা করার চেষ্টাটুকুও ছিলনা, কেননা অধিকার কোথায়! ভগবানের এমন সামান্যতায় আত্মবিলোপের নজীর নেই। অদ্ভুত বিহার! ভগবানই মানুষকে সেধে ফিরেছেন, মানুষ তাঁর দিকে যেন ফিরেই তাকায়নি।

ভগবানের অবতরণের দুটি হেতু থাকে—বাইরের ও অন্তরের। বাইরের হেতু, সব মানুষকে অহেতুক, নিষ্কাম, শুদ্ধা ভক্তি দান। দান করলেই তা নেবার রুচি হয় না, সামর্থ্য হয় না। সহৃদয় দাতা মানুষের এ দুর্বলতার কথা জানেন। জানেন বলে মুখ ফিরিয়ে নেন না। তিনি মানুষের মনে রুচি সৃষ্টি করেন। নিষ্কাম, শুদ্ধ, অহেতুক ভক্তি কা তা শুধু উপদেশ দিয়ে বললে রুচি সৃষ্টি হয় না। আপন আচরণ দিয়ে দেখাতে বোঝাতে হয়। দৃষ্টান্ত দেখাতে হয়। শুধু তাই নয়। ভগবান যখন মানুষ হয়ে ভক্তবৎ লীলা করেন সে লীলা এত মধুর হয়ে ওঠে যে মানুষ ঐ লীলাকথা দেখে, শুনে, জেনে লীলাস্বাদনের চমৎকারিত্বে উদ্দীপ্ত সঞ্জীবিত হয়। নিত্যই ঐ লীলারস পানের আকাঙ্খা জন্মে তার মনে। ভক্তি লাভে রুচি হয় তার। জাগতিক বিষয়ে রুচি কমে এসে ভগবানে রুচি বাড়ে। তাই ভগবান পৃথিবীতে এসে নির্মল লীলা বিস্তার করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃষ্ণমুখে এই উক্তি বসিয়েছেন:

এই সব রস নির্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সর্ব ভক্তেরে প্রসাদ॥

ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম ॥

আদিলীলা : ৪র্থ পরিচ্ছেদ ॥

যে সব রসের নির্যাস তিনি আস্বাদ করতে চান মর্ত্যধামে এসে, আগেই সে রসের কথা বলেছি—গোলোকে-বৈকুণ্ঠে ঐ সব রসের আস্বাদন সম্ভব হয় না। আবার ঐ সব রস আস্বাদনের মাধ্যমেই তিনি ভক্তদের প্রসাদ দিতে চান ও তাদের হৃদয়ে ভক্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে চান। ব্রজের নির্মল রাগ শুনে ভক্তরা রাগমার্গে ভজনা শিখবে ও তাতে প্রবৃত্ত হবে। ব্রজের অনুরাগ নির্মল কেননা তা ঐশ্বর্যবোধহীন ও স্বসুখকামনাহীন। রামকৃষ্ণলীলা এই স্বসুখবাঞ্ছাহীন ভক্তির লীলা। ভক্ত রূপে এই লীলা তিনি করে গিয়েছেন। যারা দেখেছিল তারা স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে সে লীলা আস্বাদন করেছিল। যারা দেখেনি তারা শ্রীম প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী সারদানন্দ প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সে লীলাকাহিনী জেনেছে। সে লীলার মাধুর্য এত চিত্তাকর্ষক, এত সর্বাতিশায়ী যে ঘরে ঘরে, দেশে বিদেশে মানুষ মুগ্ধ হয়েছে তার আস্বাদনে, স্মরণে, মননে, কীর্তনে। তাদের হৃদয়ে জন্মেছে ভগবদ্ভক্তিতে রুচি। এইটি মানুষকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান।

ভাগবতে ভগবানের এই মানুষী লীলার কথা বলতে গিয়ে শুকদেব বলেছেন : "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ।" ১০।৩৩।৩৬। ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করে ভগবান নর দেহে এমন লীলা করেন যে লীলার কথা শুনে মানুষ ভগবৎ-পরায়ণ হয়।

এ হল বাইরের কারণ। আরও গূঢ় নিজস্ব হেতু আছে ভগবানের মর্ত্যে আসার। বৈষ্ণব আচার্যদের অনুসরণে এরূপ তিনটি হেতুর কথা বলা যায়। প্রথম হেতু, ভগবান চান স্ব-মাধুর্য আস্বাদন করতে। গোদাবরী নদী তীরে রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন :

আপন মাধুর্য হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥

চৈ, চ, মধ্যলীলা : ৮ম পরিচ্ছেদ।

কিন্তু ভগবানের মাধুর্য আস্বাদন করে ভক্ত, ভগবান নন। কেননা সে মাধুর্য আস্বাদনের উপায় প্রেম—ভগবদ্ভক্তি। প্রেমের আশ্রয় ভক্ত,—ভগবান প্রেমের বিষয়। তাই ভক্তই পারে ভগবানের মাধুর্য আস্বাদন করতে। ভগবান

যদি স্বমাধুর্য আস্বাদন করতে চান তবে তাঁকে ভক্ত হয়ে আসতে হয়, ভক্ত-শরীর ধারণ করতে হয়।

দ্বিতীয় হেতু, ভগবানের মাধুর্য আস্বাদন করে ভক্ত কী তৃপ্তি লাভ করে ভগবান তো জানতে পারেন না। কেন ভগবানকে মানুষ ভালোবাসে? ভালো-বেসে কী সুখ পায়? সে সুখের গাঢ়তা কী, স্বরূপ কী তা ভগবানের জানা নেই। ভগবান নিজে ভক্তকে ভালোবাসেন। কিন্তু সে ভালোবাসা তাঁকে আত্মহারা করে না, ভক্তপ্রেমে ভগবান পাগল হন না। তিনি সদা স্থির থেকে শান্তভাবে ভক্তকে ভালোবাসেন। কিন্তু ভক্ত ভগবানকে ভালোবেসে উন্মাদ হয়—কখনো বালকবৎ, কখনো জড়বৎ, কখনো পিশাচবৎ কখনো উন্মাদবৎ। ভক্ত আত্মবোধহীন, ভগবান প্রেমেও শান্ত অবিচল।

বস্তুত: ভক্তের প্রেমের কাছে ভগবানের প্রেম যেন দীন হয়ে করজোড়ে দাঁড়ায়। গীতায় ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন:

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। ৪।১১

তাংস্তথৈব। বলদেব বিদ্যাভূষণ 'এব' শব্দের তাৎপর্য বোঝাতে লিখেছেন 'ন্যূনতামেবকারো নিবর্তয়তি'—অর্থাৎ 'এব' শব্দ এই বোঝায় যে ভক্তের ভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ অপেক্ষা ভগবানের কৃপার প্রকৃতি ও পরিমাণ বিন্দু-মাত্র ন্যূন হয় না।

কিন্তু ভগবান তেমন তেমন ভক্তের প্রেমের কাছে হার মানেন—তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা-বাক্য রক্ষা করতে অক্ষম হন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেন:

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখ বচনে॥

গোপীর ভাবের কাছে ভগবানের প্রতিজ্ঞা-বাক্য পরাস্ত হয়েছে কারণ তারা গীতোক্ত সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—ভগবানের এই আহ্বান সর্বান্তঃকরণে শুনে ও মেনে একমাত্র ভগবানকেই বরণ করেছে গৃহধর্ম সমাজধর্ম দুস্ত্যজ আর্যধর্ম সব ছেড়ে; লৌকিক যশ মান নিরাপত্তা ছেড়ে; অহং ও দেহবোধ পর্যন্ত ছেড়ে। ভগবান ছাড়া আর কিছু তাদের কামনায় নেই, দৃষ্টিতে নেই, বোধে নেই। কৃষ্ণৈকপরায়ণ গোপী [...] প্রতিজ্ঞা রাখতে

হলে ভগবানকেও তো সব ছেড়ে সব কিছু ছেড়ে তবে একমাত্র গোপীকেই ভজনা করতে হয়। তা তিনি পারেন না, কেননা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি ও ব্রহ্মাণ্ডপালক তিনি—তাঁর মন তো ব্রহ্মাণ্ডে ও তার অন্তর্গত সব জীবে ও ভক্তে দিতে হয়। তিনি আর সবাইকে ছেড়ে একজন গোপীকে ধ্যান করতে পারেন না। ভক্ত যে ভাবে তাঁকে ভজে ভগবান ঠিক সেইভাবে ভক্তকে ভজনা করতে বিফল হন। পরাস্ত তিনি ভক্তের একনিষ্ঠ আত্মহারা প্রেমের কাছে।

এমনই মহিমা ভক্তপ্রেমের।

তাই ভগবানের তৃতীয় অপূর্ণ বাসনা, ভক্তের প্রেম মহিমা জানার। সে প্রেমের এমনই বীর্য যে বিশ্বজনপালক ভগবানকে কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে —যেদিকে যেমন চায় তেমনই নাচায়। একমেবাদ্বিতীয়মকে বন্দী করে ভক্তের প্রেম। স্বাধীন স্বতন্ত্র ভগবান হন ভক্তপ্রেমবশ। কবিরাজ গোস্বামী বলেন:

রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত।
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে প্রেমে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু—আমি শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥
রাধাপ্রেম বিভু—যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ধকধকি॥

—চৈ, চ, আদিলীলা: চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাধা ও গোপী ভক্তের ভগবৎপ্রেমের চূড়ান্ত অবস্থা—যারই হবে ঐ অবস্থা ভগবান তার কাছে অমনই ভাবে বাঁধা থাকবেন।

তাহলে ভগবানের নরদেহে মর্ত্যে জন্ম নেবার তিনটি অন্তরঙ্গ হেতু এই—স্বমাধুর্য-আস্বাদন বাসনা; ভক্ত কর্তৃক ভগবৎমাধুর্য-আস্বাদনজনিত সুখের স্বরূপ জানার বাসনা এবং ভক্তের প্রেমমহিমা জানার বাসনা। ভক্তকে যদি

রাধার স্থানে বসাই তাহলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কর্তৃক উদ্ধৃত এই শ্লোকটি আমরা ব্যবহার করতে পারি ;

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী-গর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

চন্দ্র যেমন সমুদ্র থেকে উঠেছেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রও তেমনি শচীর সন্তান হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে চৈতন্য রূপে জন্ম নিয়েছেন তিনটি সাধ পূরণের জন্য। প্রথম সাধ, রাধাপ্রেমের মহিমা কতখানি তা জানবেন। দ্বিতীয় সাধ, সেই প্রেমের আলোকপাতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের চমৎকারিতা কতখানি তা তিনি জানবেন। তৃতীয় সাধ, সেই চমৎকারিতা অনুভব করে রাধার আনন্দ কতখানি তাও তিনি জানবেন।

শ্লোকটি লিখেছেন স্বরূপদামোদর—নীলাচলে গম্ভীরা লীলার অন্তরঙ্গ সঙ্গী। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধানের শ্রেষ্ঠ সাধক তিনি। তিনি ঐ শ্লোকে একটি অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করেছেন—লোভাৎ। লোভবশত ভগবান আসেন।

ভগবানেরও লোভ! হিরণ্যকশিপু বধ করতে নৃসিংহ দেবের আবির্ভাব—এটি বহিরঙ্গ হেতু। অন্তরঙ্গ হেতু, বাৎসল্য রসের প্রতি লোভ। তাই হিরণ্যকশিপু বধের পর ক্রুদ্ধ, উদ্দণ্ড নৃত্যশীল নৃসিংহ প্রহ্লাদকে দেখা মাত্র কোলে টেনে নিলেন, বাৎসল্যে পরিপ্লুত হয়ে তার মুখ চেটে আদর করতে লাগলেন। প্রহ্লাদ আনন্দে ভরপুর। প্রহ্লাদ পিতৃস্নেহ পেয়ে এত আনন্দিত কেন? পিতৃস্নেহে এত আনন্দ কেন? ভগবান পিতৃমাতৃস্নেহ ভোগের লোভে রাম হয়ে জন্মান!

ভগবান লোভ করেন। তিনি ভক্তির বিষয়। ভক্ত ভক্তির আশ্রয়। ভক্তির স্বাদ বিষয়ের তুলনায় আশ্রয়ই বেশি পায়। মাটির মালসায় তুষের আগুন রেখে শীতকালে গ্রামবাসীরা আগুন পোহায়। গ্রামবাসী ঐ মানুষরা আগুনের তাপ উপভোগ করে বিষয় রূপে। সে তাপ আশ্রয় রূপে ভোগ করে ঐ মালসা। মানুষের হাত-পা গরম হয়—কিন্তু সামান্য। মালসা গরম হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। মালসা গনগন করে তাপে। বিষয়ের তুলনায় আশ্রয় আগুনের স্বাদ বেশি পায়।

ভগবান ভক্তের ভক্তির বিষয়। সে ভক্তির স্বাদ ভগবান যা পান ভক্ত তার চেয়ে বেশি পায়। সে অনির্বচনীয় রসের মধুরিমার প্রতি ভগবানের লোভ জন্মে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণের মুখে এই কথাগুলি বসিয়েছেন :

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥

চৈ, চ, আদিলীলা : চতুর্থপরিচ্ছেদ।

তিনটি বাসনাই পূরণের একমাত্র উপায় ভগবানের ভক্ত হওয়া। প্রেমের আশ্রয় ভক্ত, বিষয় ভগবান। আশ্রয় রূপে প্রেম আস্বাদন করতে হলে ভক্ত হওয়া ছাড়া ভগবানেরও উপায় থাকে না। কল্পনায় আমরা অনেক সময় দূর দেশে বেড়াতে যাই--প্রকৃত ভ্রমণের রসাস্বাদ তাতে মেলে না। কল্পনায় আসল জিনিসের ছায়া মিলতে পারে, আসল বস্তুটি নয়। ভগবান তাঁর বিশাল কল্পনায় ভক্তের হৃদয়রসের ধারণা করতে পারেন কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে সে হৃদয়রস কী, ভক্ত হৃদয়ের আর্তি কেমন, তার বিরহব্যথার অনুভব কেমন, মিলনের নিবিড় আনন্দেই বা কেমন পুলক তার—এসব অনুমানে বুঝলেও স্বকীয় অভিজ্ঞতায় ভগবান জানেন না। জানতে গেলে ভগবানকে ভক্ত হতে হয়। জানা দুরকম। অনুমানে ধারণায় কল্পনায় জানা। আর অনুভবে জানা। ভক্তের আত্মবিস্মৃত, আত্মোন্মাদকারী ভগবৎ প্রেম ভগবানের অনুমান, ধারণা বা কল্পনাগম্য মাত্র, অনুভববেদ্য নয়।

ভগবানের একান্ত সাধ অনুমানের ভূমিকা থেকে অনুভবের ভূমিতে আসা। রসিকের রসাস্বাদ তবেই পূর্ণ হবে। সাধ পূরণে ভগবান চেষ্টা করেন। তিনি যত্নশীল। কারণ ভগবানের "হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ধক্‌ধকি" (চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। আবার সেই লোভেরই কথা। ভক্ত হবার জন্য ভগবানের উদ্যম—লোভবশতঃ। ভক্ত-ভগবানের এতটা মাথামাখি কেন, বৈষ্ণব আচার্যদের অনুসরণে সেকথাটা একবার ভেবে দেখতে পারি।

রামকৃষ্ণ বলেন, ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তিনি পাহাড় পর্বত নদী নিয়ে লীলা করতে আসেন না। ভক্ত নিয়ে তিনি লীলা করতে আসেন। ভক্তই তাঁর প্রাণ। কেননা ভক্ত তাঁর স্বরূপশক্তি। স্বরূপশ্চাসৌ শক্তিশ্চেতি। যে স্বরূপ সেই শক্তি, স্বরূপ থেকে অভিন্ন যে শক্তি তাই-ই স্বরূপশক্তি। আবার স্বরূপ থেকে আবির্ভূত শক্তিও স্বরূপশক্তি। অভিন্ন এখন ভিন্ন হয়েছে। ভগবানের নিজ শক্তি তা থেকে পৃথক মূর্তি ধরেছে। লীলার জন্যই ভেদ। কিন্তু যিনি অভেদ এই ভেদটুকু তিনি যেন সহ্য করতে পারেন না। একই জল সাগরে ও নদীতে। তবু নদী পাগল পারা হয়ে সাগরে ধায়। অধীনতা যখন খুব বাড়ে তখন কূলের বাঁধন সহ্য করতে পারে না নদী—হয় কূল ভাঙে, নতুবা কূল ছাপায়। প্লাবন ঘটায়। অভেদে ভেদ এনেছে দুটি তীর। তাই তীর ভাঙা, নতুবা ডিঙোনো!

ভক্ত ও ভগবানের দুই ভেদ। দুই দেহ তাই ভেদ। ভক্ত প্রেমের আশ্রয়, ভগবান প্রেমের বিষয়, তাই ভেদ। একে বলে আলম্বনগত ভেদ। ভক্ত-ভগবানের অভেদত্ব দেহগত ও আলম্বনগত তীর দুটির ভেদ যেন সহ্য করে না। অভেদের একান্ত চেষ্টা ভেদ মুছে ফেলে জয়ী হওয়া।

নির্গুণ নিরাকার নিরঞ্জন সর্বতোব্যাপ্ত অসীম ব্রহ্মকে জানা যায় না, বোধে বোধ করা যায় মাত্র। কিন্তু ভক্ত তাকে জেনে ফেলে, সীমা দেয়, রূপ গুণ আকার দেয়। ভক্ত ও ভগবান শব্দ দুটি আপেক্ষিক, পরস্পরনির্ভর। ভক্তই ভগবানকে উদিত করে। যেখানে ভক্ত নেই সেখানে ভগবানও নেই—আছেন শুধু ব্যাপ্ত অখণ্ড চৈতন্য সমুদ্র। ব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র ব্যক্তি আছে যার আকুতিতে চৈতন্যসমুদ্র থেকে ভগবান উত্থিত হয়েছেন। সে ভক্ত। রামকৃষ্ণ বলেন ভক্তের ভক্তি হিমে জল বরফ হয়—তরল আকারহীন রঙহীন জল শক্ত বরফের আকার পায়। চৈতন্যসমুদ্র থেকে চৈতন্যময় বিগ্রহ দেখা দেন।

নিজে নিজের মুখ দেখা যায় না। দেখা যায় শুধু দর্পণের সাহায্যে। ব্রহ্ম-চৈতন্যসমুদ্র থেকে উত্থিত ভগবান, অরূপের রূপ, নিজে দেখতে কেমন হলেন তা জানতে চান। ভক্তের হৃদয় তাঁর দর্পণ। ভক্তের হৃদয় তো জড় নয়, তা চিন্ময়। চিন্ময় দর্পণে চৈতন্যস্বরূপ নিজেকে দেখেন। প্রাকৃত বা জড় দর্পণ শুধু বিম্বকে প্রতিফলিত করে—বিম্ব বা আসল বস্তুকে ধারণ করতে পারে না। আয়নায় আমার মুখ নেই, আছে মুখের প্রতিফলন। কিন্তু ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। সেখানে তিনি আনন্দে থাকেন, যেন মজলিস মাইফেল করেন।

দর্পণে মালিন্য থাকতে পারে। ধুলো ময়লা পড়ে। তখন প্রতিবিম্বন স্বচ্ছ হয় না, ধুলোয় ঢাকা পড়ে। যে ভক্তের হৃদয় দর্পণ যত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল ভগবানের আত্মদর্শন সেখানে তত মধুর! ভক্তের স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণকে বলে সৎ প্রেমদর্পণ। এই প্রেমদর্পণে মালিন্য জমলে তাকে বলে উপাধি। নিষ্কাম ভক্তের নির্মলপ্রেম নিরুপাধি!

সৎ প্রেমদর্পণে ভগবান নিজেকে সর্বতোভাবে দেখেন। চৈতন্যস্বরূপের প্রতিবিম্বনে বা ধারণে সে দর্পণের স্বচ্ছতা উজ্জ্বলতা কেবলই বেড়ে চলে। মালিন্য নেই, উপাধি নেই তবু উজ্জ্বলতা প্রতি ক্ষণে বাড়ে। ভক্ত ভগবানকে পেলেও—তাঁকে আরও আরও পাবার আকাঙ্ক্ষা বেড়েই চলে। ভগবানের মাধুর্য আস্বাদনের উৎকণ্ঠা ভক্তের মনে নিয়তই বাড়ে। সে উৎকণ্ঠার শেষ নেই। বাড়ার জায়গা নেই। তবু তা বাড়ে।

ভক্তের ভগবৎ মাধুর্য আস্বাদনের উৎকণ্ঠা যত বাড়ে ভগবানের স্বমাধুর্য ততই হয় নব নবায়মান। নিত্য নবীনং—মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন। কে জেনেছে তা? জেনেছে একা ভক্ত। ভক্ত আস্বাদন করে বলেই সে জানে। এবং সে আস্বাদন করে বলেই তা নবায়মান হয়। ভক্ত না থাকলে কোথায় বা ভগবান আর কোথায় বা তার মাধুর্য? আর আস্বাদন না হলে নবায়মান হবার, রসবৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রেরণা আসবে কেন? পৃথিবীতে একজন ক্রেতাও যদি না থাকে তবে ময়রা কি দোকান সাজায়? ভক্তের সৎ প্রেমদর্পণের সামনে দাঁড়ালেই ভগবৎ-মধুরিমার নিরন্তর নবীনতা প্রকাশিত হয়!

বস্তুত: ভগবানের মাধুর্য ভগবানে নেই। আছে তা ভক্ত ও ভগবানের নিবিড় মিলনে। সন্দেশের মিষ্টতা দোকানের শো-কেস অনুভব করে না। সন্দেশের মিষ্টতা আমাদের জিভে। জিভেই মিষ্টতা নেই, কেননা তিতো জিনিস খেলে তিতোই লাগে। মিষ্টতার বাস সন্দেশ ও রসনার মিলনে। ঐ মিলন স্থলেই রস থাকে—আর কোথাও থাকে না। ভক্তের উৎকণ্ঠাময় ভালো-বাসায় ভগবান স্নাত হলেই তাঁর মাধুর্য নতুন থেকে নতুনতর হয়ে ওঠে। ভক্ত-হৃদয় ভগবানকে ধারণ করে স্বচ্ছতর উজ্জ্বলতর হয়। আবার ভগবানকে ধারণের দ্বারাই তাঁর মাধুর্যকে নবায়মান করে তোলে ভক্ত-হৃদয়।

ভক্তের ভালোবাসা ও ভগবানের মাধুর্য পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা করে বাড়ে। সে জিদের শেষ নেই। যত আস্বাদন তত বৃদ্ধি। তাই আস্বাদনে বিতৃষ্ণা আসে না, কেন না একঘেয়ে ভাব নেই তাতে। বরং মাধুর্য নিত্য নবীন বলে

তা আস্বাদনের তৃষ্ণা কেবলই বাড়ে। ঐ তৃষ্ণাটি কেমন? তাঁর নিজ নব নবায়মান মধুরিমা কেমন? ভগবান তা জানেন না। তিনি শুধু অনুমান করতে পারেন। অনুমানের প্রশ্ন ওঠে ভক্তকে দেখে। ভগবান যে মাধুর্যময় এ সংবাদ কে দিয়েছে? দিয়েছে ভক্ত। ভগবানকেও দিয়েছে, জগদ্বাসীকেও দিয়েছে। সে তো নিজের বুকে শুধু ভগবানের প্রতিচ্ছায়াকে ধারণ করেনি। ধারণ করেছে স্বয়ং তাঁকে। তাই সে কখনো ভগবান দ্বারা চুম্বিত, কখনো ভগবানকে সে চুম্বন করে। ঐ চুম্বন-দ্বারে, ঐ স্নেহ ভালোবাসা করুণা প্রীতির উদ্বেল বিন্দুতেই তো ভগবানের মাধুর্য আস্বাদিত হয়। তাই ভগবান যখন স্ব মাধুর্য আস্বাদনের লোভ করেন তখন আসলে তিনি ভক্ত কর্তৃক আস্বাদিত স্ব মাধুর্যই আস্বাদনের লালসা করেন। ভগবানের দুর্বার লালসা ভক্তের ঐ সতত বৃদ্ধিশীল তৃষ্ণাময় ভালোবাসার বিলাস-বৈচিত্র্যে নবায়-মান ভগবৎ মধুরিমার প্রতি। তাই নিজে ভক্ত হয়ে তাঁকে আসতে হয়। তাই রামকৃষ্ণ আসেন। ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ ইদানীং তিনিই রামকৃষ্ণ: খোলটা থেকে সচ্চিদানন্দ বেরিয়ে এসে বললে, যুগে যুগে আমিই অবতার। —এসব অন্তিম সময়ের উক্তি, বিদায় নেবার আগে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া, লীলাবসানের প্রাকমুহূর্তে লীলাবিগ্রহের স্বরূপোন্মোচন। এর আগে গোটা জীবনটাই ভক্তবৎ কেটেছে তাঁর; ভক্তই তিনি, শান্ত (বোধে বোধ-সমাধি, অদ্বৈতানন্দী), দাস্য (হনুমান ভাব), সখ্য (ফচকিমি—পৌগণ্ড ভাব), বাৎসল্য (মানসপুত্র রাখাল প্রমুখদের সঙ্গে অথবা রাম-লালাকে নিয়ে) ও মধুর (শ্রীমতীর ভাব, ওড়নাকাঁচুলি অলঙ্কার ইত্যাদি পরিধানে;—মধুরভাবে ভগবানকে আলিঙ্গন-চুম্বন করতে গিয়ে বেড়ার ওপর পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যায়) ইত্যাদি পঞ্চভাবে ও আরও বহু বিচিত্র ভাবে রামকৃষ্ণ ভক্ত রূপে ভগবৎ মধুরিমা আস্বাদন করে গিয়েছেন।

ভক্ত রামকৃষ্ণের ভগবৎ প্রেমে স্বসুখ বাঞ্ছা নেই। কোনোদিন কোনো কামনার স্পর্শ লাগেনি তাঁর চিত্তে। মালিন্যমুক্ত তাঁর হৃদয় দর্পণ। সে দর্পণে উপাধি নেই। ভগবানের প্রতিফলনে, ভগবৎস্বরূপের ধারণে হৃদয়ের সৎ প্রেম-দর্পণ স্বচ্ছতম উজ্জ্বলতম হয়ে উঠেছে তাঁর। ভক্তের ব্যাকুল উৎকণ্ঠাময় প্রণয়-তৃষ্ণার দ্বারে ভগবানের নিত্য নবায়মান মধুরিমা উপলব্ধি করে গিয়েছেন তিনি। তাই তিনি অন্ত্যলীলাকালে—কাশীপুর বাগানে বলেন, ভগবদুপ-লব্ধির ইতি করা যায় না, তা নিত্যই নতুন।

ভালোবাসাই রসের ভাণ্ডার। ভক্তহৃদয়ই সে রস-ভাণ্ডার। ঐ ধন ভগবানের নিজের ঘরে নেই। অথচ ঐ ধন তাঁর চাই। দুর্বল লোক পরধন পেতে হলে ভিক্ষা করে। সবল লোক জোর করে দখল করে। আর চতুর নিপুণ কৌশলী লোক চুরি করে নেয়। শ্রীরূপ গোস্বামী অনুভবে জেনেছেন, ভক্তের দ্বারে ভগবান কৌশলী চতুর চোর হয়ে আসেন। কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা—কৌতুকী ভগবান ভক্তহৃদয়রসভাণ্ড চুরি করে এনেছেন। নিন্দিত কাজ করেছেন। প্রেমাস্বাদন ও স্ব-মাধুর্য আস্বাদনের লালসা এত প্রবল ও দুর্নিবার যে ভক্তের আপন সযত্নবর্ধিত ধন ভগবান চুরি করেন। ভক্ত মহিমা বুঝতে কুশলী ভগবান—অতি চালাকের গলায় দড়ি নীতি মেনে—চোর সেজেছেন। চোর সেজে তিনি আমাদের সবার হৃদয় ও মন, এমনকি যেখানে সম্ভব দেহও চুরি করেছেন। চুরি করে আত্মসাৎ করেছেন। অভেদ তিনি ভেদের তীর ডিঙিয়ে গিয়েছেন। ভক্তের ধন তাই তাঁর নিজ ধনে পরিণত হয়েছে। রামকৃষ্ণ শরীরে ভক্ত-ভগবানের মিলন এত গাঢ় গভীর যে অবশেষে তিনি সত্যই কে তা চেনাই যায় না। শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত একজন পরমহংস সাধু? না জগজ্জননী কালী স্বয়ং? বেদে যাঁকে প্রণব বলেছে, ওঁ, পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ তিনিই বাংলার ধূলিপ্রান্তরে, শহরে ও গ্রাম জনপদে, সুরধুনী তীরে দক্ষিণেশ্বরে লীলা করে গিয়েছেন দীন নিরভিমান ভক্ত বেশে। তাই তাঁর সাধকের বেশ—নতুবা নিজের জন্য তাঁর আর সাধনার কী দরকার ছিল? বালোই যিনি সমাধিবান ও ভক্তদ্বারা পরম দেবতা রূপে বন্দিত—তাঁর কি আত্মমুক্তির সাধনার প্রয়োজন হয়?

ভগবান পাগল হন না। আত্মবশ তিনি, জগৎনিয়ন্তা, সর্বদা অবিচল সাম্যভাবে আছেন। সাংখ্যদর্শন বলেন, পুরুষ স্থির, কোনো চাঞ্চল্য তাঁতে নেই। চাঞ্চল্য আছে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে। ভগবান প্রকৃতির অধীন নন, প্রকৃতির অধীশ্বর। ভক্ত ভালোবাসায় উদ্বেল হয় কেননা একমাত্র ভগবানের প্রতিই তার সব ভালোবাসা কেন্দ্রীভূত ও ধাবিত। ভগবান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ও অগণিত জীবকে ভালোবাসেন—কোনো বিশেষ একজনকে নয়। তাই তিনি শান্তভাবে ভালোবাসেন—আত্মহারা উদ্বেলতা নেই তাঁর। কিন্তু রামকৃষ্ণ পাগল হলেন। তিনি ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা, দেহবুদ্ধিহীন, এমনকি জগৎ ভুলে গিয়েছেন। কেবল মা মা ডাক আর ক্রন্দন, ধুলোয় মুখ ঘষা। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও গ্রামের লোকরা নাম দিল, পাগল বামুন। তাঁর পাগলামি

সারাবার জন্য চিকিৎসাও হয়েছিল। কামারপুকুরে মা চন্দ্রমণি ঝাড় ফুক চণ্ড নামানো এসবও করেছিলেন। জয়রামবাটিতে পাড়ার লোকেরা বলত শ্যামাসুন্দরীর জামাই পাগল হয়ে গিয়েছে। সহানুভূতি জানাবার অছিলায় গামের স্ত্রীলোকেরা সারদামণিকে খোঁটা দিত পাগলের বউ বলে। বিশ্বাস না করলেও মরমে মরে যেতেন সারদা। এদিকে পাগল রামকৃষ্ণের কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত হুঁশ থাকত না।

ভগবান পাগল হন না। ভক্ত হয়। কেন হয়? সে পাগলামিতে সুখ কী? ভগবান জানতে চান। ভক্তের ভালোবাসার মহিমা এমন যে প্রিয়ের চিন্তা ছাড়া তার আর কোনো চিন্তা নেই। জগৎ মুছে গিয়েছে তার চেতনা থেকে—আত্ম-বিস্মৃত, জগৎ-বিস্মৃত সে। ভালোবাসার এ মহিমা অনুভব করতে হলে ভগবানকে ভক্ত হতে হয়। তাই রামকৃষ্ণ বেশে ভগবান হলেন উন্মাদ ভক্ত।

জীব জন্মায় প্রকৃতি বা মায়া চালিত হয়ে; ভগবান জন্মান আত্মমায়ায়, আত্মমায়া দ্বারা—যাকে যোগমায়াও বলে। তিনি মায়ার বশ নন, মায়াই তাঁর বশ, তাঁরই মায়া। তাঁর আত্মমায়া ও তাঁর আত্মশক্তি একই কথা। তাঁরই যোগমায়া আবশ্যকীয় যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন।

ভগবান রামকৃষ্ণের জন্ম—মানবী তনুম্ আশ্রিতম্—কিছু যোগাযোগ প্রয়োজন ছিল সে জন্মের পটভূমিতে। যোগাযোগটি এভাবে ঘটালেন যোগমায়া। ক্ষুদিরামের বয়স যখন উনষাট, তাঁর মেয়ে কাত্যায়নীর বয়স পঁচিশ, খবর এল আনুড গ্রামে স্বামীগৃহে কাত্যায়নী পীড়িতা হয়েছেন। ক্ষুদিরাম দেখতে গেলেন। মেয়ের কথাবার্তার ধরণ ও হাবভাব দেখে সেকালের গ্রাম্য সংস্কার ও বিশ্বাস অনুসারে ক্ষুদিরাম ভাবলেন মেয়েকে ভূতে পেয়েছে। ক্ষুদিরাম সেই প্রেতযোনিকে সম্বোধন করে বললেন: তুমি দেবতা উপদেবতা প্রেত যেই হও, আমার মেয়েকে কেন কষ্ট দিচ্ছ? অবিলম্বে ওকে ছেড়ে চলে যাও। কাত্যায়নীর কণ্ঠ অবলম্বনেই প্রেতযোনি উত্তর দিল: আপনি যদি কথা দেন গয়ায় আমার পিণ্ড দেবেন তাহলে আমারও কষ্টের শেষ হবে, আমি আপনার মেয়েকে ছেড়ে চলেও যাব। আপনি যে মুহূর্তে গয়ার উদ্দেশে পা বাড়াবেন সেই মুহূর্ত থেকেই আপনার মেয়ে সুস্থ হবে।

অমুক্ত ও অশুভকর্মফলসম্পন্ন মানুষ মৃত্যুর পর এরূপ প্রেতযোনিত্ব লাভ করে ও খুব কষ্টযন্ত্রণা পায়। গয়ায় পিণ্ড দিলে তাদের সে যন্ত্রণার লাঘব হয় ও জীবাত্মা সদ্গতি লাভ করে, এমন বিশ্বাস হিন্দুরা প্রাচীন কাল থেকেই

করে আসছে। ক্ষুদিরাম ঐ প্রেতযোনির দুঃখ ভোগের কথা ভেবে কাতর হলেন। বললেন: আমি যত শীঘ্র পারি গয়া যাব, তোমার পিণ্ডদান করব। কিন্তু পিণ্ড দেবার পর তুমি যে উদ্ধার পেলে তার একটা নিদর্শন রেখে যেও। প্রেত বললে: হাঁ, এই সামনেই যে নিম গাছটি রয়েছে ওর সবচেয়ে বড় ডালটি ভেঙে রেখে যাব। শোনা যায় ক্ষুদিরাম গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিলে উক্ত নিম গাছের বড় ডালটি সত্যই ভেঙে পড়েছিল। কাত্যায়নীও সুস্থা হন। এ গল্পটি বলে গিয়েছেন হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। গল্পটির সত্যতা সেকালের স্বামী সারদানন্দও নিশ্চয় করে বলতে পারেননি। তবে সত্য হওয়াই সম্ভব।

১৮৩৫ সালে ষাট বছর বয়সে ক্ষুদিরাম বারাণসী-গয়া ইত্যাদি তীর্থোদ্দেশে রওনা হন। তীর্থযাত্রায় তাঁর বরাবর আগ্রহ ছিল। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তাই পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানের অবশ্য কর্তব্য এখনই পালন করার শেষ সময়। তখন যেতে হত পায়ে হেঁটে। এরপর গয়া-বারাণসী যাবার শারীরিক সামর্থ্য থাকবে না। আনুড়ের ঘটনাটি তাঁকে সত্বর হবার ইঙ্গিত দিয়ে থাকবে।

শীতকালেই রওনা হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। প্রথমে গেলেন বারাণসী, বিশ্বনাথকে দর্শন ও প্রণাম করতে। সেখান থেকে ফেরার পথে গয়া। গয়ায় যখন এলেন তখন চৈত্র মাস। অর্থাৎ মধুমাস। মধুমাস গয়ায় পিণ্ডদানের পক্ষে প্রশস্ত—ঐ মাসে পিণ্ড দিলে পিতৃপুরুষগণ অক্ষয় তৃপ্তি পান। ক্ষুদিরাম এক মাস গয়ায় ছিলেন। তীর্থক্ষেত্রে ক্ষেত্রকার্য কিছু থাকে। শাস্ত্রীয় মতে সে সব কাজ সুসম্পন্ন করলেন। তারপর গদাধরের চরণ কমলে পিণ্ড দান করলেন। পিতৃপুরুষের ঋণ তাঁর শোধ হল। সব কয়টি অনুষ্ঠান শাস্ত্রবিধি মতে ও প্রাণের তৃপ্তি মতে সুসম্পন্ন হওয়ায় ক্ষুদিরাম চিত্তপ্রসাদ লাভ করলেন। হে ৺বিষ্ণু, হে ৺গদাধর, আমার মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে আজ যে পিতৃঋণ শোধ করতে দিলে সেজন্য আমি পরম কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। দীন আমি ধন্য হলাম। বারম্বার এই মিনতি-প্রণতি জানালেন ক্ষুদিরাম দেবতার পায়ে। মন তাঁর ভরে গেছে প্রশান্তিতে, সুখে, উল্লাসে। দিব্য হর্ষ জাগছে তাঁর মনে। দিন কাটল ঐভাবে। রাত্রিতে শুতে গেলেন ঐ তীব্র আনন্দোল্লাস বুকে নিয়ে।

বেশিক্ষণ ঘুম হয়নি, ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন দিনে যে মন্দিরে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ড দিয়েছিলেন সে মন্দিরেই আবার গিয়েছেন। আবার ৺গদাধরের পাদপদ্মে পিতৃপুরুষদের পিণ্ড দিচ্ছেন। আর দিব্য-

ধামবাসী পিতৃপুরুষরা জ্যোতির্ময় শরীরে মন্দিরে এসেছেন। সানন্দে ক্ষুদিরামের শ্রদ্ধার দান হাত পেতে নিচ্ছেন তাঁরা, আর বংশের সুসন্তান ক্ষুদিরামকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করছেন। বাবা মানিকরাম উজ্জ্বল কান্তিময় দেহে উপস্থিত। কৃতকৃতার্থ ক্ষুদিরাম পিতৃপুরুষের প্রত্যেকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। ভক্তিতে কৃতজ্ঞতায় আনন্দে সশব্দে কাঁদছেন তিনি তখন।

তারপরই মন্দির ভরে গেল অপার্থিব জ্যোতিতে। দুপাশে সার দিয়ে শ্রদ্ধায় আনত হয়ে দাঁড়ালেন পিতৃপুরুষগণ; হাত জোড় করে তাঁরা মন্দিরের সিংহাসনে আসীন দেবতাকে সসম্ভ্রমে উপাসনা করতে লাগলেন। সিংহাসনে যে দেবতা তিনি তাঁদেরই পারিবারিক উপাস্য—নবদূর্বাদলশ্যাম রাম। জ্যোতির্মণ্ডিত পুরুষ। স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টি তাঁর। হাসছেন। চোখের উজ্জ্বল হাসিতে ক্ষুদিরামকে কাছে আসতে আহ্বান করছেন। ক্ষুদিরাম বিবশ; তবু প্রবল প্রেরণায় চালিত হয়ে পরমপুরুষের কাছে উপস্থিত হয়ে ভক্তিগদগদ চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। স্তুতি বন্দনা করলেন। প্রসন্নতা উপচে পড়ছে পরম-পুরুষের নয়নে। কথা বললেন, যেন সঙ্গীত মাধুর্য ঝরে পড়ল তাঁর কণ্ঠ থেকে। বললেন: ক্ষুদিরাম তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হয়েছি আমি। তোমার সেবা নিতে আমার বড় লোভ। পুত্ররূপে যাব আমি তোমার ঘরে।

এ সেই ক্ষুদিরাম, মাঠের মাঝে তন্দ্রাকালে ইষ্ট দর্শন পেয়ে ঐ রকম সেবা নেবার কথা আগেও যিনি শুনেছেন। পরমপুরুষের সংকল্পের কথা জেনে আনন্দে অধীর হলেন তিনি, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান হারালেন না এবারও। রাজ-রাজেশ্বরকে দরিদ্র আমার কুটিরে নেব কী করে? কী খাওয়াব? কোথায় রাখব? নিজ সামর্থ্যাভাবের কথা ভেবে অঝোরে কাঁদলেন তিনি—সাধ আছে, সাধ্য তো নেই। বললেন: প্রভু, আপনি চাইছেন পুত্ররূপে আমার ঘরে যেতে, সৌভাগ্য সে আমার। কিন্তু সে সৌভাগ্যের যোগ্য আমি নই। আপনি আমাকে দেখা দিলেন, এমন ইচ্ছা জানালেন—এই-ই অনেক আমার; কিন্তু গিয়ে কাজ নেই। আপনি সত্যই ছেলে হয়ে এলে আপনাকে পালন-পোষণ করব, সেবা করব তেমন সম্পদ নেই আমার।

ক্ষুদিরামের কান্নাজড়িত বেদনাময় কথায় ভগবান আরও সন্তুষ্ট হলেন। দীনতা তিনি বড় ভালোবাসেন, আর সত্য বচন। বললেন: ভয় পেও না ক্ষুদিরাম, তুমি যা আমাকে দেবে তাই পরম তৃপ্তিতে নেব আমি। আমার ইচ্ছা তুমি পূরণ করতে দাও। আপত্তি কোরো না।

নির্বাক হয়ে গেলেন ক্ষুদিরাম। যেমন তীব্র আনন্দ তেমনই তীব্র শঙ্কামিশ্রিত দুঃখ তাঁকে স্তব্ধ করে দিল। যেন জ্ঞানহারা হলেন তিনি হৃদয়ে দুই বিরুদ্ধ ভাবের আলোড়নে। ঘুম ভেঙে গেল।

কিন্তু আবেশে আচ্ছন্ন অবস্থা তখন ক্ষুদিরামের, পরিপার্শ্বের বোধই ছিল না। ক্রমে সংজ্ঞা ফিরল, বুঝলেন কোথায় তিনি শুয়ে আছেন। ধীরে ধীরে উঠলেন বিছানা ছেড়ে। স্বপ্নবৃত্তান্তটি আলোচনা করতে লাগলেন বারবার। দেবস্বপ্ন বৃথা হয় না তিনি জানতেন। তাহলে এই বুড়ো বয়সে আবার ছেলে হবে! কিন্তু তবু তো স্বপ্ন! কাউকে আগেভাগে বলে হাস্যাস্পদ হব কেন! যদি ছেলে হয় তবেই বলব স্বপ্নকথা। যদি না হয়, বলব না। জানব, ও শুধু স্বপ্নই।

আরও কয়েকটা দিন কাটালেন গয়া ধামে। ক্ষুদিরাম কামারপুকুরে ফিরে এলেন বৈশাখ মাসে।

ক্ষুদিরাম ঘরে ফিরে দেখেন চন্দ্রাদেবীর চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। ঘরে যাঁকে রেখে গিয়েছিলেন তিনি সতী সাধ্বী সরলা চন্দ্রা—কিন্তু মানবী বটে! ফিরে এসে যাঁকে দেখছেন তিনি যেন আর মানবী নেই, দেবী! বিশ্বজনীন প্রেমে ভাসছেন চন্দ্রা, জগতের কেউ তার পর নয়, শুধু নিজ সংসারের লোকগুলিই যে তাঁর আপন তা নয়। সাংসারিক আসক্তি ও বাসনা তাঁর নেই। গ্রামের কে কোথায় কেমন আছে, দুর্দশাগ্রস্তদের কিভাবে রক্ষা করা যাবে এই তাঁর ভাবনা সারা সময়। ঘরের কাজ করতে করতেই বারবার তিনি ছুটে যান এ-দোরে ও-দোরে : চাল ডাল নেই কার, আর কী দরকার কার—খোঁজ নেন ও দিয়ে আসেন। নিজ সংসারের জিনিস লুকিয়ে বিলোন তিনি। সংসারের কাজ সেরে, ৺রঘুবীরের সেবা সেরে, স্বামীপুত্রদের খাওয়ানো সেরে পড়ন্ত বেলায় নিজে দুটি ভাত নিয়ে বসবেন চন্দ্রা : কিন্তু তখনই গ্রামের ক্ষুৎকাতর মুখগুলি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আবার খোঁজ নিতে ছোটেন, কার খাওয়া হয়েছে, কার হয়নি। যশোদার বাৎসল্য ভাব দুকূল ছাপিয়ে নেমেছে হৃদয়ে : তিনি অনুভব করেন তিনি সবার জননী, সবাই সন্তান তাঁর, আর সবার দায়িত্বও তাঁর। যদি কারও সেদিন খাওয়া না হয়ে থাকে অন্নাভাবের দরুণ, তাকে সাধাসাধি করে নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন চন্দ্রা, নিজের ভাত থালায় সাজিয়ে খেতে বসান। নিজে সেদিন রইলেন জল মুড়ি খেয়ে।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের বরাবরই নিজের ছেলেমেয়ে জ্ঞানে ভালোবাসতেন

চন্দ্রা। এখন ক্ষুদিরাম দেখলেন, ঘরের পূজাবেদীর দেবতাগুলিকেও তিনি ছেলেমেয়ের মতো দেখেন। আদর করেন, বকেন ঝকেন, খাইয়ে সাজিয়ে দেন। ৺রঘুবীর কুলদেবতা বটে, কিন্তু চন্দ্রা যেন তাঁকে আপন গর্ভজাত ছেলে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছেন না। ৺রামেশ্বর বাণলিঙ্গ ও শীতলা দেবীও তাঁর আদরের ছেলেমেয়ে!

ভক্তিমতী চন্দ্রা আগে এসব দেবতার সেবা পূজার সময় সসম্ভ্রমে সংকোচে থাকতেন—পাছে সেবায় কোনো ত্রুটি হয়। এখন ভালোবাসায় সেসব সম্ভ্রম সংকোচে ভয় ভেসে গিয়েছে। নেই দেবতার কাছে কিছু চাইবার, কিছু তাঁদের কাছ থেকে লুকোবার! চন্দ্রা এখন ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ, আপনতম জন রূপে দেখেন, চান শুধু নিজের সর্বস্ব তাঁদের দিয়ে তাঁদের সুখী করতে। তিনি অন্তরের গভীরে নিশ্চিত বুঝছেন ঈশ্বর তাঁরই ধন, তাঁরই জন—বুঝে শুধু উল্লাসে ভাসছেন। শোক মোহ ভয় ক্রোধের স্পর্শ শূন্য তিনি।

তাই চন্দ্রা কাউকে আর অবিশ্বাস করতে পারেন না। সরলস্বভাবা ছিলেনই তিনি, এখন যেন পৃথিবীর মতো উদারস্বভাবা হয়েছেন। কিন্তু স্বার্থপর গ্রাম্যজনরা সুযোগ নিতে পারে তাঁর এই অবস্থার, অথবা দুর্নাম রটাতে পারে তাঁর। শংকিত হলেন ক্ষুদিরাম।

দুর্নাম রটাবার মতোই কথা বটে! স্বামীর গয়াবস্থানকালে কামারপুকুরে চন্দ্রা গর্ভবতী হয়েছেন। পরপুরুষ রাত্রে তাঁর বিছানায় তাঁরই সঙ্গে শুয়ে গেছে!

স্বামীকে বিবরণটি দিলেন চন্দ্রা নিজমুখে:

তুমি গয়া গেলে এক রাতে দেখি এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আমার বিছানায় আমার পাশে শুয়ে আছেন। প্রথমে ভাবলাম তুমি, তারপর ভাবলাম মানুষ কি অমন জ্যোতির্ময় হয়? দেখেছিলাম তাঁকে স্বপ্নে। কিন্তু ঘুম ভেঙেও মনে হল তিনি তো বিছানায় শুয়েই আছেন! মানুষের কাছে কি দেবতা আসেন? একথা মনে হতেই ভাবলাম কোনো মন্দ লোক দুষ্ট বাসনায় ঘরে ঢুকেছে। তার পায়ের শব্দ ঘুমের মাঝে শুনে আমি দেবতার স্বপ্ন দেখেছি। ওকথা ভাবতেই ভয় পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে প্রদীপ জ্বাললাম। দেখলাম কেউ নেই, ঘরের দরজায় আগল ঠিক আছে। তবু ভয়ে আর ঘুমোলাম না। ভাবলাম কেউ কৌশলে দরজা খুলে ঘরে এসেছিল। আমার ঘুম ভাঙতে দেখেই সে পালিয়েছে কৌশলে দরজার আগল তুলে দিয়ে। রাত পোহাতেই

ডাকলাম ধনী আর প্রসন্নকে। (মধুসূদন কর্মকারের বিধবা মেয়ে ধনী কামারণী ও ধর্মদাস লাহার বিধবা মেয়ে প্রসন্ন)। বললাম তাদের সব কথা। বললাম : তোরা বল দেখি সত্যি কোনো লোক এসেছিল আমার ঘরে রাতে? পাড়ার কারও সঙ্গে তো আমার ঝগড়া নেই। কেবল মধু যুগীর সঙ্গে সেদিন একটু বচসা হয়েছিল। সে কি তাই বলে রাগ করে রাতে আমার ঘরে ঢুকেছে? আমার কথা শুনে ধনা আর প্রসন্ন হেসে খুন। তিরস্কার করল আমাকে। বলল : 'মর মাগী, বুড়ো হয়ে তোর মাথা খারাপ হয়েছে। স্বপ্ন দেখে তাই এমন চলাচ্ছিস। পাড়ার লোক শুনলে বলবে কী? অপবাদ রটবে তোর নামে। ওরা এরকম বলায় ভাবলাম স্বপ্নই দেখেছি তবে। ভাবলাম একথা আর কাউকে বলব না, কেবল তুমি ঘরে ফিরলে তোমাকে সব বলব।

স্ত্রীর সরলতায় মুগ্ধ ক্ষুদিরাম বুঝলেন গয়ায় তাঁর স্বপ্নদর্শন আর একই সময়ে কামারপুকুরে স্ত্রীর স্বপ্নদর্শনে সামঞ্জস্য আছে। পরমপুরুষ এসেছিলেন স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে—জানিয়ে গেলেন, আসব আমি পুত্র রূপে।

শুধু প্রতিশ্রুতিও আর তা নেই। ক্ষুদিরামের গয়া থাকা কালেই এখানে পত্নীর গর্ভাধান হয়ে গিয়েছে! চন্দ্রা সে খবরও দিলেন স্বামীকে :

যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ধনীর সঙ্গে কথা বলছি একদিন, এমন সময় দেখলাম মহাদেবের গা থেকে জ্যোতি বেরিয়ে মন্দির ভরে গিয়েছে। বাতাসের মতো ঢেউয়ের আকারে ছুটে এল সে জ্যোতি আমার দিকে। অবাক আমি ধনীকে সেকথা বলতে যাচ্ছি হঠাৎ তা আমাকে ছেয়ে ফেলল। আমার ভিতর মহা বেগে ঢুকে গেল সে জ্যোতি। ভয়ে আমি চুপ; মূর্ছা গেলাম। ধনী শুশ্রূষা করে শেষে চৈতন্য আনে। তখন তাকে সব বললাম। সে শুনে অবাক, তারপর বলল : তোমার বায়ুরোগ হয়েছে। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো? ঐ জ্যোতি এসেছে আমার পেটে। আমার গর্ভসঞ্চার হয়েছে! ধনী আর প্রসন্নকে সেকথাও বলেছি। তারা শুনে আমাকে 'নির্বোধ' 'পাগল' বলে গাল দিয়েছে। তারা বলল মনের ভুল থেকে বায়ুগুল্ম রোগ হয়। সেই রোগের দরুণই এসব আমি দেখছি ভাবছি। কাউকে এসব কথা বলতে ওরা মানা করেছে। আমিও ভেবেছি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলব না এসব কথা। তোমার কি মনে হয়? এ কি আমার বায়ুরোগ? না কি ভগবানের দয়ায় দেখেছি তাঁর জ্যোতি? আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে আমার গর্ভসঞ্চার হয়েছে।

ক্ষুদিরাম ভাবলেন গয়ায় আমি যা দেখেছি শুনেছি তার সঙ্গে চন্দ্রার দর্শন অনুভূতি তো মিলে যাচ্ছে। পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : ধনী ও প্রসন্ন বুঝতে পারেনি। এ তোমার বায়ুরোগ নয়। মনের ভুলও নয়। ঠিকই দেখেছ তুমি। তবে আমাকে ছাড়া আর কাউকে এসব বোলো না। রঘুবীর যা দেখান তাতে কল্যাণই হয়। তাই নিশ্চিন্ত থেকো। গয়াধামে গদাধরও আমাকে জানিয়েছেন আমাদের আবার পুত্রমুখ দেখতে হবে।

অযোনিজ রামকৃষ্ণ। পিতার ঔরসে তাঁর জন্ম হয়নি। পিতা মাতা যখন শত মাইল ব্যবধানে রয়েছেন তখন দিব্যজ্যোতি প্রবেশ করেছে মাতৃগর্ভে। কামারপুকুরে ফিরে সব বৃত্তান্ত শুনে ক্ষুদিরাম গয়ায় লব্ধ স্বীয় অনুভব-অভিজ্ঞতার সমর্থন পেয়ে পত্নীর শরীর আর স্পর্শ করেননি। স্বামী-স্ত্রীর দেহসম্পর্কহীন অবস্থায় মাতৃগর্ভ বৃদ্ধি পেল। তিন চার মাস কেটে গেল। লোকদৃষ্টিতে স্ফুট হল গর্ভলক্ষণ। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে চন্দ্রা দেবী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন পাড়ায় রটল এ কথা। রটল, আরও কারণ চন্দ্রাদেবীর দৈহিক রূপলাবণ্য যেন ফেটে পড়ল। স্বভাব তাঁর মধুর থেকে মধুরতর হয়েছে। ব্যবহারে স্নেহ ক্ষমা উদারতা ঝরে পড়ছে। তবে বুঝি ওঁর শেষ সময় এবার। মরণের আগে দীপ জ্বলে ওঠা! "বুড়ো বয়সে গর্ভবতী হয়ে মাগীর এত রূপ!" পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করল, প্রসব-সময়ে ব্রাহ্মণী নির্ঘাৎ মারা যাবে!

এই সব কাহিনীর উৎস কী? স্বামী সারদানন্দ লিখে গিয়েছেন রামকৃষ্ণের জনক-জননীর জীবনে এই সব দিব্যদর্শন ও অনুভবের কথা: "আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। সুতরাং সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।" কাহিনীর সম্ভাব্য সূত্র চন্দ্রামণি নিজে: দক্ষিণেশ্বরে তিনি এসব কথা সারদাদেবীর কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়ে থাকবেন। ধনী ও প্রসন্ন প্রমুখাৎ কামারপুকুরেও এসব কথা প্রচারিত হয়েছিল নিশ্চয়ই। স্বয়ং রামকৃষ্ণ এসব কথা মায়ের কাছেই শুনেছেন বই কি! যুগীদের শিবমন্দির এখনও বর্তমান—ক্ষুদিরামের বাড়ির কাছেই মন্দিরটি, উত্তর দিকে—বাড়ি ও মন্দিরের মাঝখানে একটি সরু রাস্তা মাত্র ছিল। রাস্তাটি এখনও আছে—তবে পাকা হয়েছে। মন্দিরে যে শিব আছেন তাঁর নাম শান্তিনাথ। নাথযোগীদের মন্দির—নাথযোগীরা শিবের উপাসক। কামারপুকুরে যে শুধু বৌদ্ধ ধর্মঠাকুরের প্রভাব ছিল তাই নয়; এক সময় এখানে নাথসম্প্রদায়ের প্রভাবও পড়েছিল নিশ্চয়ই। নাথরা বৌদ্ধ নয়, শৈব হিন্দু—এঁদের যোগীদের কাণফাটা যোগীও

বলত, এঁদের কানে কুণ্ডল থাকত। গোরখনাথ মীননাথ মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখগণ এই সম্প্রদায়ের গুরু।

চন্দ্রা দেবীর দিব্যানুভূতি ও দিব্যদর্শন ক্রমেই বেড়ে গেল। রোজই দেবদেবীদের দেখা পেতেন তিনি। কখনো তাঁদের গায়ের গন্ধে ঘর ভরে যেত—দিব্য সৌরভ সে! কখনো চন্দ্রা শুনতেন দেববাণী। যত দেখতেন শুনতেন তত ভগবানের ওপর মাতৃস্নেহ উথলে উঠত তাঁর হৃদয়ে—বাৎসল্যভাবে অস্থির হয়ে পড়তেন। স্বামীকে শোনাতেন সব কথা—স্বামী বুঝিয়ে দিতেন যে এসব ভাব ও দর্শন শাস্ত্রসম্মত—শাস্ত্রে এসবের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা আছে। অতএব ভয় নেই, সংশয়েরও হেতু নেই।

একদিন চন্দ্রা স্বামীকে বললেন: এমন সব দেব-দেবীর দেখা পাচ্ছি যাঁদের কথা কোনোদিন শুনিনি, ছবিও দেখিনি। আজ দেখলাম, হাঁসের ওপর চড়ে একজন উপস্থিত। দেখে ভয় হল। আবার রোদের তাপে তার মুখখানি লাল হয়ে গিয়েছে দেখে মন কেমন করতে লাগল। ডেকে বললাম, ওরে বাপ, হাঁসেচড়া ঠাকুর, রোদে যে তোর মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে; ঘরে আমানি পান্তা আছে, দুটি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যা! ঐ কথা শুনে সে হেসে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! আর দেখলুম না। অমন কত মূর্তি দেখি! পূজা ধ্যান করতে বসে নয়—যখন তখন, সহজ অবস্থায়! কখনো দেখি, মানুষের মতো সামনে আসতে আসতে বাতাসে মিলিয়ে যায় তারা। কেন এসব দেখি বলো তো? আমার কি রোগ হয়েছে, না কি গোঁসাইয়ে পেয়েছে?

গোঁসাইয়ে পাওয়া মানে ভূতে পাওয়া। ক্ষুদিরামের প্রিয় বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর কথা আগেই বলেছি। তিনি মারা গেলে গ্রামে কিছু উৎপাত হয়। গ্রামবাসীরা মনে করে যে গোস্বামীদের বাড়ির সামনে একটি বড় বকুল গাছে সুখলাল বা গোস্বামী বংশের অপর কারও প্রেত বাস করছেন। তাই কোনো রকম অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটলে, কারও দিব্যদর্শনাদি হলেও লোকে বলত গোঁসাইয়ে পেয়েছে।

চন্দ্রাকে বড় ভালোবাসতেন ক্ষুদিরাম। শঙ্কাতুরা রমণীর হৃদয় মন শান্ত করতে চাইলেন তিনি। তাই নিজ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হলেন। গয়ায় দেখা স্বপ্ন সব খুলে বললেন তিনি পুত্র জন্মাবার আগেই। বললেন: তুমি পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধারণ করেছ। অশেষ সৌভাগ্যশালিনী তুমি। তুমি কৌশল্যা, শচী-দেবীর মতো ভগবানের মা হতে চলেছ! লীলাপটু ভগবান তোমার

দেহমধ্যে আছেন। তাঁরই স্পর্শে তোমার এসব দর্শন ও অনুভূতি হচ্ছে।

স্বামী বললেন। অমন সত্যবান জ্ঞানবান স্বামী! শাস্ত্র জানেন। ওঁর কথা মিথ্যা হতে পারে না। নিশ্চিত হল চন্দ্রার মন। বুঝলেন, রোগ নয়, মাথার দোষ নয়, যা দেখছেন সব সত্য, ভগবানকেই দেখছেন তিনি নানা রূপে, নানা বেশে। ভক্তিতে ভরে গেল তাঁর মন। বল এল হৃদয়ে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাঁদের ঘরে ভগবানের আবির্ভাবের আশায় প্রতীক্ষা বুকে নিয়ে বসে রইলেন। দুজনেরই মন যুগপৎ ভক্তিতে প্রার্থনায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল!

পূর্ণ হল সচ্চিদানন্দের চন্দ্রামণি-গর্ভ-অঙ্গীকারের কাল। বসন্তে সজীব প্রাণময় ধরিত্রী। মধু ঋতু মধুময় করেছে জগৎকে। শীতপত্র ঝরে যাবার পর নতুন কচি পাতায় গাছগুলি সবুজ হয়ে উঠেছে। ৬ই ফাল্গুন।

সকালের দিকেই রঘুবীরের ভোগ রাঁধছিলেন চন্দ্রা। কিন্তু প্রাণে কেন দিব্য উল্লাস! আনন্দ ছেয়ে ফেলছে মন প্রাণ, তবু দেহ যেন যোগ্য নয়। দেহ ভারী, অবসন্ন, মন্থর, শয়নাভিলাষী। তবে কি এখনই প্রসব মুহূর্ত উপস্থিত হবে। যদি হয় তবে কে রাঁধবে ঠাকুরের ভোগ, কে করবে প্রভুর সেবা? চিন্তিতা হলেন চন্দ্রা, ভীতাও। স্বামীকে সে শংকার কথা জানালে তিনি অভয় দিলেন। বললেন: ভয় কোরো না, তোমার গর্ভশায়ী নারায়ণ রঘুবীরের সেবা পূজায় বিঘ্ন ঘটাবেন না। তিনি বিপত্তি সৃষ্টির পথে সংসারে আসেন না, তাঁর আগমনে বিপত্তি দূর হয়ে যায়। নিশ্চিন্ত হও। আজ তুমিই ঠাকুর সেবা চালাতে পারবে। কাল থেকে অন্য বন্দোবস্ত হবে—তাও আমি ব্যবস্থা করেই রেখেছি। আর ধনীকেও বলেছি আজ রাতে এখানে থাকতে।

ক্ষুদিরাম যেন সবই জানতেন; তাঁর কথা মতোই ঘটে গেল সব। রঘুবীরের দুপুরের ভোগ হল, সন্ধ্যার শীতল ভোগও নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। ঘরের লোকদের রাতের আহারপর্বও শেষ। ক্ষুদিরাম রামকুমার শুয়ে পড়লেন। চন্দ্রা ও ধনী কামারণী শুলেন অন্য ঘরে।

এ ছোট বাড়িতে আলাদা সূতিকাগৃহ ছিল না। দুটি ছোট চালাঘর, একটি রান্নাঘর, একটি ঢেঁকিশাল। বাড়িতে ঘর মোট এই। ঢেঁকিশালে ঢেঁকি আর ধান সিদ্ধ করার উনুন ছিল। মাথায় চালা ছিল ঢেঁকিশালে। ঐ ঢেঁকিশালই একটু ঘের দিয়ে আপাতত সূতিকাঘর তৈরী হয়েছিল।

৬ই ফাল্গুনের রাত শেষ হয়ে এসেছে, প্রভাত হতে আধদণ্ড বাকি। ইংরেজি মতে তাকে ৭ই ফাল্গুন বলে। চন্দ্রার প্রসববেদনা উপস্থিত হল। ধনী তাঁকে যত্নে হাত ধরে ঢেঁকিশালে নিয়ে শুইয়ে দিল। আরও একজন এসেছিল ঢেঁকিশালে। গ্রামের বাগদী মেয়ে ভৈরবা ক্যাওড়া। কারও কারও মতে ভৈরবী ছিল ক্যাওড়া নয়, হাড়ী। সে প্রসূতির নাড়ীচ্ছেদ করেছিল।

ধনী প্রসূতির পরিচর্যা করছিল। প্রসব স্বচ্ছন্দে হয়েছে, চন্দ্রাও সুস্থ। তাঁকে ঠিক মতো গুছিয়ে রেখে ধনী জাতককে খুঁজতে গিয়ে পায় না। নবজাতক কাঁদে। এ শিশুর কান্না কোথায়? চিহ্ন কোথায়? যেস্থানে ছিল সেখানে নেই। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল ধনীর। প্রদীপের সলতে উস্কে দিয়ে ইতি-উতি খুঁজতে লাগল সে। রক্তে জলে পিচ্ছিল মাটি হড়কে শিশু ধান সিদ্ধ করার উনুনে গিয়ে পড়েছে। গায়ে মেখেছে ছাই। কান্নাকাটি নেই। ত্যাগীশ্বর রামকৃষ্ণ জন্মেই ছাই করেছেন অঙ্গভূষণ। টাকা মাটি তুল্য হবে তাঁর কাছে এ তো স্বাভাবিক।

ধনী উনুন থেকে শিশু তুলে ছাই মুছিয়ে দেখে ভুবনসুন্দর! যেন ছয় মাসেরটি। ইতিমধ্যে লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে চন্দ্রামণির দু-চারজন বান্ধবী উপস্থিত হয়েছেন। শিশু দেখে তাঁদেরও মুখ খুশিতে উজ্জ্বল। চন্দ্রা নিরাপদ জেনে স্বস্তি পেলেন তাঁরা। উঠল হুলুধ্বনি।

ব্রাহ্মমুহূর্ত। নিভৃত পল্লীকোণটি জেগে উঠল। এমন প্রত্যূষকালে নব দিনমণি উদয় হলেন মাঙ্গলিক ধ্বনির অভ্যর্থনায়। এ মঙ্গলবার্তার কেন্দ্রবিন্দু ক্ষুদিরামের পর্ণকুটির।

ক্ষুদিরাম শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ। নবজাতকের জন্মলগ্নের তাৎপর্য নির্ণয় করলেন। সন ১২৪২, শকাব্দ ১৭৫৭, খৃষ্টাব্দ ১৮৩৬। ৬ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারি। বুধবার। রাত্রি একত্রিংশ দণ্ড পার হয়েছে, অর্ধদণ্ড বাকি রাত পোহাতে। শুক্লপক্ষ, দ্বিতীয়া তিথি। পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের সঙ্গে সংযুক্তা। বালকের জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র, বুধ একত্র মিলিত। শুক্র মঙ্গল শনি তুঙ্গস্থানে। পরাশর মতে রাহু কেতু তুঙ্গে। বৃহস্পতি তুঙ্গাভিলাষী রূপে বর্তমান। কুম্ভরাশি।

ধর্মস্থানাধিপে তুঙ্গে ধর্মস্থে তুঙ্গখেচরে।
গুরুণা দৃষ্টি সংযোগে লগ্নেশে ধর্মসংস্থিতে॥
কেন্দ্রস্থানগতে সৌম্যে গুরৌ চৈব তু কোণভে।
স্থিরলগ্নে যদা জন্ম সম্প্রদায়প্রভুঃ হি সঃ॥

ধর্মবিন্মাননীয়স্তু পুণ্যকর্মরতঃ সদা।
দেবমন্দিরবাসী চ বহু শিষ্যসমন্বিতঃ॥
মহাপুরুষ সংজ্ঞোহয়ং নারায়ণাংশসম্ভবঃ।
সর্বত্র জনপূজ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
ইতি ভৃগুসংহিতায়াং সম্প্রদায়প্রভুযোগঃ তৎফলঞ্চ।

এই ব্যক্তি ধর্মবিৎ ও মাননীয় হবেন। সর্বদা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকবেন। বহু শিষ্যপরিবৃত হয়ে দেবমন্দিরে বাস করবেন। নবীন ধর্ম-সম্প্রদায় প্রবর্তন করবেন। নারায়ণাংশসম্ভূত মহাপুরুষ রূপে জগতে প্রসিদ্ধ হবেন। সর্বত্র সকল লোকের পূজ্য হবেন।

জন্মলগ্ন বিচারের ফল দেখে আনন্দিত ক্ষুদিরাম ভাবলেন, গয়াধামের স্বপ্ন সত্য হল। তিনি নবজাতকের জাতকর্ম সমাপন করে বালকের রাশি আশ্রিত নাম রাখলেন শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গয়াধামের গদাধরই জন্মেছেন বলে বালকের প্রকাশ্য নাম রাখলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণ নাম তবে কে রাখলেন? উত্তর নেই। আমাদের অনুমান এ নাম ক্ষুদিরামই রেখেছিলেন—এ বংশের সবারই নাম রামযুক্ত।

চন্দ্রামণি সুস্থ হয়ে উঠলেন। পুত্রও সুস্থ। অবসর সময়ে ক্ষুদিরাম-চন্দ্রামণি সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁরা যা দেখেছেন, অনুভব করেছেন, জেনেছেন তা সত্য হল সব। মাথার খেয়াল নয়, স্নায়ুর বিকার নয়, আকাশকুসুম নয়। স্বপ্নও নয়। ধরাতলে ভগবান আসেন। তাঁদের ঘরেই এবারের মতো তিনি এসেছেন!

৫

বাললীলা

ইতিহাস প্রায়ই বিদ্রূপময় কিন্তু কখনো কখনো তার প্রসন্ন হাসিমুখ দেখি। অমিলেও সে মিল যোজনা করে দেয়। মহাপ্রভুর জন্মকথা লিখতে গিয়ে মুরারি গুপ্ত লিখেছেন :

তস্য জন্মসময়ে হৃতু শশাঙ্কং
রাহুরগ্রসদলং ত্রপয়ৈব।
কৃষ্ণপদ্মবদনেন নির্জ্জিত:
প্রাবিশৎ সুররিপোর্মুখং বিধু: ॥

কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের মুখ দেখে লজ্জা পেয়ে চাঁদ রাহুতে মুখ লুকিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রশ্ন করেছেন, অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দেখা দিলে সকলঙ্ক চন্দ্রের আর দরকার কী। তাই চাঁদে গ্রহণ লেগেছিল। বিমানবিহারী মজুমদার সিদ্ধান্ত করেছেন : শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয় ১৪০৭ শক ২৩শে ফাল্গুন শনিবার, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ ১৮ই ফেব্রুয়ারি (বর্তমান প্রচলিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডার মতে ২৭শে ফেব্রুয়ারি)।

রামকৃষ্ণের জন্মও ফাল্গুন মাসে—মহাপ্রভুর জন্মের পর ৩৫০তম বছরে। নরহরি চক্রবর্তী লিখছেন :

আজ পূর্ণিম, সাঁঝ সময়ে, রাহু শশী গরাসি।
গৌরচন্দ্র উদয়ে তবহি, তাপতম বিনাশি ॥

ঠিক সন্ধ্যায় নয়, সন্ধ্যার ঠিক আগে; চন্দ্রগ্রহণের সময় নয়, চন্দ্রগ্রহণের কিছু আগে—নরহরির ভুল ধরে আধুনিক গবেষক এরূপ জানিয়েছেন।

রামকৃষ্ণের জন্ম প্রত্যূষে নয়—তার অর্ধদণ্ড আগে। সেদিন পূর্ণিমা ছিলনা, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া ছিল। কোনো গ্রহণ ছিল না। এই অমিল ও মিলের দিকগুলি পেরিয়ে মনে হয়, রামকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি বিকাশের, উন্মীলনের, সূর্যদ্যুতির। পূর্ণিমায় পূর্ণতা বটে, কিন্তু পরদিন থেকেই তো চাঁদের ক্ষয় সুরু; কৃষ্ণপক্ষের কালো ছেয়ে যায় জগৎকে। দিনের শেষে রাতের আবির্ভাব-দ্বারে

মহাপ্রভুর জন্ম—তখন তপ্ত প্রাণ শীতল হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় বটে, কিন্তু ঘুমের, নির্জীবতার, বিশ্রামের কাল তো ঘনিয়ে ওঠে। রামকৃষ্ণের জন্ম সুখবন্দনার লগ্নে, নতুন দিন ও নতুন চেতনা, নতুন সৃষ্টি ও নতুন কর্মসাধনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন সুপ্তিমগ্ন জীবকুল। পূর্বাকাশে রঙীন অরুণোদয় আর পাখির গান গেয়ে ওঠার সময় হয়ে এলো!

রামকৃষ্ণের বাললীলা ধ্যানকালে কেন যে মহাপ্রভুর বাললীলা স্মরণে আসে! অমিলেই ভরা, তবু কোথাও যেন মিলের রেশ থেকে যায়। শচী মায়ের অঙ্গনে যে নাটুয়া বালকের চঞ্চল পদপাতের নুপুরধ্বনি আজও বাঙালীর হৃদয়ে হৃদয়ে বাজে, রামকৃষ্ণের বাললীলা যত ভাবি তত দেখি এও তো তেমনই আর এক নাটুয়া বালকই বটে। সেই দুষ্ট, মিষ্ট, জেদী, মোহন, চতুর বালক। তবু নিমাই-চরিত্রে কলঙ্ক আছে; একদিন রাগে ক্ষোভে সে মাকে মেরেছিল, ক্রোধে ঘরের জিনিসপত্র ভেঙে ফেলত, বাজার থেকে দোকানীদের জিনিসপত্র জোর করে, পয়সা না দিয়ে ঘরে নিয়ে আসত। নিজের পাণ্ডিত্যের ভার দিয়ে অন্যদের আঘাত বিদ্রুপ করত। কোথা থেকে যে নিমাই সোনা দানা এনে মাকে দিত তা জানা যায় না। সাংসারিক অভাব ও দারিদ্র্যকে প্রতিহত করতে নিমাই ক্ষমতার ঐশ্বর্য দেখিয়েছে—বাল্যেই।

গদাধর-চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শ লাগেনি। মাকে বাবাকে সে করেছে চিরসুখী, তাঁদের প্রাণে কখনো সে সামান্য ব্যথাও দেয়নি,—শ্রী অঙ্গে হাত তোলা বা ঘরের জিনিস ভাঙা তো দূরের কথা! উৎপাত করেনি সে কারও ওপর, বাজারীদের ওপর তো নয়ই। দারিদ্র্য ঠেকাতে সোনার রহস্যময় সন্ধানে সে যায়নি। তার কাছে টাকা মাটি—তা বাল্যেও। যে বিদ্যার ভার মানুষকে আঘাত করতে প্রণোদিত করে সে বিদ্যা গদাধরের কাছে গ্রাহ্য ছিল না। মানুষ তার কাছে পেয়েছে শান্তি ও শিক্ষা, শিঙের আঘাত নয়।

হোক নারায়ণ, তবু বাবা মার কাছে সে অবোধ শিশু বই তো নয়! এই বৃদ্ধ বয়সে শিশু পালনের আর্থিক সামর্থ্যই বা কোথায়! কিন্তু ক্ষুদিরামের কেমন যেন সব জুটে যেতে লাগল। সেই যে ভাগ্নে রামচাঁদ মেদিনীপুরে উপার্জন করে সে মামার পুত্র হয়েছে শুনে ভাবল, তবে তো দুধ জোগাতে মামার কষ্ট হবে। সে ক্ষুদিরামকে লিখল, মামা, চিন্তা করবেন না, আমি দুগ্ধবতী গাভী পাঠালাম।

শিশুর আকর্ষণী শক্তি চুম্বকের মতো সবাইকে টেনে আনত। মা বাবা

তো উৎফুল্ল বটেই, পাড়ার লোকরাও বারবার দেখতে না এসে পারে না। কাছেপিঠের গ্রামগুলি থেকে আত্মীয়রাও আসে প্রায়ই। মেয়েদের বুকে টান বাজে বেশি করে। চন্দ্রা যদি হেসে কখনো শুধোন, তারা বলে: তোমার ছেলেকে রোজ দেখতে ইচ্ছা করে, তাই রোজ আসি। রোজ না পারলে যত শীগগির পারি আসি।

আদর সোহাগ সে পেয়েছে জন্ম থেকেই; হয়েছে সে জনপদের নয়নমণি। বয়স যখন পাঁচ মাস পেরোল, শাস্ত্রমতে অন্নপ্রাশনের কাল তখন উপস্থিত। ক্ষুদিরাম সরল মানুষ, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা তাঁর। ঢাকঢোল বাজবে না, রঘুবীরের প্রসাদী ভাত দুটি শিশুর মুখে দিয়ে দেবেন, বড়জোর নিকট আত্মীয় দু চারজনকে নিমন্ত্রণ করবেন—গরীবের ঘরে এমনি নিঃশব্দে নিষ্পন্ন হবে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান।

হল না। যাঁর ঢাকঢোল তিনিই বাজান। নিজ বিবাহের সময় তিনি নিজেই ঢাক বাজিয়েছিলেন—তাও ঢাকের অভাবে নিজের শ্রীঅঙ্গে চাপড় মেরে ও মুখে বোল তুলে। এখন পাঁচ মাসের দুগ্ধপোষ্য শিশু মাত্র, তাই ব্যাপার অত দূর গড়াল না। বরং বলা যায় ব্যাপার আরও গুরুতর হল। যোগমায়া ভেল্কি লাগালেন।

গ্রামের প্রবীণ ব্রাহ্মণ ও সজ্জনরাই ক্ষুদিরামকে পাকড়ালেন। বললেন, এমন মনোহর পুত্র তোমার, তার অন্নপ্রাশন লুকিয়ে সারলে চলবেনা। আমরা নিমন্ত্রণ পেতে চাই। শুধু আমাদের খাওয়ালেও দায় মিটবেনা। তোমার বাড়িতে গ্রামের সবার জন্য পাতা পড়া চাই।

কথা ধ্রুব। ক্ষুদিরাম ভাবেন, গ্রামের সবাই আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। চন্দ্রা তো সকলের মা হয়ে বিরাজ করছে; নিমন্ত্রণ করতে হলে কাকে বাদ দেব? সবাইকে বলতে হয়। শুধু পুরুষ নয়, সব মেয়েদেরও। বালক বালিকাদেরও। কিন্তু সামর্থ্য কই?

অগতির গতি রঘুবীর। জয় রঘুবীর, দায় তাঁরই, দায়মোচনের ভারও তাঁর। সজ্জনদের আবদার উপেক্ষাযোগ্য নয়। সিদ্ধান্ত এরূপ করে ক্ষুদিরাম পরামর্শ করতে গেলেন গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার সঙ্গে। লাহা যেন তাঁরই জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। কথা শুনে বোঝা গেল, পিছন থেকে কলকাটি তিনিই নেড়েছেন। দেরে গ্রামের জমিদারের মতো ব্রাহ্মণকে বিপন্ন করার মতলব তাঁর ছিল না। ছিল প্রসন্ন উদার সহৃদয়তা। গদাধরের অন্নপ্রাশন

অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিলেন সহাস্যে। রামকৃষ্ণের প্রথম রসদদার শ্রীধর্মদাস লাহা, সাকিন কামারপুকুর গ্রাম।

গদাধরের আগমনও যেমন, অন্নপ্রাশনও তেমনি সঙ্গোপনে হয়নি। গ্রামবাসী শুধু জানেনি, উৎসব করেছে। শুধু তৃপ্তি করে খায়নি, রঘুবীরের প্রসাদ জ্ঞানে আহারে পরম পরিতুষ্ট হয়েছে। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ পুরুষ নারী বালক বালিকা গ্রামের সবাই তো ভোজন করেছেই, বহু গরীব ভিক্ষুকও পেট ভরে প্রসাদ পেয়েছে। গৃহীর মঙ্গল কামনা ও গদাধরকে আশীর্বাদ করে গিয়েছে তারা। পরব্রহ্মও মানুষের আশীর্বাদ চান—পেয়ে ধন্য হন।

এই যে গরীব মানুষ দুটি—ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রা—এঁরা কোনোদিন ভগবানের কাছে কোনো কামনা জানাননি। প্রার্থনার সময় দেহি দেহি ভাব এঁদের ছিল না। কিন্তু চন্দ্রা এবার অন্য রূপ ধরলেন। ভগবানের চরণে কামনা তাঁর এখন একটি নয়, অনেক। তবে এককে ঘিরে। সেই এক তাঁর নবীন পুত্র। হে ঠাকুর, তুমি ওকে রক্ষা করো। ওর যেন অসুখ না হয়। যেন বিপদ না হয়। যেন কল্যাণ হয়। পুত্রমঙ্গলভাবনায় চন্দ্রা এখন অস্থির, ব্যাকুলা। মায়ের প্রাণ কেবলই দুর্ভাবনায় কাঁপে। হাজার বার। রঘুবীর, ধর্ম, ষষ্ঠি, শীতলা প্রমুখ দেব-দেবীর চরণে সকরুণ নিবেদন জানিয়েও নিশ্চিন্ত হন না তিনি। হায়, দেবতাদের কথাও কি আর তত মনে আসে! চিত্তপটে তাঁরা আচ্ছন্ন আবৃত হয়ে যাচ্ছেন। সারাক্ষণ মন জুড়ে আছে মুত্রমুখ। সে মুখ চুম্বনের পুলক। গদাইয়ের কল্যাণ ও রক্ষণাবেক্ষণই এখন চন্দ্রার ধ্যান-জ্ঞান। গদাই তাঁর ভুবন। আগে চন্দ্রা কত কী দেখতেন, কত দেবদর্শন! এখন সে সব কোথায়? মনেই পড়েনা সে সব কথা, মনে জাগে না সেসব দর্শন-বাঞ্ছাও। নয়ন মেলে দেখেন গদাইকে। নয়ন বুজে দেখেন গদাইকে। সে হাসছে, খেলা করছে, মুখে আঙুল পুরছে, হাত পা নাড়ছে, শরীর ঘোরাচ্ছে! গদাই ছেয়ে ফেলেছে চন্দ্রার মনের আকাশ।

চন্দ্রার গদাইময় মনের আকাশে কত ভাবের ফুল ফোটে, গদাইয়ের মধুরিমা কত ভাবে আস্বাদন করেন তিনি। একদিন ভাবময়ী চন্দ্রা দেখলেন, মশারির মধ্যে সাত-আট মাসের ঘুমন্ত শিশু গদাইয়ের বদলে এক দীর্ঘকায় অপরিচিত পুরুষ। বড় খাট ও বড় মশারি জুড়ে সে শুয়ে আছে। সময় সকাল। একটু আগে গদাইকে স্তন্য দান করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই ঘুমন্ত শিশুকে মশারির ভিতর শুইয়ে ঘরের কাজকর্ম করতে গিয়েছিলেন

চন্দ্রা। এখন একটা দরকারেই ঘরে এসে দেখেন এই অবস্থা। এ দিনমানে কোথা হতে এল এ পুরুষ? সবার অসাক্ষাতে ঘর দখল করল, শয্যা দখল করল—আর গদাইকে লুকিয়ে ফেলল যাদুকরের মতো! অত দেখারও সময় নেই চন্দ্রার, পুত্রমঙ্গলব্যাকুলা ভীতা হরিণীর মতো আর্তধ্বনি করতে করতে ঘরের বাইরে ছুটে গিয়ে স্বামীকে ডাকতে লাগলেন: দেখে যাও আমার গদাইকে কে হরেছে! শশব্যস্ত ক্ষুদিরাম ছুটে এলেন।

কলকল করে কাঁদতে কাঁদতে ও শংকার কথা বলতে বলতে স্বামীসহ ঘরে প্রবেশ করে চন্দ্রা দেখেন, না, পুরুষ কোথায়, শিশু গদাই পরম নিশ্চিন্তে সুখে ঘুমোচ্ছে। মশারির কোণ তুলে ছেলের গা নেড়ে চেড়ে দেখেও চন্দ্রার ভয় যায় না। আমি যে স্পষ্ট দেখলাম। ভুল হয়নি আমার, ভুল হবার কারণও ছিল না। আমি তো জেগে আছি, সংসারের কাজকর্ম করছি, কেন আমার চোখ ভুল করবে! নিশ্চয়ই কোনো উপদেবতার খেলা, অনিষ্ট করতে এসেছে সে আমার ছেলের। ওগো, কোনো ভালো ওঝা আনো, দেখাও তাকে একবার ভালো করে।

চন্দ্রার পুত্রভাবনা এত ব্যাকুলতাময়ী করেছিল তাঁকে যে খেতে উঠতে বসতে যেন সোয়াস্তি ছিল না তাঁর। তিলকে তাল দেখতেন তিনি। কিন্তু ক্ষুদিরাম অতি স্থিরমতি। বিচারবুদ্ধি হারান না তিনি। বিশ্বাসে তিনি অটল। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন: পুত্র রূপে আমাদের ঘরে কে এসেছেন তা তো তুমি জানো। আগেও কত দিব্যদর্শন হয়েছে তোমার, এখনও হচ্ছে, পরেও হবে। এসব উপদেবতার কাজ তা ভেবো না। বাড়িতে রঘুবীর আছেন, উপদেবতারা এখানে আসবে কিভাবে? তোমার ছেলের অনিষ্ট করার সাধ্য কারও নেই। রঘুবীর ওকে সর্বদা রক্ষা করছেন। উতলা হোয়ো না। নিশ্চিন্ত হও। এসব দর্শনের কথা আর কাউকে বোলো না।

সত্যবান স্বামীর বাক্য চন্দ্রার চিরদিনের অবলম্বন। তাঁর কথায় কখনও অনাস্থা হয়নি তাঁর। আজও হল না। তবু কেন সারা দিনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মন হয় চঞ্চল, শঙ্কাতুর? গদাইয়ের মঙ্গলভাবনা গ্রাস করে তাঁকে। তারই ওপিঠে দুলে ওঠে অমঙ্গল-আশঙ্কা। রঘুবীরের কাছে বসে জোড় হাতে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রাণের বেদনা নিবেদন করে বলেন: ঠাকুর তুমি চেয়ে দেখো। রক্ষা কোরো গদাইকে।

গদাইকে কেন্দ্র করে আর কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল কিনা

পূজনীয় সারদানন্দ তা জানাননি। তিনি আধুনিক কালের লেখক, আর রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য, অলৌকিক ও অলীকের প্রতি তাঁর মন যায়নি। তিনি যুক্তিময় প্রাঞ্জল দৃষ্টির অধিকারী। মশারির মধ্যে অনুষ্ঠিত ঐ যে ঘটনাটির কথা তিনি লিখেছেন তার আগে স্পষ্টই তিনি জানিয়েছেন যে অতি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে ঘটনাটি তিনি সংগ্রহ করেছেন। বিশ্বস্ত সূত্র ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলে সারদানন্দ তাঁর পুণ্যময় গ্রন্থে কোনো কথারই স্থান দেননি। অনুরূপ পদ্ধতি নিয়েছেন "শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" কাব্যের কবি অক্ষয়কুমার সেন। ধন্য এইসব গ্রন্থকার যাঁরা আমাদের হাত ধরে রামকৃষ্ণ ধামে নিয়ে গিয়েছেন।

অক্ষয়কুমারের কবিদৃষ্টিতে আর কয়েকটি লীলাবার্তা উন্মোচিত হয়েছিল। তিনি বলেন, একদিন চন্দ্রা ছেলে কোলে নিয়ে ছেলেকে রোদ লাগাচ্ছিলেন। কিন্তু কোলে সে এত ভারী হয়ে উঠল যে তাকে কোলে না ধরতে পেরে এক কুলার ওপর শুইয়ে দিলেন। শিশুর গায়ের ভারে কুলা চড় চড় করে উঠল। কী হল, কী হল বলে চন্দ্রা কেঁদে উঠলেন। কিন্তু শিশু এদিকে নিশ্চল সুস্থির স্পন্দনহীন। কুলা থেকে ছেলেকে যত কোলে নিতে চেষ্টা করেন চন্দ্রা, কিছুতেই আর ওঠাতে পারেন না। তখন তিনি আবার কেঁদে ওঠেন। কাছাকাছি যারা ছিল সবাই ছুটে এল। চন্দ্রা বললেন, ছেলে এত ভারী হল কেন? ঐ নিমগাছটিতে একটি ব্রহ্মদৈত্য আছে। সেই আমার বাছাকে ধরেছে। যাও ভূতের ওঝা ডেকে আনো। ওঝা এসেছিল, মন্ত্র পড়েছিল, শিশুও হালকা হয়েছিল। আর একদিন দুতিন মাসের গদাধর বিছানা থেকে কিভাবে উনানে গিয়ে পড়ে। অর্ধেক উনানের ভিতর, অর্ধেক বাইরে তার দেহ ছিল—ধূলি ও ছাই মেখে চাঁদের মতো সুন্দর হয়েছিল সে। দেখে চন্দ্রা ছুটে আসেন। ধনীও আসে। বিছানা থেকে উনানে ছেলেকে কে এনে ফেলল, দেহটাও দুতিন মাসের শিশুর তুলনায় যথেষ্ট বড় হয়ে গেল কিভাবে এসব কথা বলে চন্দ্রাকে কাঁদতে দেখে ধনী শিশুর গা ঝেড়ে দেয়। তখন আবার আগের মতোই শিশু হয়ে যায় গদাই।

এসব ঘটনা সত্যই ঘটেছিল হয়তো; কিন্তু চন্দ্রামাণ ছাড়া আর কারও অনুভবে এগুলি আসেনি। তিনিই দেখেছেন, ভেবেছেন, অন্যদের ব্যাকুল হয়ে ডেকেছেন। তাঁরই ভাবদৃষ্টিতে রামকৃষ্ণের প্রথম আত্ম-উন্মোচন। রামকৃষ্ণ-জননীই প্রথম রামকৃষ্ণমহিমার ভাবুক। মাতৃপ্রাণের স্নেহময়ী ব্যাকুলতার পাশে ভগবান স্থির থাকতে পারেননি—আত্মস্বরূপ ঈষৎ দেখিয়েছেন। যেমন

তিনি দেখিয়েছিলেন যশোদাকে, শচীকে! মাতৃঋণ জগতের প্রথম ঋণ। তা ভগবানের বেলাও বটে। তাই মাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাঁর দ্বারে বাৎসল্য স্নেহ উপভোগ করেও, তাঁকে বাৎসল্যরসের আধার-আস্পদ হবার সৌভাগ্য দান করেও কিছু কথা বাকি থাকে। মাকে কখনো কখনো জানতে দিতে হয়, বুঝতে দিতে হয় যে যাকে স্নেহপুত্তলী রূপে তিনি লালন করেছেন সে বিশ্বম্ভর বটে! তাই চন্দ্রাকোলে রামকৃষ্ণ ভারী ও বৃহৎ হয়ে ওঠেন, ভোগশয্যা ত্যাগ করে উনুনের ছাই মেখে বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ হন, আবার ঐ শয্যাতেই মহাশিব হয়ে শুয়ে থাকেন। চন্দ্রা ভুল দেখেননি। স্নেহভীতি বৃদ্ধিবশত মনের ভুল হয়নি তাঁর। তাঁর লৌকিক নয়নের ভিতর দিব্য দৃষ্টির উদ্ভাস ঘটে গিয়েছিল—তাঁরই ভক্তির তাপে কিংবা ভগবৎপ্রসাদে। এমনই ধ্রুব দৃষ্টির উদ্ভাসে কুরুক্ষেত্রে অর্জুন সখার বিশ্বম্ভর রূপ দেখেছিলেন। সেখানেও যেমন অর্জুনকে আপন তত্ত্বরূপ দেখিয়েই মুহূর্ত পরে সে দৃষ্টি মুছিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ—কারণ সখা যে, সখার সঙ্গে সহজ মধুর সম্পর্কই তো কাম্য। চন্দ্রাও কোনো কোনো ক্বচিৎ মুহূর্তে রামকৃষ্ণস্বরূপের ঈষৎ আভাস পেয়েছেন। কিন্তু আর বেশিদূর গড়ায়নি ব্যাপারটি, কেননা গ্রাম্য অশিক্ষিতা মহিলা, তায় মা—তত্ত্বভাবনা বেশি হলে মাতাপুত্রের মধুর সহজ সম্পর্ক বিপন্ন হতে পারত, কে করত ছেলেকে পক্ষিণীর মতো লালন পালন? যদি তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখি তাহলে স্বামী সারদানন্দ ও অক্ষয়কুমারের বিবরণ একান্তই সত্য মনে হয়। ওরকমটা ঘটারই কথা, ঘটেও ছিল।

গদাধর কিছু বড় হলে ক্ষুদিরাম তাকে কোলে করে বংশপরিচয় শেখাতেন—আদি পুরুষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত নামের মালা ছিল। দেবদেবীর ছোট ছোট স্তব ও প্রণাম মন্ত্র, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ইত্যাদি শোনাতেন। গদাধর শোনামাত্র সব মুখস্থ করে ফেলত। তাঁর এই স্মৃতিশক্তি বাবাকে বিস্মিত করত। ক্ষুদিরাম পুত্রস্নেহাধিক্যে পুত্রের গুণ অতিরঞ্জিত করে দেখেননি—রামকৃষ্ণের স্মৃতিশক্তি পরবর্তী কালে সবাইকে অবাক করেছে। বাল্যবয়সে আস্ত আস্ত যাত্রার পালা একবার দেখেই সবটা মুখস্থ বলতে পারত গদাধর উপযুক্ত অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গী সহ। দুশত গান সুর তাল সহ রামকৃষ্ণ গেয়ে যেতেন প্রবীণ বয়সেও—অথচ তাঁর কাছে না ছিল গানের খাতা, না স্বরলিপি। পুরাণ ও শাস্ত্রের বহুলাংশ ছিল তাঁর স্মৃতিতে ধরা।

ক্ষুদিরাম যেসব পাঠ দিতেন কতদিন পর সে সব পাঠ আবার গদাধরকে

জিজ্ঞাসা করতেন। দেখতেন যে সে কিছুই ভোলেনি। আশ্চর্য ক্ষুদিরাম তারই মধ্যে একটি জিনিস লক্ষ্য করলেন। সব বিষয়ে গদাধরের মনে সমান আগ্রহ নেই। কোনো কোনো বিষয়ে তার আগ্রহ ও আনন্দ যেমন, কোনো কোনো বিষয়ে তার ঔদাসীন্যও তেমনই। চেষ্টা করেও সেসব বিষয়ে তাঁর কৌতূহল জাগানো যায়না। যেমন নামতা। অঙ্কে তার মন যেতনা। তবে একথা সত্য নয় যে তাঁর অঙ্কে আতঙ্ক ছিল। পাঠশালায় গদাধর অঙ্ক শিখেছে, তার অঙ্ক কষার সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। কড়া গণ্ডা তার অজানা ছিল না।

ক্ষুদিরামই দিয়েছিলেন হাতে খড়ি, তারপর পাঁচ বছর বয়সে গদাধরকে পাঠশালায় ভর্তি করানো হয়—সেটাই ছিল প্রচলিত গ্রাম্যরীতি। গদাইয়ের চাঞ্চল্যে তথা দুরন্তপনায় উদ্বিগ্ন হয়ে ক্ষুদিরাম সময় হবার আগেই তাকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়েছিলেন এই মত সত্য নয়। চঞ্চল ও দুরন্ত গদাই ছিল, কিন্তু তাতে কারও ভয় ও উদ্বেগের কারণ ঘটেনি। বরং পাঠশালা বসত যে ধর্মদাস লাহার বাড়িতে তিনি তো গদাধরকে অতি ভালোবাসতেন। ধর্মদাস জমিদার ও ব্যবসায়ী, টাকাপয়সার হিসাবে সদা ব্যস্ত, খাতাপত্রে ডুবে থাকতেন। তিন বছরের বালক গদাই তাঁর ঘরে ঢুকে পড়লে—প্রায়ই ঢুকত—ধর্মদাস খাতাপত্র সরিয়ে রেখে শিশুকে আদর করে অন্দর মহলে নিয়ে যেতেন খাওয়াবার জন্য। ধর্মদাসের স্ত্রী গদাইকে খাওয়াতেন আর তার মিষ্ট বুলি শুনে আনন্দে ভাসতেন। এদেরই ছেলে গয়াবিষ্ণু ছিল গদাধরের সমবয়সী বন্ধু-স্যাঙাত।

ধর্মদাসের বাড়ির বাইরের অংশে শ্রীশ্রীদুর্গামন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে ছিল পাঠশালা। এ পাঠশালার খরচ লাহাবাবুরাই দিতেন। পাঠশালায় একজন গুরুমশাই ছিলেন—সেসময় বর্ধমান থেকে এই গুরুমশাইরা নানা পাঠশালায় যোগ দিতেন। এঁরা বেতনভুক বলে সরকার নামেও অভিহিত হতেন। গদাধর লাহাবাবুদের পাঠশালায় পর পর তিনজন গুরুর কাছে পড়েছেন—প্রথমে মুকুন্দপুরবাসী যদুনাথ সরকার, পরে রাজেন্দ্রনাথ সরকার ও তারপর রামপ্রসাদ গুপ্ত।

পাঠশালা বসত সকাল বিকাল। সকালে দু'তিন ঘণ্টা পাঠ। তারপর ছাত্ররা বাড়িতে নাওয়া খাওয়ার জন্য যেত। বিকালে আবার দেড়-দুঘণ্টা পাঠ। ছোট ছেলেরা অত সময় পড়ত না, কিন্তু পাঠশালায় পুরো সময়টাই

হাজির থাকত। পাঠশালার সামনে কোথাও হয়ত খেলা করত তারা, কিন্তু ওটাও পাঠশালায় হাজির থাকা বলে গণ্য হত। পাঠশালার বড় ছেলেরা ছোটদের পাঠ শেখাত, নামতা ঘোষাত।

গদাধর দুরন্ত ছিল, পাঠশালায় না গিয়ে বালকদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বাইরেও খেলতে যেত, কাছে কোথাও যাত্রাগান হলে না বলেই শুনতে চলে যেত। যখন সে যা ইচ্ছা করত তা না করে ক্ষান্ত হত না। এ সব দুরন্তপনার পাশাপাশি ক্ষুদিরাম তার কয়েকটি গুণও লক্ষ্য করেছিলেন। যাতে তাঁর উদ্বেগ প্রশমিত হয়ে যায়। গদাধর মিথ্যা কথা বলত না, নিজের কোনো কাজ গোপন করার চেষ্টা করত না, কারও কোনোরকম ক্ষতি করত না। ক্ষুদিরাম হয়তো বোঝেননি, কিন্তু পরবর্তী কালের আলোয় বিচার করে আমরা বুঝতে পারি যে প্রথমাবধি গদাধর স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিল, কিন্তু অন্যায়কৃৎ ছিল না; সত্যনিষ্ঠ ও করুণাময় ছিল। বাল্যকালে নিমাইও অমন দুরন্ত ছিল সেই সঙ্গে কিছুটা পীড়নকারীও। তার অসহায়া বিধবা মা শচীদেবী ও প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনীগণকে সইতে হয়েছে উপদ্রব। গদাধর দুরন্ত কিন্তু কাউকে ব্যথা দেয়নি, অনিষ্ট করেনি কারও। নিমাইয়ের নির্মল চরিত্রে জন্মকালীন চন্দ্রের রাহু দশার কিছু প্রভাব পড়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু গদাধর নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র।

অবশ্যই গদাধর একগুঁয়ে ছিল। জোর করে বা ভয় দেখিয়ে তাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো যেত না। তার মনে আবেদন সৃষ্টি না হলে সে কোনো কিছুই করত না—বিধি বা নিষেধের কোনো দাম ছিল না তার কাছে যদি তা শুষ্কবৎ মনে হত। শুধু বিধি ও নিষেধের জোরে তাকে কোনো কিছু করাতে চাইলে সে উল্টো কাজ করত, মানত না বাধা। সে সব বিষয়ে কারণ জানতে চাইত; না জানালে বা সে কারণ উপযুক্ত না মনে করলে গদাধর মানত না কোনো কিছুতেই। ক্ষুদিরাম ভাবতেন, তিনি যখন থাকবেন না তখন কে ধৈর্য ধরে বালকের সব কৌতুহল মেটাবে, সব প্রশ্নের উত্তর দেবে? সেক্ষেত্রে সে কি সৎ বিধি সদাচার মানবে না? না মানার লক্ষণ দেখা গেল।

হালদারপুকুর গ্রামের সবচেয়ে বড় ও ভালো পুকুর। সে পুকুরের জলে পাড়ার লোকরা স্নান করত (এখনও করে)। মেয়েদের জলে নামার একটি ঘাট ও পুরুষদের জলে নামার আর একটি ঘাট ছিল (বাঁধানো ঘাট এখনও আছে)। বালকরা মেয়েদের ঘাটেও যেত। একদিন ঐ ঘাটে গদাধর আর

কয়েকজন বালকের সঙ্গে লাফাচ্ছে, সাঁতার কাটছে, জল খেলছে। মহিলাদের কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হল তার ফলে। প্রবীণারা সন্ধ্যাহ্নিক করছিলেন—তাঁদের গায়ে লাগল জলের ছিটে। তাঁরা বারণ করলেও বালকরা থামল না। তখন এক বিরক্ত মহিলা তাদের তিরস্কার করে বললেন : এ ঘাটে তোরা আসিস কেন? পুরুষদের ঘাটে যেতে পারিস না? এ ঘাটে মেয়েরা স্নান করে গায়ের কাপড় ধোয়। জানিস না মেয়েদের ন্যাংটা দেখতে নেই?

গদাধর মহিলাদের উত্যক্ত করছিল না, সঙ্গের বালকরাই সে ব্যাপারে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মহিলার কথায় কৌতুহল হল তার। বলল : কেন ন্যাংটা দেখতে নেই? এ কথার কী জবাব দেবেন মহিলা, এই 'কেন' কি বুঝিয়ে বলা যায় বালককে? যা রীতি, মহিলা আরও ক্ষেপলেন, আরও কড়া তিরস্কার করলেন। বিপদ বুঝে ছেলেরা সরে পড়ল।

গদাধরের মনে প্রতিক্রিয়া হল অন্যরকম। মেয়েদের ন্যাংটা দেখতে নেই—কেন? কেন? কেন? এই জিজ্ঞাসাটাই মুখ্য হয়ে উঠল তার কাছে এবং ভেদ করতে চাইল এই 'কেন'-র রহস্য। পরপর তিন দিন সে মেয়েদের স্নানের সময় ঘাটের কাছে এক গাছের আড়ালে লুকিয়ে সব লক্ষ্য করতে লাগল। তিন দিন পর সেই তিরস্কারকারিণী মহিলাকে সে বলল : পরশু চারজন মেয়েমানুষকে স্নান করতে দেখেছি, কাল ছয়জনকে, আজ আটজনকে। কই, আমার তো কিছু হল না?

প্রবীণা একথা শুনে হেসে ফেললেন, গদাধরের সরলতাই কৌতুক-প্রসন্ন করেছে তাঁকে। তিনি চন্দ্রামণির কাছে এসে আদ্যোপান্ত কাহিনীটি বলে হাসতে লাগলেন। চন্দ্রাও। কিন্তু পরে গদাইকে একসময় কাছে ডেকে চন্দ্রা বললেন : বাবা, অমন করে দেখলে তোমার কিছু হবে না, কিন্তু যাঁদের দেখছ তাঁদের অপমান করা হয়। ওঁরা আমার মতোই তোমার মা, ওঁদের অপমান করলে আমাকেই অপমান করা হয় যে। আর কখনো ওঁদের মান নষ্ট কোরোনা বাবা। ওঁদের ও আমার মনে দুঃখ দেওয়া কি ভালো?

গদাধর এর পর আর কোনো কথা জানত না। মায়ের মনে ব্যথা দেওয়া! সে তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর হয়নি।

দুষ্টুমি করলেও গদাধর পাঠশালায় লেখাপড়া শিখেছে। কেন যে এ রটনা করা হয়েছে যে গদাধর নিরক্ষর ছিল তা বোঝা যায় না। তার হস্তলিপি

সুন্দর ছিল। প্রথমে তালপাতায় বাংলা বর্ণমালা ও বানান শিখেছিল গদাধর। তারপর মানসাঙ্ক, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া ও দশকের নামতা শেখে। কলাপাতায় তেরিজ (যোগ ও বিয়োগ), জমাখরচ ও নামতা শিখতে হয়েছিল। সেকালে শুভঙ্করী নিয়ম, মাসমাহিনা, সুদকষা, জমাবন্দী, খৎ লেখা জমিদারির খাতিয়ান লেখা শিখতে হত। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আবৃত্তি শেখানো হত।

গদাধর নিরক্ষর ছিল না। বাল্য-কৈশোরে তার স্বহস্তে লেখা যে কয়টি পুঁথির (অপর পুঁথি থেকে নকল) পাওয়া গিয়েছে এ প্রসঙ্গে তার বিবরণ দিয়ে রাখি।

১। হরিশ্চন্দ্রের পালা। ১০½" দীর্ঘ ও ৩¾" চওড়া তুলোট কাগজে ৩৯ পাতার পুঁথি। এক পৃষ্ঠায় লেখা, পর পর দুটি পৃষ্ঠা নিয়ে একটি পাতা (অর্থাৎ ৭৮টি পৃষ্ঠা ছিল)। পৃষ্ঠার ক্রমিক নম্বর দশকিয়া ও গণ্ডাকিয়া উভয় অঙ্কানুসারে লেখা। গদাধর পুঁথিটির নকল সমাপ্ত করে বঙ্গাব্দ ১২৫৫ সালের ২০শে বৈশা i, সোমবার (ইংরেজি ১৮৪৮ খৃঃ ১লা মে)। তখন তার বয়স বারো বছর দুই মাস প্রায়। "শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। অথ হরিশ্চন্দ্রের পালা" —এই কথা লিখে গদাধর মূল পালাগানটি আরম্ভ করেছে। পালাগানের শেষে লিখেছে নিজের নাম ও ঠিকানা। এখানে তার নামের স্বাক্ষর "শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়"ঃ।

এই পালাগানটির মূল রচয়িতা শঙ্কর, যিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন কবিচন্দ্র, দ্বিজ কবিচন্দ্র, কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ইত্যাদি ভণিতাযুক্ত হয়ে। তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের সভাকবি। তিনি রামায়ণ পাঁচালী, অধ্যাত্মরামায়ণ, হরিশ্চন্দ্রের পালা ইত্যাদি ৪৬টি বই লিখেছিলেন।

২। মহিরাবণের পালা। পূর্বোক্ত পুঁথির একই মাপের তুলোট কাগজে ৩১ পাতার পুঁথি। মূল পালাগানটি আরম্ভ হবার আগে ৪ পাতা জুড়ে আছে বন্দনাগান। পুঁথি লেখা শেষ হয় ১২৫৫ বঙ্গাব্দ, ২রা ভাদ্র, বুধবার (১৮৪৮ খৃঃ ১৬ই আগস্ট)। তখন গদাধরের বয়স সাড়ে বারো বছর। মূল পালাগানটি লিখেছেন কবিচন্দ্র।

৩। সুবাহুর পালা। ঐ মাপের তুলোট কাগজে লেখা ২২ পাতার পুঁথি। নামপত্র ইত্যাদির জন্য তিনটি আলাদা পাতা।

"শ্রীশ্রী সীতারামঃ। অথ সুবাহুঃ পালা লিখ্যতে"—এই ভূমিকা লিখে

গদাধর পালা গানটির অনুলেখন করে। পুঁথি সমাপ্ত হয় ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ১৯শে আষাঢ়, মঙ্গলবার (১৮৪৯ খৃঃ ২রা জুলাই)। বয়স তখন তেরো বছর চার মাস। পালাগানের মূল লেখক কৃত্তিবাস (অর্থাৎ কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত)। পুঁথিতে পাই রাবণের পুত্র সুবাহু। সে রামভক্ত। তার মনের ভাব এরকম :

করিয়া সম্মুখে রণে যদি আমি মরি।
চতুর্ভুজ হয়্যা যাব বৈকুণ্ঠ নগরি ॥

৪। যোগাদ্যার পালা। পুঁথি সমাপ্ত হয় ১২৫৫, ১৯শে মাঘ, শনিবার (১৮৪৯ খৃঃ ১০ই ফেব্রুয়ারি)। গদাধরের বয়স তখন তেরো।

৫। রামকৃষ্ণায়ণ। পুঁথিখানি পাওয়া যায়নি।

৬। শ্রীশ্রীচণ্ডী। গদাধর শ্রীশ্রীচণ্ডী পুঁথির অনুলেখন করে কিন্তু তার কিছু অংশ মাত্র পাওয়া গিয়েছে—মাত্র বারো তেরোখানি পাতা। শিহড় গ্রামে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রের বাড়িতে এই পুঁথির অংশ পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষা বাংলা অক্ষরে লেখা হয়েছে। পূর্বোক্ত বাংলা পুঁথি-গুলির পরবর্তী সময়ে এটি লেখা হয়েছিল মনে হয়। (এই পুঁথিগুলি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য স্বামী প্রভানন্দ লিখিত "আনন্দস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ" গ্রন্থ থেকে নেওয়া)।

স্বামী প্রভানন্দ পুঁথিগুলি পরীক্ষা করে লিখেছেন : উপরোক্ত প্রতিটি পুঁথি শ্রীগদাধরের হস্তাক্ষরের মুন্সিয়ানার উজ্জ্বল প্রমাণ। দৃঢ় বলিষ্ঠ গতিতে ছন্দায়িত তাঁর লিখন ভঙ্গিমা ও স্বাক্ষরের নমুনা দেখা যায়। পুঁথিগুলির মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অংশে গদাধরের মৌলিক রচনা। সামান্য কিছু অংশ গদ্যে লেখা। 'সুবাহুর পালা' পুঁথিখানির শেষ পৃষ্ঠায় সে লিখেছে : ওঁ রামঃ। শ্রীরামচন্দ্র দাসের পুস্তক জানিবেন।

গদাধর নিজেকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দাস মনে করে—এই মূল্যবান তথ্যটি পুঁথি থেকে জানা গেল।

'হরিশ্চন্দ্রের পালা' মূল পাঠ শেষ করে গদাধর লিখেছে :

ভিমস্বামী রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রর্মঃ। পাঠটি ভুল। শুদ্ধ পাঠ হবে :

ভীমস্তাপি রণে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম। তারপর গদাধর লিখেছে :

জথাদ্রিষ্টং তথা লিখিতং লেক্ষকো নাস্তি দোষক। এও ভুল পাঠ। শুদ্ধ পাঠ হবে :

যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকস্য নাস্তি দোষঃ।

এগুলি মূল পুঁথি-বহির্ভূত নিজস্ব সংযোজন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পুঁথি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা এই সমস্যা নিয়ে অতি বিব্রত যে মূল পুঁথির অনুলেখনের সময় লিপিকার নিজের মৌলিক রচনা কিছু জুড়ে দিত। এটা সেকালের রীতি ছিল। গদাধরও তার মৌলিক রচনা পুঁথিগুলির মধ্যে মধ্যে গুঁজে দিয়েছে। 'মহিরাবণ বধ' পালার শেষে কিশোর কবি লিখেছে :

গদাধরকে বর দিবে রোহে গুণণীধী।
মহানন্দে রাখিবে তোমায় জাবেদীঃ॥
গুষ্টিবগ্রে বর দিবে আহে কমল আঁখি।
জর্ন্ধে থাকে যেন হোএ বড় সুখীঃ॥

কয়েকটি শব্দার্থ দিয়ে দিচ্ছি। রোহে=ওহে। গুষ্টিবগ্রে=গোষ্ঠীবর্গে। আহে=ওহে। জর্ন্ধে=জন্মে। হোএ=হয়ে।

"সুবাহুর পালা" শেষ করে গদাধর লিখেছে :

শ্রীগদাধরকে বর দিবে ওহে গুণনিধি।
কর্ল্যাণে রাখিবে রাম তোমায় নিবেদিঃ॥
রামায় রামচন্দ্রায় রাম ভন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সিতায় পথ্যা নম॥

কর্ল্যাণে শব্দের অর্থ কল্যাণে। শেষ দুটি পংক্তিতে ভুল পাঠ আছে। শুদ্ধ পাঠ হবে :

রামায় রামচন্দ্রায় রাম ভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

গদাধর কিছু সংস্কৃত শিখেছিল বোঝা যাচ্ছে চণ্ডীর পুঁথি ও উপরোক্ত শ্লোক লেখা দেখে।

"হরিশ্চন্দ্রের পালা" শেষে এই দুটি পংক্তিও আছে :

এতদূরে হরিশ্চন্দ্রের পালা হইল সায়।
অভিমত বর পায় জেজন গাওয়ায়॥

পংক্তি দুটি গদাধরের নিজ রচনা মনে হয়।

ছোট ছোট নক্সার সাহায্যে পুঁথিপাটাকে সজ্জিত করেছিল গদাধর। প্রতিটি পুঁথি সে শুরু করেছে শ্রীরাম বা শ্রীরামসীতাকে স্মরণ করে। "সুবাহুর

পালা" পুঁথিখানির প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠার লেখা শুরু হয়েছে "ওঁ রাম" "শ্রীরাম" দিয়ে। রামচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে পালা বলেই এই রামনাম স্মরণ নয়। গদাধরের রামাৎ মন্ত্রে দীক্ষা হয়েছিল। ইস্টদেব রঘুবীরের পূজা জপ ধ্যান করে গদাধর তখন আনন্দে ভাসমান। ঐ সাধনার অংশ হিসাবেই পুঁথিগুলির অনুলেখন।

পুঁথিগুলি লোকগোচরে আনা হয়নি। পুঁথিগুলিতে বানান ভুল দেখে রামকৃষ্ণ ভক্তরা লজ্জা পেয়েছেন তাই সযত্নে ওগুলি আড়াল করা হয়েছে। কিন্তু বানান ভুলের জন্য একমাত্র গদাধরকে দায়ী করা যায় না। প্রথমত, যে পুঁথি দেখে অনুলেখন করা হয়েছিল সেই পুঁথিগুলিতেই বানান ভুল থাকা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সেকালের প্রচলিত বানান রীতি ও একালে গৃহীত বানান রীতি এক নয়—এজন্য সেকালের বানান ভুল বলা ঠিক নয়। তৃতীয়ত, সেকালে হুগলি-বাঁকুড়া অঞ্চলের বানান রীতিই পুঁথিতে অনুসরণ করা হয়েছে। চতুর্থত, গ্রামের গুরুমশাইরা স্বল্প শিক্ষা হেতু বানান বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। গদাধরের বানান শিক্ষা তাঁদেরই কাছে। পঞ্চমত, পাঠশালার পর গদাধর কোনো উচ্চতর স্কুলে বিদ্যালাভ করেনি। এজন্য ভক্তবৃন্দের দুঃখ বা লজ্জার হেতু নেই। বরং গদাধর-অনুলিখিত পুঁথিগুলি সযত্নে ও সমর্যাদায় ফটোমুদ্রণে প্রকাশ করলে আমরা তাঁর প্রচুর হস্তলিপি, অঙ্কন, স্বরচিত পদ ইত্যাদির আস্বাদনে ধন্য হতে পারি।

তবু বলতেই হবে গদাধরের কবিত্বশক্তির তুলনায় অপরাপর কলাবিদ্যা-নিপুণতা অনেক বেশি বিকশিত হয়েছিল। গ্রামের কুমোরদের বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল। কুমোররা দেবদেবীর মূর্তি ও প্রতিমা গড়ত। গদাধর ঐগুলি লক্ষ্য করত ও কোনো কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করত। নিজের বাড়িতে সে নিজে মূর্তি গড়ত। ওটা তার খেলা। ঐভাবেই পটুয়াদের কাছে গিয়ে সে দেখে আসত পট নির্মাণ। ঘরে এসে নিজেই হত পটুয়া। কথকতার আসরে, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যার আসরে সে ছিল মনোযোগী শ্রোতা। শুধু কথা ও ভাবই সে অনুধাবন করত তা নয়—কিভাবে বললে শ্রোতাদের মন তৃপ্ত হয়, তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় ভাব, তাও সে খুঁটিয়ে দেখত। শুধু স্মৃতিশক্তি নয়, এই সময় ফুটে উঠতে থাকল গদাধরের মনস্বিতা। শিল্পকলা সে আয়ত্ত করতে লাগল, লোকব্যবহার সম্পর্কে হতে লাগল অভিজ্ঞ, দেশের পুরাণ কাব্য ও শাস্ত্রাদির বক্তব্যের সঙ্গে হতে লাগল তাঁর পরিচয়;—কিন্তু তার চেয়ে বড়

কথা, গদাধর নিজে শিল্পী হয়ে উঠল, লোকসমূহকে প্রভাবিত করতে সুরু করল এবং পাঠ শোনাবার সময় দু একটি নিজস্ব ভাবনা যোগ করে দিতে লাগল।

গদাধর ভালো mimicry করতে পারত। অর্থাৎ লোকজনের আচরণ, কথা বলা, হাঁটা চলা, স্বভাবচরিত্র, কাজকর্ম ইত্যাদির ভালো অনুকরণ করতে পারত। এই অনুকরণ করে সে লোকদের দেখাত ও প্রচুর হাসাত। এতে বোঝা যায় যে তার পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল খুব তীক্ষ্ণ এবং জীবনের একজন তন্নিষ্ঠ দ্রষ্টা ছিল সে। দ্বিতীয়ত সে ছিল রসিক, রসস্রষ্টা। তৃতীয়ত, সেই শৈশব-বাল্যেই সে ছিল একজন জীবনের ভাষ্যকার। mimicry শিল্প হয় শুধু দক্ষ অনুকরণে নয়। অনুকরণ করারও উদ্দেশ্য থাকে ও বক্তব্য থাকে। নির্বিচার অনুকরণ করায় শিল্প নেই—মজাও নেই। রসসৃষ্টি ও রস-উপভোগ সম্ভব হয় নির্বাচিত অনুকরণে, ভাষ্যসমন্বিত অনুকরণে। লোকচরিত্রের দুর্বলতা, সবলতা ও লোকস্বভাব গদাধর ভালো অধ্যয়ন করেছিল এবং তাঁর নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলি সে তুলে ধরত বলেই দর্শকরা মজা উপভোগ করত। কাউকে আঘাত দিলে, অবজ্ঞা করলে, হেয় করলে এ সরল মজা থাকে না। গদাধর যে সবাইকে আনন্দ দিতে পেরেছে ও তার অনুকৃতি-প্রদর্শনে কেউ আপত্তি করেনি তাতে বোঝা যায় যে অনুকৃতিতে সে যতটা ছিল ব্যঙ্গময় ততটাই সহানুভূতিশীল। সে পরিবেশন করেছে নির্দোষ আনন্দ। তাই যাদের চরিত্র ও হাব-ভাব সে অনুকরণ করত তারাও তা দেখে খুশি হয়েছে।

তা সম্ভব হয়েছিল কেননা তার নিজের মধ্যে কোনো দুর্বলতা ছিল না। সে দুর্বল চরিত্রের বালক ছিল না। তার সাক্ষ্য তার ভয়হীনতা। গ্রামাঞ্চলে সে যুগে লোকরা ভূতের ভয় করত। প্রবীণরাও এ ভয় থেকে মুক্ত ছিল না। গদাধর ভূত অমান্য করত না, ভূত নেই এরকম কথাও বলত না। কিন্তু ভূতের ভয় তার ছিল না। গ্রামে দুটি শ্মশান ছিল। সে শ্মশানে একা ঘুরতে ফিরতে তার অসুবিধা হয়নি।

পিসিমা রামশীলাদেবীর ওপর ৺শীতলা দেবীর ভর হত। এরকম ভরের কথা চিরকালই শোনা যায়, এখনও। ভর হলে মানুষ অন্যরকম হয়ে যায়—যে দেব বা দেবীর ভর হয় তাঁরই ভাব আরোপিত হয়। রামশীলা শীতলার ভাবাবেশে অন্য রকম হয়ে যেতেন। রামশীলা কখনো কখনো কামারপুকুরে দাদার কাছে এসে থাকতেন—বোনেরা দাদার বাড়ি আসেই। কামারপুকুরে

রামলীলার একদিন ভর হল। পরিবার ও পাড়ার লোকরা দেখে ভক্তি ও ভয়ে সন্ত্রস্ত হল। ভয় পায়নি একা গদাধর। সে পিসির কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গোটা অবস্থাটি তন্ন তন্ন করে দেখল। দেখে খুশি হল। পরে বলেছিল : পিসিমার ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়।

নিজের বাল্যলীলার কথা নিজ মুখেই রামকৃষ্ণ এভাবে শুনিয়েছেন :

ও দেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ মেয়ে সকলে ভালোবাসত। আমার গান শুনত ; আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেইসব দেখত ও শুনত। তাদের বাড়ির বউরা আমার জন্যে খাবার জিনিস রেখে দিত। কেউ অবিশ্বাস করত না। সকলে দেখত যেন বাড়ির ছেলে।

কিন্তু সুখের পায়রা ছিলুম। বেশ ভালো সংসার দেখলে আনাগোনা করতুম। যে-বাড়িতে দুঃখ-বিপদ দেখতুম সেখান থেকে পালাতুম। ছোকরাদের ভিতর দু-একজন ভালো লোক দেখলে খুব ভাব করতুম। কারুর সঙ্গে স্যাঙাৎ পাতাতুম। কিন্তু এখন তারা ঘোর বিষয়ী। এখন তারা কেউ কেউ এখানে আসে, এসে বলে, ও মা ! পাঠশালে যেমন দেখেছি এখানেও তাই দেখছি।

পাঠশালে শুভঙ্কর আঁক ধাঁধাঁ লাগাত। কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম, আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম। সদাব্রত আতথিশালা যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম, গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম। কোনোখানে রামায়ণ বা ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্য লোকদের শোনাতুম।

মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা সুর নকল করতুম। কড়ে রাড়ী বাপকে উত্তর দিচ্ছে, যা-ই। বারান্দায় মাগীরা ডাকছে, ও তোপসে মাছ-ওলা ! নষ্ট মেয়ে বুঝতে পারতুম। বিধবা সোজা সিঁথে কেটেছে আর খুব অনুরাগের সহিত গায়ে তেল মাখছে। লজ্জা কম, বসবার রকমই আলাদা।

ধোরো না ধোরো না রথ চক্র রথ কি চক্রে চলে।
যে চক্রের চক্রী হরি যার চক্রে জগৎ চলে ॥

এসব গান আমি ছেলেবেলায় খুব গাইতুম। এক এক যাত্রার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতুম। কেউ কেউ বলত, আমি 'কালীয় দমন' যাত্রার দলে ছিলুম।

লাহাদের ওখানে সাধুরা যা পড়ত, বুঝতে পারতুম। কোনো পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।

একদিন স্বামীসহ বড় দিদি বাড়ি এসেছিলেন। গদাধরের চোখে পড়ল জামাইবাবু ঘরে বসে আছেন, দিদি তামাক সেজে তাঁর হাতে হুকা তুলে দিচ্ছেন। গদাধরের শিল্পবুদ্ধি সজাগ হল। ছবি এঁকে দৃশ্যটি ধরে রাখল। শিল্পী নিজে ও চিত্রস্থ ব্যক্তিরা খুশি। ছবি আঁকা, প্রতিমা ও মূর্তি গঠনে গদাধরের নিপুণতা এত হয়েছিল যে "বিচক্ষণ শিল্পীরাও মিষ্টান্ন দানে প্রীত করিয়া স্ব স্ব শিল্পের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করাইয়া লইত।" খবরটি দিয়েছেন বৈকুণ্ঠ নাথ সান্যাল "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত" গ্রন্থে।

কামারপুকুরে যে সব বালক গদাধরের সঙ্গী ছিল তাদের কয়েকজনের নাম পাওয়া যায় : একজন ধর্মদাস লাহার বড় ছেলে গয়াবিষ্ণু। সে ছিল গদাধরের স্যাঙাৎ। একসঙ্গে খাওয়া শোয়া বেড়ানো ছিল তাদের। বড়রা বলত ওরা মানিকজোড়। দুজনের অভিভাবকরাই এ বন্ধুত্বে খুশি ছিলেন। একদিন শিবরাত্রিতে দুজনে একত্রে উপোস করে। রাতের প্রথম প্রহরে তারা একত্রে শিবপূজা করে। ঐদিনই ঘটনাচক্রে সীতানাথ পাইনের বাড়িতে যাত্রার আসরে শিব সাজার জন্য ডাক পড়ে গদাধরের। গয়াবিষ্ণু সেদিন স্যাঙাৎকে শিব সাজিয়েছিল। তাদের বন্ধুত্ব পরবর্তী কালেও ছিল। দক্ষিণেশ্বরবাসী রামকৃষ্ণের অনুরোধে তাঁরই কামারপুকুরের বাড়ির লোকদের জন্য কামারপুকুরের কাছে ডোমপাড়ায় এক বিঘে জমি কিনে দেন গয়াবিষ্ণু লাহা। কামারপুকুরের সংসার এতে উপকৃত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বন্ধু ধর্মদাস লাহার ভাই নিধিরামের বড় ছেলে গঙ্গাবিষ্ণু। অনেকে বলে গদাধরের স্যাঙাৎ ছিল এই গঙ্গাবিষ্ণু—গয়াবিষ্ণু নয়। তৃতীয় বন্ধু কুঞ্জবিহারী কর্মকার। গদাধরের খেলুড়ে বন্ধু। তাসখেলায় কুঞ্জকে হারাতে পারলে গদাই আনন্দে ল্যাংটা হয়ে নাচত। এই কুঞ্জ দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। বুড়ো কুঞ্জ রামকৃষ্ণের বাল্যলীলা আনন্দভরে পরিবেশন করতেন।

চতুর্থ বন্ধু শ্রীরাম। এর সঙ্গেও রাতদিন একত্রে কাটত গদাধরের। ষোলো সতর বছর বয়স পর্যন্ত অটুট ছিল বন্ধুত্ব। শ্রীরামের বাড়িতে ছিল খেলার আড্ডা। লোকে বলত, এদের একজন মেয়েমানুষ হলে দুজনের বিয়ে হত। এসব কথা রামকৃষ্ণের মনে ছিল। আরও মনে ছিল : শ্রীরামের

কুটুম্বরা পাল্কী চড়ে আসত। বেয়ারাগুলো 'হিঞ্চোর হিঞ্চোর' বলতে থাকত।

কামারপুকুরের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তিদের কথা আমরা একে একে বলব।

প্রথমেই বলতে হবে মানিক রাজার কথা। কামারপুকুরের এক মাইল উত্তরে ভুরসুবো গ্রামে ছিল তাঁর বাড়ি—আগেই সেকথা বলেছি। ক্ষুদিরামের সঙ্গে এঁর বন্ধুত্ব ছিল। ছয় বছর বয়সের গদাধরকে নিয়ে একদিন ক্ষুদিরাম মানিক রাজার বাড়ি যান। গদাধর যেন এক চিরপরিচিত স্থানে এসেছে, পরিবারের সবাই যেন তাঁর চেনা। এমন অসঙ্কোচ, মধুর ব্যবহার তার, আর এমন আনন্দময় সে যে বাড়ির লোকরা মহা খুশি। ছাড়তেই চায় না তাকে। মানিক রাজার ভাই রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুদিরামকে বললেন: সখা, তোমার ছেলে তো সাধারণ নয়, দেব-অংশ রয়েছে ওর মধ্যে। বড় আনন্দ পেলাম ওকে দেখে। যখন এখানে আসবে গদাইকে সঙ্গে আনতে ভুলো না।

ক্ষুদিরাম কিন্তু এর পর বেশ কিছুদিন আর যেতে পারেননি ওদিকে। মানিক রাজা গদাইকে দেখতে এত আকুল হয়ে পড়লেন যে নিজ পরিবারের এক রমণীকে পাঠিয়ে দিলেন ক্ষুদিরামের বাড়ি। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও গদাইকে নিয়ে আসতে হবে। ক্ষুদিরাম অমত করেননি। গদাধর উল্লাসভরে ঐ রমণীর সঙ্গে মানিক রাজার বাড়ি গিয়েছিল। সারাদিন কাটিয়েছিল সেই বাড়িতে। রাজার পরিবার গদাইকে অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়েছিল। সে অলঙ্কার তারা খুলে নেয়নি। অলঙ্কৃত গদাধর রাজার বাড়ি থেকে দেওয়া নানারকম মিষ্টি দ্রব্য সহ সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরেছিল—ঐ রমণীরই সঙ্গে। মানিক রাজার বাড়িতে গদাধর হয়ে পড়ল সবার চোখের মণি। ক্ষুদিরামকে তাঁরা বললেন গদাধরকে নিয়ে মাঝে মাঝে আসতেই হবে। মাঝে মাঝে গেলেও কুলোলো না; তাঁরাই কয়েকদিন পর পর লোক পাঠিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। কেননা গদাধর যেখানে আনন্দ সেখানে।

পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন প্রভুর বাল্যলীলার আরও কয়েকটি মনোহর চিত্র দিয়েছেন। অক্ষয়কুমার বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামের লোক। কামারপুকুর-জয়রামবাটি থেকে তাঁর বাড়ি বেশি দূর নয়। তিনি অঞ্চলের লোক হওয়ায় বহু খোঁজখবর নিতে পেরেছেন। গদাধরের বাল্যলীলার দ্রষ্টারা

অনেকেই বেঁচেছিলেন দীর্ঘদিন। তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা অক্ষয়-কুমারের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাই তাঁর দেওয়া বিবরণগুলির নির্ভরযোগ্যতা আছে। তাঁর সংগৃহীত অতিরিক্ত লীলাকথা নিম্নরূপ :

গদাধর যখন মাতৃক্রোড়ে শিশু তখন তার নানা ঐশ্বর্য দেখতেন মা চন্দ্রাদেবী। মাঝে মাঝে সে শিবনেত্র হত। শিবনাম উচ্চারণ করলে আবার সে স্বাভাবিক হত। আবেশ থেকে নেমে এসে চোখ খুলে মধুর হাসত সে। বিস্মিতা ও অমঙ্গলশঙ্কাতুরা ক্রন্দনরতা মাকে সে ভোলাত মাতৃস্তন মুখে নিয়ে শিশুবৎ আচরণ করে।

বালক গদাইকে একদিন মা টুঁকিতে গুড়-মুড়ি মেখে খেতে দিয়েছেন। খেলতে খেলতেই টুঁকি হাতে গুড়মুড়ি খাচ্ছিল সে—হঠাৎ ভাবাবিষ্ট স্পন্দহীন হয়ে গেল সে। দাঁড়িয়েই আছে, বাঁ হাতে টুঁকি—নিমেষহীন দুটি চোখ। মা অবাক; গদাইকে কোলে টেনে নিয়ে কাঁদেন। উনি সব সময় তটস্থ থাকতেন। ব্রহ্মদৈত্য বুঝি ছেলেকে ধরে। দুর্গা দুর্গা বলতে লাগলেন তিনি; প্রকৃতিস্থ হল গদাধর।

একদিন সকালে ক্ষুদিরামের মনে বাসনা উঠল, রঘুবীরকে ফুলে ফুলে সাজাবেন। ফুল তুললেন; অনুরাগে মালা গাঁথলেন; চন্দন ঘষলেন। গদাই সব লক্ষ্য করেছে। ঐ ভক্তিচন্দন মাখা রঘুবীরের প্রাপ্য ফুলমালাটি নিজে গলায় দিতে খুব শখ হল তার। কিন্তু কী করে! বাবার পূজোপকরণ তো আত্মসাৎ করা যায় না। বাবার কাছে কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ করল সে।

ক্ষুদিরাম পূজো করতে বসেই ধ্যানে তলিয়ে গেলেন সেদিন—বেহুঁশ; অন্যান্য দিনে ঠিক এমনটি হয় না। ধ্যান ভাঙল না তাঁর। ঐ অবসরে গদাধর রঘুবীরের মালাটি থালা থেকে তুলে নিয়ে নিজ গলে পরল। চন্দনে নিজের অঙ্গ সুসজ্জিত করল। সব কাজই সে ধীর স্থিরভাবে করেছে। তারপর ডাক দিল বাবাকে। ছাখো ক্ষুদিরাম, আজ কেমন সেজেছে রঘুবীর। তুমি যাঁর ধ্যান কর আমি সে-ই রঘুবীর। মালা-চন্দনে আমি কেমন সেজেছি ছাখো।

ক্ষুদিরামের ধ্যান ভাঙল এই আহ্বানে। ইষ্ট দর্শন হল তাঁর। স্বগৃহে দিনমানে সম্মুখে জাগ্রত রঘুবীর। গয়াধামে স্বপ্নদর্শন, আজ প্রত্যক্ষ দর্শন। ভেদ নেই। গয়ায় যিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি ক্ষুদিরামের পুত্র হবেন; আজ মধুকণ্ঠে তিনি জানালেন, কেমন, কথা রেখেছি তো!

একবার চন্দ্রামণি বাপের বাড়ি চলেছেন সরাটিমায়াপুর গ্রামে। গদাই

মায়ের পাশে পাশে হেঁটেই যাচ্ছিল। মাঠের মাঝে সে বললে: মা, আমায় কাপড়ে ঢেকে ফেল, কেউ যেন আমাকে দেখতে না পায়। আর কোলে কর। মা তাই করলেন। পথের পাশে একটা পীরের আস্তানা, গাছের ছায়ায় ঢাকা ঠাণ্ডা জায়গা। সেখানে পৌঁছাতেই গদাই বলল: মা কোল থেকে নামাও আমাকে। একটি গাছের গোড়ায় সত্যপীরের অধিষ্ঠান বেদী। মাটির নানা হাতী ঘোড়া পুতুল তার আশপাশে ছড়িয়ে ছিল। গদাই সোজা গিয়ে বসল সে বেদীর সামনে, কী ভাবে সে ভাবিত। মা ডাকছেন, সে শুনতে পাচ্ছে না। উঠতেই চায় না সেখান থেকে। বেলা হল, আর কতক্ষণ এমনভাবে বসবে বাবা। মার মিনতি ঝরে পড়ে। মা উতলা হচ্ছেন দেখে গদাধরের ভাব ভেঙে গেল। চলো মা, যাই।

একবার পথে যেতে যেতে আর একটি বিপদ হয়েছিল চন্দ্রামণির। গদাইকে কোলে করেই পথ হাঁটছিলেন তিনি, ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বসলেন এক গাছ তলে। সে গাছে হনুমানের দল ছিল। একটা হনুমান গাছের নিচে মাটিতেই বসেছিল। গদাই গাছের একটি ডাল মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তাড়া করতে গেল হনুমানগুলিকে। তাড়া খেয়ে হুপ হুপ করে হনুমানগুলি গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল নিচে, আর সবাই মিলে খেলা করতে লাগল গদাধরের সঙ্গে। খেলা—আক্রমণ নয়। গদাইও তাদের সঙ্গে খেলতে লাগল বিভোর হয়ে। ছুটোছুটি হুটোপাটি করছে হনুগুলি মানবশিশুর সঙ্গে। চন্দ্রার প্রাণ উড়ে যায় ভয়ে। বাছাকে যদি আঁচড়ে-কামড়ে দেয়! ওরে বাছা চলে আয়, আমাদের যে কত পথ যেতে হবে। মায়ের বারবার ডাকে খেলা শেষ করে গদাই ফিরে আসে মায়ের আঁচলে।

মানবশিশু তো শুধু হনুমানের সঙ্গে খেলে না, খেলে তার মানব সখাদের সঙ্গেও। সেই তো আসল খেলা। সে খেলার আর শেষ নেই। কামারপুকুরে তার সমবয়সীরা তাকে বই জানে না! গদাই না থাকলে সব খেলা মাটি। আর সে থাকলে সব খেলা জমাটি। দুদণ্ড গদাই চোখের আড়াল হলে প্রাণ কেঁদে ওঠে। ইচ্ছে করে রাতদিন তার সঙ্গে কাটাই। রাতে ঘুমোই ওর সঙ্গে। ওকে ছেড়ে ঘরে রাত কাটাতে যাওয়া—দুঃসহ। বালকদের ভাব দেখে ক্ষুদিরাম-চন্দ্রামণির বুক ভরে যায়। চন্দ্রা তো সকলের মা হয়ে বসে আছেন কবে থেকে এই গ্রামে। এখন শিশুদের দাপাদাপিতে ঘর-উঠোন যখন ভরে যায়, উল্লাসে বুক আসে ছেয়ে তাঁর। এ বালচপলতায় উনি কি শোনেন

সেই সুদূর কালের অতল থেকে ভেসে আসা নূপুর ধ্বনি? ওদের কলকণ্ঠে কি ধ্বনিত হয় দূর দেশকালের কোনো বিস্মৃত সংবাদ? অতশত ভাবার সময় নেই চন্দ্রামণির। গরীবের কুটিরে বসে তিনি রাঁধেন আর এই বালকদের সারি সারি বসিয়ে খাওয়ান। নিত্যই লেগে থাকে এ বালক-ভোজন। ক্ষুদিরামও অতৃপ্ত নয়নে পুত্রের বালসখাদের এ ভোজন দেখেন। ওদের খেলাধূলা রঙ্গ-কৌতুকে তাঁরও থাকে পূর্ণ সম্মতি। ওরে আমাকে তোরা নন্দ রাজা বানালি! ধনী করলি, ধন্য করলি আমাকে।

একদিন আবার লোক সমাগম হল বেশি। সবাইকে খাইয়ে তবে অন্যদিন চন্দ্রামণি খেতে বসেন। আজও সে নিয়ম মতো তিনি লোকজনকে অন্ন ব্যঞ্জন দিয়েই চলেছেন। বেলা পড়ে এল: বিকাল। এমন সময়ে দশজন সাধু ফকির এসে পড়ল। পুরীতে জগন্নাথ-দর্শন মানসে এরা চলেছে। এরকম যাত্রীরা ক্ষুদিরামের বাড়িতে প্রায়ই অতিথি হত—পুরী যাবার পথের পাশে তাঁর বাড়ি কি না! আজ চন্দ্রামণি এ অতিথি-উদয়ে বিপন্না হলেন। হাঁড়িতে অবশিষ্ট বিশেষ কিছু নেই। এখন দশজনকে কী দিই! না দিতে পারলে সাধু-ফকিররা ফিরে যাবেন বিনা অন্নজলে? তাতে ধর্ম রাখা হবে না, প্রাণের বেদনা ঘুচবে না। ফাঁপরে পড়লেন চন্দ্রামণি, কেননা ঘরে এক দানা চালও নেই যে নতুন করে রেঁধে দেবেন। মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে যেন। কাঁপছে গা। হঠাৎ দেখেন নয় বছরের একটি মেয়ে রান্না ঘরে। পাত্রে চন্দ্রামণির নিজের জন্য যে সামান্য ভাত-ব্যঞ্জন ছিল তারই ওপর হাত নাড়ছে মেয়েটি—আর ভাত-ব্যঞ্জন ফুলে ফুলে উঠছে। পাত্র উপচে পড়ল। সে অন্ন-ব্যঞ্জনে সাধু-ফকিরদের পরম পরিতোষে খাওয়ালেন চন্দ্রামণি।

মেয়েটি নতুন বটে, কিন্তু ব্যবস্থাটি নতুন ছিল না। চন্দ্রার নিজের খাওয়া যতক্ষণ সারা না হত ততক্ষণ তাঁর হেঁসেলে কখনো অন্ন-ব্যঞ্জন ফুরোত না। যত লোক আসুক উনি সবাইকে খাওয়াতে পারতেন। রাঁধতেন বাড়ির লোকদের উপযুক্ত পরিমাণ, কিন্তু খাওয়াতেন যতজন আসুক সবাইকে। ওঁর নিজের খাওয়াটি হলে কিন্তু হাঁড়ি শূন্য হয়ে যেত। গরীবের ঘরণী, কিন্তু অন্নপূর্ণা—অভাবকে ছাপিয়ে বলবতী হয়েছে স্বভাব; লজ্জা পেয়ে অভাব পালিয়েছে ক্ষুদিরাম-চন্দ্রামণির ঘর থেকে।

গ্রামের তেলি বেণে কামার ইত্যাদি বাড়ির ছেলেরা মাঠে গরু চরাতে যেত। গদাইকে সঙ্গে পেলে তারা খুশি। গদাধর গোপ বালক ছিল না,

কিন্তু গোপবালকদের আহ্বানে সে ছুটত মাঠে। মাঠের খেলার তুলনা হয় না। কত রঙ্গ কত রস। খেলার বুদ্ধি জোগায় গদাই। আর এত জানেও সে। শাস্ত্র-পুরাণ বাবার কাছে শিখেছে, সন্ন্যাসী পণ্ডিতদের সভায় গিয়ে শিখেছে, যাত্রা-কথকতা শিখেছে। আর তার উদ্ভাবনী প্রতিভা! নতুন নতুন খেলা বানায়!

গদাধর বন্ধুদের সাজায় ব্রজের রাখাল দল। কেউ সুবল, কেউ শ্রীদাম, কেউ দাম, কেউ বসুদাম ইত্যাদি। গদাধরকে কিন্তু কানাই না বানালে কারও মন ওঠে না। গরু বাছুররাও রাগ করে। গরু বাছুরগুলি গদাইয়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে থাকতে চায়, গাছের পাতা দুর্বাদল তার হাত থেকে খাবে, আদর কাড়বে তার কাছ থেকে।

গদাই বালকদের নিয়ে গাছে ওঠে, ডালে দোলে, লাফায় ঝাঁপায়। নামে পুকুরের জলে। দূর মাঠে যেতে অভিভাবকেরা বারণ করে দিয়েছেন—তা কে কার কথা শোনে। পথে ঘাটে চারদিকে লোকে দেখে দলবল নিয়ে গদাই খেলেই বেড়াচ্ছে। খেলাই যেন তার মূল কাজ।

গো-চারণের নিয়ম হল বালকরা গরু বাছুর মাঠে চরতে ছেড়ে দিয়ে আঁচলে বেঁধে আনা মুড়ি খায়। খায়, নাচে, খেলে। একদিন গাছতলে কোঁচড়ের মুড়ি খুলে সবাই বসেছে জলপান সারতে। গদাধরের চিত্তে দূরস্মৃতি উদিত হল। স্ফুরিত হল ব্রজভাব। ভাবে হৃদয়-সমুদ্র দুলে উঠল। বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হল। হতবাক রাখালরা ক্রমে ভীত হল। গদাই কি মারা গেছে? বাড়ি ফিরে বলব কী? আমরাই বা বাঁচব কিভাবে গদাইকে ছেড়ে? ভীতিবিহ্বল ব্যথা-ব্যাকুল হয়ে তারা ডাকল: গদাই গদাই ওঠ, চোখ চা, অমন করিসনি গদাই। বালকরা কাপড় ভিজিয়ে এনে মুখ মুছিয়ে দেয় গদাইয়ের: আবার যদি ভূতে ধরে থাকে তাই ভূত ছাড়াতে তারা রাম রাম বলে। কতক্ষণ কেটে যাবার পর চোখ চাইল গদাধর। কিন্তু চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে তার। কী হয়েছে গদাই, অমন করছিস কেন, বল আমাদের। বাক্য নেই। কেবল তার হাত দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। বালকরাও কেঁদে ফেলে। ঘাট মানছি, আর আনব না তোকে মাঠে। নারে, তোরা সখা আমার, তোদের না দেখে আমিই বা বাঁচব কিভাবে? দুঃখ নয় রে, আজ বড় আনন্দ দিলি তোরা। আমার ব্রজকথা আবার আমাকে তোরা মনে পড়িয়ে দিলি।

মনে যদি পড়ে গেল তবে আর ভোলা নয়। একদিন মাঠের মাঝে রাখাল

বালকদের সঙ্গে মাথুর পালা সুরু করে দিল গদাই। পালার সব তার মুখস্থ, সঙ্গীদেরও নিয়েছে শিখিয়ে দুরস্ত করে। যেখানে পালা গান হয় সেখানে গদাই দলবল নিয়ে যেত—পালাটি নিজে শিখে নিত, তৎসঙ্গে অন্যরাও।

অতএব মাথুর-পালা মাঠের মাঝে জমে উঠল। আজ গদাধর রাধা বিনোদিনী সেজেছে। আর বালকরা তাঁরই সখী। গদাই গান ধরতে ধরতে কৃষ্ণবিরহব্যাকুলা হয়ে উঠল। রাই কমলিনী হল পাগলিনী। পরাণ-বঁধু বলতে বলতে চোখের জলে ধারা নামল। কোথা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, সখি তোরা আমার কৃষ্ণকে এনে দে। কাপড় ভিজে গেল। বিরহ মূর্চ্ছায়, যেন বা দশম-দশায় জ্ঞান হারা গদাধর মাটিতে পড়ে গেল।

তখন বালকদের ভয়, রোদন, ছোটাছুটি। জল এনে দেয় তার চোখে মুখে। রাম নাম করে। জ্ঞান ফেরে না। হঠাৎ এক বালক কোন ভাবে প্রাণিত হয়ে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে উচ্চৈঃস্বরে বলে। কৃষ্ণনাম শোনা মাত্র গদাধর চোখ মেলে, কিন্তু করুণ বিলাপস্বরে কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে ইতি-উতি চায়। অদূরে কাকে দেখতে পেয়ে ঐ কৃষ্ণ ঐ কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ বলে গদাই দুবাহু মেলে ছুটে যায়। কৃষ্ণ নামেই গদাইয়ের চেতনা ফিরেছে দেখে সবাই তার চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে লাগল। বহু বালকণ্ঠে উচ্চারিত কৃষ্ণ নামে মুখরিত হতে লাগল সে দিগন্তলীন মাঠ। মহানামের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে গদাধরের ব্যাকুল চিত্ত শান্ত হয়ে এল। আশ্বস্ত রাখাল দল গোধন নিয়ে ফিরল গ্রামে।

ঐ মাঠে গদাধর কোনো কোনোদিন সঙ্গীদের নিয়ে নাম সংকীর্ত্তন সুরু করে দিত। হোক তারা গ্রাম্য বালক ; তবু তাদের কচি কণ্ঠোৎসারিত নাম-ধ্বনি গগন ভেদ করত। পথিকরা দেখত বিস্তৃত মাঠে নীল নভোতলে শিশুপুঞ্জ হরিনামে মাতোয়ারা : তাদের মধ্যমণি তথা প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ গদাধর যেন নওল কিশোর হরি স্বয়ং।

মাঝে মাঝে গদাধর বালক সঙ্গীদের নিয়ে মানিক রাজার বাগানে যেত। সেখানে গাছের ডালে ডালে বালকরা উঠে লাফালাফি করত, লুকোত পাতার আড়ালে। এ বাগানের মালিক ও তাঁর পরিবার গদাধরের কাছে বাৎসল্যমূল্যে আগেই বিকিয়েছে,—এ বাগান তাই গদাধরের নিজের বাগান। তার সখারা বাগানে হাজার দুরন্তপনা করলেও কে করবে মানা? এখানে ওদের স্বাধীন পদক্ষেপ।

এরই মধ্যে গদাধর পাঠশালায়ও যেত। গুরুমশায়রা তার প্রতি এত স্নেহাসক্ত হন যে পাঠের জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করতেন না। সহ পড়ুয়ারাও তার ভালোবাসায় মুগ্ধ, জ্বালাতন করত না তাকে। গদাধর পাঠশালার বন্ধুদের নিয়ে যাত্রার দল খুলল—রিহার্সালের স্থান ছিল মানিক রাজার আমবাগান। পাঠশালার গুরুমশাই সে কথা জানতে পেরে একদিন বললেন : গদাই তুই যাত্রা করিস্, কেমন করিস একবার দেখা। সঙ্গে সঙ্গে রাজী গদাধর পাঠশালায়ই সুরু করে দিল যাত্রা ; বাদ্যযন্ত্র সে একাই বাজাল মুখে আর তার মনোহরণ গান—সুরতাললয় সহ নাচও। সংয়ের পার্টও বাদ গেল না। যাত্রা দেখে পড়ুয়ারা ও গুরুমশাই স্বয়ং হেসে কুটি কুটি। গুরুর আদেশে গদাধরের যাত্রা প্রায় রোজ হতে লাগল : পাঠশালা পরিণত হল নাট্যশালায়। অভিভাবকদের অগোচর রইল না সে কথা ; কিন্তু তারাও কেউ কিছু বলল না, বরং যারা শব্দ শুনে এসে পড়ত তারা মজা উপভোগ করত।

তখনো বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয় বেরোয় নি। সেসময় বর্ণ-পরিচয়ের অন্য রীতি ছিল। লাহাদের পাঠশালার গুরুমশাই প্রহ্লাদ-চরিত্র-পুঁথি পড়াতেন। আর তারই সঙ্গে বর্ণ পরিচয় হত। শ্রুতিধর গদাধরের প্রহ্লাদ-চরিত্র সহজেই মুখস্থ হয়ে গেল। সে পুঁথি আবৃত্তি করত সুমিষ্ট ভাষায়, আর একটা অন্য ভাব এসে যুক্ত হত তার কণ্ঠে।

যুগীপাড়ায় বাস করত মধু যুগী। পাঠশালা থেকে বিকালে ফেরার পথে প্রায়ই গদাধর মধুর বাড়িতে আসত। এখানে বসত তার পুঁথি পড়ার আসর। এখানে সে প্রহ্লাদ-চরিত্র, দাতাকর্ণ এসব পুঁথি পাঠ করেছে। পাড়ার ভক্তিমতী মেয়েরা এসে তার পাঠ শুনত। মধু ছিল অবশ্য সেরা শ্রোতা।

মধু যুগীর বাড়িতে পুঁথি-পাঠের আসরে একদিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল। গদাধর আপন মনে পুঁথি পড়ছে, মধু ও মহিলারা তাকে ঘিরে বসে পাঠ শুনছে, কাছেই একটি আমগাছের ডালে বসে একটি হনুমানও শুনছিল সে পাঠ। একসময় গাছ থেকে হনুমানটি নেমে এসে চুপ করে বসল শ্রোতাদের মধ্যে। তারপর এসে গদাধরের পায়ে হাত রেখে বসে রইল। পাঠ শেষ হলে গদাধর পুঁথিখানি গুছিয়ে তুলে হনুমানের মাথায় ঠেকাল—হনুমানও তার পায়ে প্রণাম করে গাছে উঠে গেল।

কামারপুকুরে এক বৃদ্ধ কুমোর ছিল, শম্ভু কুমোর। সে গদাধরকে আপ্রাণ ভালোবাসত। গদাধরও যেত তার বাড়ি আর এই বুড়োর সঙ্গে বসে বসে

বলত প্রাণের কথা। শম্ভু মাটি দিয়ে দেব-দেবীর মূর্তি গড়ত। গদাধর শিখত তার কাছে মূর্তি গড়া। গদাধর ওখানে বসেই এমন সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়তে লাগল যে শম্ভু তো অবাক। শম্ভু গদাধরের গানের অনুরাগী ছিল; সে এলেই গান শোনাতে বলত। একদিন গান এত মধুর হল যে হাতের কাজ ফেলে—মূর্তি গড়তে গড়তে শম্ভু গান শুনত—ছুটে এসে গদাধরের পা দুটি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। সে মিনতি করল আরও একটি গান শোনাতে। শম্ভুর ভক্তি-আবেগ গদাধরকে এমন স্পর্শ করল যে আর একটি গান ধরতেই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। শম্ভু ভাবল বাবাঠাকুর মারা গেছে—আপন গৃহে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে সে ডুকরে কেঁদে উঠল। শম্ভুর বয়স তখন আশি।

ঐ পথেই সে সময় যাচ্ছিল মধু যুগী। শম্ভুর কান্নায় মধু অবস্থা দেখে বুঝে নিল সব। গদাধরের এমন ভাব-সমাধি হয়ে থাকে সে জানত—তাই সে চিন্তিত হয়নি। সে আশ্বস্ত করল শম্ভুকে। মধু সেবা-পরিচর্যায় গদাধরকে সুস্থ করে তুলে কাঁধে করে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে।

গদাধর যে ধর্মপ্রিয় বালক সেকথা ততদিনে সবাই বুঝেছে। তাকে প্রথম ধর্মোপদেশ করেছিলেন ক্ষুদিরাম। পরিণামও তিনি দেখে গিয়েছিলেন। পুরী যাবার পথ বেয়ে সন্ন্যাসী-ফকিররা প্রায়ই যাতায়াত করত। গ্রামে প্রবাদ আছে যে এরা ছেলে-ধরা, বালকদের ভুলিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। দলপুষ্টির জন্য, সন্ন্যাসী-ফকির সম্প্রদায়ের ধারা বজায় রাখার জন্য তারা হয়তো এমনটি করত। বাপমায়েরা এজন্য বালকদের সতর্ক করে রাখতেন—বালকরাও ভয়ে এঁদের কাছে ঘেঁষত না। ভয় পেতনা গদাধর। সে সন্ন্যাসী-ফকিরদের দেখলেই তাদের কাছে এসে জুটত। তাদের কাছে বসে সে দেবতার প্রসাদ খেত, মাকে এসে বলত তাদের গল্প। একদিন সে সারা গায়ে তিলক চিহ্ন এঁকে, পরণের নতুন কাপড়খানি ছিঁড়ে কৌপীন ও বহির্বাস করে পরে বাড়ি ফিরল। এসে মাকে বলল: দ্যাখো মা, আমি কেমন সাধু হয়েছি। পুত্রের সাধু-বৈরাগী রূপ ক্ষুদিরামও দেখলেন। যে অন্তঃসলিলা বৈরাগ্যধারা গদাধরের অন্তরে বহমান তারও পরিচয় পেয়ে গেলেন তিনি।

গদাধরের স্বরূপ আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ক্ষুদিরামের কাছে। তিনি যে বছর মারা যান এ সেই বছরের ঘটনা। গদাধরের বয়স তখন সাত।

একদিন সকালে টেকোয় মুড়ি নিয়ে গ্রামের মাঠে আলপথে যাচ্ছিল গদাধর। মুড়ি খেতে খেতে যাচ্ছে। হঠাৎ আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়তে দেখল

মেঘকজ্জল আকাশের কোল ঘেঁষে উড়ে চলেছে এক ঝাঁক শ্বেতপক্ষ বলাকা—কালো পটে দুধের রেখায় সে সুন্দরের আলিম্পনে রসো বৈ সঃ কে মনে পড়ে গেল গদাধরের; সৌন্দর্যাহত বালক জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মাঠ থেকে বেহুঁশ অবস্থায় তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যেতে হল বাড়ি। রামকৃষ্ণ নিজেই বাল্যের এ ঘটনাটি বলেছেন:

সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে। আমার তখন ছয় কি সাত বছর বয়স। একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্চি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেচে, তাই দেখ চি ও খাচ্চি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেচে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মতো বক ঐ কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। সে এমন এক বাহার হল! দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবে তন্ময় হয়ে একটা অবস্থা হল যে, আর হুঁশ রইল না! পড়ে গেলুম, মুড়িগুলি আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলুম বলতে পারি না। লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁশ হয়ে যাই।

বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপ সেদিন রামকৃষ্ণের মধ্যে এক দিব্য কবিকে উদ্বোধিত করেছিল—অথবা, অসীমের পথলিখায় মহাযাত্রার বাণী ব্যঞ্জিত করেছিল বলাকার দল তাঁর মনে; ক্ষুদিরাম কিন্তু সেকথা বুঝেও বুঝলেন না। পুত্রমায়া আবৃত করে দিল তাঁর দৃষ্টি। তিনি ও চন্দ্রা এ ঘটনায় চিন্তিত হয়েছিলেন। গদাধর জ্ঞানহারা হয়ে মাঠে পড়ে গেলে তার বন্ধুরাই এসে খবর দিয়েছিল বাড়িতে। তখন ক্ষুদিরাম গিয়ে ছেলেকে নিয়ে আসেন। বাড়ি এসে একটু পরই গদাধরের চেতনা ফিরেছিল—কোনোরকম অসুস্থতার লক্ষণ ছিল না তার দেহ মনে। তবু বাবা-মা ভাবলেন, এ তো অসুখেরই আভাস। চিকিৎসা ও শান্তিস্বস্ত্যয়ন দুরকমই ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা—যাতে পুত্রের ব্যাধি ও আধি দুই-ই দূর হয়। গদাধর তাঁদের বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে তার অসুখ হয়নি—এক অপূর্বভাবে তার মন লীন হওয়ায় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল; কিন্তু অন্তরে তার সংজ্ঞা ছিল আর ছিল গভীর আনন্দবোধ। কিছুদিনের মধ্যে আর কোনো উপদ্রব হতে না দেখে ক্ষুদিরাম ভেবেছিলেন সাময়িক বায়ুর প্রকোপে গদাধর সেদিন মূর্চ্ছা গিয়েছিল। তিনি তার কিছুদিন পাঠশালা যাওয়া তথা লেখাপড়া বন্ধের ব্যবস্থা করলেন—বিশ্রামার্থে। তাতে

আপত্তি ছিল না গদাধরের, বরং সে বেজায় খুশি। তার খেলার ও স্ফূর্তির আরও অবকাশ মিলল।

কেন ক্ষুদিরাম অহেতুক চিন্তিত হয়েছিলেন? ঐ বলাকার পক্ষ বিধূননে কি তার নিজেরই মহাযাত্রার বাণী সংকেত এসে পৌছেছিল তাঁর প্রাণে? চলো মুসাফির, গাঁঠরি বাঁধো। বহুদিন হয়ে গেল এ মর্ত্য বাসায়। এবার নোঙর তোলো এ বন্দর থেকে—চলো মহাযাত্রাপথে।

দেরে গ্রাম থেকে একদিন ক্ষুদিরাম এসে বসতি করেছিলেন এই কামারপুকুরে। সে ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের কথা। আজ ১৮৪২ খ্রীঃ। জীবনের আটাশটি বছর কেটে গেল এই গ্রামে। এখন আর তিনি এখানে আগন্তুক নন, এই গ্রামেরই একটি অঙ্গ। কিন্তু এখানেও মর্ত্য বাস সমাপ্ত করলে চলবে না তাঁর। মহাযাত্রার আগে একটি ক্ষুদ্র যাত্রা আছে: এ গ্রাম থেকে পা বাড়িয়ে সে ক্ষুদ্র যাত্রাটি সারতে হবে—এই ছিল ক্ষুদিরামের ললাট লিপি।

মেদিনীপুরে ক্ষুদিরামের যে প্রিয় ভাগনে রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকত, বাঙালীর নিয়মানুসারে সে শারদীয় দুর্গাপূজার সময় নিজ গ্রামে ফিরে আসত। সে গ্রাম সেলিমপুর। রামচাঁদ ধুমধাম করে বাড়িতে দুর্গাপূজা করত। আটদিন গান-বাজনা হত; ব্রাহ্মণভোজন, দরিদ্রভোজন ও বস্ত্রদান উৎসবে আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। রামচাঁদ প্রতি বছর দুর্গাপূজায় মামাকে নিয়ে যেত। ভাগ্নের শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি এত ছিল তাঁর প্রতি যে পূজার এ কয়টি দিন বড় সুখে কাটত তাঁর।

ক্ষুদিরামের আটষট্টি বছর বয়স; বৃদ্ধ ও রোগজীর্ণ। অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগে ভুগছিলেন তিনি। শরীর ভেঙে গিয়েছিল। তাই রামচাঁদের নিমন্ত্রণ রাখতে এবার সায় পাচ্ছিলেন না মনে। হেতু বুঝতে পারছিলেন না, কিন্তু মনে হচ্ছিল এবার যাওয়া উচিত হবে না। কিন্তু আবার ভাবলেন, আয়ু হয়তো আর বেশি নেই, এই হয়তো শেষ যাওয়া—আগামী বছর আর যাওয়া হবে না। প্রিয় ভাগনেকেও দেখতে ইচ্ছা করে!

প্রথমে ভাবলেন, গদাধরকে নিয়ে যাই। তারপর ভাবলেন, কয়দিন গদাইকে না দেখে চন্দ্রা থাকবেন কিভাবে? অতএব বড় ছেলে রামকুমারকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। যাবার সময় সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, রঘুবীর ও অন্য গৃহদেবতাদের প্রণাম করে, গদাধরের মুখ চুম্বন করে, চোখের কোণে উদ্গত অশ্রু লুকিয়ে ক্ষুদিরাম সঙ্গী রামকুমারকে নিয়ে যাত্রা করলেন।

তখনো পুজোর কয়েকদিন বাকি ছিল। মামা ও মামাতোভাইকে পেয়ে রামচাঁদ খুশিতে ডগমগ। ক্ষুদিরামের গ্রহণীরোগ বাড়ল। রামচাঁদ চিকিৎসাও করাল মামার। পূজা এসে গেল। ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী আনন্দে কেটে গেল। নবমীতে এল বিষাদ। ক্ষুদিরামের রোগ যেন আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। কবিরাজ এলেন, সেবা-পরিচর্যারও অভাব হয়নি। নবমী কাটল, কিন্তু দশমীর নিশা হল কালনিশা।

ক্ষুদিরাম দুর্বল ও প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। দশমী সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে রামচাঁদ যেমন ঘরে ফিরল, অপেক্ষমান মহাযাত্রী আর কালবিলম্ব না করে অন্তিম যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। বাকহারা মামাকে ক্রন্দনজড়িত স্বরে রামচাঁদ বলল : মামা, তুমি যে সবসময় রঘুবীর, রঘুবীর বলো, এখন কেন বলছ না ?

ইষ্টনাম শ্রবণে সম্বিৎ ফিরে পেলেন ক্ষুদিরাম। ধীর কণ্ঠে কাঁপা স্বরে তিনি বললেন : কে, রামচাঁদ ? মাকে বিসর্জন করে এলে ? আমাকে এবার তবে বসিয়ে দাও।

রামচাঁদ, রামকুমার, রামচাঁদের বোন হেমাঙ্গিনী ধরাধরি করে বিছানায় বসিয়ে দিলেন ক্ষুদিরামকে। রঘুবীর, রঘুবীর, রঘুবীর বলে তিনবার গম্ভীরস্বরে ইষ্টনাম উচ্চারণ করলেন ক্ষুদিরাম। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সেলিমপুর গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল। মধ্যরাতে বেরোল শ্মশান যাত্রা। সেলিমপুরের শ্মশানেই দাহ করা হল ক্ষুদিরামকে। গদাধর কি তখন ঘুমোচ্ছিল নিদ্রাবশে ? চন্দ্রাও ? তাঁরা খবর পেলেন পরদিন সকালে।

শেষ দেখাটিও হল না। শেষের জন্য আর মায়া রাখেননি ক্ষুদিরাম। ভাগনের শুভ কাজে বাধা সৃষ্টি করেননি। মাতৃপূজা শয্যায় শুয়েই উদযাপন করে গেলেন তিনি। বিজয়াতেই হল তাঁর বিজয়যাত্রা।

কামারপুকুরে অনুষ্ঠিত হল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। বৃষোৎসর্গ, ব্রাহ্মণভোজন, পল্লীবাসী ভোজন—সবই হল। রামচাঁদ পাঁচ শত টাকা দিয়েছিলেন মামার শেষ কাজে।

চন্দ্রার জগৎটি শূন্য হয়ে গেল। চুয়াল্লিশ বছরের দাম্পত্যজীবন—বড় শান্তিময়, ধর্মময়, কল্যাণময় সে জীবন। কত ছোটটি এসেছিলেন, কত পূর্ণটি তাঁকে করে দিয়ে গেলেন স্বামী। বাস্তু হারিয়েছিলেন, কিন্তু আপন চরিত্রবলে ধর্মের অটুট আসনে তিনি বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন চন্দ্রাকে। আর দিয়ে

গিয়েছেন সংসারের ভারটি। রামকুমার ও রামেশ্বর বড় হয়েছে, কাত্যায়নী শ্বশুর ঘরে গিয়েছে, কিন্তু গদাধর মাত্র সাত বছরেরটি আর ছোট মেয়ে সর্বমঙ্গলার বয়স মাত্র চার। ওদের দায়িত্ব এখন চন্দ্রাকেই নিতে হবে মুখ্যভাবে। তাঁকে এখনো সংসারে থাকতে হবে বহুদিন। রঘুবীরের সেবাও বন্ধ করা চলবে না। সেও তো বাড়ির বালক।

আর গদাধর? পিতৃহারা বালকের মনোবেদনা তো সামান্য নয়। আর বাবা তাকে কত ভালোবাসতেন। ধর্ম শিক্ষা দিতেন। শেখাতেন সদাচার। গদাধর জন্মাবধি শোক জানেনি। জগৎ ছিল তার আনন্দের রাজ্য। শান্তির স্বর্গ। এই প্রথম সেখানে শোকের প্রবেশ। জীবনের দুঃখময় রূপের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হল গদাধরের। জানল, সুখের পিছনেই দুঃখ আছে। আলোর পিছনেই অন্ধকার। জীবনের পিছনে মৃত্যু।

পিতৃবিয়োগসংবাদে গদাধর কেঁদেছিল কিনা, কত কেঁদেছিল জানা নেই। তাঁর মতো সংবেদনশীল কোমল বালক নিশ্চয়ই কেঁদেছিল। কিন্তু সত্য দেখতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ। জগৎ ও জীবনের সত্য লিপি সে পড়ে নিল। পিতার মহাগম্ভীর শূন্যতার আলোয় জগতের অনিত্যতার পাঠ সে স্থির ভাবে নিল। এই তো তিনি সেদিন মুখচুম্বন করছিলেন—এখনো সে স্পর্শ ও স্বাদ লেগে আছে মুখে—এরই মধ্যে কোথায় গেলেন তিনি? সেলিমপুরে যাবেন বলে তিনি চলে গেলেন মহাশূন্যের পারে! জলজ্যান্ত অস্তি থেকে নিঃসীম নাস্তিতে? প্রাণীকুল কোথায় যায়? তবে কি এ আমাদের স্থায়ী আবাস নয়? এ দেহ ও গেহ ক্ষণিকের?

আনন্দ-কলোচ্ছ্বাসিত গদাধরের মনে জাগল নির্বেদ ও তীব্র জীবনজিজ্ঞাসা। কী এই জীবন? কী এর অর্থ? মৃত্যু কী? কেন জীবনকে বেষ্টন করে মৃত্যু? মৃত্যু কি জীবনের গায়ে সাপের ছোবল? বিনাশকারী? নাকি সে জীবনের সুহৃদ? বিকাশকারী?

সাত বছরের গদাধরের মনে এত ভারী সব কথা উঠেছিল কিনা সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু ভারী তো নয় প্রশ্নগুলি—আমাদের ভাষার আড়ম্বরই ওগুলিকে ভারা আকার দিয়েছে। বালক গদাধরের অন্তশ্চেতনায় এই সব প্রশ্নের স্বর বেজেছিল, জীবনমৃত্যুবোধের অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল তার চিত্ত-ভূমিতে। সে ছিল গভীর ও সূক্ষ্মতাময়—বোধির আলো হাতে সেই শৈশব থেকেই সে দাঁড়িয়ে।

পিতার মৃত্যুর পর এই বোধির সহসা-উন্মেষ ঘটেছিল তার। এতদিন সমাধিবৎ অবস্থা আসছিল তার ঘুরে ফিরে, কিছু বা ঘটছিল তার চারিত্রিক ঐশ্বর্যের প্রকাশ। কিন্তু জীবনের আনন্দের মাঝে মৃত্যুর বেদনার আকস্মিক আবির্ভাবে—অমৃতের সঙ্গে বিষগরল পান করে গদাধরের তৃতীয় নয়ন, দিব্যনয়ন উন্মেষিত হয়ে গেল। এরপর থেকে তার জীবনের ঘটনাগুলির মাঝে অন্য একটা তাৎপর্য এসে পড়বে। তাং মধ্যে দিব্যের প্রকাশ ঘটবে। ক্ষণে ক্ষণে সে প্রকাশে ঊর্ধ্বজগতের আলোর বিচ্ছুরণে গদাধরের বাল্য-কিশোর লীলা দেবভাবমণ্ডিত হয়ে উঠতে থাকবে এবং গ্রামের নরনারীর সরল দৃষ্টিতে তাঁর নরোত্তম রূপ আভাসিত হতে থাকবে।

৬

লীলাকিশোর

বাল্য ও কৈশোর-চাঞ্চল্য গদাধরের সমানই রইল, কিন্তু তারই মধ্যে এসে পড়ল গাম্ভীর্য, অন্তর্মুখিতা, যেন বা দায়িত্ববোধ। বিষাদের পটভূমিতে মার সঙ্গে তার যেন নতুন পরিচয় হল। বাবার অভাব সে নিজে বুঝল, কেননা বাবা তাঁর প্রতি উদাসীন ছিলেন না, নিবিড় স্নেহময় ছিলেন—তার পালয়িতা, ভাবগ্রাহী, সহানুভূতিশীল। বাবার অভাব তার মনে যে বিষাদ এনে দিল তাই দিয়েই গদাধর মায়ের হৃদয় স্পর্শ করল—বুঝল তার সরলা গ্রাম্য মায়ের হৃদয়েও নেমেছে বিষাদের ভার। এখন তাকে শোকভারমুক্ত রাখার দায় যেন গদাধরের; সাত বছর বয়সে গদাধর অনুভব করলে তাকে এখন মায়ের রক্ষাকর্তা হতে হবে। আগে যদি আবদার করেছে মায়ের কাছে, চেয়েছে কোনো জিনিস, এখন সেসব আর করতে নেই, এ সিদ্ধান্ত সে নিজেই নিল। মা কোথায় কিছু পাবে? বরং গদাইয়ের আবদার না মেটাতে পারলে মায়ের ব্যথা বাড়বে বই তো নয়।

গদাধর এখন চন্দ্রার কিছু কিছু কাজের ভার নিয়ে নিল স্বেচ্ছায়। ঘরের কাজের খুঁটিনাটিতে ও রঘুবীরের সেবার কাজে গদাধর হয়ে উঠল মায়ের সাহায্যকারী। আরও বুঝল, মায়ের কাছে সে যতক্ষণ থাকে মা দুঃখশোক ভুলে আনন্দে থাকেন—তাই মায়ের কাছে কাছেই সে থাকে বেশি সময়।

কিন্তু কখনো কখনো সে চলে যেত ভূতির খালের শ্মশানে, মানিকরাজার আমবাগানে বা গ্রামপ্রান্তের কোনো নির্জন স্থানে। আগে সে সর্বদা খেলুড়ে বালকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকত, এখন সে নির্জনতা খোঁজে। একা থাকে, কী সে ভাবে, কী সে করে নির্জনতায়, কেউ জানে না। লোকে ভাবে, এও বালকের এক রঙ্গ।

ভাবে, কেননা গদাধরের রঙ্গ কখনো কমেনি। কোনো বিষাদভাব সে মুখে ফুটে উঠতে দেয়নি; জানায়নি কাউকে নিজের মনের কথা ঘুণাক্ষরেও। বাইরে সে যেমন সদানন্দ ছিল, তেমনই রইল। তার যাত্রা করা, গান করা,

ব্যঙ্গ পরিহাস করা আগের মতোই চলল। আমুদে বালকের আমোদ-পরিবেশনে ভাঁটা পড়েনি।

ছেদ পড়েনি পাঠশালায় যাওয়ায়। কিন্তু পাঠশালার চেয়ে তার আকর্ষণ বাড়ল যাত্রাপালা, পুরাণ ভাগবত পাঠ শোনায় ও প্রতিমা গড়ায়। এসবে সে মনের দুঃখ ভুলে থাকতে পারত, তাই পাঠশালায় বিদ্যালাভের তুলনায় এগুলিকেই আঁকড়ে ধরল একটু বেশি করে।

আর একটি নতুন আশ্রয় মিলল গদাধরের। কামারপুকুর ঘেঁষে পুরী যাবার যে পথটি ছিল, তার পাশে একটি পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জমিদার লাহা বাবুরা। এ পান্থনিবাসে এসে উঠতেন পুরীযাত্রী বা পুরী-প্রত্যাগত সাধু সন্ন্যাসীরা। পুরাণে যাত্রায় গদাধর শুনেছে সাধুরা সংসারকে অনিত্য মনে করেন ও ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে সংসারবিরাগী হন। সাধুসঙ্গে, সাধুদের উপদেশে মানুষ পরম মঙ্গল ও শান্তি লাভ করে। সাধুজীবন গদাধরকে আকৃষ্ট করল। কিংবা নিষ্কাম ভক্তিপরায়ণ ঈশ্বরব্যাকুল সাধুরাই তাঁদের ভক্তি-আহ্বানে গদাধরকে টেনে আনলেন।

পান্থনিবাসে সাধুসান্নিধ্য হল গদাধরের সময় কাটাবার প্রধান স্থান। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সাধুরা ধুনি জ্বালান। উজ্জ্বল অগ্নিকে সাক্ষী রেখে, অথবা অগ্নিতেই দেবতার আবির্ভাব জেনে সাধুরা ঈশ্বরধ্যান করেন। তাঁদের আহার ভিক্ষালব্ধ সামান্য অন্ন—ইষ্টদেবতাকে তাই নিবেদন করে তাঁরা তৃপ্তচিত্তে নেন প্রসাদ। অসুখ হলে তাঁরা ছটফট করেন না, বৈদ্যের খোঁজ করেন না—নির্ভর করেন ভগবৎকৃপার ওপর আর সহিষ্ণুভাবে বহন করেন রোগভোগ। কাউকে তাঁরা উদ্বিগ্ন করেন না, স্বার্থবোধই লুপ্ত তাঁদের। এঁরা সাধু এবং সজ্জন।

সাধু বেশধারী ভণ্ডরাও আসে অবশ্য। তারা স্বার্থসিদ্ধির ধান্ধা করে। গদাধরের চোখের দৃষ্টি থেকে কিছুই এড়ায় না, সবই সে লক্ষ্য করে। সে বলতে পারে কে খাঁটি সাধু, কে অখাঁটি। সৎ সাধুকে দেখতে পেলেই গদাধর তাঁর সেবা করতে এগিয়ে যায়। এনে দেয় তাঁদের জন্য জল, আগুন জ্বালবার কাঠকুটো, আরও যতটুকু কুলোয় তার ক্ষুদ্র হাতে। সাধু সেবা এখন গদাধরের প্রিয় কাজ। সাধুরাই তার প্রিয়জন।

সাধুরাও এ বালকের প্রতি আকৃষ্ট, মুগ্ধ, স্নেহপর। তাঁরা তাকে শেখান ঈশ্বরভজন, গান। সে শুনতে উন্মুখ বলে তত্ত্বকথা ও তত্ত্বোপদেশও তাকে শোনান তাঁরা। ভজন শুধু নয়: ভোজনেও তাঁরা চান গদাধরকে সঙ্গী

পেতে। ভিক্ষান্নপ্রসাদ গদাধর সামনে বসে খেলে যেন প্রসাদ-মাধুর্য বেড়ে যায়। গদাধর নিজেও ভিক্ষান্নপ্রসাদলোভী। সে তৃপ্ত হয় তা খেতে পেলে।

যেসব সাধু পান্থনিবাসে দু-এক দিনের চেয়ে বেশি থেকে যেতেন গদাধরের ঘনিষ্ঠতা তাঁদের সঙ্গে গাঢ় হয়ে আসত। এ বালককে ফেলে চলে যেতে মন সরত না তাঁদের। সাধুরা তাঁদের অন্তশ্চেতনায় গদাধরকে চিনেছিলেন। সৌভাগ্যবান তাঁরা—তাঁদের ধ্যেয় ও ইষ্ট তাঁদেরই সম্মুখে; কথা কইছে, গান গাইছে, সেবা করছে, তত্ত্বোপদেশ শুনছে। সাধুসন্ন্যাসীকুলে তাঁদের মতো ভাগ্যবান বেশি হয় না।—হৃদয়ের মধ্যে এই গূঢ় বার্তা তাঁরা পেয়েছিলেন।

সাত পেরিয়ে গদাধর আটে পা দিয়েছে। কয়েকজন সাধু তখন এলেন পান্থনিবাসে। সামোদ দামোদর গদাধরকে পেয়ে তাঁরা আর কামারপুকুর থেকে যেতেই চান না। পান্থনিবাসে তাঁদের আস্তানা ঈষৎ স্থায়ী হল। গদাধরই কি তাঁদের দূর থেকে আকর্ষণ করে এনেছে কৃপা করবে বলে? সে তাঁদের সঙ্গে এমন মিলেমিশে রইল যে গ্রামের লোকদের নজর পড়ল। প্রথম জানলেন চন্দ্রাদেবী। প্রায়ই সাধুদের ইষ্টভোগ সে এত খেয়ে আসতে লাগল যে বাড়িতে খেতে চাইত না। জননী জিজ্ঞাসা করলে সে সব কথা খুলে বলত। চন্দ্রা এতে উদ্বিগ্না হননি। গদাধর সাধুকৃপা লাভ করছে জেনে তিনি সুখী হয়েছিলেন। চন্দ্রা নিজেও সাধুসেবায় উদ্যোগিনী হলেন। তিনি গদাধরের হাত দিয়ে পাঠাতে লাগলেন সিধা। কিন্তু ভয় পাবার মতো কারণ ঘটল অচিরেই।

এক একদিন গদাধর বাড়ি ফিরতে লাগল সাধুদের মতো গায়ে ছাইভস্ম মেখে। কোনোদিন সে করল তিলক ধারণ। কোনোদিন নিজের কাপড় দুটুকরো করে কৌপীন ও বহির্বাস করে পরে ফিরল। এইসব সাজে গদাধরের খুশির প্রাবল্য এত বেশি যে বাড়ি ফিরেই মাকে সে ডাক দেয়, বলে দ্যাখো সাধুরা কেমন সাজিয়ে দিয়েছেন আমাকে।

ভয় পেলেন চন্দ্রাদেবী। গদাধর কি এই কোমল বয়সে সাধু হয়ে সংসার ছেড়ে চলে যাবে? সাধুরা কি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যাবার মতলব আঁটছে? চন্দ্রা একদিন কেঁদে ফেললেন। গদাইকে জানালেন মনের শঙ্কার কথা। গদাই মাকে বোঝাল: আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। মা শান্ত হলেন না তার কথায়। দুধের শিশুকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে সাধুদের

কতক্ষণ? গদাধর কর্তব্য স্থির করে ফেলল। এমন সংকটে কর্তব্য স্থির করতে কোনোদিন তার দুদণ্ড লাগেনি। একদিকে মা, অন্যদিকে আপন অভিলাষ—এ দুয়ের মধ্যে বেছে নিতে গদাধর পলকপাত করে না। মায়ের পাল্লাই ভারি সব সময় তার কাছে। বৃন্দাবনে আনন্দে গঙ্গামাইয়ের সঙ্গে বাসের অভিলাষ প্রবল হয়েছিল একদিন রামকৃষ্ণের। সব ব্যবস্থাই স্থির হয়ে গিয়েছিল। হৃদয় মনে করিয়ে দিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে চন্দ্রাদেবীর অবস্থানের কথা। 'মা পথ চেয়ে আছেন'—মনে পড়া মাত্রই রামকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উপস্থিত গদাধরও ঐ একই সিদ্ধান্ত নিল। মা কেঁদেছেন, তাই আর কোনোদিন যাব না সাধুদের আস্তানায়।

কিন্তু সাধুদের কাছে একটা শেষ বিদায় তো নিতে হয়—তাঁরাও যে আছেন তারই পথ চেয়ে। কোনো অপরাধও করেননি তাঁরা। গদাধর তাঁদের কাছে গিয়ে স্বীয় সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করল। জিজ্ঞাসিত হয়ে কারণও জানাল। মা ভয় পেয়েছেন, কেঁদেছেন, তাই আর আসব না সাধু-আবাসে। আসতে তো চাই আমি, কিন্তু আসতে পারি কই? মাকে কি দুঃখ দেওয়া যায়?

বনমালী যদি মনমালী হয়ে এলেন আমাদের কাছে, আমরাও কি তাঁকে ছাড়তে পারি? গদাধরকে ছেড়ে থাকব কিভাবে আমরা? গদাধরের মা যে আমাদেরও জননী। চলো তাঁকে শান্ত করে আসি। তাঁর ক্ষতি করার কথা আমরা যে চিন্তাও করিনা।

সাধুরা গা তুললেন। এলেন সরাসরি চন্দ্রার কাছে। বললেন: বাবা-মায়ের মত না নিয়ে অমন শিশুকে তো আমরা সঙ্গে নিয়ে যাই না মা। সে তো অপহরণতুল্য। সাধুশাস্ত্রে সেটা নিষিদ্ধ, বিষম পাপ হয় তাতে। আপনি গদাধর সম্পর্কে নিশ্চিন্তা থাকুন মা।

সাধুবাক্যই সরলা চন্দ্রার কাছে যথেষ্ট। সব শঙ্কা তিরোহিত হল তাঁর। বললেন: গদাই যাবে বই কি আপনাদের কাছে। সাধুসঙ্গ ও সাধুপন্থা উন্মুক্ত হল গদাইয়ের কাছে। ভবিষ্যতে সে সাধু হবে—মায়ের অনুমতি গোড়াতেই পেয়ে গেল সে। তার সাধুত্বের বৈশিষ্ট্য এই যে সে সাধুও হয়েছে, মাকেও ছেড়ে যায়নি। সর্বত্যাগী রামকৃষ্ণ ভোলেননি মাতৃসেবারূপ পরম ধর্মের কথা।

সাধুসঙ্গের পূত মহিমা রামকৃষ্ণই কীর্তন করে গিয়েছেন। অবিরাম

সাধুসঙ্গের পর গদাধরের মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটেছিল। উন্মুক্ত প্রান্তরে সে আবির্ভাব।

কামারপুকুরের তিন কিলোমিটার উত্তরে আনুড় গ্রাম। সে গ্রামের ৺বিশালাক্ষী দেবী জাগ্রতা বলে খ্যাতি ছিল। বিশালাক্ষী, বিষলক্ষ্মী, বিষহরি মনসা দেবীর নাম। সেকালে বহু যাত্রী এই দেবীকে পূজা দিতে যেত। তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি হত। মাঠের মাঝে আকাশতলেই দেবীর অবস্থান ছিল। রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য দেবীর মাথার ওপর পাতার ছাউনি করে দিত কৃষকরা। গল্পটি এই—গ্রামের রাখাল বালকরা ছিল দেবীর প্রিয় সঙ্গী। সকাল থেকে তারা এখানে এসে গরু ছেড়ে দিয়ে বসে গল্প করবে, গান করবে, খেলা করবে, বনফুল তুলে দেবীকে সাজাবে, যাত্রী বা পথিকরা দেবীকে পয়সা ও মিষ্ট দিলে বালকরা তা আনন্দ করে খাবে—দেবী এটাই চাইতেন। একবার একজন ধনী ব্যক্তি দেবীর কাছে মানত করে ফল পাওয়ায় সে একটি ইটের মন্দির তৈরী করে তার মধ্যে দেবীকে প্রতিষ্ঠিতা করে। পুরোহিত এসে সকাল-সন্ধ্যায় পূজা করে যায়, বাকি সময় থাকে মন্দিরের দরজা বন্ধ। যাত্রী ও ফকিররা জাফরির ভিতর দিয়ে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে যায়। রাখাল বালকরা না পায় মিষ্টান্ন, না পয়সা, তাদের আনন্দ মাটি! তারা মাকে বলল—মা মন্দিরে ঢুকে আমাদের খাওয়া বন্ধ করলি? তোর দয়ায় রোজ লাড্ডু মোয়া খেতাম—এখন কে খাওয়াবে আমাদের? সেদিন রাত্রেই সগর্জনে মন্দির ফেটে গেল। দেবী নিজেই চাপা পড়ার জোগাড়। পুরোহিত আবার দেবীকে মাঠে অবন্ধনে রাখলেন। এরপর আর যখনই কেউ ইটের মন্দির করে দিতে চেয়েছে স্বপ্নে দেবী তাকে ভয় দেখিয়েছেন—ও কর্ম কোরোনা। মাঠের মাঝে রাখাল বালকদের মাঝে আমি বেশ আছি—মন্দিরমধ্যে আমাকে নিতে চাইলে তোমাকে সবংশে নিধন করব।

কামারপুকুরের কয়েকটি মেয়ে ও মহিলা মানত শোধে দেবীর পূজা দিতে সংকল্প করে। লাহাদের মেয়ে প্রসন্নময়ী ও চন্দ্রাদেবীর পরিবারের কোনো মহিলা ছিল তাদের দলে। এই মেয়েরা গদাইকে অতি ভালোবাসত। তার বয়স তখন আট। সে ছিল তাদের নয়নানন্দ, শ্রবণানন্দ, প্রাণের প্রিয়। অতটা পথ মাঠ ভেঙে যেতে হবে, গদাই সঙ্গে থাকলে পথের ক্লান্তি থাকবে না। সে সঙ্গে থাকলে লোকে শ্রান্তি ক্লান্তি শোক দুঃখ ভুলে যায়। উৎসাহ উদ্দীপনা ও

আনন্দের জোয়ার আসে। তাছাড়া এমন একটা শুভকর্ম যেন পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে গদাই-সান্নিধ্যে। সর্বোপরি তার যে গান ও রঙ্গ!

সঙ্গে যেতে গদাইও রাজি। বরং সে নিজেই যেতে অগ্রিম আগ্রহী হয়েছিল।

কিন্তু মাঠের মাঝে দেবীর গান গাইতে গাইতে জড়বৎ হয়ে গেল গদাই। সে বাহ্যজ্ঞান হারা! অথচ সে মরেনি, কেননা দাঁড়িয়েই আছে। তার আনন উদ্ভাসিত দিব্য হাসিতে। দক্ষিণ হাতে বরাভয় মুদ্রা। দুচোখে জলধারা।

পাড়া গাঁর মেয়ে তারা, অত জানে না। গদাই তাদের প্রাণ এটুকু শুধু জানে তারা। এখন যদি তার ভালো-মন্দ কিছু হয়ে যায়! অল্পে ভয় পায় মেয়েরা, ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হয়। কেঁদে আকুল হয়। তারা কেউ তাকে করতে লাগল বাতাস, জ্ঞান ফেরাবার জন্য কেউ মাথায় দিতে লাগল জলছিটা, কেউ ডাকতে লাগল গদাই গদাই বলে। কিন্তু প্রসন্নময়ী গদাইকে কত কোলে-পিঠে করেছে জন্মকাল থেকে—তার হাবভাব জানা ছিল তার। সে এগিয়ে এসে সান্ত্বনা দিল সবাইকে। ওরে গদাইয়ের কিছু হয়নি। দেখছিস না ওর মুখের হাসি আর উজ্জ্বলতা! ছাখ ওর হাতের ভঙ্গী। মানুষে কি অমন হয়? ওরে মা নিজে এসেছেন পথের মধ্যে। বিশালাক্ষী মা। আর আনুড় যেতে হবে না আমাদের। আমাদের পূজো নিতে আগ বাড়িয়ে মা নিজেই এসেছেন। দে এখানেই পূজো দে মাকে। গদাইয়ের পায়ে পূজো-নৈবেদ্য দে। গদাই-ই মা বিশালাক্ষী এখন। তখন সব মেয়ে ও মহিলারাই হাঁটু গেড়ে বসে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে বলতে লাগল: "মা বিশালাক্ষি, প্রসন্না হও; মা, রক্ষা কর; মা বিশালাক্ষি, মুখ তুলে চাও; মা, অকূলে কূল দাও।"

কাশীপুর বাগানবাড়িতে এমনিভাবেই কালীপূজার রাতে গিরিশ, রাম, সুরেশ ও অপরাপর ভক্তবৃন্দ কালীজ্ঞানে রামকৃষ্ণকে পূজা দিয়েছিলেন। সেদিনও রামকৃষ্ণর আননে ফুটে উঠেছিল প্রসন্ন দিব্য বিভা। সেদিনও তাঁর হাতে ছিল বরাভয় মুদ্রা!

মহানগরীর জ্ঞানীগুণীগণ বোঝার বহুদিন আগেই কামারপুকুরের নিরক্ষরা সরলা বালিকারা দেবী বিশালাক্ষী জ্ঞানে খোলা মাঠে, মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে গদাধরের পূজা করেছিল। যে গদাধরকে তারা জন্ম থেকে জানত আর নিজেদের হাতে যাকে ধোওয়ামোছা করেছে সেই পরিজ্ঞাত গদাধর সহসা,

বিনা প্রস্তুতিতেই, অজানা বিশালাক্ষীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। আর গদাধর তাদের সরল অন্তঃকরণের বিশ্বাস ও নিবেদনকে সাদরে অঙ্গীকার করেছিল। তার মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে রঞ্জিত হয়ে উঠল। তাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করতে ও মা মা বলে ডাকতে লাগল সব মেয়ে। গদাধরের বাহ্যজ্ঞান ফিরলে দেবীর জন্য আনা কলা নৈবেদ্য তাকেই খাওয়াল মহিলারা। তারপর তারা আনুড়ে বিশালাক্ষী স্থান পর্যন্ত গেল ও আবার সানন্দে পূজা লাগাল। তারা গ্রামে ফিরলে চন্দ্রাদেবী তাদের কাছ থেকে সব কথা শুনে সেদিন রঘুবীরের বিশেষ পূজা দিলেন ও বিশালাক্ষীকে পূজা মানত করলেন।

বালিকাদের ফুল, হুলু ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত কামারপুকুর-আনুড় প্রান্তরে গদাধর বিশ্বের প্রথম পূজা পেয়েছিল। স্বগ্রামে যোগী ভিখ পায় না বলে প্রসিদ্ধি আছে। গদাধরের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ভিক্ষা দূর কথা, সে পেয়েছে পূজা! রামকৃষ্ণকে প্রথম প্রণাম জানিয়েছেন তাঁর পুণ্য গ্রামবাসীরা। এই-ই এ লীলার অপরূপ বৈশিষ্ট্য!

গদাধরের দেবস্বরূপের যদি মাধুর্য থাকে তবে তার মানবস্বরূপের মহিমা তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সেই সুদূর পল্লীতে নয় বছরের কিশোর গদাধর বিদ্রোহমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। মাঠে নয়, পরের ব্যাপারে নয়, নিজ ঘরে। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।

নয় বছরে পড়লে গদাধরের উপনয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন দাদা রামকুমার। তিনিই তখন চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অভিভাবক। নিঃসন্তানা, ধনী কামারনী গদাইকে নিজের ছেলে বলেই জানত ও তার নিকট 'মা' ডাক শোনার গূঢ় অভিলাষিনী ছিল। শুধু 'মা' ডাক নয়। গদাধরের মা হবার বাসনা ছিল তার। গদাধরের মাতৃপদ লাভের একটি উপায়ও সে স্থির করেছিল। উপনয়নের সময় গদাধর যদি তার কাছে প্রথম ভিক্ষা নেয় ও মা বলে ডাকে তবে ধনীর হৃদয় অক্ষয় আনন্দে পূর্ণ হবে ও ভিক্ষা-মা রূপে অচ্যুত মাতৃরূপ প্রতিষ্ঠা হবে তার। নিভৃতে এ মিনতি সে বহুদিন আগেই জানিয়েছিল গদাধরকে। গদাধরও তখনই সানন্দে সম্মতি দিয়েছিল। সে কতদিন আগের কথা।

ধনী গরীব কামারের মেয়ে, কামারের বউ। তার ব্রাহ্মণের ভিক্ষা-মা হবার অধিকার সামাজিক বিধিতে ছিল না—এখনও নেই। উপনয়ন হলে তবে ব্রাহ্মণপুত্র দ্বিজত্ব লাভ করে—সে ব্রাহ্মণ হয়। উপনয়নের প্রথম ভিক্ষা ব্রাহ্মণই দিতে পারে, অপর বর্ণের লোক নয়। এ বিধির ব্যতিক্রম এই বিশ

শতকের শেষলগ্নে কলকাতার মতো মহানগরীতেও কেউ করে না। করা নিষিদ্ধ। তখনো ব্রাহ্মদের উপবীত ত্যাগের আন্দোলন আসেনি—সে আসবে আরও বিশ বছর পর। উপবীত-মর্যাদা তখন হিন্দু সমাজে প্রবল বিদ্যমান ছিল।

ধনী গদাধরের প্রতিশ্রুতি-বাক্যে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে ভাবী গোপন সুখের চিন্তায় ডুবে ছিল। সে জোগাড় করে রাখছিল কিছু অর্থ ও আবশ্যকীয় জিনিস। উপনয়ন-অনুষ্ঠান আসন্ন হলে গদাধর দাদাকে সব কথা জানাল। রামকুমার আপত্তি জানালেন। বাবা শূদ্রযাজী ছিলেন না—শূদ্রের দান গ্রহণ করেননি কখনো। এ বংশেই অমন রীতি নেই। তুই এ কী বলছিস গদাই? গদাই একরোখা। সে বংশমর্যাদা বা প্রচলিত রীতির চেয়ে সত্যকে বেশি মানে। আমি যে কথা দিয়েছি ধনীকে। এখন কি আমাকে সত্যচ্যুত হতে হবে? যদি সত্যচ্যুত হয়ে মিথ্যাবাদী বনি, তাহলে আমি ব্রাহ্মণ হব কিভাবে? যদি ব্রাহ্মণ হবার যোগ্য না হয়ে পৈতে নিই তবে এ উপনয়ন অসার্থক, হাস্যকর। আমি মিথ্যাবাদী হব না।

নয় বছরের বালকের যুক্তিধারার কাছে রামকুমারের সব শাস্ত্রবাক্য নিষ্ফল হল। শাস্ত্রের উদ্ধৃতি তিনি দিতে জানতেন, দিলেন। বোঝালেন গদাধরকে। অবুঝ বালক সে। সে কি শাস্ত্রবিধির মধ্যে বদ্ধ থাকতে এসেছে? সে এসেছে শাস্ত্রের নিহিতার্থ প্রকাশ করতে। শাস্ত্র মানুষের জন্য—শাস্ত্রের জন্য তো মানুষ নয়। মানুষকে অঙ্গীকার করা শাস্ত্রবিধি পালনের চেয়ে বড়। ধনীর মাতৃত্বতৃষ্ণা সব শাস্ত্রবাণীকে ছাপিয়ে উঠেছে। গ্রাম্য মেয়ে সে, দীনা, নিরক্ষরা—কিন্তু গদাধরকে সে পুত্র রূপে দেখে, পেতে চায়—এর চেয়ে বড় শাস্ত্র আর জগতে কী আছে? ভগবানের মানবতনুকে জগতে আনার সময় ও করেছে ধাত্রীর কাজ; ওর সেই সেবা পরিচর্যায় ও ভগবানের মাতৃপদ সেই কবেই পেয়ে গিয়েছে। আজ শুধু হবে সে পদলাভের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণে ভগবান কবেই বা কাতর হন? ধনীর দীন আর্তি দেখে গদাধরের হৃদয় যে করুণায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

অটল গদাধরকে রামকুমার টলাতে পারলেন না। অনুনয় বিনয় শাসন ভর্ৎসনা সবই বিফল হল। উপনয়নের আয়োজনে টাকা খরচ হয়ে থাকে। টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে এখন কি বালকের জিদের জন্য সব আয়োজন নষ্ট করে দিতে হবে? তাহলে আবার উপনয়ন কবে হবে? তখনও তো এই একই

বাধা থাকবে? ধর্মদাস লাহা এগিয়ে এলেন অনুষ্ঠান পণ্ড হওয়া বন্ধ করতে। রামকুমারকে বললেন, গদাইয়ের কথাই মেনে নাও। তাতে ও শান্ত ও তৃপ্ত হবে। আর সামাজিক আপত্তির কথা ছেড়ে দাও। আমরাই তো সমাজ? আমরা আপত্তি করব না। গদাইয়ের কোনো কাজের ফলে তোমাদের নিন্দাভাগী হতে হবে না। গ্রামে কে না গদাইকে ভালোবাসে? তার উপনয়ন নির্বিঘ্নে হয়ে গেলেই বরং সুখী হবে সবাই।

অগত্যা রাজি হলেন রামকুমার। উপনয়ন-অনুষ্ঠান হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ হবার পর গদাধর প্রথম 'মা' বলে ডাকল কামারকন্যা ধনীকে। প্রথম ভিক্ষা সে নিল শূদ্রাণীর হাত থেকে। প্রচারহীন, আড়ম্বরহীন একটি স্বতস্ফূর্ত পদক্ষেপের দ্বারা গদাধর জাতিভেদ অতিক্রম করে গেল।

পুঁথির কবি অক্ষয়কুমার কাহিনীটি একটু অন্যভাবে দিয়েছেন। তাঁর মতে, গ্রামের ব্রাহ্মণকন্যারা গদাধরকে প্রথম ভিক্ষা দিতে অতিশয় আগ্রহান্বিত ছিল। কিন্তু গদাধর ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে ভিতর থেকে বলেছিল যে কামারণী ভিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত সে দরজাও খুলবে না, খাবেও না কিছু। তার অনাহার সইতে না পেরে গ্রামের লোক অস্থির হয়ে এসে মীমাংসার ভার নেয়। তাদেরই পীড়াপীড়িতে মেজ দাদা রামেশ্বর গিয়ে জানালেন যে গদাইয়ের কথাই থাকবে। তখন গদাই দরজা খোলে। বিবরণগত এই ঈষৎ পার্থক্যে মূল ব্যাপারটির ইতর বিশেষ হয় না। তবে সারদানন্দের বিবরণই সত্য মনে হয়। গদাধর পরিবারকে বিপাকে ফেলে তার দাবী আদায় করেনি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানের আগেই স্পষ্ট কথা বলে সে তার স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে ঋজু স্বভাবের বলিষ্ঠ বালক ছিল। মনের কথা শেষ মুহূর্তে জানাবার জন্য অপেক্ষা করেনি সে।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিচার করে। সেই তার কাজ, তার স্বভাব। উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণ বালকের হয় গায়ত্রী দীক্ষা। তারপর থেকে প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র জপ ও ধ্যান তার নিত্য কর্তব্য। গায়ত্রী মন্ত্রটি এই:

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্

তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো-দেবস্য ধীমহি।

ধীয়ো ন চ প্রচোদয়াৎ। ওম্।

সূর্যে সেই বরেণ্য ভর্গদেব আছেন। তাঁর ধ্যান করি। তিনি আমাদের অন্তরে থেকে প্রচোদনা করেন অর্থাৎ প্রেরণা দেন।

এক ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্মাণ্ডে ও জীবহৃদয়ে। জড়ে ও চৈতন্যে। আমাদের চিন্তা ও কর্মের প্রেরণাদাতা তিনি।

গদাধরের তখন দশ বছর বয়স। গায়ত্রীমন্ত্র জপ ও ধ্যানে ব্রহ্মবোধ স্ফূর্ত হয়েছে তার মধ্যে। অদ্বৈতবোধ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সভায় তা ব্যক্ত হয়ে পড়ল।

সভার আয়োজন করেছিলেন লাহাবাবুরা। তাঁদের বাড়িতে একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়েছিল। সেকালের রীতি ছিল, ঐরূপ অনুষ্ঠানে নিকটের ও দূরের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো। তাঁরা এসে সভায় বসে ব্রহ্মবিচার করবেন। আগ্রহী ব্যক্তি মাত্রে তা শুনতে পারবে। বিচারে জয়-পরাজয় আছে। যিনি বিজয়ী হবেন তিনি বহুমান্য হবেন। আমন্ত্রণকর্তা দানে ও বন্দনায় সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরিতৃপ্ত করবেন।

এই রীতি মেনেই সভা হয়েছিল। কাছে দূরের টোল চতুষ্পাঠী থেকে পণ্ডিতরা এসেছিলেন। গ্রামের সাধারণ লোকরাও এসব তর্ক সভায় বিশেষ আগ্রহ দেখায়। বালকরাও আসে। পণ্ডিতরা হাত পা নেড়ে কথা বলেন, টিকি দোলে, তর্ক করতে করতে উত্তেজিত হন। তাঁদের বক্তব্য না বুঝলেও সে উত্তেজনার আসরে বালকরা মজা পায়। পণ্ডিতদের অঙ্গ ও বাকভঙ্গী নকল করে তারা হাস্য পরিহাস করে। আর বয়স্করা শাস্ত্রযুক্তি অনুধাবনের চেষ্টা করে—এ দেশের নিরক্ষররাও দর্শনালোচনায় উৎসাহী।

তর্কসভায় একটি শাস্ত্রীয় প্রশ্নের মীমাংসা হচ্ছিল না। বহু তর্ক হলেও না। গদাধর সভাতে বসেই সব তর্ক শুনছিল। একজন পরিচিত পণ্ডিতকে সে বলল : দেখুন প্রশ্নের মীমাংসা কি এই নয়? মীমাংসাটি সে বলে দিল।

পণ্ডিত মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি সব পণ্ডিতকে সম্বোধন করে গদাধর কী সমাধান দিয়েছে তা বললেন। পণ্ডিতরা নানা দিক থেকে শাস্ত্রীয় বিচার করেই সিদ্ধান্ত করলেন, হাঁ ওটিই একমাত্র শাস্ত্রসম্মত মীমাংসা। মতভেদ হল না। এক বালক যে এভাবে মীমাংসা করে দিতে পারে তা তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। অবাক হয়ে সবাই গদাধরকে দেখলেন। বললেন, এ বালক দৈবশক্তি সম্পন্ন। কেউ তাকে কোলে নিলেন, কেউ করলেন চুম্বন।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সভায় গদাধর ব্রহ্মবাদী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল—সারদানন্দ লিখেছেন, রামকৃষ্ণের জীবনে 'গুরুভাবের প্রথম জ্বলন্ত নিদর্শন এই ঘটনা।

গুরু রামকৃষ্ণকে প্রথম দেখার সুযোগ যদি হয়েছিল কামারপুকুরবাসীদের, তবে ইষ্ট রূপেও তারাই তাঁকে প্রথম পেয়েছিল। তাঁকে ইষ্ট রূপে প্রথম চেনেন চিনু শাঁখারি। কামারপুকুরেরই মানুষ তিনি, আজও তাঁর ভিটে আছে।

চিনু গরীব ও বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি শাঁখা বিক্রী করতেন, অন্যান্য ছোটো-খাটো মনোহারী জিনিসও। সামান্য ব্যবসা, সামান্য আয়। তাঁর দোকান ছিল। তাঁর নাম শ্রীনিবাস, কিন্তু গ্রামের লোক ডাকত চিনিবাস, তাই আবার ছোট করে হয়ে গেল চিনু। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁর অধিকার ছিল, সাধনাও করতেন। সাধনায় কিছু সিদ্ধিও লাভ হয়েছিল। বিভূতি ও সিদ্ধাইয়ের প্রকাশ হয়েছিল তাঁতে।

বালক গদাই ও বৃদ্ধ শ্রীনিবাসের মধ্যে পরম সখ্যতা ছিল। এই বালককে দেখলেই বৈষ্ণব শ্রীনিবাসের ভাবোদ্দীপন হত। গদাধর এলেই তাকে পরম সমাদরে আসনে বসিয়ে মিষ্টান্ন খাওয়াতেন শ্রীনিবাস। সেসময় তাঁর দোকানে ক্রেতা এলেও তাদের ফিরিয়ে দিতেন তিনি। গদাধর ধীরে ধীরে খেত, শ্রীনিবাস দেখতেন বসে বসে আর ভাববিহ্বল হয়ে পড়তেন। জগৎ সংসার ভুলে যেতেন। পলকহীন চোখে তাকে দেখতে দেখতে শ্রীনিবাসের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত।

একদিন কোনো কারণ নেই, আপন মনে ফুলমালা গেঁথে চলেছেন শ্রীনিবাস। উদ্দেশ্য কী তা তাঁরও জানা নেই। হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই সেখানে গদাধর হাজির। তুই একটু বোস গদাই, আমি এক্ষুনি আসছি। শ্রীনিবাস কাছেই দোকান থেকে কিছু মিষ্টান্ন কিনে গোপনে কাপড়ে ঢেকে আনলেন। চল গদাই, একটু মাঠে ঘুরে আসি। ফুলমালা ও মিষ্টান্ন দুইই রইল গোপনে কাপড়ে ঢাকা।

জনহীন মাঠে এক গাছের তলায় গিয়ে দুজন দাঁড়ালেন। চারদিকে চেয়ে কেউ আসছে কিনা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন শ্রীনিবাস। মালা বের করে পরালেন গদাধরের গলায়। আপন হাতে মিষ্টান্ন খাইয়ে দিলেন গদাধরকে। মুখে কথা নেই। চোখের জল ঝরছে। ভাবপ্লাবিত শ্রীনিবাস ঠিকমতো খাওয়াতে পারছেন না গদাধরকে—কখনো তার নাকে, কখনো চোখে, কখনো কানে গিয়ে পড়ছে হাত। হাত বশে নেই। মনও বশে নেই। গদাধর নিজেই শ্রীনিবাসের হাত ধরে ধীরেসুস্থে খেল মিষ্ট। আনন্দে।

খাওয়ানো শেষ হলে জোড় করে শ্রীনিবাস গদ গদ ভাষায় বললেন : বৃদ্ধ আমি, এ শরীর থাকবে না বেশিদিন। তোমার কত লীলা হবে প্রভু, আমি তো দেখতে পাব'না। এ দুঃখ মনে রইল, তবু আমাকে কৃপা কোরো ঠাকুর।

রামকৃষ্ণকে ইষ্টজ্ঞানে প্রথম পূজা করেছিলেন শ্রীনিবাস। এই দীন কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিবান বৈষ্ণবের সঙ্গে গদাধরের সম্পর্ক ঐদিন ওখানেই শেষ হয়ে যায়নি। চিনুও শীঘ্র মারা যান'নি। তিনি আরও দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন। আঁটো-সাঁটো দেহ, বলশালী লোক ছিলেন তিনি। রোগশূন্য এই বৃদ্ধের গায়ে এত জোর ছিল যে গদাধরকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতেন তিনি। গদাধর তাঁকে দাদা বলে ডাকত—সে ডাকে আহ্লাদে আটখানা হতেন বৃদ্ধ চিনু। ভাগবতের পণ্ডিত চিনুর সঙ্গে গদাধরের তর্ক বেধে যেত। তর্ক এতদূর গড়াত যে দুজনেই রেগে যেতেন—চিনু কিঞ্চিৎ বেশি। তর্কের পরিণামে দুজনেই প্রতিজ্ঞা করতেন যে আর কেউ কারও মুখ দেখবেন না। যে যার ঘরে ফিরে যেতেন। কিন্তু এক দণ্ড না কাটতেই আবার দুজনের মিলন হত। সে মিলনে দুজনেরই আনন্দ উছলে উঠত। এই বৃদ্ধ ও বালকের সম্পর্কমাধুর্য অনির্দেয়। বয়সের দিক থেকে পিতামহ-পৌত্রের পর্যায়ের দুটি মানুষ বড় ভাই ছোট ভাই বা বন্ধুবৎ হয়ে গিয়েছিলেন।

উত্তরকালের কথাও এখানে শেষ করে রাখি। দক্ষিণেশ্বর থেকে রামকৃষ্ণ যখন আসতেন কামারপুকুরে তখনও চিনু জীবিত ছিলেন। তখনও দাদা-ভাইয়ের আসর বসত। চিনুর বাড়িতেই ভাগবত-আলোচনা জমে উঠত। কোনো কোনোদিন সে আলাপনে ভোর হয়ে যেত রাত। সেবার এসেছিলেন রামকৃষ্ণ-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী কামারপুকুরে। ব্রাহ্মণী চিনুকে আমন্ত্রণ করে এনে রঘুবীরের প্রসাদ খাওয়ান ও তাঁর এঁটো নিজ হাতে পরিষ্কার করেন। এ নিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণীর বিবাদ হয়েছিল। নিচু জাতের এঁটো ব্রাহ্মণীর স্বহস্তে পরিষ্কার করা হৃদয় অনুমোদন করেননি। কিন্তু ব্রাহ্মণী যে চিনুর মধ্যে এক পরম বৈষ্ণবকে দেখেছিলেন—জাতির প্রশ্ন তাঁর মনে তাই ওঠেনি।

গ্রামের গল্পকথা আরও একটু আছে। একদিন জমিদারের বরকন্দাজ চিনুকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল খাজনা না দেবার কারণে। তারা চিনুর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে যায়—তাদের পায়ে ধরেছিল খিল। সারারাত দাঁড়ানোর পর সকালে মুক্ত হয়েছিল তারা। এ অলৌকিক অভিজ্ঞতার পর চিনুকে গ্রেপ্তার করার সাহস তাদের হয়নি।

আর একবার কয়েকজন সাধু কামারপুকুর আসেন। চিনুর বাড়িতে অতিথি হন তাঁরা। আমের টক খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা। তখন আমের সময় নয়। আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভগবানের কাছে কেঁদে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন চিনু। অকস্মাৎ কয়েকটি কাঁচা আম গাছ থেকে খসে পড়েছিল। কাঁচা আমের টক খাইয়ে অতিথিদের তৃপ্ত করেছিলেন চিনু। কিন্তু অতৃপ্ত হয়েছিলেন তাঁর আরাধ্য কান্হ। দেশে ফিরে এ ঘটনা শোনায় রামকৃষ্ণ চিনুকে বলেন : এ সব সিদ্ধাই। এ ভালো নয়। সিদ্ধাইয়ে মন দিতে নেই।

সিদ্ধাই ঈশ্বরসাধনার পথে বিঘ্নস্বরূপ। উপনয়নের পর সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে গদাধর নিজে কখনো সিদ্ধাই চায়নি। 'রঘুবীরের সেবা-পূজার ভার এ সময় সে পেয়েছিল। নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনা, গায়ত্রী জপ ও ধ্যান ; রঘুবীর, রামেশ্বর শিব ও শীতলার পূজা ও বেশবাস তখন তাঁর করণীয়। বাবার জীবনকাহিনী এতদিনে সে সব শুনেছে—বয়স এগারো বারো হল। বাবা কিভাবে রঘুবীরকে পেয়েছিলেন, রঘুবীরকে পাবার পর থেকে সামান্য এক বিঘে জমির ধানে কিভাবে এত বড় পরিবারটি প্রতিপালিত হয়ে আসছে সব শুনেছে সে। এই প্রসন্ন দেবতার দর্শন ও স্পর্শ পাবার জন্য ব্যাকুল হল গদাধর। বাবাকে তুমি দেখা দিয়েছ ঠাকুর—আমাকেও দেখা দিতে হবে যে। কথা কও। সেবায় সে আন্তরিক, পূজায় নিষ্ঠাবান। ধ্যান করে দীর্ঘক্ষণ। ভাব সমাধি হতে লাগল তার—সবিকল্প সমাধি। হতে লাগল দেব-দেবী দর্শন। কিন্তু গদাধর কখনো ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন আর কিছু প্রার্থনা করেনি।

গদাধরের একালীন শুদ্ধ সাধক চরিত্রের পরিচয় প্রকাশ হয়েছিল একদিনের ঘটনায়। সেদিন শিবরাত্রি। এ রাতে গ্রামের পুরুষ মেয়েরা ঘুমোয় না, শিব-উপাসনা ও শিবমহিমা কীর্তন করে ও তা শুনে কাটায়।

সীতানাথ পাইনের বাড়ি শিবযাত্রা হবার কথা ছিল। পাইনরা সুবর্ণবণিক, গ্রাম্য সমাজে তারা বেশ ধনবান ছিল। কামারপুকুরের পাইনদের জমিজমা, হালবলদ ছিল, সোনার দোকানেও আয় ছিল। তাদের শ্রীময় বাড়ি লোকজনে ভরা ছিল। তবে তারা জমিদার বা বড় রকমের ধনী ছিল না।

সীতানাথ পাইন ছিলেন পাইনগোষ্ঠীর কর্তা। ক্ষুদিরামের গৃহের দক্ষিণ-পশ্চিমে কিছুদূরে তাঁর বাস ছিল। টাকা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাঁশ কাঠ খড়

মাটির বাড়িতে বাস করতেন, কিন্তু মন্দির নির্মাণ করেছিলেন ইটের, আর শিল্পী লাগিয়ে কারুকার্যখচিত করেছিলেন সে মন্দির।

পাইনরা বৈষ্ণব ছিলেন কিন্তু শিবভক্তিও ছিল তাঁদের। সীতানাথ হরিনামও জপতেন, শিব প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। শিবরাত্রিব্রত পালিত হত তাঁর পরিবারে। এজন্যই বাড়িতে শিবযাত্রার বন্দোবস্ত হত।

সেবার কাছের গ্রাম থেকেই একটি যাত্রার দল আনা স্থির হয়েছিল। রাত এক দণ্ড কেটে গেলে তবে যাত্রা সুরু হবার কথা—কেননা প্রথম দণ্ডে শিবপূজা সাঙ্গ করার কথা। সন্ধ্যাবেলা খবর এল যে যে বালক ঐ যাত্রাদলে শিব সাজে তার গুরুতর পীড়া হয়েছে, আসরে আসার সম্ভাবনা নেই। অনেক খুঁজেও অধিকারী বিকল্প অভিনেতা পায়নি। অধিকারী বহু মিনতি জানিয়ে খবর পাঠিয়েছে—এ অবস্থায় যাত্রা গাইতে তারা আসতে পারবে না, যেন ক্ষমা করা হয়।

এখন উপায় কী হবে? যাত্রাগান না হলে লোকরা রাত জাগবে কিভাবে? গ্রাম-বৃদ্ধরাই পরামর্শ করে অধিকারীকে খবর পাঠালেন, আমরা যদি শিব জোগাড় করে দিই তবে কি যাত্রা হতে পারবে? অধিকারী উত্তর পাঠালেন—হাঁ, তা পারবে। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ আবার পরামর্শ করলেন। এখন কাকে শিব করা যায়। গদাধরের কথাই মনে উঠল সবার। সে অভিনয় জানে, গান জানে, শিবের গাজন জানে। শিববেশে তাকে মানাবেও ভালো। আর সংলাপ?—সে অধিকারী খানিকটা শিখিয়ে নেবে, খানিকটা অধিকারীই চালিয়ে নেবে। গদাধরকে বলা হল। সে রাজি।

গদাধর স্যাঙাৎ গয়াবিষ্ণু ও অন্য বালকদের সঙ্গে শিবের উপোস করেছিল। রাত্রির প্রথম দণ্ডে তারা শিবপূজাও করে। তারপর গদাধর শিব সাজার আহ্বান পেলে গয়াবিষ্ণুই বন্ধুবান্ধব নিয়ে গদাধরের বেশভূষা করে দেয়।

সাজঘরে বসে শিবের কথাই ভাবছিল গদাধর। এমন সময় আসরে যাবার ডাক পড়ল তার। একজন পথ দেখিয়ে গদাধরকে নিয়ে গেল আসরে। গদাধর উন্মনা; কোনোদিকে লক্ষ্য নেই। মন্থর পদবিক্ষেপে আসরে এসে সে স্থিরভাবে দাঁড়াল। জটাজালভূষিত, বিভূতিমণ্ডিত, রুদ্রাক্ষধারী শিব, ধীর পদবিক্ষেপ, অচল অটল সুমেরুবৎ অবস্থান, অন্তর্মুখী নিমেষহারা দিব্য দৃষ্টি, ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা—দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে গেল। হরিবোল, হরিবোল ধ্বনি উঠল। মেয়েরা করতে লাগল হুলু ও শঙ্খধ্বনি। ওরে, স্বয়ং শিব,

একবার প্রাণ ভরে দেখে নে। কিন্তু জানিস, ও আমাদের গদাই রে। একদম চেনা যায় না। বাঃ বাঃ। মাইরি, কী সুন্দর দেখাচ্ছে গদাইকে। ছোঁড়া শিবের পালা এত ভালো করবে কে জানত! ছোঁড়াকে বাগিয়ে নিয়ে আমরাই তো একটা যাত্রাদল করতে পারি!

এইসব কথা বলাবলির মধ্যেই অধিকারী শিবস্তুতি করতে লাগল। কিন্তু গদাধরের দৃকপাত নেই। সে দাঁড়িয়েই আছে, স্থির, নিস্পন্দ। দরদরধারে চোখের জল ঝরে বুক ভাসছে তার। সেই নাটুয়া, চঞ্চল, গায়ক, লীলাপর চেনা গদাইয়ের আজ কী হল? যে পশ্চাদ্দেশ চাপড়িয়ে বাজনার বোল তুলত, ফচকিমি করত, অভিনয় করত—সে কেন নির্বাক? নড়াচড়াটুকু নেই। ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে। কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। অধিকারী ও দুএকজন বৃদ্ধ কাছে গিয়ে দেখে—গদাধরের হাত পা অসাড়, জ্ঞান নেই।

তখন গোলমাল উঠল। কেউ বলল, জল দাও চোখে মুখে। কেউ বলল, বাতাস কর। কেউ বলল, শিবের ভর হয়েছে, নাম কর। কেউ বলল, রসভঙ্গ করল ছোঁড়াটা, এমন পালাটি আর শোনা হল না।

যাত্রা ভেঙে গেল। সংজ্ঞা হারা গদাধরকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে গেল লোকে। সে রাতে আর সংজ্ঞা ফেরেনি তার। শোনা যায়, তিন দিন সংজ্ঞাহীনভাবে ছিল গদাধর। কান্নার রোল উঠেছিল বাড়িতে। শিবভাবনায় ডুবে গদাধরের সমাধি হয় বহু জনসমক্ষে। এসব দক্ষিণেশ্বরের সমাধিবান রামকৃষ্ণের বহু আগের কথা। এবং কামারপুকুরের লোকরাই প্রথম স্বচক্ষে দেখেছিল, জেনেছিল যে গদাধর নট নয়, নটনাথ স্বয়ং। সাধনার সিদ্ধি তখনই তার করতলগত।

পাইনদের বাড়িতেই আর একটি ঘটনা ঘটেছিল যাতে নটনাথ নটী হয়ে মানুষের খল রসনাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। ওঁ নমো নটনাথায় নমঃ।

বৃদ্ধ সীতানাথ পাইনের সাতটি ছেলে ও আটটি মেয়ে ছিল। মেয়েদের বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তারা বাপের বাড়িতেই থাকত। আরও সম্পর্কিত কিছু মেয়েও বাড়িতে ছিল – সর্বমোট চোদ্দজন। রূপবতী ভক্তিমতী ছিল মেয়েরা। গদাধরের সঙ্গে এদের মহা সখ্য ছিল।

সীতানাথের বাড়িতে লোকজন এত বেশি ছিল যে রাঁধার মশলাই বাটা হত প্রতিদিন দশখানি শীলে। তাছাড়াও তাঁর দূর সম্পর্কীয় অনেক আত্মীয় তাঁর বাড়ির পাশেই বাস করত—তাই স্থানটির নাম ছিল বণিক পল্লী। এ

বাড়ির মেয়েরা অবসর পেলে চন্দ্রাদেবীর কাছে যেত। ফলে গদাধরের সঙ্গে এদের পরিচয় ও সখ্যতা জন্মে। এরা গদাধরকে বাড়িতে নিয়ে যেত, মেয়েবেশে সাজাত। অভিনয়পটু গদাধর এদের নানা অভিনয় ও কৌতুক দেখাত। গদাধরের গান ও রামায়ণ-ভাগবত ইত্যাদি পাঠ শুনতে বণিকপল্লীর মেয়েরাও এসে জুটত।

গদাধর সীতানাথের অন্দরমহলে যখন তখন যেত। মেয়েদের মধ্যে বসে থাকতে থাকতেই তার সমাধি হয়ে যেত। মেয়েরা তাকে জানত গোপাল। শুদ্ধাত্মা তারা, তাই গোপাল গদাধরকে এত কাছে পেয়েছে তারা। মেয়েদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিল রুক্মিণী। তার মুখে শোনা গেছে যে গদাধরকে ছেড়ে থাকতে পারবে না বলেই তারা বাপের বাড়ি থাকত—স্বামীগৃহে যেত না।

মেয়েরা গদাইকে খাওয়াত, দোলনায় দোল দিত, শুনত তার গান ও উপদেশ—আনন্দ কলহাস্যে মুখরিত হত পাইন বাড়ি।

কিন্তু সীতানাথ পাইনেরই খুড়তুতো ভাই দুর্গাদাস পাইন এ ব্যাপারে একটু বাঁকা কথা তোলেন। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল, মেয়েদের অবরোধ-প্রথায় বন্দী রাখার পক্ষপাতী। তাঁর বাড়ির অন্দরমহলে কোনোদিন যাননি গদাধর। দুর্গাদাস সীতানাথকে কটু কথাও শোনালেন গদাধর সীতানাথের বাড়ির ভিতর যায় বলে। দুর্গাদাস এমন অহঙ্কারও করেন যে তাঁর বাড়িতে তিনি কোনো অনাচার সইবেন না এবং গদাধরের সাধ্য নেই তাঁর বাড়ির অন্দরমহলে ঢোকার। কাকপক্ষীও আমার বাড়ির মেয়েদের মুখ দেখতে পাবে না।

সব কথা শুনে হাসতেন সীতানাথ পাইন। ভাইকে বলতেন, গদাধরের কথা বলছ? সে যে অকলঙ্ক চন্দ্র। তার গুণের অন্ত নেই। প্রথম গুণ তার চরিত্রের স্বচ্ছ নির্মলতা। মূর্ত বালক সে। কেন মিছে রাগ করছ দুর্গা?

পাড়ার লোকরাও দুর্গাদাসকে বুঝিয়েছিল। বলেন কি দাদা, ঐ গদাধরের নামে কুকথা বলতে প্রবৃত্তি হল আপনার? ওর মনে যে কোনো দাগ নেই। এই দেখুন, আমার বাড়িতেই তিনদিন কাটিয়ে গেছে সে গতমাসে। তিনটি দিন যেন স্বর্গ নেমে এসেছিল ঘরে। তার কথা শুনে মন ভরে গেছে আমাদের। আর একজন বলল, এই তো গত পক্ষে গদাধর দুদিন কাটিয়েছে আমাদের ঘরে। আনন্দ-বাজার বসে গিয়েছিল। সে চলে গেলে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। ওর জন্য প্রাণ কাঁদে সবসময়। আর একজন বলল, গদাইকে পেলে পুত্রশোক ভুলে যায় মানুষ।

দুর্গাদাস গদাধরকে অশ্রদ্ধা করেননি। কিন্তু অবরোধ-প্রথা সম্পর্কে তাঁর মতের বদল নেই।

গদাধর নিজেই একদিন তাঁর কাছে গেল। দুর্গাদাস একজন আত্মীয়ের কাছে আত্মমত সমর্থন করছিলেন—অবরোধ-প্রথার গুণ গাইছিলেন। গদাধর কাছে বসে সব কথা শুনল। তারপর বলল: এভাবে মেয়েদের ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে কি তাদের রক্ষা করা যায়? বরং তাদের সৎ শিক্ষা দিলে ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবেই তারা সব বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আমি তো ইচ্ছা করলেই আপনার অন্দরে ঢুকে আপনার ঘরের মেয়েদের দেখে আসতে পারি। আপনার ঘরের সব কথা জেনে আসতেও পারি। দুর্গাদাস অহংকার প্রকাশ করলেন। বললেন: ইস, কেমন জানতে পারিস, জান দেখি। গদাধর মুচকি হেসে বলল: বেশ দেখবেন। উঠে চলে গেল সে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দুর্গাদাস বাড়িতেই বসে আছেন। একটি শ্যামাঙ্গী কিশোরী, মোটা ময়লা শাড়ি পরা, রুপার পৈঁছে আছে, মুখ ঘোমটায় ঢাকা, কাঁখে একটা চুবড়ি, তাঁতি মেয়ে সে—হাটের দিক থেকে এসে দুর্গাদাসের ঘরের সামনে দাঁড়াল। দুর্গাদাস বন্ধুবান্ধবসহ বসেছিলেন, গদাধরের স্পর্ধিত চ্যালেঞ্জের কথাই বলাবলি করছিলেন। মেয়েটি অসহায় মিষ্ট কণ্ঠে বলল: সুতো বেচতে হাটে গিয়েছিলুম। আমার সুতো বেচতে দেরী হয়ে গেল। সাঙ্গনা মেয়েরা আমার দেরি দেখে গাঁয়ে ফিরে গেছে। এখন রাতে এত পথ একা হেঁটে ফিরতে ভয় করছে আমার। রাতের মতো থাকার একটু ঠাঁই দেবেন আমায়?

সেকালের গৃহস্থরা আশ্রয়প্রার্থীকে বিমুখ করতেন না। তায় মেয়ে। তায় অল্পবয়সী। তাঁতি মেয়ের প্রার্থনা মঞ্জুর হল। তবু দুর্গাদাস জানতে চাইলেন কোন গ্রামে তার বাস, বাবার নাম কী ইত্যাদি। ঠিক ঠিক উত্তর দিল মেয়ে। দুর্গাদাস বললেন: তাহলে বাড়ির ভিতর অন্দরমহলে যাও মা। সেখানে থাকো গে আজকের রাতটুকু।

মেয়েটি সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রণাম করল দুর্গাদাসকে। ভিতরে চলে গেল। অন্দরমহলেও বাড়ির মহিলাদের কাছে একই আত্মপরিচয় দিল সে। মেয়েদের অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ চোখেও ঐ তাঁতি মেয়ের শ্রী, চালচলন, সজ্জা ও বাগভঙ্গীতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়ল না। আগন্তুক অসহায়া কিশোরীর প্রতি সবার সহানুভূতি ও মমত্ব জন্মাল। তারা তাকে যত্ন করে বসাল, রাত্রে কোথায়

শোবে সে স্থান ঠিক করে দিল, সান্ধ্য জলযোগের জন্য দিল মুড়ি মুড়কি। তাঁতি মেয়ে মুড়িমুড়কি খাচ্ছে আর শুনছে মেয়েদের সব কথা, খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে তাদের। প্রতিটি ঘরের ভিতরে চলে যাচ্ছে তার দৃষ্টি। মেয়েদের কথায় সেও যোগ দিতে লাগল, কিছু কিছু প্রশ্নও করল, জেনে নিল পাইন-পরিবারের অন্তঃপুরের কথা। তার সে সব প্রশ্ন এতটুকু অসঙ্গত হয়নি, তার কৌতুহল কারও কাছে বাড়াবাড়ি বা আপত্তিকর মনে হয়নি, বিরক্ত বা সতর্ক হয়নি কেউ—হওয়ার কথা মনেই হয়নি। তাঁতি মেয়ে গল্প জানে, গান জানে, আর মিষ্ট শান্ত কোমল স্বভাবা সে—মন জয় করে নিয়েছে পাইন পরিবারের।

এদিকে রাত বাড়ছে। গদাধর ফেরেনি ঘরে। চন্দ্রা ঘর-বাহির করছেন। কোথা গেল গদাই। রামেশ্বরকে পাঠালেন খোঁজ করতে। চন্দ্রা জানেন গদাই সীতানাথ পাইনের বাড়ি প্রায়ই যায়। সেখানেই পাঠালেন রামেশ্বরকে। রামেশ্বর গিয়ে শুনলেন, না, সীতানাথের বাড়ি সেদিন আসেনি গদাই। তাহলে? বণিকপাড়া থেকে বেরোবার সময় রামেশ্বর 'গদাই গদাই' বলে ডাকতে লাগলেন উচ্চকণ্ঠে। দুর্গাদাসের বাড়ির সামনে ঐভাবে তিনি ডাকতে ডাকতে যাচ্ছেন। তাঁর ডাক পৌঁছেছে দুর্গাদাসের বাড়ির অন্দরমহলে। অমনি তাঁতি মেয়ে ভুলে গেল পরিবেশের কথা। রামেশ্বরের ডাকে সে সাড়া দিয়ে উঠল : দাদা, যাচ্ছি গো। বলতে বলতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল দ্রুত পায়ে। রামেশ্বর তাকে দেখেই চিনলেন। বললেন : তুই এ বেশে?

দুর্গাদাস পাইন ও তাঁর বন্ধুরাও চিনলেন তাদের সকলকে ঠকিয়েছে গদাধর। মুখ নিচু করলেন দুর্গাদাস। হেরে গিয়েছেন তিনি। চূর্ণ হয়েছে তাঁর অহঙ্কার। বন্ধুদের কাছে মান খোয়া গিয়েছে উপরন্তু তার অন্তঃপুরে বাইরের পুরুষ ঢুকেছে। রুষ্ট হলেন দুর্গাদাস। কিন্তু হেসে ফেললেন পরক্ষণে। উঃ কী সাজই করেছে গদাধর! কী অভিনয়! নিখুঁত। মেয়েদের চোখকেও দিব্য ফাঁকি দিতে পারল সে!

পাড়ায় এ খবর রটে গেলে উঠল হাস্যরোল। প্রচুর হাসলেন সীতানাথ। হাসল বণিক পাড়ার মেয়েরা প্রাণ খুলে। আর ঐ সামান্য সঙ্গ লাভে গদাইকে কী যে ভালোবেসে ফেলল দুর্গাদাসের পরিবারের মেয়েরা যে তারপর থেকে সীতানাথের অন্তঃপুরে এসে তারা মিলতে লাগল তার সঙ্গে। গদাই হল তাদেরও চোখের মণি।

তাঁতি মেয়ের ভূমিকায় নিপুণ অভিনয়শিল্পীর মতো গদাধরের অভিনয়—

তা কি সত্যই অভিনয় ছিল? কাছে বসেও মেয়েরা কেন অভিনয়কলার মর্মচ্ছেদ করতে পারেনি? যোগমায়া এভাবেই ব্যবস্থা করে দেন। নারায়ণের ইচ্ছা পালনে সদা তৎপরা যোগমায়া ভেলকি লাগিয়ে দেন। সে ভেলকি ধরে কার সাধ্য। প্রভুও জীবের অহঙ্কার বিনাশক। তিনি আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁকে রুখবে কে? রামকৃষ্ণ চির দুর্নিবার।

সীতানাথ পাইনের ঘরে গদাধরের বহু অপরূপ লীলা হয়েছিল। পাইন পাড়ার মেয়েরা একদিন গদাধরকে না দেখলে পাগল হত। ডেকে আনত তাকে লোক পাঠিয়ে। অন্তত চন্দ্রার কাছ থেকে শুনে আসত তার সুস্থতার সংবাদ। গদাধর সীতানাথের বাড়িতে বসে রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ ও গান করত। করতে করতে তার ভাব হত। তার ভাবাবেশে মেয়েরা মুগ্ধ হয়ে যেত। ভক্তিতে প্রণাম করত তাকে। পূজা করত। তারা স্থির জেনেছিল গদাধরই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ। তারা তাকে সোনার বাঁশি গড়ে দিয়েছিল। আর দিয়েছিল অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ। সীতানাথের মেয়ে রুক্মিণীর বয়স যখন ষাট তখন রামকৃষ্ণানন্দ ও সারদানন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। রুক্মিণী তাঁদের বলেছিলেন: গদাইয়ের প্রতিটি কথা আমাদের অমৃতের মতো মনে হত। যেদিন সে আমাদের বাড়ি আসত না সেদিন তার কথা নিয়েই আমরা দিন কাটাতাম।

ধন্য কামারপুকুরের পল্লীবালারা। নিজ নিজ প্রাণ তারা কতদিন আগেই দিয়েছে রামকৃষ্ণকে। কেউ তাদের শেখায়নি, বোঝায়নি—কেবল সহজবোধে ও প্রেমে তারা ভগবানের কিশোর লীলার সঙ্গিনী হয়ে গিয়েছিল।

শুধু পাইন পাড়াই বা কেন। গোটা কামারপুকুরের সব পুরুষ ও মেয়েই ভালোবাসত গদাধরকে। সে ছিল সবার মাথার মণি। অভিভাবক দাদা রামেশ্বর (কেননা রামকুমার তখন কলকাতায় চলে গিয়েছেন) ভাবতেন, সবাই যখন গদাইকে এত ভালবাসে তখন বুঝতে হবে যে তার চরিত্র সৎ। সবাইয়ের সে পরমাত্মীয় হয় কিভাবে যদি স্বভাবে সে উদার না হয়। রামেশ্বর তাই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন

গদাধর কিন্তু লেখাপড়ায় উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চোখের সামনে ভাসত বাবার আদর্শ। তিনি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু সেই সঙ্গে ছিলেন সৎ, সদাচারনিষ্ঠ, ধার্মিক, বৈরাগ্যবান, ঈশ্বর ভক্ত। আর এখন বড় হয়ে গদাধর যেসব পণ্ডিত ও ভট্টাচার্যদের দেখছে তারা ধনস্পৃহা ও বিষয়ভোগে

শোবে সে স্থান ঠিক করে দিল, সান্ধ্য জলযোগের জন্য দিল মুড়ি মুড়কি। তাঁতি মেয়ে মুড়িমুড়কি খাচ্ছে আর শুনছে মেয়েদের সব কথা, খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে তাদের। প্রতিটি ঘরের ভিতরে চলে যাচ্ছে তার দৃষ্টি। মেয়েদের কথায় সেও যোগ দিতে লাগল, কিছু কিছু প্রশ্নও করল, জেনে নিল পাইন-পরিবারের অন্তঃপুরের কথা। তার সে সব প্রশ্ন এতটুকু অসঙ্গত হয়নি, তার কৌতুহল কারও কাছে বাড়াবাড়ি বা আপত্তিকর মনে হয়নি, বিরক্ত বা সতর্ক হয়নি কেউ—হওয়ার কথা মনেই হয়নি। তাঁতি মেয়ে গল্প জানে, গান জানে, আর মিষ্ট শান্ত কোমল স্বভাবা সে—মন জয় করে নিয়েছে পাইন পরিবারের।

এদিকে রাত বাড়ছে। গদাধর ফেরেনি ঘরে। চন্দ্রা ঘর-বাহির করছেন। কোথা গেল গদাই। রামেশ্বরকে পাঠালেন খোঁজ করতে। চন্দ্রা জানেন গদাই সীতানাথ পাইনের বাড়ি প্রায়ই যায় সেখানেই পাঠালেন রামেশ্বরকে। রামেশ্বর গিয়ে শুনলেন, না, সীতানাথের বাড়ি সেদিন আসেনি গদাই। তাহলে? বণিকপাড়া থেকে বেরোবার সময় রামেশ্বর 'গদাই গদাই বলে ডাকতে লাগলেন উচ্চকণ্ঠে। দুর্গাদাসের বাড়ির সামনে ঐভাবে তিনি ডাকতে ডাকতে যাচ্ছেন। তাঁর ডাক পৌঁছেছে দুর্গাদাসের বাড়ির অন্দরমহলে। অমনি তাঁতি মেয়ে ভুলে গেল পরিবেশের কথা। রামেশ্বরের ডাকে সে সাড়া দিয়ে উঠল: দাদা, যাচ্ছি গো। বলতে বলতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল দ্রুত পায়ে। রামেশ্বর তাকে দেখেই চিনলেন। বললেন: তুই এ বেশে?

দুর্গাদাস পাইন ও তাঁর বন্ধুরাও চিনলেন তাদের সকলকে ঠকিয়েছে গদাধর। মুখ নিচু করলেন দুর্গাদাস। হেরে গিয়েছেন তিনি। চূর্ণ হয়েছে তাঁর অহঙ্কার। বন্ধুদের কাছে মান খোয়া গিয়েছে উপরন্তু তাঁর অন্তঃপুরে বাইরের পুরুষ ঢুকেছে। রুষ্ট হলেন দুর্গাদাস। কিন্তু হেসে ফেললেন পরক্ষণে। উঃ কী সাজই করেছে গদাধর! কী অভিনয়! নিখুঁত। মেয়েদের চোখকেও দিব্য ফাঁকি দিতে পারল সে!

পাড়ায় এ খবর রটে গেলে উঠল হাস্যরোল। প্রচুর হাসলেন সীতানাথ। হাসল বণিক পাড়ার মেয়েরা প্রাণ খুলে। আর ঐ সামান্য সঙ্গ লাভে গদাইকে কী যে ভালোবেসে ফেলল দুর্গাদাসের পরিবারের মেয়েরা যে তারপর থেকে সীতানাথের অন্তঃপুরে এসে তারা মিলতে লাগল তার সঙ্গে। গদাই হল তাদেরও চোখের মণি।

তাঁতি মেয়ের ভূমিকায় নিপুণ অভিনয়শিল্পীর মতো গদাধরের অভিনয়—

তা কি সত্যই অভিনয় ছিল? কাছে বসেও মেয়েরা কেন অভিনয়কলার মর্মচ্ছেদ করতে পারেনি? যোগমায়া এভাবেই ব্যবস্থা করে দেন। নারায়ণের ইচ্ছা পালনে সদা তৎপরা যোগমায়া ভেলকি লাগিয়ে দেন। সে ভেলকি ধরে কার সাধ্য। প্রভুও জীবের অহঙ্কার বিনাশক। তিনি আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁকে রুখবে কে? রামকৃষ্ণ চির দুর্নিবার।

সীতানাথ পাইনের ঘরে গদাধরের বহু অপরূপ লীলা হয়েছিল। পাইন পাড়ার মেয়েরা একদিন গদাধরকে না দেখলে পাগল হত। ডেকে আনত তাকে লোক পাঠিয়ে; অন্তত চন্দ্রার কাছ থেকে শুনে আসত তার সুস্থতার সংবাদ। গদাধর সীতানাথের বাড়িতে বসে রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ ও গান করত। করতে করতে তার ভাব হত। তার ভাবাবেশে মেয়েরা মুগ্ধ হয়ে যেত। ভক্তিতে প্রণাম করত তাকে। পূজা করত। তারা স্থির জেনেছিল গদাধরই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ। তারা তাকে সোনার বাঁশি গড়ে দিয়েছিল। আর দিয়েছিল অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ। সীতানাথের মেয়ে রুক্মিণীর বয়স যখন ষাট তখন রামকৃষ্ণানন্দ ও সারদানন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। রুক্মিণী তাঁদের বলেছিলেন: গদাইয়ের প্রতিটি কথা আমাদের অমৃতের মতো মনে হত। যেদিন সে আমাদের বাড়ি আসত না সেদিন তার কথা নিয়েই আমরা দিন কাটাতাম।

ধন্য কামারপুকুরের পল্লীবালারা। নিজ নিজ প্রাণ তারা কতদিন আগেই দিয়েছে রামকৃষ্ণকে। কেউ তাদের শেখায়নি, বোঝায়নি—কেবল সহজবোধে ও প্রেমে তারা ভগবানের কিশোর লীলার সঙ্গিনী হয়ে গিয়েছিল।

শুধু পাইন পাড়াই বা কেন। গোটা কামারপুকুরের সব পুরুষ ও মেয়েই ভালোবাসত গদাধরকে। সে ছিল সবার মাথার মণি। অভিভাবক দাদা রামেশ্বর (কেননা রামকুমার তখন কলকাতায় চলে গিয়েছেন) ভাবতেন, সবাই যখন গদাইকে এত ভালবাসে তখন বুঝতে হবে যে তার চরিত্র সৎ। সবাইয়ের সে পরমাত্মীয় হয় কিভাবে যদি স্বভাবে সে উদার না হয়। রামেশ্বর তাই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন

গদাধর কিন্তু লেখাপড়ায় উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চোখের সামনে ভাসত বাবার আদর্শ। তিনি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন—কিন্তু সেই সঙ্গে ছিলেন সৎ, সদাচারনিষ্ঠ, ধার্মিক, বৈরাগ্যবান, ঈশ্বর ভক্ত। আর এখন বড় হয়ে গদাধর যেসব পণ্ডিত ও ভট্টাচার্যদের দেখছে তারা ধনস্পৃহা ও বিষয়ভোগে

মত। তাহলে বিদ্যার দাম কী? বাবার আদর্শের নিরীখে বিচার করে সে পণ্ডিত-বিদ্বানদের নাকচ করে দিল। ওঁদের মতো সে হবে না। সে দেখল ওঁদের পাণ্ডিত্যের উদ্দেশ্য অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন। আবার কামনা পূরণে বাধা পেলে ওঁদের দুঃখের সীমা থাকে না। তখন পাণ্ডিত্য তাঁদের বাঁচায় না। নিত্য-অনিত্য বোধ তাঁদের নেই। পাণ্ডিত্য নিত্য-অনিত্য বোধ দেয় না, বিচার-বিবেক দেয় না, দেয় শুধু ভোগাসক্তি। তাই পাণ্ডিত্য নিরর্থক।

তবু গদাধর পাঠশালা ছাড়েনি। বাংলা বই সে পড়ত। ধর্মগ্রন্থ সে এত সুন্দর প্রাণস্পর্শীভাবে পাঠ করত যে যে শুনত সেই মুগ্ধ হত। গ্রামেরা লোকরা জমাট বেঁধে বসত তার পাঠ শুনতে। আমন্ত্রণ করে আনত তাকে নিজ নিজ বাড়িতে। সে পাঠ করত ভক্তি-উপাখ্যান—প্রহ্লাদচরিত, ধ্রুবোপাখ্যান, রামায়ণ মহাভারত, তারকেশ্বর শিবের আত্মপ্রকাশ কাহিনী, বিষ্ণুপুরের আনন্দমোহন জীউর উপাখ্যান ইত্যাদি। যেসব পুঁথির সে অনুলিপি করেছিল সে পুঁথিগুলিও ছিল তার পাঠের বিষয়।

রামকুমারের বিয়ে ক্ষুদিরামই দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন মেজো রামেশ্বরের বয়স হল বাইশ ও ছোট বোন সর্বমঙ্গলার বয়স হল নয়। রামকুমার এদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করলেন। কাছেই গৌরহাটি গ্রামের রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন শাকম্ভরীর সঙ্গে বিয়ে হল রামেশ্বরের। আর পালটি বিয়ে হল সর্বমঙ্গলার সঙ্গে রামসদয়ের। পালটাপালটি ব্যবস্থায় পণ লাগল না। এ বিয়ে হল ১২৪৮ সালে।

রামকুমারের এতদিন কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। সকলেই ধরে নিয়েছিল, তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা। রামকুমারও বলেছিলেন যে গর্ভ ধারণ করলেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হবে। এই বলার পিছনে একটু ইতিহাস আছে।

রামকুমার শাস্ত্র পড়েছিলেন। তিনি স্মৃতির বিধান দিতেন ও শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতেন। তিনি আদ্যা শক্তির উপাসনা করতেন। গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধনভজন করতেন—তিনি ছিলেন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। ইষ্টপূজা করার সময় একদিন তাঁর অনুভব হয় যে ইষ্ট দেবী নিজের আঙুল দিয়ে তাঁর জিভের আগায় মন্ত্রবর্ণ লিখে দিচ্ছেন যাতে জ্যোতিষ বিদ্যায় তাঁর সিদ্ধি হয়। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কাজেও রামকুমার দৈবী শক্তি পান।

এই সব ক্ষমতা বলে কোনো রোগীকে দেখলেই রামকুমার বলে দিতে পারতেন যে সে বাঁচবে কিনা এবং তাঁর কথা ছিল অব্যর্থ। ভবিষ্যৎ বলতে

পারেন বলে রামকুমারের খ্যাতি হয়েছিল। লোকে কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখাতে নিয়ে যেত রামকুমারকে। তিনি ঐ ব্যক্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন করতেন। স্বস্ত্যয়ন-বেদীতে শস্য ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বলতেন যে ঐ শস্যবীজে অঙ্কুর উঠলেই রোগী বাঁচবে। তাই হত।

রামকুমার একবার এসেছেন কলকাতায়। গঙ্গায় স্নান করছেন। একজন ধনী ব্যক্তি সপরিবারে তখন গঙ্গায় স্নান করতে এসেছিলেন। উনিশ শতকের কলকাতার বাবুদের রীতি ছিল, বাবুদের বউরা গঙ্গায় নাইতেন পালকি চড়েই—পালকি শুদ্ধ তাদের ডুব দিয়ে নেওয়া হত, নইলে আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হত। উক্ত বাবুর স্ত্রী অমনি পালকিতে বসেই স্নান করছিলেন। স্ত্রীটি পরমাসুন্দরী যুবতী।

রামকুমার গ্রাম্য মানুষ, কলকাতার ধরণ ধারণ জানেন না, বিশেষত বাবু কালচারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই। পাড়া গাঁয়ে মেয়েদের পর্দা প্রথা ছিল না, সব ছিল খোলামেলা ব্যাপার। পালকিতে চড়েই গঙ্গাস্নান রামকুমারের কাছে অপূর্ব দৃশ্য, কৌতুককরও। তিনি অবাক হয়ে দেখছেন— হঠাৎ পালকির ঈষৎ খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে যুবতীর মুখকমল দেখতে পেলেন তিনি। দেখেই বুঝতে পারলেন অমন সজীব সুন্দরী ভাগ্যবতী যুবতীটি মৃত্যুগ্রাসিত হয়েছে—তার আয়ু নিঃশেষ। মর্মাহত হলেন রামকুমার, অজ্ঞানিতে আক্ষেপোক্তি করে বসলেন: আহা! আজ এত ঢেকেঢুকে যাকে স্নান করাচ্ছে, আগামী কালই বহু লোকের সামনে তাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেবে।

বাবু শুনে ফেললেন কথাটি। বললেন: ঠাকুর মশাই, আপনার কথা সত্য কিনা দেখতে চাই। আপনি আমার বাড়ি চলুন। একটি দিনের ব্যাপার তো, চলুন। বাবু ভাবছেন, কথা তো সত্য হবেই না—কেননা তার স্ত্রী সম্পূর্ণ নীরোগ। ঠাকুর মশাইকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেবেন। সরল রামকুমার এতটা বোঝেন নি। তাঁর নিজের দর্শন সত্য হয় কিনা তা জানার কৌতূহলও তাঁর ছিল। তিনি বাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ি গেলেন, থাকলেন সেখানে সেদিন।

বউটি পরদিনই মারা যায়। রামকুমার যেমনটি বলেছিলেন, তাই হল। পরদিন মৃতার শরীর গঙ্গাস্নান করাতে পালকির দরকার হয় নি। খোলা আকাশের নিচে বহুজন সমক্ষে তার গঙ্গাপ্রাপ্তি করানো হয়। বাবু রামকুমারের পায়ে নত হয়ে বলেন: আমায় ক্ষমা করুন। সম্মানিত করেন তিনি রামকুমারকে দ্রব্যাদি দানে।

রামকুমারের বিয়ে হয়েছিল ১৮২০ খ্রীঃ—গদাধরের জন্মের ষোলো বছর আগে। স্ত্রী কাত্যায়নীর বয়স তখন সাত। রূপবতী, সুলক্ষণা কন্যা। সে বালিকা এখন কত বড় হয়েছে, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স। এতদিন তার ছেলেমেয়ে না হওয়ায় রামকুমার নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। যাক, ফাঁড়া কেটে গেল।

কিন্তু কাটল না। এই বয়সে কাত্যায়নী প্রথম গর্ভবতী হলেন। হয়েই তাঁর স্বভাব পালটে যেতে লাগল। হাসিখুশি, শাশুড়ীর আহ্লাদী বৌমাটি যেন মনের ভারসাম্য হারালেন। রুক্ষ, কোপনস্বভাবা হয়ে উঠলেন তিনি। হয়ে উঠলেন অবুঝ। বাড়ির নিয়ম ছিল, রোগী ও বালক-বালিকা ছাড়া আর কেউ রঘুবীরের পূজা সমাপ্ত হওয়ার আগে জলগ্রহণ করবে না। এতদিন কাত্যায়নী ঐ নিয়ম কখনো ভাঙেননি। এখন ভাঙতে লাগলেন। খেতে লাগলেন সবার আগে, যখন তখন। মনে উৎকণ্ঠা জাগল সবার—অমঙ্গল হবে যে এতে! কাত্যায়নীকে বুঝিয়ে নিরস্ত করতে চাইলেও কারও কোনো কথায় কাণ দিতেন না তিনি। বরং ছোট ছোট ছলছুতোয় তিনি বিবাদ বাধাতে লাগলেন সবার সঙ্গে। শাশুড়ী চন্দ্রাদেবীকেও রেয়াৎ করলেন না। তিক্ত, রুক্ষ, বিরক্ত কাত্যায়নী যেন মনোমালিন্যই চাইছেন। সাত বছরে এসেছিলেন—তিনি তো এ বাড়িরই মেয়ে, শুধু তো বউ নন। ভুলে গেলেন সেসব কথা। শাশুড়ি তাঁকে কত ভালোবেসে এসেছেন, দেওররা কত মানে তাঁকে—সেসব কথা ভুলতে চাইলেন কাত্যায়নী, মনোমালিন্যই যেন কাঙ্ক্ষিত তাঁর! মেয়ের মতো কাত্যায়নী চন্দ্রার কাছে—কত বোঝালেন তিনি। বোঝালেন রামকুমার। ফল হল না। ওঁরা ভাবলেন, বেশি বয়সে গর্ভধারণে খিটখিটে হয়েছে বউ—তা কী আর করা! কাত্যায়নীর আচরণ মেনে নিলেন সবাই। তবু যেন অশান্তির ঝলক লাগল শান্তির সংসারে।

আশ্চর্য এই যে রামকুমারের আয়-উপার্জনও ঐ সময় পড়ে গেল, ভেঙে গেল স্বাস্থ্যও। বালিকা কাত্যায়নী যখন ঘরে এসেছিল বধূ রূপে তখন রামকুমারের আয় বেড়েছিল ক্রমাগত—লক্ষ্মীমন্ত ছিল বউটি। আজ চাকা ঘুরেছে উল্টো দিকে। রামেশ্বরের বিয়ে হয়েছে, সংসারে বেড়েছে লোক, কিন্তু আয় কমে গেল। রামেশ্বর লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু উপার্জনক্ষম হয়নি। রামকুমার আয় বাড়াবার নানা কথা ভাবলেন, চেষ্টাও করলেন, সফল হলেন না। দুশ্চিন্তা গ্রাস করল তাঁকে। তিনি বুঝলেন, দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসছে। স্ত্রী যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নেবে সংসার থেকে লক্ষ্মীশ্রী।

১৮৪৯ সালে কাত্যায়নী রূপবান এক পুত্র প্রসব করলেন। কিন্তু সূতিকাগৃহ থেকে আর বেরোলেন না কাত্যায়নী। মৃত্যু হল তাঁর। মাতৃহীন এই শিশুর নাম হয়েছিল অক্ষয়। অক্ষয়ের নামকরণটিও যেন হল ছন্নছাড়া রকমের। পরিবারের সবার নাম 'রাম' যুক্ত—কেবল অক্ষয়ের তা হল না। এবং সে অক্ষয়ও হয়নি, যৌবনসমাগমেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছিল। মারা গিয়েছিল আঠারো বছর বয়সে। তার বাল্যেই সে তার বাবাকেও হারিয়েছিল।

দুর্ভাগ্যের শিশু অক্ষয় যে যখন এল তখন বাবা রামকুমারের আয় মন্দ; ঋণজাল বাড়ছে, গ্রামে বসে আয় বাড়াবার আর কোনো পথ নেই। বন্ধুরা বললেন, বিদেশে যাও—কলকাতায় যাও। কামারপুকুরে আর তিষ্ঠোতে পারছিলেন না রামকুমার। পত্নীর কথা মনে পড়ে। সর্বত্রই তাঁর ছায়া। ঘরে-দুয়ারে তাঁরই স্মৃতি রয়েছে অনুলেপিত হয়ে। উনত্রিশ বছরের জীবনসঙ্গিনী। বড় ভালোবাসতেন তাঁকে রামকুমার। তাই এখন বাড়ি ছেড়ে পালাতে চাইলেন তিনি। দূরে গেলে যদি ভোলা যায়।

যাওয়া যায় বর্ধমানে, যাওয়া যায় কলকাতায়। কিন্তু কলকাতাই ভালো। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতা। কত লোক, কত ধন, কত শ্রী। বিদ্যা-পাণ্ডিত্যেরও আদর আছে সেখানে। সাহেবরাও সংস্কৃত চর্চা করে! কেন, শোনোনি যে শিওড়ের মহেশ চাটুজ্যে, দেশড়ার রামধন ঘোষ কলকাতায় গিয়ে ভাগ্য ফিরিয়েছেন। এখন তাঁদের বাড়ি দেখে এসো, কী শ্রী! ওঁরা তো তোমারও চেনা লোক রামকুমার! বন্ধুরা বোঝাতে থাকলেন—তা সত্যি কথাই বলব, জ্ঞানে-বিদ্যায় বুদ্ধিতে-চরিত্রে ওঁরা তো তোমার কাছে লাগেই না। তুমি ওঁদের চেয়ে অনেক গুণী, অনেক বড় রামকুমার।

কে বড় কে ছোট সে কথা থাকুক। রামকুমার সিদ্ধান্ত করলেন, সংসারের দায়িত্ব কাঁধে যখন আছে আয় বাড়াতে হবেই। কাত্যায়নীর স্মৃতিও যে সহ্য করতে পারি না এখানে। তিনি কলকাতায় গেলেন। রামেশ্বরকে করে দিয়ে গেলেন পরিবারের অভিভাবক।

এ বৃদ্ধ বয়সে চন্দ্রার ঘাড়ে আবার চেপে বসল সংসারের জোয়াল। মেজো বৌমা বড় ছোট বালিকা তো। সে কী করবে। বাড়িতে দ্বিতীয় মেয়ে নেই—সর্বমঙ্গলাও চলে গিয়েছে শ্বশুর বাড়ি। মাতৃহীন অক্ষয়ের লালন পালন এক নতুন কাজ! রান্না, শিশুপালন, রঘুবীরের সেবা সবই চন্দ্রার কাজ

এখন! বয়স হল উনষাট। সংসার ছিল কাত্যায়নীর—এখন এ বয়সে সে সংসারের পুরো ভার বওয়া কঠিন। তবু চন্দ্রা ভাবেন, রঘুবীরের যখন এই-ই ইচ্ছা, সে ইচ্ছাকে অমান্য করি কী করে।

কিন্তু মায়ের অত কষ্ট হবে কেন গদাইয়ের মতো পুত্র থাকতে। সে যে সবার আগে মায়ের কষ্ট বুঝে নেয়। আর ছেলে হলেও সে মেয়ের চেয়ে কিছু কম নয়। সংসারের সব কাজ জানে সে, পারে। রঘুবীরের সেবা পূজা তো সে অনেকদিন আগে থেকেই করে আসছে। আর শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের লালন-পালন যেন তার স্বভাবসিদ্ধ কাজ। অক্ষয় কি মা হারিয়েছে, না ছোট কাকার মধ্যে মাকেই ফিরে পেয়েছে সে? অক্ষয় কি দুর্ভাগা, না কি পরম সৌভাগ্যবান? কাত্যায়নীর কোল পায়নি সে, কিন্তু স্বয়ং নারায়ণের কোলে চড়ে বসেছে। আর গদাধর স্ত্রী না পুরুষ তা কি কেউ ঠিকভাবে নির্ণয় করতে পেরেছে? সে যে কখনো পুরুষ, কখনো পরমা জননী। হয়তো অক্ষয়ের নামকরণ অতি সার্থক—তার বাবার দৈবীকৃপাপ্রাপ্ত দৃষ্টিতে অক্ষয়ের স্বর্ণোজ্জ্বল ললাটলিখন উদ্ভাসিত হয়েছিল। জীবনের উষা কালেই সে তার কর্মফল খণ্ডন ক্ষয় করে অক্ষয় পরম পদে চলে যাবে এবং তার মৃত্যুতে স্বয়ং অক্ষয়পুরুষ কাঁদতে থাকবেন—গামছা নিংড়ানো আকুল কান্না সে! অক্ষয়ের সৌভাগ্যের সীমা নেই।

রামেশ্বর সংস্কৃত বিদ্যা শিখেছিলেন ১৮৫০ সাল—ভারতে ইংরেজ শাসনের মধ্যভাগ। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতীয় শাস্ত্র উদ্ধার, সংস্কৃত গ্রন্থাদির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ ও তাতে পাশ্চাত্যে সংস্কৃত বিদ্যায় উৎসাহ আগ্রহ সঞ্চার, বড় বড় ইংরেজ সাহেবের সংস্কৃত চর্চা এসবই চলছিল বটে কিন্তু দেশীয় সমাজে সংস্কৃত বিদ্যা আর অর্থকরী ছিল না। টোল চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের আয় ছিল না, সংস্কৃত শিখে সরকারী বেসরকারী অফিসে চাকরি পাওয়া যেত না—তখন ইংরেজি বিদ্যাই গরীয়সী বিদ্যা। রামেশ্বরের আয়ের পথ প্রশস্ত হল না। বিবাহিত ও পরিবারের অভিভাবক তিনি—কিন্তু আয় নেই তাঁর। চিন্তিত হলেন তিনি, কিন্তু দুশ্চিন্তিত নন। দুশ্চিন্তা করা তাঁর ধাতে ছিল না। কোনোদিনই তিনি তেমন উপার্জনশীল হননি। ভ্রমণশীল সাধু ও সাধকদের দেখতে পেলেই তিনি তাঁদের সঙ্গ করতেন, সেবা করতেন সাধ্যের অতিরিক্ত ভাবে। তাতে রামেশ্বরের ঋণ বাড়ত দিন দিন। তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না

তাঁর। রঘুবীর চালিয়ে নেবেন—এই ছিল তাঁর মনোগত বিশ্বাস। ক্ষুদিরামের ছেলে বটে।

রামেশ্বরের অশেষ প্রীতি ও আস্থা ছিল গদাধরের প্রতি। তিনি ছোট ভাইকে আদৌ শাসন করতেন না। গদাই যেমন ধর্মপ্রাণ, নির্মল চরিত্র তার, তাতে কুপথে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভবই নয়—একথা ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলেন রামেশ্বর। সর্বলোকপ্রিয় গদাধরের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এ তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। ফলত গদাধরের ওপর কোনোরকম অভিভাবকত্বই তিনি করেননি।

গদাধরের এখন তেরো বছর বয়স। সে তো সুখলালিত হয়নি, আজন্ম সে অভাব-অনটন জেনেছে। তাই সংসারের বাস্তব রূপ উন্মোচিত হয়েছিল তার কাছে। গোলাপী রঙীন দৃষ্টি ছিল না তার। সে দেখল সংসার স্বার্থের দাস। গ্রামেই দেখা যায় যে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, বিরোধ, মোকদ্দমা লাগে। দড়ি ফেলে দিয়ে বাস্তু ভিটার ও ধানজমির ভাগ করে তারা। বলে : এদিক আমার, ও দিক তোর। কয়দিন পর সে জমি ঘর ফেলে যমের আহ্বানে চলে যায় লোক। গদাধরের ওষ্ঠ প্রান্তে ফুটে ওঠে হাসির রেখা, যদিও মানুষের মূঢ়তায় অন্তরে তার বিষাদ জাগে। ভগবান দুইবার হাসেন, বলেছিলেন রামকৃষ্ণ। একবার হাসেন যখন দড়িদড়া ফেলে জমি ভাগ করে মানুষ, আর বলে এদিক আমার ওদিক তোমার। ভগবান হেসে বলেন, আমার জগৎ, ওরা ভাগ করছে। ভগবান আবার হাসেন যখন ডাক্তার মরণাপন্ন রোগীকে দেখে বলে, ভয় কি, আমি বাঁচিয়ে দেব। ভগবান হেসে বলেন, আমি যাকে মারছি ও তাকে বাঁচিয়ে দেবে!

সংসার চলছে স্বার্থের তাড়নায়। গদাধর দেখে লোকে লেখাপড়া শেখে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু অনেকেই উপার্জন করতে পারে না। তাদের জীবনে আসে দুঃখ ও নৈরাশ্য। আর যারা যথেষ্ট টাকা উপার্জন করে তারাও ভোগ ও দুর্ভোগে মজ্জিত; সত্যলাভ, চরিত্রবল এ ধর্মলাভে তাদের আগ্রহও নেই, সামর্থ্যও নেই। অর্থ অনিবার্যভাবেই আনে অনর্থ—এও গদাধরের চোখ এড়ায়নি।

তাই বাবার আদর্শই সে সার করল। মোটা ভাত কাপড় জুটলেই যথেষ্ট, আর ঈশ্বরে অটল ভক্তি। এ দুটির জন্য পণ্ডিত হওয়া লাগে না। বরং পাণ্ডিত্য সৃষ্টি করে বিড়ম্বনা।

বন্ধুদের টানে গদাধর পাঠশালায় যেত দিনে একবার, কিন্তু পড়ালেখা তার সাঙ্গ হয়ে আসছিল। তাছাড়া বাড়িতে তার অনেক কাজ। মাকে সাহায্য করতে হয় সর্বভাবে। তাতে দুপুর পর্যন্ত সে থাকে বাড়িতেই আটক। আবার দুপুরের পর পাড়ার মহিলারা আসেন চন্দ্রার কাছে। তাঁদের আকর্ষণ গদাধর। তার ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও গল্প সবাই শুনতে চান। শুনিয়ে আনন্দ পায় গদাধর। যদি গদাধর গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকে তবে মেয়েরাই হাতে হাতে সব কাজ করে দেন তার। যাতে সে অবসর পেয়ে পাঠ ও গান করতে পাবে। তাই বাড়িতে নিত্য আসর বসতে লাগল গদাধরের। এত মধুর তাঁর কথা যে তা ফেলে উঠতে চাননা মহিলারা। আমরা আরও বেশি শুনব—একথা ভেবে তাঁরা এখন নিজ নিজ ঘরের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে, স্বামীপুত্রকন্যাদের খাইয়ে দাইয়ে চলে আসেন চন্দ্রার কাছে। হাতে হাতে সেরে দেন তাঁরও কাজ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত একান্ত দক্ষিণেশ্বরের ধন নয়। বহু আগেই তার সূত্রপাত হয়েছিল কামারপুকুরে।

সে সময়ে ঐ ছোট কামারপুকুর গ্রামেই তিনদল যাত্রা, একদল বাউল ও একটি দুটি কবি গানের দল ছিল। তখন বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট থাকায় গ্রামের বৈষ্ণবদের ঘরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভগবত পাঠ ও সংকীর্তন ইত্যাদি হত। গদাধর এসব পালা, গান, পাঠ ও সংকীর্তন আয়ত্ত করে নিয়েছিল। গ্রামের সবটুকু আনন্দের আয়োজন সে নিঃশেষে হজম করে নিয়েছিল। সে ছিল প্রতিভাবান শিল্পী। প্রাপ্ত ধনের সঙ্গে সে যোগ করেছিল নিজের প্রতিভাদীপ্তি। যোগ করেছিল তার ভাবের উপলব্ধি। অসাধারণ হয়ে যেত গান-নাটক-যাত্রাপালা তাঁর কণ্ঠে, ভাবে ও দেহমূর্ছনায়। তেমনটি কেউ কখনো শোনেনি। আর একক কণ্ঠে কত বৈচিত্র্য! যাত্রার পালা, বাউলের গীত, কবির গান, বৈষ্ণবের কীর্তন—এত বৈচিত্র্য দিয়ে সে তার গৃহপ্রাঙ্গনের আসরটি মুখর করে তুলত। যাত্রার পালায় বহু ভূমিকা যথাপযোগী বাচনভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী ও ভাব সহ সে অভিনয় করে যেত। মেয়েরা শুনে কাঁদত, হেসে গড়াত, আনন্দে নেয়ে উঠত। গদাধর যদি আসরে কাউকে বিষণ্ণচিত্ত দেখত তাহলে সেদিন সে সুরু করে দিত সঙের পালা। অথবা গ্রামেরই পরিচিত কারও কারও হাব-ভাব-চলন-বলন নিপুণ অনুকৃতির (mimicry) সাহায্যে এমন ফুটিয়ে তুলত যে হাসির ফোয়ারা ছুটত আসরে। রামকৃষ্ণ কবি। রামকৃষ্ণ আনন্দময় পুরুষ। জগবাসী তা জানার আগে কামারপুকুরবাসীরা তা জেনেছিল।

আবার এতদিনে গয়াধামে ক্ষুদিরামের সেই স্বপ্ন-দর্শনের কথা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। হাউড়েস্বভাবা চন্দ্রামণির বিচিত্র দর্শন-অনুভূতির কথাও জানতে বাকি ছিল না কারও। গদাধরের ভাবাবেশ, সমাধি ইত্যাদিও কত দেখেছে লোকরা। তারপর তার অনুপম চরিত্র, পরমাত্মীয়ের মতো আচরণ, লাবণ্যময় মূর্তি, আনন্দময় ব্যক্তিত্ব—তার শুদ্ধ নির্মলতা! বালগোপালের দিব্য প্রকাশ দেখেছেন তার মধ্যে ধর্মদাস লাহার মেয়ে প্রসন্নময়ী ও আরও কেউ কেউ। কিশোরীরা তাকে দেখত কৃষ্ণস্বরূপ। বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও সাধনা মানুষের মধ্যে দেবতার প্রকাশে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল। সে শিক্ষা ও সংস্কার ক্রিয়াশীল ছিল পল্লীবাসীদের জীবনে। গদাধর সাধারণ মানুষ নয়, দেবসম্ভব, স্বয়ং দেবতা ও ঈশ্বর—কামারপুকুরের লোকেরা সেই কবে সে বিশ্বাস করে বসেছে। কলকাতার মথুরানাথ বিশ্বাস, রামচন্দ্র দত্ত, বলরাম বসু, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক নন। ঈশ্বর স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ম্বেদ্য। তাঁর প্রচারের ঢাকের প্রয়োজন নেই। সূর্য উঠলে সকলেই তা দেখতে পায়—অন্ধ ছাড়া। কামারপুকুরে যে গদাধরকে লোকেরা পেয়েছিল সে সূর্যের প্রথমাভা—অরুণোদয়। স্নিগ্ধ কমনীয় সে দিব্যজ্যোতি।

রামকৃষ্ণ পুরুষ, না, রমণী কে তা বলবে? অন্তরে রমণী বলেই বাইরে পুরুষচিহ্ন রূপে দাঁড়ি রাখতে হয়েছিল কিনা ভাবি। গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে আলাপন কালে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন:

কৃষ্ণের স্বরূপ কহ, রাধিকা স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্বরূপ॥

রামানন্দ এ প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্ব বলতে স্বরচিত একটি গীত গেয়ে উঠলেন:

ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভাব পেষল জানি॥

কৃষ্ণ পুরুষ নন, আমি রাধাও নারী নই। তবু তাঁর ও আমার মন পেষণ করে একীভূত হয়েছে।

এই কথা শোনা মাত্র মহাপ্রভু রামানন্দের মুখ চেপে ধরলেন—পরম সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে!

আলাপ চলল দিন রাত ব্যেপে। রামানন্দ এক প্রার্থনা করলেন অবশেষে। বললেন: এক সংশয় জাগছে আমার হৃদয়ে। প্রথমে তোমাকে দেখেছি সন্ন্যাসী রূপে, এখন তোমাকে দেখছি শ্যাম গোপরূপে:

তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা।
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥
এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥

মহাপ্রভু রহস্য গোপন করার উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি কৃষ্ণে গাঢ় প্রেমবশতই এ রকম দেখছ। স্থাবর-জঙ্গমে শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ হয় মহাভাগবতের দৃষ্টিতে! সব জীবের মধ্যে আত্মারূপ ভগবানকে দেখছ তুমি—তাই আমার মধ্যে তুমি দেখছ কৃষ্ণ, আর সে কৃষ্ণও রাধা-আচ্ছাদিত। রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেমের ফলে যেখানে সেখানে তোমার রাধাকৃষ্ণ স্ফুরণ হচ্ছে।

রামানন্দ মানলেন না একথা। বললেন:

রায় কহে—তুমি প্রভু ছাড় ভারিভূরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥

ধরা পড়ে গিয়ে লাজুক হাসিতে মুখ ভরে মহাপ্রভু:

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা মূর্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥

মহাপ্রভু রামানন্দকে চেতন করালেন। তারপর তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন:

তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন ॥
মোর তত্ত্বলীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে ॥

পরমপুরুষই পরমাপ্রকৃতি। অভিন্ন সত্তা—শুধু উপলব্ধির দুটি দিক। গীতায় কৃষ্ণের উক্তি তিনিই পুরুষোত্তম, তিনিই পরাপ্রকৃতি! যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী। কালী-ব্রহ্ম অভেদ—বলেছেন রামকৃষ্ণ। এবং নিজের কথা তিনি বলেছিলেন, তাঁর মাতৃযোনি। এ এক পুরুষে-নারীতে মিশ্রিত সত্তা—অথবা একই সত্তার একদিকে পুরুষ, অপরদিকে নারী।

গদাধরকে তার গ্রামের লোকজনরাই বুঝে উঠতে পারেনি যে সে পুরুষ

না মেয়ে। দুর্গাদাস পাইনের দোষ নেই, গদাধরের বাড়ির আসরে যে মহিলারা আসতেন তাঁরাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন, গদাই পুরুষ না মেয়ে! গ্রামের মেয়েরা তাকে মেয়েই দেখত—তাই তাদের মনের কথা খুলে বলত তার কাছে, গোপনীয় নারীকথাও। চাইত তার কাছে পরামর্শ—নারীস্থলভ বিষয়েও।

গদাধর নারীর বেশে সাজ্জিতা হয়ে নারীবৎ হয়ে যেত। হয়তো নারী-ভূমিকায় সে অভিনয় করছে—রাধারাণীর ভূমিকায় বা তাঁরই মুখ্যা সখী বৃন্দার ভূমিকায়। গদাধরের হাবভাব, চালচলন, কথাবার্তা, কণ্ঠস্বর অবিকল নারীর মতো হয়ে গিয়েছে। শুধু অভিনয় কালেই নয়। শাড়ি পরিহিতা এক নব কিশোরী কলসী কাঁখে চলেছে হালদারপুকুরে জল আনতে। কত পুরুষের দৃষ্টি তার দিকে—ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি বয়ে যায়। কাঁচা সোনার মতো রঙ। নাকে বেসর দিলে সে শ্রীমতী! মেয়ে বলো পুরুষ বলো গ্রাম্যজনরাই চিনতে পারে না যে সে তাদের আজন্ম পরিচিত গদাই। উত্তরকালে চিনতে পেরেছিলেন শুধু শ্রীশ্রীসারদামাতা। রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ ঘটার পরই তাঁর প্রথম আকুল ক্রন্দনধ্বনিতে তিনি বলেছিলেন : মা কালীগো, আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে গো! রামকৃষ্ণই কালী!

আবার গদাধর রমণীও নয়, রমণীমোহনও নয়। গ্রামে পুরুষদের যত আড্ডা ছিল ভাগবত ইত্যাদি চচার ও সংকীর্তনের, প্রতি সন্ধ্যায় গদাধর সে সব জায়গায় হাজির হত। যে আড্ডায় সে যেদিন যেত সেদিন আনন্দ উছলে উঠত সেখানে। কী যে অঘটন ঘটে যেত কেউ বুঝতনা—শুধু বুঝত গদাধর হাজির থাকলে চাঁদের সেদিন পূর্ণোদয় হবে। প্রেমামৃত লহরী বইবে। গদাধর যেমন প্রাণস্পর্শী ভাবে পাঠ করে, তেমনই তার ভাবময় ধর্মব্যাখ্যা! সংকীর্তনকালে তার ভাবোন্মত্ততা, নতুন নতুন ভাবপূর্ণ আখর দেওয়া. জগৎভুলকারী মধুর মোহন নৃত্য আর সুরের বন্যা ঢালা গান! ধরাতলে কেউ দেখেনি, শোনেনি।

কামারপুকুরের কৈশোর জীবনেই গদাধরের সমাধিমগ্নতা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। শুধু দুএকটি ঘটনা উপলক্ষেই এ সমাধি অবস্থা আসেনি, নিত্যই আসত। বাড়িতে সে এখন পূজক—রঘুবীরের, শীতলার, রামেশ্বর শিবের। সন্ধ্যা-বন্দনা-পূজা-ধ্যানে তার সময় কোথা দিয়ে বয়ে যায় সে জানে না। ঐ সময় হতে লাগল তার ভাব সমাধি বা সবিকল্প সমাধি। তখন তার হয় নানা

দিব্যদর্শন। ভক্তিগীতি ও দেবদেবীস্তোত্র শুনতে শুনতেও তার বাহ্যচেতনা লোপ পেয়ে যেত। তার দেহ হত জড়বৎ। ঐ অবস্থা কাটলে সে বলত গানে বা স্তবে বর্ণিত দেবদেবীর দর্শন হয়েছে তার, লাভ করেছে বিপুল আনন্দ। তার শরীরের বা মনের কোনো হানি হত না এতে। সে হয়ে উঠল সর্বকর্মকুশল ও সদানন্দময়। তার কাজ ও সমাধি যেন হাত ধরাধরি করে চলত—সবটাতেই সে অভ্যস্ত। সবটাই যেন তার ইচ্ছাধীন। তার সূক্ষ্ম দৃষ্টির উন্মোচন ঘটে গিয়েছিল—সে দেখতে পেত এমন সব অবস্থা ও অস্তিত্ব, প্রাকৃত নয়নের যা অগোচর। সে উপলব্ধি করত এমন সব তত্ত্ব যা প্রাকৃত জনের ধারণাগম্য নয়।

হরিবাসর, শিব ও মনসার গাজন, ধর্মপূজা—গ্রামের সব ধর্মানুষ্ঠানেই সমভাবে যোগ দিত গদাধর, ছিলনা কোনো ধর্মভাবের প্রতি তার বিদ্বেষ। গ্রামের পরিবেশও এই উদার ধর্মবোধের অনুকূল ছিল, কোনো ধর্মদ্বেষ ছিল না সেখানে।

গ্রামের ধর্মজিজ্ঞাসুরা গদাধরের কাছে তত্ত্বোপদেশ শুনতে আসতেন। এমনকি তার কাছ থেকে জেনে নিতেন সাধনতত্ত্ব। কিন্তু গদাধরের শত্রুও ছিল গ্রামে। ভণ্ড, ধূর্ত, শঠরা দেখতে পারত না তাকে। কারণ তাদের ছলনা ও মধুমাখা বাক্য ও আচরণ ভেদ করে গদাধর দেখতে পেত তাদের অন্তস্তল। বিষকুম্ভ পয়োমুখম এসব ব্যক্তির মনের দুষ্ট মতলব তাদের মুখের ওপরই বলে দিত গদাধর। তাই সে হয়ে উঠল এদের কোপের পাত্র। গদাধর এদের আচরণ অনুকৃতির সাহায্যে এমন ফুটিয়ে তুলত যে এরা হয়ে উঠত সবার হাসির বিষয়। মানুষের কাছে এভাবে ধরা পড়ে এরা বিপন্ন হত। কিন্তু গদাধরকে আঘাত করা সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে, কেননা বাকি সবাই যে তাকে ভালবাসার রক্ষাকবচে ঘিরে রেখেছে। উপায়ান্তর না থাকায় এই দুষ্টরা এসে গদাধরেরই শরণ নিত। আর শরণাগত মাত্রেরই ওপর ছিল গদাধরের অশেষ করুণা। সে-ই তখন তাদের রক্ষা করত।

এই মানবপটভূমিতেই গদাধর তার জীবনের মিশন অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পেরেছিল। তার জীবনের যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, বিশেষ কাজের জন্যই তার এ জন্ম ও জীবন তা ক্রমে সে অনুভব করতে পারছিল। কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য, মিশন ও কাজ তা নির্দিষ্টভাবে তখন সে বুঝতে পারেনি। কেবল একটা ছবি ফুটে উঠত তার মানসদৃষ্টির সামনে। সে দেখতে

পেত গৈরিক বসনে পবিত্র হেমাগ্নির সামনে সে বসে আছে, হয়তো বা খাচ্ছে ভিক্ষায় সংগৃহীত অন্ন, কিংবা নিঃসঙ্গ সে চলে যাচ্ছে আপন মনে পথে পথে। তার পূর্ণ সন্ন্যাসী-স্বরূপ তার সামনে এসেই দাঁড়াত যেন। কিন্তু তারপরই মনে পড়ত মাকে, চন্দ্রাদেবীকে—তাঁকে ফেলে রেখে কি কোথাও যাওয়া যায়? ঘর-সংসারের দায়িত্ব রয়েছে, তাও তো অস্বীকার করা যায় না। সে ভাবল, সিদ্ধান্ত নেবার ভার নিজের হাতে না নিয়ে ঈশ্বরের হাতে তুলে দেওয়াই ভালো এবং নিজের উচিত সর্বভাবে ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল হওয়া। যদি বুদ্ধি পরামর্শ দেয়, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হও; আর হৃদয় বলে, প্রেমপূর্ণ হও সমদর্শী ও সমব্যথী হও সবার প্রতি—কার কথা তবে শুনব? এ দ্বন্দ্বের সমাধান গদাধর এইভাবে করে নিল যে রঘুবীর যা বলবেন, তাঁর যা আদেশ হবে—তাই-ই করব। ধৈর্য ধরো, এক বগগা হয়ে ভারসাম্যহীন সিদ্ধান্ত কোরো না। ঈশ্বরই পরম জ্ঞানী, তাঁর দেওয়া সমাধানই শ্রেষ্ঠ সমাধান। পক্ষপাতশূন্য হৃদয়-মনে তাঁর বাণী শোনার জন্য অপেক্ষা করো।

গদাধর আসলে মানবসঙ্গ পরিত্যাগী শুষ্ক সন্ন্যাসীর পথ বাতিল করে দিল। মানুষকে সে কখনো ঘৃণা করেনি। সত্যলাভের পথে মানুষ একান্তভাবে বাধা এমন মনে হয়নি তার। কামারপুকুরে যত মানুষ তাকে ভালোবেসেছে তারা কি পারত্যজ্য? কোনো মানুষই কি পরিত্যজ্য? গদাধর মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চিরকালীন উদাসীন হতে পারেনি, চায়নি। এই মানব জগৎই তার জগৎ। ভগবান যখন আসেন তখন তিনি পর্বত নদ-নদী গাছপালা নিয়ে লীলা করতে আসেন না, তিনি মানুষকে নিয়ে লীলা করতে আসেন—রামকৃষ্ণর উক্তি।

স্বামী সারদানন্দের অনুভবে আর একটি অপূর্ব সত্য ধরা পড়েছিল। তিনি এত বড়, এত বীজগর্ভ একটি বাক্য উচ্চারণ করেছেন যে এখানে তা লক্ষ্য না করে পারি না। তিনি লিখেছেন, গ্রামের নরনারীর সঙ্গে গদাধরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাদের গদাধরকে একান্ত আপনজন মনে করা গদাধরের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্বন্ধ—শাশ্বত সম্বন্ধ—স্থাপন করে দেয়। তাদের সুখ দুঃখ সর্বতোভাবে নিজের সুখ দুঃখ বলে মনে করত গদাধর। গদাধর ভাবত এ বর্তমান মর্ত্যসম্বন্ধ সুগভীর দিব্য সম্বন্ধে পরিণত হয়ে যেন চিরকালের জন্য অবিনশ্বর হতে পারে। কামমলিন সম্পর্ক ক্ষণভঙ্গুর, পার্থিব সীমানায় সীমাবদ্ধ। নিষ্কাম প্রেমের সম্পর্ক শাশ্বত—তার লয় ক্ষয় হয় না। ভগবান চান তাঁর

নিজের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আমাদের মতো পার্থিব জনকে তুলে নিতে—জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য যোগ স্থাপন করতে, এ এক আশ্চর্য সংবাদ। জীব ঈশ্বরকে চায় এটা সংবাদ। কিন্তু ঈশ্বরও যে সমভাবে বা ততোধিক ভাবে জীবকে চান—এই-ই জগতের পরমাশ্চর্য সংবাদ।

গদাধরের নিষ্কাম হৃদয়ে ঈশ্বরের এই আদেশ ধ্বনিত হল: নিজের জন্য সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়া—সে তো স্বার্থপরতা; যাতে সব মানুষের কল্যাণ হয় তাই-ই করো।

কিসে কল্যাণ হয়? কে জানে! তা কি কলকাতা মহানগরীতে বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা করে হয়, বড় বড় দলের নেতৃত্ব দিলে হয়, লম্বা-চওড়া তত্ত্বোপদেশ দিলে হয়? গদাধরের মনে কিন্তু এসব কথা ওঠেই নি। তার সরল মনে অন্য কথা ছিল। তার বন্ধুরা বললে, একটা যাত্রা দল খুললে কেমন হয়? গদাধর রাজি। যাত্রা দলের শিক্ষক হল সে। রিহার্সাল চলল সেখানে। পালা রামায়ণ ও কালীয়দমন। সংলাপ ও গান মুখস্থ হয়ে গেল সবার। রাম ও কৃষ্ণের নাম ভূমিকায় গদাধর। খুশি সবাই। মুস্কিল বাধায় কিন্তু গদাধরের সেই পুরনো স্বভাব—অভিনয় করতে করতেই তার সমাধি হয়ে যায়। ভগবান অভিনয় করতে যখন জগতে আসেন সমাধি তখনো তাঁকে ছাড়ে না যে! আত্মবিস্মৃত হতে চাইলেই কি হওয়া যায়? স্মরণ বিস্মরণের পথে পথে প্রসুপ্ত আত্মজ্ঞান উদিত হয়ে পড়ে। এও যে লীলা, এতেই হয়তো জীবের মহত্তম কল্যাণ নিহিত। মানিক রাজার আম বাগানে অভিনয়চ্ছলে গদাধর লোককল্যাণ করছিল। সঙ্গী বালকদের আত্মস্বরূপবোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল সে। আমাকে ত্যাখো। বুঝে নাও মানুষের ভিতর আর এক মানুষ আছে। আসল মানুষ। সে আছে, আছেই। ভুলে থাকলেও সে ভুলতে দেয় কই? তারই ভাব হয়, তারই সমাধি হয়। সেই অন্তর্নিহিত আত্মপুরুষই সমাধি অবস্থায় আপনাকে আপনি দেখে। আপনাকে আপনি পায়। আত্মোপলব্ধির সে নিবিড় ক্ষণে বাইরের জগৎ-চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়। তারই নাম সমাধি—অটল আত্মসমাহিত অবস্থা।

উনিশ শতকের মধ্যাহ্নকালে এক চঞ্চল লীলাপটু নাটুয়া কিশোর বাংলার এক সুদূর নিভৃত গ্রামে নাচে গানে অভিনয়ে কথকতায় গ্রাম্যজনের মন কেড়ে নিয়েছিল। তারা গদাধরের, গদাধর তাদের—এই ছিল মুগ্ধ গ্রাম-বাসীদের মনোভাব। কে গদাধর? ক্ষণে ক্ষণে সে জ্ঞানও তাদের উপস্থিত

হত, তারপর ভুলে গিয়ে ভাবত, কে আবার? ও যে আমাদের চির চেনা চির আপনার গদাই। ওর নেই কোনো বিশেষণ, নেই বিভূতি, জ্যোতির্মণ্ডলে ঘেরাও তো দেখি না ওকে। ওর সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের ভালোবাসার— অহেতুকী অমল ভালোবাসার। ও আমাদের আনন্দ, আমরা ওর। আমরা নিরক্ষর সাধারণ গ্রাম্যজন। এ বিশাল বিশ্বের কী জানি আমরা, খবর রাখি কতটুকু? আমাদের ছোট মাপের আধারে বড় তত্ত্ব কি ধরে গো? তাই এই সারটুকু জেনে নিয়েছি, গদাই আমাদের প্রাণের প্রাণ, শ্বাসের শ্বাস। আর বাকি বড কথা? সে রইল জ্ঞানীগুণী বড় দরের মানুষদের জন্য।

এই জ্ঞানশূন্যা ভালোবাসাটুকু আস্বাদন করতে লীলাকিশোর জগতে আসেন। এর চেয়ে প্রিয় বস্তু তাঁর ত্রিভুবনে নেই।

৭

বিশ্বের পথে

সময় যখন পরিণত হয়েছিল তখন স্বয়ং কংসই কৃষ্ণ বলরামকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে আসার জন্য অক্রূরকে পাঠিয়েছিলেন। যাদবশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে ডেকে তাঁর হাতে হাত রেখে কংস বলল, হে বদান্য অক্রূর, তুমি আমার সুহৃদ, সুহৃদের একটি কাজ কর। তুমি ছাড়া হিতকামী বন্ধু আমার আর কেউ নেই। তুমি নন্দব্রজে যাও, সেখানে বসুদেবের দুই পুত্র আছে, এই রথে তাদের এখানে নিয়ে এস, দেরি কোরো না। এখানে তাদের আনার পর কালরূপ হস্তী দ্বারা তাদের বধ করাব। যদি তা থেকে তারা মুক্ত হয় তবে বজ্রসদৃশ মল্লগণ দ্বারা তাদের বিনাশ করাব। তারা নিহত হলে শোকাকুল বসুদেব প্রমুখ, তাদের বিষ্ণু ভোজ ও দশার্হ বংশজ বন্ধুগণ, আমার বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেন, পিতৃব্য দেবক এবং আমার বিদ্বেষী সকলকে বধ করাব। বন্ধু, তাহলে এ রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। আমি সুখে পৃথিবী ভোগ করব। আমার এই মনোভিলাষ জেনে তুমি ধনুর্যজ্ঞ ও যদুপুরীর শোভা দেখানোর নাম করে রাম-কৃষ্ণ বালক দুটিকে এখানে নিয়ে এস।

পরদিন প্রত্যূষে অক্রূর রথে চড়ে ব্রজাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে ভাবতে লাগলেন, আজ আমার অমঙ্গল নাশ হয়েছে, জন্ম হয়েছে সার্থক। কারণ আজ যোগীদের ধ্যেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রণাম করতে পারব। কংস আজ আমায় পরম অনুগ্রহ করেছে, সেই তো পাঠাল আমাকে হরিচরণ-দর্শনে।

অক্রূর ব্রজে পৌঁছে রাজাজ্ঞা জানালে বলরাম ও কৃষ্ণ মথুরায় যেতে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন। পিতা নন্দও। কিন্তু খবর শুনে ব্রজগোপীদের দুঃখের অবধি রইল না। তারা অবশ হয়ে পড়ল। মথুরায় একবার গেলে আর কি কৃষ্ণ আমাদের মতো গ্রাম্য জনদের কাছে ফিরে আসবে? নির্দয় অক্রূর আমাদের কৃষ্ণকে কেন নিয়ে যাচ্ছে দূর দেশে? তাকে কি অক্রূর বলা যায়—সে যে মহা ক্রূর।

ব্রজগোপীরা অক্রূরের রথ আটকে দিয়েছিল এমন কথা ভাগবতে নেই। কিন্তু বাঙালীর লোককথায় তারা রথের চাকা ধরে রথ আটকায়। তখন অক্রূরের জবাব রূপে একটি গীত স্বয়ং রামকৃষ্ণ গাইতেন :

ধোরো না ধোরো না রথ রথ কি চক্রে চলে।
যে চক্রের চক্রী হরি যার চক্রে জগৎ চলে॥

রামকুমার অক্রূর নন, তিনি গদাধরের বড় দাদা, কিন্তু অক্রূরের মতোই তিনি কলকাতা থেকে উদিত হলেন কামারপুকুরে গদাধরকে নিয়ে যেতে কলকাতায়।

কলকাতা অবশ্য তখন কংসনগরীতুল্যই ছিল। বিদেশী সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতা, ধনগর্বিতা কলকাতা, বিদেশাগত বিকাশমান বস্তুবাদী দর্শন ও সংস্কৃতির পাদপীঠ কলকাতা। মেকলে বলে দিয়েছেন, পাশ্চাত্য বইয়ের একটি শেলফে যত জ্ঞান আছে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য জড়ো করলেও সে জ্ঞান মিলবে না। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো দেশী বিদ্বানরা অনুরূপ রায় দিতে ইতস্তত করেননি। ভারতীয় দর্শনে তেমন কোনো সার পদার্থ নেই, যা আছে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে—এই তাঁদের অভিমত। টাকা, মান-সম্ভ্রম, বিদ্যাবিলাস ও সম্ভোগই জীবনের উদ্দেশ্য বলে উনিশ শতকের মধ্যভাগের কলকাতার মনীষীরাও বিশ্বাস করতেন। কলকাতা কেনই বা সৃষ্ট হয়েছিল? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রয়োজনে, তারপর ভারতশোষণের কেন্দ্র রূপে কলকাতা স্থাপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। জনজীবন ও সংস্কৃতির ভিতর থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে কলকাতা গড়ে ওঠেনি। এটা বিদেশীদের বাণিজ্যিক, সাম্রাজ্যিক ও ভারতের সম্পদশোষণের উদ্দেশ্যজাত ও আরোপিত নগরী—সেকালের কংসের মথুরার তুলনায় কলকাতা অন্তত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে শ্রেয়তর কোনো নগরী ছিল না। উনিশ শতকেই কলকাতার যথাযথ পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন ইংরেজ কবি কিপলিঙ :

Thus from the midday halt of Charnock grew a eity,
As the fungus sprouts chaotic from its bed
So it spread.
Chance-directed, chance-erected, laid and built
On the silt,

Palace, byre, hovel, poverty and pride
Side by side.

হুতোম কলকাতার ভাষ্য করেছিলেন আরও সরস ব্যঙ্গে :

আজব সহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।

বকবিড়ালীরাই এখানে ব্রহ্মজ্ঞানী সাজে! বদমাইসির বিরাট ফাঁদ এই কলকাতা। কেন এরূপ কলকাতায় দুর্নিবার আকর্ষণে বাংলার গ্রাম থেকে মানুষ ছুটে আসত? কেন রামমোহন-বিদ্যাসাগর এসেছিলেন? কেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজেই শুধু আসেননি, ভাই গদাধরকেও আনলেন? ঐ কালের একজন কলকাতাবাসী লেখকই তা লিখে গিয়েছেন :

> ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার কর্মকার চর্মকার চটকার মঠকার বেতনোপভুক্ত হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।
>
> ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নববাবুবিলাস।

রুজি রোজগারের উপায় পাওয়া যাবে বলেই গ্রাম থেকে লোকে কলকাতায় আসত এটাই প্রধান কথা। এসে অবশ্য শিক্ষা-দীক্ষাও লাভ করত। কলকাতার আধারে লালিত এ দেশজ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কেউ কেউ 'মেকলে সম্প্রদায়' আখ্যা দিয়েছেন। অসঙ্গত হয়নি এ আখ্যাদান। টমাস ব্যাবিংটন মেকলে এদেশের জন্য যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন ও যা সরকার বলবৎ করেন তার উদ্দেশ্য ছিল মেকলেরই ভাষায় : এমন এক শ্রেণীর মানুষ গড়া যারা রক্তে ও গায়ের রঙে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, মতামতে,

নীতিবোধে ও মানসতায় ইংরেজ। (to form a class of persons, Indian in blood and in colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect)

মেকলে যা চেয়েছিলেন ঠিক তেমনটি হয়তো হয়নি, কিন্তু দেশজ সংস্কৃতির ভূমি থেকে উন্মূল, জাতীয় ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাহীন সহানুভূতিহীন এক নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তারাই আধুনিক যুগের বাংলার এলিট সমাজ। কলকাতাই এদের মুখ্য বাস ও কর্মকেন্দ্র।

এই কলকাতাই গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে আপন পরিপাক-যন্ত্রে হজম করে ফেলার উদ্দেশ্যে ডাক পাঠিয়েছিল। সুদূর পল্লীর নিভৃতিতে তার আপন স্বভাবসিদ্ধ জীবনচর্যার মধ্যে কেন তাকে থাকতে দেবে নবযুগ? সেকালে বাংলার কোনো সম্ভাবনাময় মানুষকেই সে রেহাই দেয়নি—নিয়ে এসেছে কলকাতায়। এসো, নব যদুপুরী কলকাতার শোভা দেখে যাও আর দেখ এসে এখানকার নতুন ধনুর্যজ্ঞ—টাকা বিদ্যা যশ বিলাস যজ্ঞ!

রামকুমার কলকাতায় তিন বছর পরিশ্রম করে কিছুটা স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর চতুষ্পাঠীতে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছিল, উপার্জনও। তিনি বছরে একবার আসতেন কামারপুকুর। এসে দেখতেন যে গদাধর পাঠাশালায় যাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছে। লেখাপড়া চর্চায় তেমন কিছু মন নেই তার। তাহলে তার ভবিষ্যৎ কী? আয়-উপার্জন করবে কিভাবে? গ্রামে একজন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মানুষের জীবিকা অর্জনের উপায় হল মাঠে চাষ করতে যাওয়া বা অনুরূপ কাজ। চট্টোপাধ্যায় বংশের ছেলে হয়ে কি ঐ কাজ গদাধর করবে? আর তার ধাতও চাষী বা মুটেমজুরের নয়। অথচ নিজেদের জমি মাত্র এক বিঘে—তার ভরসায় ক্রমবর্ধমান সংসার কতদিনই বা থাকবে?

রামকুমারের নিজেরও একটু স্বার্থ ছিল। তাঁর টোলের ছাত্র বাড়ার ফলে এখন তিনি কলকাতায় রাঁধাবাড়া ইত্যাদি ঘরের কাজে সময় দিতে পারেন না, বয়সও হয়েছে, স্বাস্থ্যও মজবুত নেই। গদাধর কলকাতায় গেলে তাঁরই টোলে সংস্কৃত বিদ্যা কিছুটা আয়ত্তও করতে পারবে, গৃহকর্মে সাহায্যও করতে পারবে।

মা ও রামেশ্বরকে এসব কথা বলতে তাঁরা রাজি হয়ে গেলেন। গদাধরকে বলা হলে সেও রাজি। কোনো আপত্তিই সে করেনি। আপাত কারণ, সে

ভাবল দাদাকে সাহায্য করা তো উচিত। গূঢ়তর কোনো কারণ ছিল কিনা তা সেই জানত। সতেরো বছর বয়স তখন তার, অনেক কিছু বোঝা ও ভাবার মতো বড় হয়েছে সে। নাকি অন্তরে সে বুঝেছিল যে এই-ই রঘুবীরের আদেশ, এই কলকাতা যাত্রা।

বাংলা ১২৫৯ সাল, ইংরেজি ১৮৫৩ সাল। শীতকালের কোনো সময়ে পঞ্জিকায় শুভ দিন দেখে রঘুবীর, শীতলা ও অন্য দেবদেবীদের প্রণাম করে, মায়ের পদধূলি নিয়ে দাদার সঙ্গে গদাধর কলকাতায় চলে গেল।

কামারপুকুরে নেমেছিল বিষাদ। মা চন্দ্রামণি, ধনী, প্রসন্নময়ী, রুক্মিনীরা তো কাঁদলেনই—কামারপুকুরের কোনো মানুষই হয়তো অশ্রু সম্বরণ করতে পারেনি। শ্রীনিবাস শাঁখারির জগৎটা যেন ফাঁকা হয়ে গেল। মধু যুগী দেখল তার গৃহাঙ্গন আঁধার হয়ে এসেছে। ধর্মদাস লাহা, সীতনাথ পাইন নীরব হয়ে গেলেন। তাঁদের বাড়ির মেয়েরা অক্রুর-সংবাদে যেন বা হল বজ্রাহত।

কৃষ্ণের মতোই রামকৃষ্ণ নবীন যৌবনের সম্ভার নিয়ে বিশ্বের পথে পা বাড়ালেন।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর ও উত্তরকালে কেশবচন্দ্র সেন কলকাতার যে অঞ্চলে বাড়ি তৈরি করে বাস করে গিয়েছেন সে অঞ্চলেই রামকুমার বাস করতেন। বর্তমান রামমোহন সরণিতে অবস্থিত সিটি কলেজের কাছাকাছি বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে এক খোলার ঘরে তাঁর বাস ছিল। লাহাদের বাড়ির বিপরীত দিকে রাস্তার উত্তর দিকে ছিল এই ঘর। পরে এখানে 'হেয়ার প্রেস' হয়েছিল। ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চাটুজ্যের বাড়িতেও এঁরা কিছুদিন বাস করেন।

রামকুমারের টোলও ছিল বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে—এখন সেখানে রাধাকৃষ্ণের ঠাকুর বাড়ি হয়েছে।

এই ঝামাপুকুর অঞ্চলে রামকৃষ্ণ পরেও এসেছেন। ১৯ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীটে ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি, ২৭ ঝামাপুকুর লেনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাসায় এসেছেন। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে ছিল কথামৃত-কার শ্রীমর বাড়ি।

এসব পরের কথা। রামকুমারের সঙ্গে গদাধর যখন এসেছেন তখন ঝামাপুকুরের কয়েকটি বাড়িতে তাঁর যাতায়াত হয়েছিল। ১ ঝামাপুকুর

লেনে রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ি, ঝামাপুকুরেই রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়ি, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ি সে যেত। কয়েকটি বর্ধিষ্ণু ঘরে নিত্য দেবসেবার ভার নিয়েছিলেন রামকুমার। দেবসেবা করতে হলে গৃহস্থ বাড়িতে সকাল সন্ধ্যা দুবেলাই যেতে হয়। ছাত্র-অধ্যাপনার কাজ সেরে সে সময়ও পাচ্ছিলেন না রামকুমার। অথচ পূজারী ব্রাহ্মণের কাজ ছাড়া সম্ভব হয়নি, কারণ শুধু টোলের আয় যথেষ্ট ছিল না। তাই গদাধরকেই দেবসেবার কাজে পুরোপরি নিয়োগ করে দিলেন তিনি।

দেব দেবীর পূজা গদাধরের প্রিয় কাজ; সে এতে অভ্যস্তও ছিল। তার পূজায় শুদ্ধাচার, শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল—প্রাণঢালা ভাব ছিল। এতে যজমানরা সন্তুষ্ট হলেন। তার সরলতা, মধুর ব্যবহার আর গান মনোহরণ করল সবার। বাড়ির মহিলারা গদাধরকে খুব কাছের লোক বলেই মনে করে নিয়েছিল, তাকে ফরমায়েস খাটিয়েও নিত। চুম্বকের মতো সে এখানেও দল আকর্ষণ করে নিয়েছে তার চারপাশে, যারা তাকে পেয়ে খুশি, যারা তাকে আনন্দের উৎস মনে করে।

রামপ্রসাদ মিত্রের দুটি ছেলে কালী ও ভুলু গদাধরের খুব অনুগত হয়ে যায়। এদের সঙ্গে তার ভাব খুব জমে ওঠে। এদের অনুরোধে সে তাদের দেশের বাড়ি আঁটপুরে দুর্গাপূজার সময় গিয়েছিল। বাবুরাম (পরে স্বামী প্রেমানন্দ) যেদিন প্রথম রামকৃষ্ণকে দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বর আসে সেদিন এরূপ কথাবার্তা হয়েছিল:

রামকৃষ্ণ। তোমাদের বাড়ি কোথায়?

বাবুরাম। আজ্ঞে, তড়া-আঁটপুর।

রামকৃষ্ণ। বটে? তবে তো তোমাদের দেশেও একবার গেছি। ঝামাপুকুরের কালী-ভুলুর বাড়িও সেইখানে না?

বাবুরাম। হ্যাঁ। আপনি তাঁদের কেমন করে জানলেন?

রামকৃষ্ণ। তাঁরা যে রামপ্রসাদ মিত্রের ছেলে। যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম তখন দিগম্বর মিত্রের বাড়ি আর ওদের বাড়ি যখন তখন যেতুম।

সম্ভবত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্গাপূজার সময় গদাধর গিয়েছিল আঁটপুর। আঁটপুরের মিত্ররা বিখ্যাত। তাদের দুর্গাপূজা সেকালে আড়ম্বরের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হত। মিত্রদের চণ্ডীমণ্ডপের শিল্পকাজ উল্লেখযোগ্য।

আঁটপুর থেকে কামারপুকুর চব্বিশ কিলোমিটার। মনে হয় আঁটপুর

পর্যন্ত এসে কামারপুকুর না গিয়ে পারেনি গদাধর। কলকাতায় সে এসেছে দুবছর। এ দুবছরে জননী ও জন্মভূমির ব্যাকুল আহ্বান অনুভব করেছিল গদাধর। শুধু কামারপুকুর নয়, শিওড়ে দিদির বাড়িও সে গিয়েছিল।

শিওড়েই একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল সেবার। রামকৃষ্ণজীবনের সে এক পরমাশ্চর্য ঘটনা। সে ঘটনার নিগূঢ় তাৎপর্যে রামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলী উভয়ই উদ্ভাসিত।

১২৬১ সাল। ইংরেজি ১৮৫৪। শিওড়ে দিদির বাড়ি গিয়েছে গদাধর। দিদির বাড়িতেই কীর্তন-যাত্রার আসর বসেছিল। বেশ লোক হয়েছিল। শিওড় শ্যামাসুন্দরীর বাপের বাড়ি হওয়ায় শিশু-মেয়ে কোলে তিনিও ঐ সময় শিওড়ে ছিলেন ও কীর্তনাসরে এসেছিলেন। মেয়ের নাম সারদা, বয়স এক বছরের কম (জন্ম ১৮৫৩ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর)।

গান শেষ হয়ে গেলে একজন মহিলা শিশুকে বললেন: খুকি, কাকে বিয়ে করবি তুই? সারদার বিয়ে কী তা বোঝার কথা নয় এবং কথা বলতেও সে তখন বিশেষ শেখেনি। সে আঙুল দিয়ে কাছেই বসা গদাধরকে দেখিয়ে দিয়েছিল। এক বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই স্বয়ংবরা হয়েছিল সারদা। চার চোখের মিলন হয়েছিল সেদিন। তাই বিয়ের জন্য পাত্রী নির্বাচনের কথা উঠলে রামকৃষ্ণ নিজেই এই পাত্রীর সন্ধান দিয়ে বলেন: জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্জের বাড়িতে দেখগে, বিয়ের কনে সেখানে কুটোবাঁধা আছে।

গদাধর ফিরে গেল কলকাতায়। ঝামাপুকুরে।

ঝামাপুকুরের আর একটি লোকের কথা এখানে বলে রাখা দরকার। তার নাম নকুড় বাবাজী। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে তার একটি ছোট মুদির দোকান ছিল। সে ছিল একজন বৈষ্ণবভক্ত। গদাধর এর সঙ্গে পরিচিত হয় ও যজমানদের বাড়িতে পূজা সেরে বাড়ি ফেরার পথে এর দোকানে মাঝে মাঝে এসে বসত। নকুড় খুশি হত তাকে পেলে—আদর-আপ্যায়নও করত। নকুড় কামারপুকুরের কাছাকাছি কোনো গ্রামের লোক—হয়তো এটাও উভয়ের সম্পর্ককে মাধুর্য দিয়েছিল। যজমানের বাড়ি থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি গদাধর নকুড়ের দোকানে বসে প্রায়ই বিলিয়ে দিত ও শূন্য হাতে ফিরে যেত ঘরে। পরবর্তী কালে নকুড় দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে যেত। সে ভালো কীর্তন গাইত। পানিহাটিতে চিঁড়া মহোৎসবে সে যেত ও এই বৈষ্ণব-উৎসবে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হত। ঝামাপুকুরের এই সম্পর্কটি স্থায়ী

হয়েছিল। রামকৃষ্ণ বলতেন, ভগবান কাজ দেখেন না, মন দেখেন। সামান্য মুদি, কিন্তু ভক্ত—তাই রামকৃষ্ণবৃত্তে নকুড়ের আসনটি পাকা হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় আড়াই বছর ঝামাপুকুরে কাটিয়ে দিল গদাধর। কামকলুষময় কলকাতা তার চিত্তদর্পণে কোনো ছায়াই ফেলতে পারেনি এ দীর্ঘ সময়ে। এতটুকু চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেনি তার। তার সাবেক দৃষ্টিভঙ্গীতে আসেনি তিলমাত্র পরিবর্তন। কলকাতার কালচার স্পর্শই করেনি তাকে। যদুপুরী কলকাতা নগরী গ্রাস করতে পারেনি গদাধরকে।

তাই তার মনোভাব ও চালচলন লক্ষ্য করে চিন্তিত হলেন রামকুমার। ঝামাপুকুরে সে বেশ আনন্দেই কাটাচ্ছে কিন্তু জীবনের উন্নতির কোনো চেষ্টাই করছেনা, দাদার টোলে পড়াশোনায় উদ্যোগী নয় সে, ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকার ভাবনাই করে না। কামারপুকুরের অভ্যস্ত জীবন থেকে কলকাতায় এসে তার না এসেছে মনের সংকোচ, চিত্তের গ্লানি অথবা অসাচ্ছন্দ্যবোধ। নগরীতে সে দিব্য আছে। সদানন্দময়, যেন সদা স্বজনবেষ্টিত। কর্তব্য করছে। দাদার সেবা করছে হাসি মুখে কিন্তু কোনোরকম উচ্চাশা, চিন্তা, মতলব দ্বারা দষ্ট হয়নি সে।

লেখাপড়ায় গদাধরের অনাগ্রহ দেখে রামকুমার একদিন গদাধরকে তিরস্কার করলেন। বললেন বিদ্যাশিক্ষায় উদ্যোগী হতে। সে সরাসরি দাদাকে বলল: চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না। তবে তুই কি চাস? আমি চাই সেই জ্ঞান যার উদয়ে মানুষ কৃতার্থ হয়।

চালকলা-বাঁধা বিদ্যার অর্থ অর্থকরী বিদ্যা। যে বিদ্যার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন।

উনিশ বছর বয়স হয়ে গেল গদাধরের। কোথায় তার সেই প্রার্থিত জ্ঞান?

জ্ঞানময়ী ব্রহ্মময়ী নিজেই সে কথা ভাবার দায় নিলেন। তাঁর নব নির্মিত ছত্রতলে গদাধরকে তিনি ডেকে বসলেন। রাণী রাসমণি বানিয়ে দিয়েছিলেন সে ছত্র।

তারই নাম দক্ষিণেশ্বর মন্দির।

গদাধর তখনো কামারপুকুরে বাস করে, বাং ১২৫৫ সালে রাসমণি কাশী যাবার সংকল্প করেছিলেন। উদ্দেশ্য সেখানে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন ও পূজা দান। দেবভক্তি বরাবরই প্রবল ছিল তাঁর। আর ছিল তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব ও অর্থসম্পদ।

হালিশহরের কাছে কোনা গ্রামে জগমোহন দাসের পুত্র হরেকৃষ্ণ দাস বাস করতেন—তাঁরই মেয়ে রাসমণি। হরেকৃষ্ণ ছিলেন কৃষক কিন্তু তিলকধারী বৈষ্ণব। ১২০০ বঙ্গাব্দের ১১ই আশ্বিন বুধবার, ১৭৯৩ খ্রীঃ রাসমণির জন্ম হয় এই গরীবের ঘরে—লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল তখন। রাসমণির মায়ের নাম রামপ্রিয়া। দুই দাদার নাম রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। সাত বছর বয়সে মাতৃহারা হয় রাসমণি, কিন্তু কন্যার সুলক্ষণ দেখে মা বলে গিয়েছিলেন: তুমি রাজরাণী হবে। ১২১১ সালের ৮ই বৈশাখ, ১৮০৪ খ্রীঃ, এগারো বছরে বয়সে কলকাতার জানবাজারের রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে রাসমণির বিয়ে হয়। মাহিষ্যের সঙ্গে মাহিষ্যের বিয়েতে অস্বাভাবিক কিছু হয়নি, কিন্তু কলকাতার ধনী প্রীতরাম দাস গঙ্গার ঘাটে বালিকা রাসমণিকে দেখে এই চাষীকন্যাকে পুত্রবধূ করে আনায় কিছুটা বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রীতরামের আদি বাস হাওড়া জেলার ঘোষালপুরে। পলাশি যুদ্ধের চার বছর আগে, ১৭৫৩ খ্রীঃ, প্রীতরামের জন্ম হয়। বাবা কৃষ্ণরাম দাস। মারাঠা আক্রমণ কালে ১৭৬৭ খ্রীঃ প্রীতরাম দুই ছোট ভাই রামতনু ও কালীপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছিল। জানবাজারের জমিদার মান্নাদের বাড়িতে সে আশ্রয় পেয়েছিল। মান্নাদের আদি বাড়ি ছিল বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ যেখানে সেই জমিতে। প্রীতরাম পাঠশালায় লেখাপড়া শিখে ডনকি সাহেবের দেওয়ান, মান্নাবাড়ির অক্রূরচন্দ্র মান্নার সুপারিশে বেলেঘাটায় ডনকি সাহেবের লবণ কারখানায় মুহুরীর চাকরি পায়। এখানে বেতন ও কমিশন থেকে প্রীতরাম যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে।

ডনকি সাহেব মারা গেলে বেলেঘাটার লবণ-কারখানাটি উঠে যায়। প্রীতরাম দাস তখন একজন বাগান ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিলে বেলেঘাটায় বাঁশের আড়ত খোলে। অনেক বাঁশ একত্রে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে আনলে তাকে বলে মাড়! এই মাড়ের ব্যবসা করার দরুণ লোকমুখে প্রীতরামের নাম হয়ে যায় প্রীতরাম মাড়। তাঁর বংশেরই নাম হয় মাড় বংশ।

প্রীতরাম ফোর্ট উইলিয়মে সৈন্যদের রসদ জুগিয়ে প্রচুর টাকা কামান। যশোর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এই সময় কলকাতায় এসে মান্নাদের একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করছিলেন। এঁর সঙ্গে প্রীতরামের পরিচয় হয়। সাহেব প্রীতরামকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে যশোরে, পরে বদলি হলে ঢাকায় নিয়ে যান। সাহেবের সুপারিশে প্রীতরাম নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের এস্টেটে বিশেষ

কর্মচারী রূপে চাকরি পান। সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে মান্না বাড়ির যুগলকিশোর মান্নার মেয়ে যোগমায়াকে বিয়ে করেন। বিয়ের যৌতুকরূপে জানবাজারে কয়েকখানি বাড়ি ও ষোল বিঘা জমি পান। এই বিয়ে হয় ১৭৭৭ খ্রীঃ।

কলকাতায় এসে প্রীতরাম আমদানি—রপ্তানির ব্যবসায়ে নামেন। ১৭৮৭ খ্রীঃ তিনি বার্ণ কোম্পানির মুৎসুদ্দি হন। ১৮০০ খ্রীঃ নাটোর এস্টেটের কয়েকটি পরগণা নীলামে উঠলে প্রীতরাম মকিনপুর পরগণা কিনে নেন। মাড়বংশের জমিদারির সূচনা হয়েছিল এভাবে।

প্রীতরামের দুই ছেলে—হরচন্দ্র ও রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের জন্ম ১৭৮৩ খ্রীঃ। হরচন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে মারা যান। রাজচন্দ্র দুবার বিয়ে করলে দুবারই স্ত্রী মারা যায়। তৃতীয়বার বিয়ে হয় রাসমণির সঙ্গে। রাজচন্দ্র-রাসমণির দুটি মেয়ে পদ্মমণি ও কুমারী জন্মাবার পর প্রীতরাম মারা যান ১৮১৭ খ্রীঃ। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান জানবাজারের বর্তমান প্রাসাদ, তখনকার ছয় লক্ষ টাকা দামের ধনসম্পত্তি ও জমিদারি।

রাজচন্দ্র দাস বাবার ব্যবসা ও সম্পত্তি প্রচুর বাড়িয়েছিলেন। তিনি আফিং, কস্তুরী ও নীল রপ্তানি করতেন—বিলেতে তাঁর এজেন্ট ছিল কলভিন কাউই কোম্পানী। তাঁর ভাগ্য এমন ছিল যে একদিন নীলামে পঁচিশ হাজার টাকার আফিং কিনে সেদিনই তা পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রী করে একদিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করেন। কলকাতায় নানা রাস্তায় তিনি বহু বাড়ি ক্রয় ও নির্মাণ করেন। এইসব বাড়ির কোনো কোনোটি অপ্রত্যাশিত বেশি দামে বিক্রী করে রাজচন্দ্র বহু টাকা পান। রাসেল স্ট্রীটে তাঁর একটি বাড়ি ও জমি সরকার দুলক্ষ টাকায় কেনে। মকিনপুর ছাড়াও জমিদারি মহাল তাঁর ছিল। জমিদারি থেকে তাঁর আয়ের পরিমাণও ছিল অনেক।

রাজচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব ও কালীপ্রসাদ সিংহ। ভাইসরয় লর্ড অকল্যাণ্ড রাজচন্দ্র দাসের বাগান বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় আসেন। রাজচন্দ্রই প্রথম বাঙালী যাঁর বাগান বাড়িতে কোনো বড়লাট এসেছেন।

তখনও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন চলছে। কোম্পানীর অভিজাত অংশীদার জন বেব কলকাতায় এসে রাজচন্দ্র দাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। তিনি রাজচন্দ্রকে বহু সম্মানিত করেন। তাঁরই চেষ্টায় রাজচন্দ্র ও তাঁর বংশধররা

পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী পরিবেষ্টিত হয়ে চতুরশ্বযানে ভ্রমণ করার সনদ-অধিকার পান। ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে জন বেব বন্ধুত্বের নিদর্শন রূপে রাজচন্দ্রকে একটি সোনার ঘড়ি পাঠিয়েছিলেন। ঘড়িটি এখনও রক্ষিত আছে।

রাজচন্দ্র ও রাসমণির চারটি মেয়ে জন্মে—পদ্মমণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা। একটি মৃত পুত্রও প্রসব করেন রাসমণি। আর কোনো ছেলে হয়নি। করুণাময়ীও অকালে মারা যায়।

রাসমণির দান ও সেবাকার্য সুরু হয়েছিল ১৮২৩ সালে বাংলার বন্যার সময় থেকে। বহু টাকা তিনি এবছর খরচ করেছিলেন বাবার মৃত্যুতে গঙ্গায় চতুর্থী করতে গিয়ে রাণী ঘাটের দুরবস্থা দেখে ঘাট নির্মাণ করে দিতে স্বামীকে বললে রাজচন্দ্র বাবুঘাট ও বাবু রোড নির্মাণ করে দেন। বাবুঘাটের নাম ছিল বাবু রাজচন্দ্র দাস ঘাট। প্রস্তর ফলকে লেখাও ছিল সে কথা। লোকমুখে সংক্ষেপে হয়ে যায় বাবুঘাট। ১৮৩০ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্কের অনুমতি নিয়ে ঘাটটি নির্মিত হয়েছিল।

রাজচন্দ্র আহিরীটোলায় গঙ্গাতীরে যোগমায়া স্নান ঘাট (নিজের মায়ের নামে) ও নিমতলায় মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীদের জন্য গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। মেটকাফ হলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগার) উন্নতির জন্য দশ হাজার টাকা দান, বেলেঘাটায় সরকারী খাল খননের জন্য ভূমি দান, চানকে গ্রামবাসীদের জলাভাব দূর করতে তালপুকুর খনন ইত্যাদি জনহিতকর কাজের জন্য সরকার রাজচন্দ্রকে ১৮৩৩ সালে রায়বাহাদুর উপাধি দেন

১৮১৩-১৮২১ এই দীর্ঘ আট নয় বছর ধরে সাড়ে ছয় বিঘা জমিতে পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানবাজারে "রাণী রাসমণি কুঠি" নির্মিত হয়েছিল প্রীতরামই এ কাজ তিন চার বছর পর্যন্ত করে যেতে পেরেছিলেন। বাড়িটি এখনো তার বৃহদাকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়িতে রামকৃষ্ণ যেতেন, থাকতেন।

রাজচন্দ্র মারা গিয়েছিলেন মাত্র ৫৩ বছর বয়সে, সর্দিগর্মি অংশুঘাত রোগে ১৮৩৬ সালে। এ বছরই গদাধরের জন্ম হয়েছিল কামারপুকুরে। এ বছরই রাণী রাসমণির ব্যক্তিত্বের ঝলক বাইরে প্রকাশ পেতে সুরু করে।

সে ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার দাহে প্রথম ঝলসে গিয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তার প্রতিক্রিয়া ঠাকুর পরিবারে পরবর্তী কালেও বর্তমান ছিল কিনা তা জানি না। তবে ঘটনাটি নিশ্চয়ই উত্তরকালের ঠাকুররাও জানতেন

—জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্রেই তার উল্লেখ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে অথবা প্রবীণ কর্মচারীদের মুখে এ ঘটনা জেনে থাকবেন।

দ্বারকানাথ বন্ধু রাজচন্দ্র দাসের কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন; শোধ দেননি। স্বামীর মৃত্যুর পর রাসমণি এ টাকা আদায় করার জন্য চাপ দেন। দ্বারকানাথ টাকা দিতে পারেননি। তার বদলে রংপুরের তালুক ও দিনাজপুর জেলার স্বরূপপুর পরগণার তালুকটি রাসমণিকে দিয়ে দেন। কিছুদিন পর দ্বারকানাথ রাসমণির জমিদারির ম্যানেজার হবার জন্য আবেদন করেন। মনুষ্যচরিত্রাভিজ্ঞা রাসমণি বিনয়ের সঙ্গে জবাব দেন: "আপনার মতো সুযোগ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এ সামান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। আমার পুত্রতুল্য ভাবী উত্তরাধিকারী জামাতারাই এ সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে। বিশেষত মথুর এ কাজে খুব দক্ষ।"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী মথুর দ্বারকানাথের দৃষ্টিতে নিতান্তই বালক মাত্র। দ্বারকানাথের প্রার্থিত পদ মথুরই পূর্ণ করবে এ কথা বলায় দ্বারকানাথের মনে আঘাতটি আর একটু বেশি বেজেছিল। প্রত্যাখ্যানের জ্বালা, উদ্দেশ্যহানির জ্বালা তো ছিলই।

রাণী ইংরেজ সরকারকেও বেশ কয়েকটি আঘাত দিয়েছিলেন। জেলেরা গঙ্গায় জাল ফেলে মাছ ধরত। সরকার হঠাৎ তাদের ওপর মৎস্যকর চাপালেন। জেলেরা রাজা রাধাকান্ত দেব ও অপরাপর ধনীমানীদের কাছে প্রতিকার-প্রার্থনায় গিয়েছিল। কেউই সরকারের সঙ্গে বিবাদে যেতে রাজি হননি, এমনকি জেলেদের পক্ষ হয়ে আবেদন-নিবেদন করতেও না। তখন জেলেরা রাণী রাসমণির কাছে যায়। রাণী এককথায় জেলেদের আশ্বস্ত করে দিলেন।

তিনি ঘুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গা সরকারের কাছ থেকে দশ হাজার টাকায় জমা নিলেন। দড়ি ও বাঁশ দিয়ে তার অধিকার ক্ষেত্রটুকু ঘিরে ফেললেন। জেলেদের বলে দিলেন নিশ্চিন্ত হয়ে মাছ ধরতে। কলকাতার গঙ্গায় জাহাজ ও নৌ চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। গভর্ণমেন্ট রাণীকে হুকুম দিলেন গঙ্গা মুক্ত করে দিতে যাতে সরকারী ও বেসরকারী জাহাজ স্টীমার নৌকা ইত্যাদি চলাচল করতে পারে। প্রত্যুত্তরে রাণী জানালেন, আমি বহু টাকা খরচ করে গঙ্গা জমা নিয়েছি। জাহাজ ও স্টীমার চললে মাছ

পাশায়। তাতে আমার জেলে প্রজাদের বিশেষ ক্ষতি হয়। আইনমাফিক গঙ্গাপথ আমি বন্ধ করতে পারি। তবে আপনারা মৎস্য-কর প্রত্যাহার করলে আমি আমার অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেব।

বেগতিক বুঝে সরকার মৎস্য-কর প্রত্যাহার করে নিলেন ও রাণীকে জমার টাকাও ফেরৎ দিলেন। গঙ্গা মুক্ত হল, জেলেরাও নির্বাধে মাছ ধরতে লাগল।

মকিনপুর পরগণায় রাসমণির জমিদারিতে ডোনালড সাহেব ছিল নীলকর। সে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করত। রাণী খবর পেয়ে পালোয়ান-লেঠেল লাগালেন। তারা ডোনালড ও তার দলবলকে প্রহার করল। হতভম্ব ডোনালড পালটা আঘাত হানার কথা ভাবতেই পারেনি। সে আদালতে মামলা এনেছিল। মামলায় সে হেরে যায়।

সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ সৈন্যরা উদ্ধত অত্যাচারী হয়ে ওঠে। জানবাজারে রাণী রাসমণির বাড়ির কাছেই ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে একদল ইংরেজ সৈন্য থাকত। তারা এ এলাকায় উপদ্রব করত। দল বেঁধে তারা রাস্তায় ঘুরত, সুবিধা পেলেই পথচারীদের অপমান ও উৎপীড়ন করত। পথের পাশের দোকানগুলি থেকে জিনিসপত্র টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যেত। একদিন সন্ধ্যাবেলা চারজন মাতাল ইংরেজ সৈনিক রাসমণির বাড়ির সামনেই জনৈক পথচারীর সর্বস্ব লুট করে তাকে বেদম মারতে থাকে। ছাদ থেকে রাণীর জামাইরা তা দেখতে পান ও দারোয়ানদের আদেশ দেন ঐ নিগৃহীত লোকটিকে বাঁচাতে। হুকুম তামিল করল দারোয়ানরা—ইংরেজ সৈন্য চারজনকে দু চার ঘা মেরেও দিল তারা। মার খেয়ে চারজন ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ব্যারাকে গিয়ে খবর দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ষাট জন সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য এসে রাসমণির বাড়ি আক্রমণ করল। ফটক বন্ধ ছিল, ভেঙে ফেলল সে ফটক তারা। বাড়ির ভিতর ঢুকে তারা তাণ্ডব সুরু করে দিল।

রাসমণির জামাইরা প্রাণ ভয়ে বাড়ির খিড়কি দিয়ে পালিয়ে মান্না বাবুদের বাড় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেদিন ঘটনার সময় সেজো জামাই মথুরানাথ বাড়ি ছিলেন না। দারোয়ানরা ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত, কেউ বা স্থানত্যাগী। ইংরেজ সৈন্যরা প্রমত্ত ভাবে লুটপাট সুরু করল ও অন্দর মহলে ঢুকতে উদ্যোগী হল।

রাণী সেই পরিস্থিতিতে একাকী কোষমুক্ত তরবারি হাতে রঘুনাথজীর মন্দিরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। রাত তখন দশটা। ততক্ষণে মথুরানাথ ফিরেছেন ও ফটকে দাঁড়িয়েই ভিতরের সব সংবাদ জেনেছেন। তিনি কলিঙ্গা

বাজারে গিয়ে এক পুলিশ ইনসপেকটরকে ধরেছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের সামরিক ব্যারাকে। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ককে ঘটনা ও তার গুরুত্ব জানিয়েছেন। অধিনায়ক সঙ্গে সঙ্গে রাণীর বাড়িতে এসে সৈন্যদের সংযত করে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। যত জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছিল সব ক্ষতিপূরণ গবর্ণমেণ্ট রাণীকে দেন।

দেশী অত্যাচারীদেরও রেয়াৎ করেননি রাণী। তাঁর জগন্নাথপুর তালুকের চার দিক ঘিরে ছিল নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের জমিদারি। রামরতনের নজর পড়েছিল জগন্নাথপুর তালুকের ওপর—ওটি নিয়ে নিতে পারলে তাঁর জমিদারি ভরাট হয়ে ওঠে। রাণী বিক্রী করবেন না। অতএব রামরতন অন্য পথ নিলেন। তিনি জগন্নাথপুরের প্রজাদের ঘর জ্বালানো, লুট এমনকি নরহত্যা সুরু করলেন। খবর পেয়ে রাসমণি এমন প্রচণ্ড পালটা ব্যবস্থা নেন যে রামতন তাঁর ইচ্ছাটুকু চিরতরে ভুলে যান।

তবু সংঘর্ষেও নয়, গণ-কল্যাণেই রাসমণির ব্যক্তিত্বের উদারতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। মধুমতী নদীর সঙ্গে নবগঙ্গার যোগ ঘটিয়েছিলেন তিনি দশ হাজার টাকা ব্যয়ে টোনার খাল কাটিয়ে। এই খাল কৃষিতে সেচ ও জলনিকাশীর বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। প্রজারা উপকৃত হয়।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে রাণী রথযাত্রার আয়োজন করেছিলেন কলকাতায়। চাকা ছাড়া এই বিশাল রথের বাকি সব অংশই রূপার, গড়ে দিয়েছিল বাঙালী কারিগররা। রথ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠায় সওয়া লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। কলকাতার পথে রথ টানা হয়েছিল এক শতের বেশি বাজনদার, শত শত গায়কের উচ্চ বাজনা ও গান সহযোগে। চার পাঁচ শত লোক রথ টেনেছিল। রাণীর কুলগুরু ও জামাইরা গিয়েছিলেন রথের আগে আগে খালি পায়ে হেঁটে। এক কুইণ্টাল জুঁইফুলই ছড়ানো হয়েছিল। এই রথযাত্রা কলকাতায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আরও বিখ্যাত ছিল রাসমণির দুর্গোৎসব। রাজচন্দ্রের সময় থেকেই এই দুর্গোৎসব সুরু হয়, রাণীর আমলে তার ধূমধাম বাড়ে। সেকালে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা খরচ হত এ দুর্গোৎসবে। পাঁচ শত মহিলাকে শাড়ি, শাঁখা ও সিন্দুর এবং এক হাজারের বেশি কুমারীকে নববস্ত্র দান ও আহার করানো হত। দাশুরায়ের পাঁচালী, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা, আখড়াই ইত্যাদি হত আট দিন ধরে। এক বছর ষষ্ঠী পূজার দিন প্রত্যুষে ব্রাহ্মণগণ বহু বাজনদার

পাঠায়। তাতে আমার জেলে প্রজাদের বিশেষ ক্ষতি হয়। আইনমাফিক গঙ্গাপথ আমি বন্ধ করতে পারি। তবে আপনারা মৎস্য-কর প্রত্যাহার করলে আমি আমার অধিকার স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেব।

বেগতিক বুঝে সরকার মৎস্য-কর প্রত্যাহার করে নিলেন ও রাণীকে জমার টাকাও ফেরৎ দিলেন। গঙ্গা মুক্ত হল, জেলেরাও নির্বাধে মাছ ধরতে লাগল।

মকিনপুর পরগণায় রাসমণির জমিদারিতে ডোনালড সাহেব ছিল নীলকর। সে প্রজাদের ওপর অত্যাচার করত। রাণী খবর পেয়ে পালোয়ান-লেঠেল লাগালেন। তারা ডোনালড ও তার দলবলকে প্রহার করল। হতভম্ব ডোনালড পালটা আঘাত হানার কথা ভাবতেই পারেনি। সে আদালতে মামলা এনেছিল। মামলায় সে হেরে যায়।

সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ সৈন্যরা উদ্ধত অত্যাচারী হয়ে ওঠে। জানবাজারে রাণী রাসমণির বাড়ির কাছেই ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে একদল ইংরেজ সৈন্য থাকত। তারা এ এলাকায় উপদ্রব করত। দল বেঁধে তারা রাস্তায় ঘুরত, সুবিধা পেলেই পথচারীদের অপমান ও উৎপীড়ন করত। পথের পাশের দোকানগুলি থেকে জিনিসপত্র টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যেত। একদিন সন্ধ্যাবেলা চারজন মাতাল ইংরেজ সৈনিক রাসমণির বাড়ির সামনেই জনৈক পথচারীর সর্বস্ব লুট করে তাকে বেদম মারতে থাকে। ছাদ থেকে রাণীর জামাইরা তা দেখতে পান ও দারোয়ানদের আদেশ দেন ঐ নিগৃহীত লোকটিকে বাঁচাতে। হুকুম তামিল করল দারোয়ানরা—ইংরেজ সৈন্য চারজনকে দু চার ঘা মেরেও দিল তারা। মার খেয়ে চারজন ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ব্যারাকে গিয়ে খবর দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ষাট জন সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য এসে রাসমণির বাড়ি আক্রমণ করল। ফটক বন্ধ ছিল, ভেঙে ফেলল সে ফটক তারা। বাড়ির ভিতর ঢুকে তারা তাণ্ডব সুরু করে দিল।

রাসমণির জামাইরা প্রাণ ভয়ে বাড়ির খিড়কি দিয়ে পালিয়ে মান্না বাবুদের বাড গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেদিন ঘটনার সময় সেজো জামাই মথুরানাথ বাড়ি ছিলেন না। দারোয়ানরা ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত, কেউ বা স্থানত্যাগী। ইংরেজ সৈন্যরা প্রমত্ত ভাবে লুটপাট সুরু করল ও অন্দর মহলে ঢুকতে উদ্যোগী হল।

রাণী সেই পরিস্থিতিতে একাকী কোষমুক্ত তরবারি হাতে রঘুনাথজীর মন্দিরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। রাত তখন দশটা। ততক্ষণে মথুরানাথ ফিরেছেন ও ফটকে দাঁড়িয়েই ভিতরের সব সংবাদ জেনেছেন। তিনি কলিঙ্গা

বাজারে গিয়ে এক পুলিশ ইনসপেকটরকে ধরেছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের সামরিক ব্যারাকে। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ককে ঘটনা ও তার গুরুত্ব জানিয়েছেন। অধিনায়ক সঙ্গে সঙ্গে রাণীর বাড়িতে এসে সৈন্যদের সংযত করে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। যত জিনিসপত্র নষ্ট হয়েছিল সব ক্ষতিপূরণ গবর্ণমেণ্ট রাণীকে দেন।

দেশী অত্যাচারীদেরও রেয়াৎ করেননি রাণী। তাঁর জগন্নাথপুর তালুকের চার দিক ঘিরে ছিল নড়াইলের জমিদার রামরতন রায়ের জমিদারি। রামরতনের নজর পড়েছিল জগন্নাথপুর তালুকের ওপর—ওটি নিয়ে নিতে পারলে তাঁর জমিদারি ভরাট হয়ে ওঠে। রাণী বিক্রী করবেন না। অতএব রামরতন অন্য পথ নিলেন। তিনি জগন্নাথপুরের প্রজাদের ঘর জ্বালানো, লুট এমনকি নরহত্যা সুরু করলেন। খবর পেয়ে রাসমণি এমন প্রচণ্ড পালটা ব্যবস্থা নেন যে রামতন তাঁর ইচ্ছাটুকু চিরতরে ভুলে যান।

তবু সংঘর্ষেও নয়, গণ-কল্যাণেই রাসমণির ব্যক্তিত্বের উদারতা বেশি প্রকাশ পেয়েছে। মধুমতী নদীর সঙ্গে নবগঙ্গার যোগ ঘটিয়েছিলেন তিনি দশ হাজার টাকা ব্যয়ে টোনার খাল কাটিয়ে। এই খাল কৃষিতে সেচ ও জলনিকাশীর বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। প্রজারা উপকৃত হয়।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে রাণী রথযাত্রার আয়োজন করেছিলেন কলকাতায়। চাকা ছাড়া এই বিশাল রথের বাকি সব অংশই রূপার, গড়ে দিয়েছিল বাঙালী কারিগররা। রথ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠায় সওয়া লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। কলকাতার পথে রথ টানা হয়েছিল এক শতের বেশি বাজনদার, শত শত গায়কের উচ্চ বাজনা ও গান সহযোগে। চার পাঁচ শত লোক রথ টেনেছিল। রাণীর কুলগুরু ও জামাইরা গিয়েছিলেন রথের আগে আগে খালি পায়ে হেঁটে। এক কুইণ্টাল জুঁইফুলই ছড়ানো হয়েছিল। এই রথযাত্রা কলকাতায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আরও বিখ্যাত ছিল রাসমণির দুর্গোৎসব। রাজচন্দ্রের সময় থেকেই এই দুর্গোৎসব সুরু হয়, রাণীর আমলে তার ধূমধাম বাড়ে। সেকালে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা খরচ হত এ দুর্গোৎসবে। পাঁচ শত মহিলাকে শাড়ি, শাঁখা ও সিন্দুর এবং এক হাজারের বেশি কুমারীকে নববস্ত্র দান ও আহার করানো হত। দাশুরায়ের পাঁচালী, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা, আখড়াই ইত্যাদি হত আট দিন ধরে। এক বছর ষষ্ঠী পূজার দিন প্রত্যূষে ব্রাহ্মণগণ বহু বাজনদার

সঙ্গে নিয়ে গঙ্গায় নবপত্রিকা স্নান করাতে যাচ্ছিলেন। বাজনার শব্দে বাবু রোডের পাশে এক বাড়িতে এক সাহেবের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বাজনা থামাতে আদেশ দেন। রাসমণির লোকরা সম্ভবত মালিকের তেজে তেজীয়ান ছিল, তারা সাহেবের কথায় কান দেয়নি। সাহেব পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। দুর্গোৎসব মিটে যাবার পরই রাণীর ওপর সরকার কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। রাণী আদালতে মামলা করলেন। মামলার সময় রাণী আদালতকে তাঁর আইনজ্ঞ মারফত সরকারী সনদ দেখান ও বলেন : বাবু রোড আমার রাস্তা। আমি যা ইচ্ছা তা করব। সরকার আমার কাজে বাধা দিলে যে ব্যয়ে আমি রাস্তা করেছি তার দ্বিগুণ ব্যয়ে রাস্তা ভেঙে দেব। উল্লেখ থাকে যে ভারতের বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের দেওয়া সনদ বলে বাবু রোড নির্মাণ করেছিলেন রাজচন্দ্র দাস।

তবু মামলায় হারলেন রাণী। সরকারী আদেশ অমান্য করার অপরাধে তাঁর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হল। জরিমানা দিয়ে দিলেন রাণী। কিন্তু পরদিনই জানবাজারে তাঁর বাড়ি থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত বাবু রোডের দু পাশে বড় বড় গরানকাঠের বেড়া দিয়ে পথ বন্ধ করে দিলেন। এই রাস্তাটি চৌরঙ্গী এলাকায় বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড ও রাসমণি রোড। এ রাস্তা বন্ধ করলে চলেনা—অতি ব্যবহৃত এই রাস্তা। এ রাস্তা বন্ধ করলে চৌরঙ্গী রোড, রেড রোড ইত্যাদিও বন্ধ হয়ে যায়। তাই পরদিনই সরকার আদেশ পাঠালেন : অবিলম্বে বেড়া খুলে ফেলতে হবে। রাণী জবাব দিলেন : রাস্তা আমার। আমার রাস্তায় সরকারের কোনো দরকার থাকলে আমাকে উপযুক্ত মূল্য দিলে আমি রাস্তা খুলে দেব। নতুবা খুলব না।

রাণীর এই তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্বে কলকাতায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। সরকারও আর না ঘাঁটিয়ে রাণীর দেওয়া জরিমানা পঞ্চাশ টাকা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিলেন ও অনুরোধ করে রাস্তা খোলালেন। রাসমণি বাবু রোডটি বরাবর তাঁর খাসে রেখেছিলেন— সরকারকে দেননি।

১২৫৭ সালে রাসমণি জগন্নাথ দর্শনে পুরী গিয়েছিলেন। তখন কলকাতা-পুরী রেলপথ হয়নি। গঙ্গায় বঙ্গোপসাগর গিয়ে বঙ্গোপসাগর বেয়ে পুরী যাওয়া যেত—স্থলপথও ছিল। সাগর পথে নৌকায় যাচ্ছিলেন রাণী। সাগর সঙ্গমের কাছেই ভীষণ ঝড়ে পড়েন তিনি। যাহোক সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে তিনি দেখেন যে পুরী যাবার পথ ভালো অবস্থায় নেই। সুবর্ণরেখা থেকে পুরী পর্যন্ত

তিনি ভালো পথ নির্মাণ করান। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে তিনি হীরকখচিত তিনটি মুকুট দেন। খরচ পড়েছিল প্রায় ষাট হাজার টাকা।

কালীঘাটে স্নানঘাট, কোথায় স্নানঘাট এসব নির্মাণ ছাড়াও রাণীর দান এত বেশি ছিল যে সারা বাংলায় তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ে। জমিদারির কাগজপত্রে তাঁর শীলমোহরে উৎকীর্ণ ছিল এই কথা :

কালীপদ অভিলাষিণী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।

তাঁর জীবনযাপনও ছিল সাত্ত্বিক, সংযত, ধর্মপরায়ণ অথচ জমিদারি ও বৈষয়িক কর্ম পরিচালনায় তাঁর কোনো শিথিলতা ছিল না। সে বিষয়ে তিনি ছিলেন নিপুণ ও নির্মোহ।

কাশীধামে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনের ইচ্ছা বহুদিন যাবত মনে পোষণ করলেও নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। ১২৫৫ বঙ্গাব্দে রাণী এই ইচ্ছা পূর্ণ করার অভিলাষ করলেন।

তখনো কলকাতা-কাশী রেলপথ হয়নি। তখন গঙ্গানদীই ছিল যাবার প্রশস্ত উপায়। আত্মীয় স্বজন, লোকজন নিয়ে রাণীর সঙ্গী-সঙ্গিনী হল অনেক। একশোখানি ছোট ও বড় নৌকা সাজানো হল। ছয় মাসের খাদ্যদ্রব্য তোলা হল। বড় নৌকাগুলি বজরা।

যেদিন কলকাতা থেকে নোঙর তুলে যাত্রা সুরু করার কথা তার ঠিক আগের রাতে রাণী স্বপ্নে ইষ্ট দেবীর দর্শন পেলেন।

দেবী বললেন : কাশী যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভাগীরথীতীরে মনোরম জায়গা দেখে আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। নিত্যপূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমার মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে তোমার নিত্যপূজা ও ভোগ আমি গ্রহণ করব।

কোনো কোনো মতে রাণীর বজরা-বহর কলকাতা থেকে শুভক্ষণে রওনা হয়ে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল। সেদিন ঐখানেই রাতের বিশ্রাম নির্দিষ্ট হয়। ঐখানেই বজরার শয্যায় রাণী স্বপ্ন দেখেন।

যাই হোক, কাশীযাত্রা বন্ধ হয়ে গেল। রাসমণি আর কাশী যাননি কোনোদিন।

স্বপ্নাদেশে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে রাণী জমি খুঁজতে লাগলেন মন্দির প্রতিষ্ঠা কল্পে। কথায় আছে, গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। ভাগীরথীর

পশ্চিম তীরে বালি, উত্তরপাড়া ইত্যাদি গ্রামে জমি খোঁজা হয়েছিল। পাওয়া যায়নি। ওখানকার জমিদাররা চড়া দামেও রাণীকে এক লপ্তে বেশি জমি দিতে রাজি হননি। তাঁদের অভিমান ছিল—তাঁদের এলাকায় অন্য কেউ স্নানঘাট প্রতিষ্ঠা করলে সেই ঘাটে তাঁরা স্নান করবেন না। রাণী বাধ্য হয়েই ভাগীরথীর পূর্ব তীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে জমি কেনেন। তখন বোঝা যায়নি কিন্তু এখন স্পষ্ট যে কলকাতা ও সারা দেশের লোকের পক্ষে দক্ষিণেশ্বরের বর্তমান মন্দির-স্থানটি যতটা সুগম বালি-উত্তরপাড়া ততটা নয়। রাসমণি ও মথুর দক্ষিণেশ্বরে সহজে যাতায়াত করতে পেরেছেন; রামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী অবিরত কলকাতা-দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করেছেন—গঙ্গার পরপারে বালি-উত্তরপাড়া থেকে যাতায়াত ততটা সুবিধাজনক হত না। বিশেষত সেকালে বিবেকানন্দ সেতু হয়নি, নৌকাই নদী পারাপারের প্রধান ভরসা ছিল।

সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন ছাড়াও স্থান নির্বাচনের পিছনে ভবতারিণীর আরও কোনো গূঢ় ইচ্ছা হয়তো ছিল। অন্তত: এখানে জমিদারদের দাপট নেই। কারও অহমিকা এখানে মানুষের সহজ যাতায়াতে কোনোদিন বাধা সৃষ্টি করেনি।

বর্তমান দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও সংলগ্ন ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের এটর্ণি জেমস হেস্টি সাহেবের কুঠি ছিল। অন্য অংশে ছিল মুসলমানদের কবরডাঙ্গা ও গাজিপীরের থান। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর কুঠি সমেত ষাট বিঘা জমি হেস্টি সাহেবের নিকট থেকে রাসমণি কেনেন পঞ্চান্ন হাজার টাকা দামে। বিক্রী কবালায় দেখা যায়: Deed of Conveyance, Date of purchase of the temple grounds 6th September, 1847. Date of Registration, 27th August 1861. জমিটি কচ্ছপের পিঠের মতো আকৃতিযুক্ত ছিল। তন্ত্রে বলে ওরকম শ্মশান শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এ যেন মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দেবনির্দিষ্ট স্থান।

সেসময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রেল লাইন ছিল না। ওদিকে কতগুলি বাগান ছিল, যথা যদু মল্লিকের বাগান। উত্তরে সরকারের বারুদখানা ছিল, এখন উইমকো দিয়াশলাই কারখানা আছে। পশ্চিমে ভাগীরথী। ভাগীরথী পাড় ভাঙে বলে রাণী প্রথমে ইটের উঁচু পোস্তা ও ঘাট বাঁধান। কিন্তু পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ঘুসুড়ির টেক থেকে আসা বানের জলের

আঘাতে ঐ পোস্তা ও ঘাট ভেঙে যায়। তখন রাসমণি ম্যাকিন্টশ কোম্পানীকে পাকা মজবুত ঘাট ও পোস্তা নির্মাণের দায়িত্ব দেন। এ বাবত ঐ কোম্পানীর সঙ্গে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকার চুক্তি হয়। ঘাটের দু-পাশে উত্তরে ও দক্ষিণে পোস্তা। গঙ্গা থেকে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই চাঁদনি। চাঁদনির দুদিকে ছয়টি ছয়টি করে বারোটি শিবমন্দির। দক্ষিণে ছয়টি মন্দিরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যথাক্রমে যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাগেশ্বর, নন্দীশ্বর বা নন্দিকেশ্বর ও নরেশ্বর শিবলিঙ্গ। উত্তরে ছয়টি মন্দিরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যথাক্রমে যোগেশ্বর, যত্নেশ্বর, জটিলেশ্বর, নকুলেশ্বর, নাকেশ্বর ও নির্জনেশ্বর শিবলিঙ্গ। এই দ্বাদশ শিবমন্দিরে সাদা ও কালো পাথরে মেঝে বাঁধানো। প্রতি মন্দিরে গোল বেদীর ওপর কালো পাথরের শিবলিঙ্গ ও শিবের পূব দিকে কালো পাথরের ষাঁড়। শিবদের নিত্য পূজা হয়। শিবরাত্রিতে ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা-দিবসে শিবপূজার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণেশ্বরের দ্বাদশ শিবমন্দিরের খ্যাতি বহুবিস্তৃত। গঙ্গাপথে নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ শিবমন্দির দেখতে পায়।

দ্বাদশ শিবমন্দিরের পূর্বে বিশাল উঠান। এই পাকা উঠানটি দৈর্ঘ্যে ৪৫০ ফুট ও প্রস্থে ২২০ ফুট। উঠানের পুব দিকে নয়টি চূড়া বিশিষ্ট (বা নবরত্ন) ভবতারিণীর মন্দির। মন্দিরের মাথায় প্রথমে চারটি চূড়া। এর মধ্যে দক্ষিণ-পূব কোণের চূড়াটি প্রবল ঝড়ে বেঁকে যায় কিন্তু ভাঙেনি। ঐ চারটি চূড়ার মাথায় আরও চারটি চূড়া ও সবার ওপরে একটি চূড়া। একবার ভবতারিণী মন্দিরে বজ্রপাত হয়েছিল। তার ফলে ভবতারিণীর মূর্তির চার-পাশের মর্মর পাথরগুলি ভেঙে দীর্ণ হয়ে যায়—কিন্তু ভবতারিণী মূর্তির কোনো ক্ষতি হয়নি।

ভবতারিণীর মন্দিরের মেঝে সাদা কালো পাথরে গড়া। কালো পাথরে গড়া সোপানযুক্ত, দ্বিস্তবক বেদী, বেদীর ওপর রূপার সহস্রদল পদ্ম, পদ্মে সাদা পাথরের শিব শায়িত। ঐ সহস্রদলের পরিধি প্রায় তিন হাত। শিবের মাথা দক্ষিণদিকে, পা উত্তরে। শিবের বুকে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন কালো পাথরের ভবতারিণী মূর্তি। বারাণসী চেলী ও অলঙ্কারে সজ্জিতা মা। পায়ে আলতা, নুপুর, গুজরী-পঞ্চম, চুটকী ও পাঁজেব আর জবা বেলপাতা। পাঁজেব পশ্চিমা মেয়েরা পরত। রামকৃষ্ণ সাধ করায় মথুরবাবু মাকে পাঁজেব পরিয়েছিলেন। মায়ের কটিতে নিমফল, কোমর পাটা ও সোনার নরকর-

পশ্চিম তীরে বালি, উত্তরপাড়া ইত্যাদি গ্রামে জমি খোঁজা হয়েছিল। পাওয়া যায়নি। ওখানকার জমিদাররা চড়া দামেও রাণীকে এক লপ্তে বেশি জমি দিতে রাজি হননি। তাঁদের অভিমান ছিল—তাঁদের এলাকায় অন্য কেউ স্নানঘাট প্রতিষ্ঠা করলে সেই ঘাটে তাঁরা স্নান করবেন না। রাণী বাধ্য হয়েই ভাগীরথীর পূর্ব তীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে জমি কেনেন। তখন বোঝা যায়নি কিন্তু এখন স্পষ্ট যে কলকাতা ও সারা দেশের লোকের পক্ষে দক্ষিণেশ্বরের বর্তমান মন্দির-স্থানটি যতটা সুগম বালি-উত্তরপাড়া ততটা নয়। রাসমণি ও মথুর দক্ষিণেশ্বরে সহজে যাতায়াত করতে পেরেছেন; রামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী অবিরত কলকাতা-দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করেছেন—গঙ্গার পরপারে বালি-উত্তরপাড়া থেকে যাতায়াত ততটা সুবিধাজনক হত না। বিশেষত সেকালে বিবেকানন্দ সেতু হয়নি, নৌকাই নদী পারাপারের প্রধান ভরসা ছিল।

সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন ছাড়াও স্থান নির্বাচনের পিছনে ভবতারিণীর আরও কোনো গূঢ় ইচ্ছা হয়তো ছিল। অন্ততঃ এখানে জমিদারদের দাপট নেই। কারও অহমিকা এখানে মানুষের সহজ যাতায়াতে কোনোদিন বাধা সৃষ্টি করেনি।

বর্তমান দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও সংলগ্ন ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের এটর্ণি জেমস হেস্টি সাহেবের কুঠি ছিল। অন্য অংশে ছিল মুসলমানদের কবরডাঙ্গা ও গাজিপীরের থান। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর কুঠি সমেত ষাট বিঘা জমি হেস্টি সাহেবের নিকট থেকে রাসমণি কেনেন পঞ্চান্ন হাজার টাকা দামে। বিক্রী কবালায় দেখা যায়: Deed of Conveyance, Date of purchase of the temple grounds 6th September, 1847. Date of Registration, 27th August 1861. জমিটি কচ্ছপের পিঠের মতো আকৃতিযুক্ত ছিল। তন্ত্রে বলে ওরকম শ্মশান শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এ যেন মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দেবনির্দিষ্ট স্থান।

সেসময় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রেল লাইন ছিল না। ওদিকে কতগুলি বাগান ছিল, যথা যদু মল্লিকের বাগান। উত্তরে সরকারের বারুদখানা ছিল, এখন উইমকো দিয়াশলাই কারখানা আছে। পশ্চিমে ভাগীরথী। ভাগীরথী পাড় ভাঙে বলে রাণী প্রথমে ইটের উঁচু পোস্তা ও ঘাট বাঁধান। কিন্তু পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ঘুসুড়ির টেক থেকে আসা বানের জলের

আঘাতে ঐ পোস্তা ও ঘাট ভেঙে যায়। তখন রাসমণি ম্যাকিন্টশ কোম্পানীকে পাকা মজবুত ঘাট ও পোস্তা নির্মাণের দায়িত্ব দেন। এ বাবত ঐ কোম্পানীর সঙ্গে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকার চুক্তি হয়। ঘাটের দু-পাশে উত্তরে ও দক্ষিণে পোস্তা। গঙ্গা থেকে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই চাঁদনি। চাঁদনির দুদিকে ছয়টি ছয়টি করে বারোটি শিবমন্দির। দক্ষিণে ছয়টি মন্দিরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যথাক্রমে যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাগেশ্বর, নন্দীশ্বর বা নন্দিকেশ্বর ও নরেশ্বর শিবলিঙ্গ। উত্তরে ছয়টি মন্দিরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যথাক্রমে যোগেশ্বর, যত্নেশ্বর, জটিলেশ্বর, নকুলেশ্বর, নাকেশ্বর ও নির্জনেশ্বর শিবলিঙ্গ। এই দ্বাদশ শিবমন্দিরে সাদা ও কালো পাথরে মেঝে বাঁধানো। প্রতি মন্দিরে গোল বেদীর ওপর কালো পাথরের শিবলিঙ্গ ও শিবের পূব দিকে কালো পাথরের ষাঁড়। শিবদের নিত্য পূজা হয়। শিবরাত্রিতে ও মন্দির-প্রতিষ্ঠা-দিবসে শিবপূজার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণেশ্বরের দ্বাদশ শিবমন্দিরের খ্যাতি বহুবিস্তৃত। গঙ্গাপথে নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ শিবমন্দির দেখতে পায়।

দ্বাদশ শিবমন্দিরের পূর্বে বিশাল উঠান। এই পাকা উঠানটি দৈর্ঘ্যে ৪৫০ ফুট ও প্রস্থে ২২০ ফুট। উঠানের পূব দিকে নয়টি চূড়া বিশিষ্ট (বা নবরত্ন) ভবতারিণীর মন্দির। মন্দিরের মাথায় প্রথমে চারটি চূড়া। এর মধ্যে দক্ষিণ-পূব কোণের চূড়াটি প্রবল ঝড়ে বেঁকে যায় কিন্তু ভাঙেনি। ঐ চারটি চূড়ার মাথায় আরও চারটি চূড়া ও সবার ওপরে একটি চূড়া। একবার ভবতারিণী মন্দিরে বজ্রপাত হয়েছিল। তার ফলে ভবতারিণীর মূর্তির চার-পাশের মর্মর পাথরগুলি ভেঙে দীর্ণ হয়ে যায়—কিন্তু ভবতারিণী মূর্তির কোনো ক্ষতি হয়নি।

ভবতারিণীর মন্দিরের মেঝে সাদা কালো পাথরে গড়া। কালো পাথরে গড়া সোপানযুক্ত, দ্বিস্তবক বেদী, বেদীর ওপর রূপার সহস্রদল পদ্ম, পদ্মে সাদা পাথরের শিব শায়িত। ঐ সহস্রদলের পরিধি প্রায় তিন হাত। শিবের মাথা দক্ষিণদিকে, পা উত্তরে। শিবের বুকে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন কালো পাথরের ভবতারিণী মূর্তি। বারাণসী চেলী ও অলঙ্কারে সজ্জিতা মা। পায়ে আলতা, নুপুর, গুজরী-পঞ্চম, চুটকী ও পাঁজেব আর জবা বেলপাতা। পাঁজেব পশ্চিমা মেয়েরা পরত। রামকৃষ্ণ সাধ করায় মথুরবাবু মাকে পাঁজেব পরিয়েছিলেন। মায়ের কটিতে নিমফল, কোমর পাটা ও সোনার নরকর-

মালা। অগ্রহাতে বালা, নারকেল ফুল, পৈঁচে, বাউটি। মধ্যহাতে তাড়, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দুলছে। বাম হাত দুটিতে খড়্গ ও নরমুণ্ড, দক্ষিণ দুটি হাতেই বরাভয় মুদ্রা। গলায় চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারাহার ও সোনার মুণ্ডমালা। নাকে নথ, নোলক দেওয়া। কাণে কাণবালা, কাণপাশা, ফুলঝুমকো, চৌদানী ও মাছ। মাথায় সোনার মুকুট। প্রতিমার পিছনে বারাণসী বস্ত্রখণ্ড টানানো। বেদীর চার কোণে চারটি রূপার স্তম্ভ, তার ওপর রূপার ফ্রেমে চন্দ্রাতপ। মা দক্ষিণাস্যা।

কালীমন্দিরের সামনে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে নাটমন্দির। বিরাট আকার তার। এ নাটমন্দিরে এখন প্রতিদিন শত শত লোক গান করে, শোনে ও সন্ধ্যায় মায়ের আরতি দেখে। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলির স্থান। নাট-মন্দিরের ছাদ ষোলোটি থামের ওপর রয়েছে।

কালী মন্দিরের উত্তরে বিষ্ণুমন্দির। এখানে রাধা ও রাধাকান্তের পূজা হয়।

মন্দিরের দক্ষিণ দিকের কয়েকটি ঘরে অফিস। পূবের কয়েকটি ঘরে কর্মচারীরা থাকেন ও আসবাবপত্র রাখা হয়। ভাণ্ডার, ভোগঘর ও নৈবেদ্য ঘর এখানে। উত্তরের ঘরগুলি অতিথিশালা। মন্দিরের দক্ষিণে ও উত্তরে দুটি নহবৎখানা।

মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করতে লেগেছিল দশ বছর, ১২৫৪-১২৬৩ বঙ্গাব্দ। জমি কেনা, মন্দির নির্মাণ ও মন্দিরের খরচপত্র চালাবার উদ্দেশ্যে দিনাজপুরে ক্রীত জমিদারী, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে বহু টাকা ব্যয় হয়। জমি ক্রয়ের কবালা থেকে জানা যায় যে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার শালবাড়ী পরগণার জমিদারি ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট থেকে কেনা হয়েছিল ২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকায়। মন্দির নির্মাণে ও প্রতিষ্ঠা-উৎসবে খরচ হয় নয় লক্ষ টাকা।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ব্যয়বহনার্থ রাসমণি যে দিনাজপুরের জমিদারি রেখে যান তার বার্ষিক আয় ছিল সেকালেই পঁয়ষট্টি হাজার টাকা। তা থেকে সরকারের খাজনা বাইশ হাজার টাকা, রোডসেস পাঁচ হাজার টাকা, অন্যান্য ব্যয় চার হাজার টাকা বাদ দিলে বার্ষিক নীট আয় ছিল চৌত্রিশ হাজার টাকা। দিনাজপুর বর্তমানে বাংলাদেশভুক্ত; তার আয় আসা বন্ধ হয়ে যায় দেশভাগের পর।

রাসমণির সময়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে কর্মচারী ছিলেন পঞ্চাশ জন—বার্ষিক বেতন ছিল তিন হাজার টাকা। কর্মচারীদের বেতন, মন্দিরের জমির খাজনা, নিত্য ব্যয় ও পর্বোপলক্ষে বিশেষ ব্যয় ইত্যাদি নিয়ে মন্দিরের মোট বার্ষিক ব্যয় ছিল সাড়ে সাত হাজার টাকা। অতএব রাসমণি যে বন্দোবস্ত করে যান মন্দিরের যাবতীয় ব্যয় সংকুলান হয়েও টাকা উদ্বৃত্ত থাকার কথা। তখন মন্দিরে কোনো আয় ছিল না—ও ছিল খরচের উৎস, আয়ের নয়। দেশ ভাগ হবার পর দিনাজপুরের জমিদারি চলে গেলেও দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন মন্দিরে আসেন—পর্বোপলক্ষে লোকসমাগম বাড়ে। তাঁদের শ্রদ্ধার নিবেদনে মন্দিরের খরচাদি স্বচ্ছন্দে নির্বাহ হয়ে যায়। এছাড়া মন্দির কর্তৃপক্ষ সংলগ্ন জমিতে কয়েকটি দোকানঘর ভাড়া দিয়েছেন, তারও আয় আছে।

মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে যাবার আগেই রাণী রাসমণি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ—১৮৫৫ খৃঃ ৩১শে মে। ঐদিন ছিল স্নানযাত্রা। রাণী দীর্ঘদিন প্রতীক্ষায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন; ভেবেছিলেন, বয়স হয়েছে—৬২ বছর বয়স, হয়তো জীবদ্দশায় মায়ের প্রতিষ্ঠা ও পূজা দেখে যেতে পারবেন না, তাই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হবার আগেই এই প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করেন।

তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল মা ভবতারিণীকে নিত্য অন্নভোগ দেওয়া। কিন্তু মাহিষ্য বংশ, শূদ্রাণী—দেশী রীতিতে তাঁর দেবীকে অন্নভোগ দান নিষিদ্ধ। রাণী নানা স্থানে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে লোক পাঠালেন পাঁতি আনতে। কোনো পণ্ডিত শূদ্রাণীর অন্নভোগ দানের পক্ষে মত দিলেন না। রাণীর ব্যাকুল প্রাণ তাতে শান্তি পায়নি। অন্ধকারে হঠাৎ বিদ্যুদ্দামের মতো ঝামাপুকুর টোল থেকে এল রামকুমারের রায়—মন্দির প্রতিষ্ঠার আগেই মন্দির যদি কোনো ব্রাহ্মণকে দান করেন রাণী এবং সেই ব্রাহ্মণ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন তাহলে তা শাস্ত্রনিয়মবিরুদ্ধ হবে না ও ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ ঐ মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করলেও তাঁদের দোষ হবে না।

এই ব্যবস্থা পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হল রাসমণির মন। মা কি পর? মেয়ে হয়ে মাকে দুটি অন্ন দিতে পারব না? শাস্ত্রীয় বিধি কোনোমতেই এতদিন তাঁকে প্রবোধ দিতে পারে নি, এখন দিল। তিনি স্বীয় গুরুর নামে মন্দির ও সংলগ্ন সম্পত্তি উৎসর্গ করে দিলেন। গুরুর অনুমোদনে দেবসেবার

তত্ত্বাবধায়ক পদে কর্মচারী রূপে রাণী রাসমণি নিযুক্তা হলেন। এতেও বহু ব্রাহ্মণ বাধা দিয়েছেন; বলেছেন, এতে দোষ খণ্ডাবে না। সে কথা আর কাণে তোলেননি রাসমণি।

গুরুকে মন্দির ও মন্দিরের সম্পত্তি অর্পণ করলেও গুরু ও গুরুবংশের লোকরা যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন, শাস্ত্রবিধি মেনে নিষ্ঠাভরে দেবসেবায় অক্ষম তা রাণী জানতেন। তিনি চাইছিলেন সৎ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা এ মন্দিরে দেবসেবার ভার নিন।

কিন্তু তাঁরা কোথায়? শূদ্রাণী প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পৌরোহিত্য করা দূরে থাকুক ঐ মন্দিরের ত্রিসীমায় আসতেই চান না তাঁরা, মন্দিরের দেববিগ্রহকে প্রণাম করাও অবান্তর মনে করেন। রাণী রাসমণির ব্রাহ্মণ গুরুবংশ—কালীঘাটের হালদার তাঁরা—শূদ্রের গুরু বলে ব্রাহ্মণসমাজে নিন্দিত ছিলেন।

পূজক না পেয়েও রাণী দমেননি। তিনি বেতন ও পারিতোষিকের হার বাড়ালেন ও চারদিকে যোগ্য লোক খুঁজতে পাঠালেন। কামারপুকুরের কাছের শিওড় গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাসমণির এস্টেটে কর্মচারী ছিলেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূজক পাচক ইত্যাদি ব্রাহ্মণ কর্মচারী জোগাড় করার ভার নেন। প্রথমে তিনি নিজের দাদা ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বুঝিয়ে রাধাগোবিন্দের পূজার ভার নিতে রাজি করান। একজন ব্রাহ্মণ কাজ নেওয়ায় আরও ব্রাহ্মণ কর্মচারী জুটে গেল। কিন্তু জুটল না ভবতারিণীর পূজার ভার নেবার লোক। কিছুতেই সে কাজে শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী ব্রাহ্মণ পাওয়া গেল না।

মহেশচন্দ্র তখন ঝামাপুকুরে রামকুমারের কাছেই হানা দিলেন। গ্রাম সম্পর্কে এঁরা পূর্ব পরিচিত। মহেশ আরও জানতেন যে রামকুমার শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত লোক, মহা ভক্তিমান পিতার পুত্র। রামোপাসক পরিবারের সন্তান হয়েও স্বেচ্ছায় শাক্তমতে দীক্ষা নিয়েছেন তিনি, এতদূর দেবীভক্ত। উপরন্তু তিনি দেবীকৃপাও পেয়েছেন। কিন্তু মহেশ এও জানতেন যে রামকুমারের বংশে শূদ্রের দান গ্রহণের রীতি নেই, শূদ্রযাজী তাঁরা হননি কখনো। এই বাধার কথা মনে থাকায় মহেশ নিজে রামকুমারকে কোনো প্রস্তাব দিতে সাহস করেননি। তিনি সব কথা খুলে রাসমণিকে বলেছিলেন।

রাসমণি দীন ও কাতরভাবে রামকুমারকে আবেদন পাঠালেন: আপনার ব্যবস্থাবলে সাহসিনী হয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়েছি।

আগামী স্নানযাত্রার দিন প্রতিষ্ঠাকর্ম সুসম্পন্ন করার আয়োজনও সম্পূর্ণ করেছি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর জন্য পূজকও পেয়েছি। কিন্তু শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজক হতে কোনো ব্রাহ্মণই রাজি হননি। আপনি আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন। এখন সময়ও আর নেই। যাকে তাকে শ্রীশ্রীকালীমাতার পুরোহিত করা চলে না। আপনি সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ—আমি আপনার শরণাপন্ন।

এ মর্মে রাণীর পত্রখানি হাতে নিয়ে মহেশ রামকুমারের সঙ্গে দেখা করলেন। স্নানযাত্রার দিন যাতে মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় সেজন্য অন্ততঃ সাময়িকভাবেও ভবতারিণীর পূজার দায়িত্ব নিতে তাঁকে সবিশেষ অনুরোধ জানিয়ে রাজিও করালেন। সম্ভবত কামাপুকুরের কাছের দেশড়া গ্রামের রামধন ঘোষ—যিনি রাসমণির আস্থাভাজন কর্মচারী ছিলেন তিনিও এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে রামকুমারকে রাজি করান।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিন মহা সমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। শক্তিমন্দির কেন বৈষ্ণবের পুণ্যদিনে প্রতিষ্ঠিত হল তারও হেতু ছিল। ভবতারিণীর মূর্তি যেদিন নির্মাণ সুরু হয় সেদিন থেকে রাসমণি কঠোর তপস্যানুষ্ঠান করছিলেন শাস্ত্রবিধি মেনে। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন, পূজা ও জপ ছিল তাঁর এ সময়ের নিত্য কর্ম। মূর্তি নির্মাণ শেষ হয়ে গেলে তা বাক্সবন্দী করে রাখা হয়। এইভাবে বেশ কিছুদিন গেলে মূর্তিটি ঘেমে ওঠে। রাণী স্বপ্নে আদেশ পান: আমাকে কতদিন বাক্সবন্দী করে রাখবি? আমার বড় কষ্ট হচ্ছে—যত শীঘ্র পারিস আমার প্রতিষ্ঠা কর।

স্বপ্ন পেয়ে রাণী আর বিলম্ব করতে চাননি। পঞ্জিকা খুলে প্রথম শুভদিন দেখা যায় ঐ স্নানযাত্রার দিন। ঐদিন শুভ কাজ হয়ে গেল। 'দাও দাও, খাও খাও' রব উঠেছিল সেদিন মন্দির প্রাঙ্গণে। রাণী টাকার ভাণ্ডার খুলে ধরেছিলেন। কনৌজ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, পুরী, নবদ্বীপ, চট্টগ্রাম ইত্যাদি দূর দূর স্থান থেকে আমন্ত্রিত হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা এসেছিলেন। প্রত্যেক পণ্ডিত যাতায়াত খরচ ও আহার বাসস্থানাদি ছাড়াও একখানি রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় ও একটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলেন। কত লোক সেদিন এসেছিল, খেয়েছিল তা বলা যায় না। আগের দিন থেকেই যাত্রা, কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণকথা চলছিল। আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। আগের দিনই রামকুমারের সঙ্গে গদাধর এসেছিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার আগের দিন রাতেই

আলোর রোশনাইয়ে মন্দির দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণের বর্ণনা: "ঐ সময় দেবালয় দেখে মনে হয়েছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছেন।"

১৮৫৫ সালের ৩০শে মে বুধবার, বাংলা ১২৬২ সালের ১৭ই জ্যেষ্ঠ রামকৃষ্ণ প্রথম দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৯ বছর ৩ মাস ১৩ দিন। গদাধর এখন পূর্ণ যুবক।

প্রথম দিন দাদার সঙ্গে আসার হেতু ছিল। রাণী রাসমণির নাম সে সময় বাংলায়, কলকাতায় তো বটেই, সুবিখ্যাত। তিনি দেবীর আদেশে দশ বছর যাবত একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করছেন, যা একান্তভাবে কালীমন্দির নয়, শিবমন্দির নয়, রাধাগোবিন্দ মন্দির নয়—বরং এই সব নিয়েই গঠিত, অর্থাৎ শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবের মিলন যেখানে—এ খবর বহুল প্রচারিত ও বহুল আলোচিত বিষয় ছিল। গদাধর ঘটনাচক্রে বা অপর কোনো নিগূঢ় কারণে কামারপুকুর থেকে কলকাতায় আসার পর শ্রীশ্রীকালীমাতার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ঝামাপুকুরে থাকতে আড়াই বছর তিনি প্রায় প্রতিদিন ঠনঠনিয়ার কালীমন্দিরে যেতেন ও মাকে গান শোনাতেন। শিব ও বিষ্ণুভক্তি তাঁর আবাল্যই ছিল। তাই রাসমণির এই মহামিলনমন্দির সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত ঘটনাচক্রে বা বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায়ে তাঁর দাদার পাঁতিতেই মন্দির-প্রতিষ্ঠা বাধামুক্ত হয়। পাঁতি দেবার আগে রামকুমার যখন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছিলেন তখন তিনি তাঁর সাধক-ভক্ত অনুজের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। গদাধর তখনই পণ্ডিতদের বিরূপ রায়ের ফলে রাসমণির ভক্তিব্যাকুল চিত্তের মর্মব্যথা অনুভব করেছেন। ধনী কামারণীর ক্ষেত্রে তিনি যা করেছিলেন—মানুষের সরল প্রাণের আকুতিকে মর্যাদা দিতে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করেছিলেন—এখানেও তাই-ই করতে রামকুমারকে তিনি বলে থাকবেন। আর যেদিন রাসমণির পত্রদূত নিয়ে মহেশচন্দ্র তাঁদের বাসায় এসেছিলেন সেদিন রামকুমার ও গদাধর দুজনই সমভাবে ব্যথিত হয়ে ভেবেছেন, ব্রাহ্মণ পূজকের অভাবে ভক্তের মাতৃপূজা বন্ধ হবে, ভগবতী-আদিষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠা বন্ধ হবে? এ দায় রক্ষায় রামকুমার যদি এগিয়ে গিয়ে থাকেন তবে গদাধরও পিছিয়ে থাকার মানুষ ছিলেন না। যৌবনশক্তির দৃঢ়তা এখন তাঁর দেহে মনে পূর্ণ বিকশিত—এখন তাঁর পদক্ষেপে কোনো জড়িমা নেই।

অত বড় মন্দির, অত অর্থব্যয়ে নির্মিত, ধনীর ঐশ্বর্যবুদ্ধির স্পর্শকলঙ্ক তার কোথাও যে লাগেনি তা তো নয়। মন্দির নির্মাণে ভারপ্রাপ্ত মথুর, রাণীর পরিবারের অপরাপর জন, এমনকি স্বয়ং রাণী অহঙ্কৃত ছিলেন নিশ্চয়ই। ধন মানুষের চিত্তকে মলিন করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠাও মানুষকে মলিন করে। রাণী রাসমণি অশেষ গুণে গুণবতী হলেও তিনি মায়ামোহমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন না। অহংমুক্ত মানুষও তিনি ছিলেন না। তাঁর জপের মালাটি স্ফটিক-নির্মিত ছিল, বিধবা অবস্থায়ও গলায় মোটা তুলসীর মালার সঙ্গে সোনার হারও থাকত। তাঁর ভক্তি গাঢ় হলেও ত্রিগুণাতীত হয়নি তা।

গদাধর রাণী রাসমণির আন্তরিক ভক্তিকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু রাণীর চিত্তের অবশিষ্ট মলিনতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। ঐ চিত্ত-মালিন্যকেই তিনি শূদ্রত্ব মনে করতেন—জন্মগত পরিচয়কে নয়। "সবাই বলে রাণী রাসমণি এ মন্দির করেছে, ঈশ্বর করেছেন এ কথা কেউ বলেন।"—উত্তরকালে রামকৃষ্ণের মন্তব্য। স্বয়ং রাণী কী মনে করতেন? তাঁর সেই মনোভাবের ওপরই তাঁর শূদ্রত্ব বা শুদ্ধতা নির্ভর করে। মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিনেও গদাধরের কাছ থেকে রাণী রাসমণি পাশ নম্বর পাননি।

তাই প্রতিষ্ঠার উৎসব-ধুমধামে যোগ দিলেও, আগের দিন থেকে পরদিন পর্যন্ত ঐখানে কাটালেও, ঐ দীয়তাং ভুজ্যতাংয়ের আসরে-দূর দেশাগত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যেখানে ভোজন ও ভজন করেছেন সেখানেও—গদাধর মন্দিরের কোনো প্রসাদ দাঁতে কাটেননি। রাণীর কোনো দান তিনি স্পর্শ করেননি। একটি রাত ও একটি দিন তিনি কাটিয়েছিলেন নিজের গাঁট থেকে একটি পয়সা বের করে মুড়ি মুড়কি কিনে খেয়ে। তিনি দেখছিলেন, শুনছিলেন, আনন্দ করছিলেন কিন্তু কোনো বস্তুকণা গ্রহণ করেননি রাণীর মন্দির থেকে। রাণী তখনও অহং-অভিমানমুক্ত হতে পারেননি বলেই শূদ্রাণী পদবী থেকে উত্তীর্ণ হননি। এ কথাটা বোঝাতেই দাদা রামকুমারকে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর গদাধর বলেন: কেন তুমি শূদ্রের দান গ্রহণ করছ? কেন শূদ্রের যাজক হয়ে এখানে তুমি থাকবে?

মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন সব কাজ সুসম্পন্ন হয়ে গেলে সন্ধ্যার দিকে গদাধর হেঁটে একা ঝামাপুকুরের বাসায় চলে যান। রামকুমার যাননি। পরদিন গদাধর আবার দক্ষিণেশ্বর আসেন। তিনি বুঝলেন, মন্দির-প্রতিষ্ঠা করে দিতেই দাদা এসেছিলেন বটে কিন্তু এখন যেন এখানে স্থায়ী হচ্ছেন তিনি। দাদা

বরং তাঁকেও মন্দিরে থাকতে ও খেতে বলছেন। গদাধর রাজি না হয়ে আবার ফিরলেন ঝামাপুকুর। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আর দক্ষিণেশ্বর যাননি। সপ্তাহ কেটে গেলেও দাদা ফিরছেন না দেখে আবার গদাধর দক্ষিণেশ্বর এলেন। দাদাকে প্রশ্ন করে জানলেন, প্রথমে অতি সাময়িকভাবে এলেও এখন বারবার রাণীর অনুরোধে রামকুমার এখানে স্থায়ী পূজকের পদ স্বীকার করেছেন। তখনই গদাধর দাদাকে বাবার আদর্শের কথা শোনান। বললেন, বাবার আদর্শ মেনে তুমিও শূদ্রযাজী হোয়ো না দাদা।

রামকুমার তখন গদাধরকে বোঝাতে বসলেন। শাস্ত্রবিধি ও যুক্তি অনেক শোনালেন। ফল হল না। কিন্তু গদাধর এও লক্ষ্য করলেন যে দাদার মনে কোনো দ্বিধা নেই, কোনো 'কিন্তু' ভাব নেই, শূদ্রযাজী ও শূদ্রপ্রতিগ্রাহী হয়ে তাঁর মনে কোনো গ্লানি নেই। বরং তিনি স্বচ্ছ সরল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। যেন দাদা তাঁর ইষ্ট দেবীর অনুমোদন পেয়েছেন, আত্মার প্রসন্নতা অনুভব করেছেন। শাস্ত্রযুক্তিও দাদার বিরুদ্ধে নয়।

রামকুমার মনে এরকম বল পাচ্ছিলেন বলেই প্রস্তাব দিলেন: বেশ, এসো ধর্মপত্র করা যাক। কয়েকটি বেলপাতায় 'হাঁ' বা 'না' লিখে একটি ঘটিতে রাখা হল। একটি শিশু ঐ ঘটিতে হাত ডুবিয়ে যে কোনো একটি বেলপাতা তুলবে—তাতে 'হাঁ' উঠলে ঈশ্বরের সম্মতি, 'না' উঠলে অসম্মতি বোঝাবে।' 'হাঁ' উঠল। একথাও ঐ বেলপাতায় লেখা ছিল: রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণ করে নিন্দিত কাজ করেননি। এতে সবার মঙ্গল হবে।

গদাধর ধর্মপত্রের রায় মেনে নিলেন। সদসৎ বিচার করো। তা করা প্রয়োজন। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ হলে তা অবলীলায় মানতে হবে। ধর্মপত্র ঈশ্বরের আদেশ জানিয়ে গেল। দক্ষিণেশ্বর-লীলার মুখপাতে গদাধর ব্যক্ত করলেন যে এ লীলা মানুষী তনু-আশ্রিত বটে কিন্তু মানুষী অহং-আশ্রিত নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিসিদ্ধান্ত এখানে নেই। বিশুদ্ধ ঈশ্বর-সংকল্পে এ লীলা আদ্যন্ত বিধৃত।

ভক্তের অনেক দোষ—কবে সে ত্রুটিমুক্ত? গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি যব তুহুঁ করবি বিচার। মাধব, বহত মিনতি করি তোয়, দয়া জনু ছোড়বি মোয়। ভক্তের চিত্তে মালিন্য আছে; থাকবেই, সে তো জীব মাত্র। সেজন্য সে পরিত্যাজ্য হয়নি কখনো ঈশ্বরের দ্বারে। হাজার মলিনতা থাকলেও তার ঐ যে ভক্তিটুকু, ঐটুকু গ্রহণ করে তিনি সব মলিনতা মুছিয়ে

তাকে অঙ্গীকৃত করে নেন। সে আর শূদ্র থাকে না, পরম শুদ্ধ হয়ে ওঠে। গদাধর রাসমণির চিত্তকলুষহর; তিনি ভক্তের দায় নিতেই এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনিই দক্ষিণ-ঈশ্বর।

আপাতত যে চিন্তাটি তিনি করলেন তা হল, দাদা এখানে স্থায়ী হয়ে থেকে যাওয়ায় ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী উঠে গেল—বাসাও। কলকাতায় থাকার স্থান নেই। তাই দক্ষিণেশ্বরে থেকে গেলেন সেদিনের মত। মন্দিরের প্রসাদ তবু সেদিন তিনি নেননি। রামকুমার বললেন: মন্দিরের অন্ন, গঙ্গাজলে পাক, সর্বোপরি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত ভোগ—মায়ের প্রসাদ পেতে দোষ কী? তবু গদাধরের মন থেকে 'কিন্তু' গেল না। তখন রামকুমার বললেন: সর্বপাপহর গঙ্গা এ কথা তো মান? পঞ্চবটীতলে গঙ্গাগর্ভে স্বপাক কর। মন্দির থেকে চাল ডাল নিলে দোষ হবে না—দোকান থেকে নিলেও তা হয় না তো!

এ যুক্তি গদাধর মানলেন। তিনি গঙ্গার পবিত্রতা ও পবিত্রকরণক্ষমতা মানতেন। সারদানন্দ সাক্ষ্য দিয়েছেন:

> বাস্তবিক, আমরা আজীবন ঠাকুরকে গঙ্গার প্রতি গভীর ভক্তি করিতে দেখিয়াছি। বলিতেন—নিত্য-শুদ্ধ ব্রহ্মই জীবকে পবিত্র করিবার জন্য বারিরূপে গঙ্গার আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং গঙ্গা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি। গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্মবুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পূতবাষ্পপূর্ণ পবন উভয় কূলে যতদূর সঞ্চরণ করে, ততদূর পর্যন্ত পবিত্র ভূমি—ঐ ভূমিবাসীদিগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বরভক্তি, নিষ্ঠা, দান ও তপস্যার ভাব শৈলসুতা ভাগীরথীর কৃপায় সদাই বিরাজিত। অনেকক্ষণ যদি কেহ বিষয়কথা কহিয়াছে বা বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে ত ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, 'একটু গঙ্গাজল খাইয়া আয়।' ঈশ্বরবিমুখ বিষয়াসক্ত মানব পুণ্যাশ্রমের কোন স্থানে বসিয়া বিষয়-চিন্তা করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিতেন এবং গঙ্গাবারিতে কেহ শৌচাদি করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ ব্যথা পাইতেন।

আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্যে স্বপাক বিধি। গদাধর এখন আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচর্যে প্রবেশ করেছেন। ঝামাপুকুরে অবস্থান কালেই তিনি স্বপাক আহার

করতেন--পাকের ভার দাদা তাঁর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে এ কঠোরতা সাময়িক। এটুকু শুধু ব্যক্ত হল যে গদাধর এখন আনুষ্ঠানিকভাবেই সাধক হচ্ছেন। কামারপুকুরে তাঁর ছিল স্বতস্ফূর্ত বাল্য-কৈশোর লীলা। ঝামাপুকুরে তিনি প্রথম শক্তিদেবী—ব্রহ্মের ব্রহ্মশক্তি, যথা অগ্নির দাহিকা,—ব্রহ্মময়ী শ্রীশ্রীকালীর মুখোমুখি হন। তাঁকে রোজ দিনান্তে গান শোনাতে শোনাতে জানতে পারেন, এই বিশ্বময়ীই কামারপুকুরের বৃন্দাবন থেকে তাঁকে বিশ্বের পথে বের করে এনেছেন। শিশু জন্মাবার আগেই জগজ্জননী শিশুর জননীর স্তনে দুধ সঞ্চার করেন—রামকৃষ্ণের উক্তি। কামারপুকুরের নিভৃতি থেকে বের করে আনার আগেই বিশ্বপটে রামকৃষ্ণলীলা প্রস্ফুটনের উপযুক্ত ক্ষেত্রাধার নির্বাচন ও নির্মাণ করছিলেন ব্রহ্মময়ী কালী। রাসমণি উপলক্ষ,—দক্ষিণেশ্বরের মন্দির জগন্মাতা-নির্দেশিত ও নির্মিত। কোনো অশুভ ভাবের প্রবেশাধিকার এখানে নেই, রাসমণিকেও শূদ্রত্ব তথা কামনা ও অহংবোধ ত্যাগ করেই এখানে আসতে হয়েছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা অর্থলোভী, নগদ বিদায়লোভী একথা সর্বজনবিদিত। তবু দানশীলা ধনকুবের রাসমণিকে বাংলার তাবৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—কোনো লোভেই তাঁব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেননি। স্বয়ং ব্রহ্মময়ী তাঁদের মুখ দিয়ে রাণীকে 'না' 'না' 'না' ধ্বনি শুনিয়েছিলেন। তুমি ধনী, মানী, ইংরেজ সরকার পর্যন্ত তোমাকে খাতির করে, তোমার খোসামুদের অভাব নেই। কিন্তু যতক্ষণ তুমি শূদ্র, অহংবোধ-দৃপ্ত ততক্ষণ তোমার কানাকড়ি মূল্য নেই আমার কাছে। তোমার বিপুল ধনগরিমায় আচ্ছন্ন তোমার মন্দির তোমারই শূন্য মন্দির থাকবে, আমি জগতের মাতা, আমি পা দেব না। প্রত্যাখ্যান করব তোমার পূজা-বাসনা। কোনো লোভী ব্রাহ্মণকেও টাকায় কিনে নেবার সাধ্য তোমার নেই।

সে প্রত্যাখ্যানের আঘাতের মর্মবেদনায় রাসমণির ভক্তি যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল তেমনি একথাও তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর টাকায় দালানবাড়ি করা যায়, মাকে আনা যায় না, মানুষকেও কেনা যায় না। বুঝেছিলেন, ধিক এ 'রাণী' পদবী। মায়ের কাছে যে যাবে সে সেই বৈষ্ণব ভক্ত হরেকৃষ্ণ দাসের দীনা মেয়েটি; সে চাষীর মেয়ে কি রাজার বৌ তাতে কিছু এসে যায় না; মায়ের কাছে সে শুধু ভক্তিব্যাকুলা নম্রনতা এক নিরহঙ্কার সন্তান। একদিন মাতৃমন্দিরে বসে ক্ষণতরে একথা বিস্মৃতা হয়েছিলেন রাসমণি। রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঈষৎ আঘাত করে শাসন করেছিলেন।

নতমস্তকে প্রসন্নবদনে সে শাসন মেনে নিয়েছিলেন রাসমণি। শুদ্ধতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

এমন নিষ্কাম ক্ষেত্রে স্বয়ং মা আগ বাড়িয়ে এসে দাঁড়ালেন গদাধর আসবেন বলে। তাঁর অষ্ট সখীর এক সখীকে আগে পাঠিয়ে এই পরম পুণ্যময় ভগবৎ-পাদপীঠ তিনিই নির্মাণ করালেন, তারপর নিজে এসে গদাধরকে আনালেন। কে আগে এল এ পুণ্যপীঠে? কালী, না, রামকৃষ্ণ? রামকৃষ্ণ তাঁর মহতী সাধনায় মৃন্ময়ী মূর্তি আশ্রয়ে চিন্ময়ী ব্রহ্মময়ীকে জাগিয়ে তুললেন? নাকি, চিন্ময়ী ব্রহ্মময়ী সাধক রামকৃষ্ণকে করুণাভরে দেখা দিলেন? যিনি ব্রহ্মময়ী কালী তিনি মৃন্ময়ী মূর্তিতে ও চিন্ময়ী সত্তায় এবং নরদেহে রামকৃষ্ণ রূপে একই দিনে একই লগ্নে একই মুহূর্তে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন। ওঁরা কেউ আগে-পরে আসেননি। ওঁরা ওঁরাও নন—একই সত্তার দুটি বিভাব, দুটি মুখ মাত্র।

বৃন্দাবন থেকে কংসপুরী মথুরায় যিনি গিয়েছিলেন তিনি কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ। কামারপুকুর থেকে যিনি কলকাতায় এসেছিলেন তিনি বিশ্বপথিক মহাকাল। দক্ষিণেশ্বর তাঁর সাধনক্ষেত্র এই অর্থে যে তা তাঁর বিশ্বব্যাপ্ত বিশ্বতোমুখ হবার যজ্ঞক্ষেত্র। এখানকার লীলা গুপ্তভাবে কালীর আপ্তলীলা বটে, কিন্তু কালের প্রচ্ছদ সরালেই বোঝা যায় যে তা বিশ্বনাথের বিশ্বমোহন লীলাও বটে।

৮

সাধনদ্বারে

১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিস থেকে প্রকাশিত জার্মাণ-ফরাসী পত্রিকার প্রথম ও শেষ সংখ্যায় (একটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল) ছাব্বিশ বছরের যুবক কার্ল মার্ক্স Introduction to a Critique of the Hegelian Philosophy of Law নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধেই তিনি লেখেন :

> Religion is the sigh of an oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of a souless state of affairs. It is the opium of the people.
>
> ধর্ম অত্যাচার-পীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন বিশ্বের হৃদয়, আত্মাহীন পরিস্থিতির আত্মা। ধর্ম জনগণের আপিং।

সদ্যবিবাহিত মার্ক্স কথাগুলি লিখেছিলেন প্যারিস নগরীতে বসে নয়, স্বদেশ জার্মানীতে, প্রবন্ধ প্রকাশের কয়েক মাস আগে। বাংলায় কামার-পুকুরে গদাধরের বয়স তখন আট বছর, পিতৃবিয়োগান্ত, মাঠপ্রান্তরে কৃষ্ণাকাশের পটে শ্বেতবলাকা দর্শনে ঈশ্বরচেতনায় আপ্লুত, আবিষ্ট, সমাধিস্থ হবার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ।

১৮৫৫ সালে রামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে প্রতিষ্ঠিত তখন জীবনদর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে কার্ল মার্ক্স ১৮৫৫ সালেই ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, বিপ্লব আসছে। সহযোগী এঙ্গেলস বৈপ্লবিক যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করছেন নিজেকে (এঙ্গেলসের পত্র, ১৫ই নভেম্বর ১৮৫৭)।

দুটি পৃথক জীবনদর্শন, পৃথক লক্ষ্য, পৃথক সাধনপথ—অসেতুসাধ্য, দুস্তর ব্যবধানযুক্ত। কষ্টকল্পিত কোনো মিল উভয়ের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা বাতুলতা ও অনাবশ্যক। কিন্তু প্রশ্নটি তো তা নয়। বিশ্বপুরুষ বিশ্বকে বাদ দিয়ে নয়, বিশ্বকে ধারণ করেই বর্তমান—বিশ্বের সব স্বর তাঁরই স্বর, সব কণ্ঠ তাঁরই কণ্ঠ,

সব জ্ঞান তাঁরই জ্ঞান, সব সাধনা ও সংকল্প তাঁরই সাধনা ও সংকল্প। এক বই দুই নেই। এক অদ্বিতীয়ই আছেন—সকলই সেই দ্বিতীয়রহিতের দৃষ্টিপাত, সবই অদ্বয়-বাণী।

ব্রহ্মসূত্র প্রথমেই বলে দিয়েছেন :

তত্তু সমন্বয়াৎ ১।১।৪

তাঁতে সব বিরোধ ও বিসদৃশেরও সমন্বয়—তিনি সমন্বয়-পুরুষ। ভারতীয় প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম "ব্রহ্মসূত্র"কে অগ্রাহ্য করার স্পর্ধা আজ পর্যন্ত কোনো ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর হয়নি। সব আলোই অদ্বৈতের আলো—রামকৃষ্ণের জীবনলক্ষ্য ও সাধনরহস্য অদ্বৈতের আলো ভিন্ন আর কোন আলোয় বুঝব? তাই সমসাময়িক মহাবীর্যবান জ্ঞানতপস্বী কার্ল মার্ক্সের জীবন-অভিজ্ঞতা ও বাণী—হোক তা রামকৃষ্ণমার্গের বিপরীত কোটিতে অবস্থিত—উপেক্ষাযোগ্য নয়। সে বাণীতে সত্য প্রতিফলিত বলেই তা আদরণীয় ও প্রাসঙ্গিক।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার খাতায় যে কিশোর তাঁর স্বচ্ছ আদর্শবাদী মনের দীপ্তিতে লিখে আসতে পারে : মানবতার সেবা সর্বাধিক করা যায় এমন পথই আমার বরণীয় এবং সেজন্যই জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমাকে চরমোৎকর্ষ লাভ করতে হবে (A Young Man's Reflections On the Choice of Career নামক রচনায় মার্ক্স একথা লেখেন) সে যে ভিন্নতর পটভূমিতে ভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন হলেও একজন মহাসাধক তাতে কে সন্দেহ করবে? যৌবনে জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ডক্টরেটের থিসিসে মার্ক্স লিখেছিলেন : মানুষের আত্মচৈতন্যই পরম ঈশ্বর। ভারতীয় ব্রহ্মবাদীর মতোই এ উক্তি। বিশেষত যখন দেখি তরুণ মার্ক্স মানুষের স্বাধীনতার সমস্যা নিয়েই মুখ্যত ভাবিত—প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদ্বয় ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করে এপিকিউরাসকেই বরমাল্য দিচ্ছেন এই কারণে যে এপিকিউরাসের বস্তুবাদে পরমাণুগুলি বেঁকে যায় (swerve করে) বলায় স্বাধীনতার সম্ভাবনা স্বীকৃত ও উন্মোচিত হয়েছে! স্বাধীনতা, মুক্তিই লক্ষ্য, তারই নিরীখে দর্শন-বিচার! মার্ক্সের জীবন ও ভাবনার মৌল প্রবণতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মুক্তির সাধক তিনি, দাসত্বের নয়।

পরিণত বয়সে মেয়ের প্রশ্নের জবাবে মার্ক্স যখন জানিয়েছিলেন যে যে গুণটি তিনি সবচেয়ে ভালোবাসেন তা হল সরলতা, আর পুরুষের মধ্যে যে গুণটিকে প্রিয় জ্ঞান করেন তা হল আত্মশক্তি (power নয়—strength),

সবচেয়ে ঘৃণ্যতম পাপ মনে করেন দাসত্ব বরণ এবং সংগ্রামশীলতাই মনে করেন সুখ—তখন মতবাদিক ঐক্য তাঁর সঙ্গে যাদের নেই তাদেরও মানতে বাধা হয় না যে মার্ক্স একজন খাঁটি মানুষ। অন্তত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তমণ্ডলীর তো তা মানতে বাধাই নেই। এই সব কথা তাঁদের মুখে কতবার কতভাবে ঝঙ্কৃত হয়েছিল !

মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করাই জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করে যৌবনেই জগতের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে এ এক ক্ষয়িত মানবতার জগৎ (de-humanized world—পূর্বোক্ত ফরাসী-জার্মান পত্রিকায় প্রকাশিত পত্র) এবং প্রচলিতাবস্থার নির্মম সমালোচনার সাহায্যেই এর উন্নতিসাধন সম্ভব। সমালোচনা থেকেই এল বিপ্লবের ধ্যান এবং তখনই মার্ক্স এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে মানবতার অপহ্নব সম্পূর্ণ ঘটে গিয়েছে যে শ্রেণীর মধ্যে, পূর্ণ মানবতা তাদেরই অর্জন করতে হবে—এবং তা করতে গিয়েই তাদের বিপ্লব করতে হবে (a class which represents the complete loss of humanity and can therefore win itself only through re-winning of humanity)—প্রোলিতারিয়েতই সেই শ্রেণী। এসবই ঐ ছাব্বিশ বছর বয়সের মার্ক্সের সিদ্ধান্ত। প্রোলিতারিয়েত-বিপ্লবের লক্ষ্য সম্পর্কে সে সময়ই তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে তা হবে মানবতার যথার্থ কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠা (Vorwarts পত্রিকায় প্রকাশিত মার্ক্সের প্রবন্ধ)।

এই হল মার্ক্সের প্রস্থানভূমি—এখান থেকেই তিনি তাঁর তত্ত্ব ও কর্মের বিকাশ ঘটাতে এগিয়েছেন। তত্ত্ব তাঁর ঐতিহাসিক বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, কর্মের লক্ষ্য তাঁর কমিউনিস্ট বিপ্লব। সত্যের স্পর্শ না থাকলে এই তত্ত্ব ও এই কর্মপথ সারা বিশ্বকে এত ব্যাপকভাবে আন্দোলিত ও প্রভাবিত করতে পারত না। আর সত্য যদি কোথাও থাকে তবে কোনো সত্যসন্ধী তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না—সত্য যে বেশে যে দেশেই আসুক তাকে গ্রহণ করাই সত্য-অন্বেষুর কর্তব্য। আর যিনি সত্যময় পুরুষ, সত্যস্বরূপ—সব সত্যই তাঁতে বিধৃত।

শুধু কার্ল মার্ক্সের ভাব নয়; সকল ভাব, সকল ধর্ম তথা সত্যের বিকাশোন্মুখ সকল ধারার সমন্বয় করতে; যেখানে যত সত্যোপলব্ধি হয়েছে এ পর্যন্ত সবই নিজের মধ্যে ধারণ করতে এবং জগতের ইতিহাসে বৃহত্তম আমূল বিপ্লব ঘটাবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সাধনপীঠ রচনা করেছিলেন।

তাঁর সঙ্গে কার্ল মার্ক্সের তুলনা হয় না, আমি তা করিওনি—কিন্তু সেই উনিশ শতকের মধ্যভাগে জগতে যে বৈপ্লবিক চেতনার স্ফুরণ ঘটছিল রামকৃষ্ণের চৈতন্যে তা অঙ্গীকৃত হয়েছিল বলেই তাঁর সাধনার স্বরূপ-রহস্য উদ্ঘাটন করার উদ্দেশ্যেই তাঁর সমকালীন প্রধান উদীয়মান ভাবুক ও তাঁর ভাবধারার কথা উল্লেখ করেছি। এরূপ উল্লেখের পরিধি ও মাত্রা ক্রমেই বাড়বে। কারণ বিশ্বপুরুষ রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী উনিশ শতকের ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে যে বিচার স্বামী সারদানন্দ সহ অপরাপর আলোচকরা করে গিয়েছেন তা কখনোই পর্যাপ্ত নয়, যথার্থ নয়। তিনি একটি দেশের জাতীয় নেতা নন—একটি শতকের চিন্তাবিদও নন। রামকৃষ্ণ সর্বদেশের ও সর্বকালের।

ভারতবর্ষের সনাতন ব্রহ্মসাধনার পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছেন রামকৃষ্ণ এবং অতীতের ধর্মসাধনাকে পুনর্জীবিত করেছেন শুধু এরূপ বর্ণনাতেও তাঁকে সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত করা হয়। তা তো তিনি করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু অতীতের, প্রাচীনের পুনর্জীবন দান বা revival ঘটানোই তাঁর একমাত্র কাজ ছিলনা, তিনি এসেছিলেন নতুন মহতী সৃষ্টির জন্য। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের সাধনা অভিনব সৃষ্টির সাধনা। সে সৃষ্টি সমগ্র মানবতাকে ব্যেপে ধরেছে—তা দেশবিশেষের জাতিবিশেষের শ্রেণীবিশেষের বা যুগবিশেষের সম্পত্তি নয়।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দশ আঙুল পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন। যা হয়েছে বা যা হবে সকলই সেই পুরুষ।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৯০ সূক্তে (বিখ্যাত পুরুষ সূক্ত) নারায়ণ ঋষি সরল অনুষ্টুপ ও ত্রিষ্টুপ ছন্দে বিশ্বপুরুষের আত্মবলির বার্তা শুনিয়েছেন। তিনিই সব ও সবের মূল—কিন্তু এ বিশ্বসৃজনের জন্য তিনি নিজেকে দিয়েছেন আত্মবলি :

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥

যিনি জন্মেছিলেন সবার আগে, সে পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুরূপে অগ্নিতে পূজা দেওয়া হল। দেবতারা, সাধ্যবর্গ ও ঋষিগণ তা দ্বারা যজ্ঞ করলেন।

এ বিশ্বসৃষ্টি ভগবানের আত্মবিসর্জন লীলা। যজ্ঞের তিনিই বলি।

রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন আত্মবিসর্জন দিতে—বলি দিতে নিজেকে। সে বলির মূল্যে সৃষ্টি হবে নতুন মানববিশ্ব, নতুন মানব সভ্যতা। এই-ই তাঁর সাধনার গূঢ়তম রহস্য কথা!

রামকৃষ্ণের সমসময়ে কার্ল মার্ক্স যে বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে বস্তুবাদ প্রচার করেছিলেন তা তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়। ব্রহ্মবাদের যেমন একটি ধারা সারা পৃথিবীতে অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান, বস্তুবাদের ধারাও তেমনই প্রাচীন। মার্ক্স এই ধারাকে বরণ করার পক্ষে একটা হেতু ছিল। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবাদী হেগেলের শিষ্য। তিনি যখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন বার্লিনে Young Hegelian Club নামে একটি গোষ্ঠী ছিল। তার সদস্য ছিলেন ব্রুনো বয়ার, ডেভিড স্ট্রস, লুডউইগ ফয়েরবাখ, আর্ণল্ড রুজ, এডগার বয়ার ও কার্ল মার্ক্স। এঁরা সকলেই হেগেলের দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু জার্মাণ দর্শনে ভাববাদের প্রভাব অতিরিক্ত বলে এঁরা উল্টো মতটি অর্থাৎ বস্তুবাদ স্থাপন করতে চাইছিলেন। তাই যীশু খ্রীস্টের জীবনী (Leben Jesu) লিখে ডেভিড স্ট্রস ডায়ালেকটিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখান যে বাইবেলের বহু কাহিনী খ্রীস্টভক্তদের অবচেতন মনের সৃষ্টি। আর্ণল্ড রুজ ছয় বছর জেল খেটেছিলেন তাঁর মতামতের দরুণ। ব্রুনো বয়ার অধ্যাপকের পদ পাননি ঐ বস্তুবাদী মত পোষণের কারণে। রুজের ভাষায় এই তরুণ বস্তুবাদীরা ছিলেন "দার্শনিক পর্বতারোহীর দল।" অর্থাৎ অ্যাডভেঞ্চারবাদী!

বস্তুবাদের প্রশ্নে এই গোড়ার সহযাত্রীদের সঙ্গে মার্ক্সের পরে বিরোধ বেধেছিল। ১৮৪৫ সালে মার্ক্স ফয়েরবাখের বস্তুবাদ আলোচনা করে কিছু মন্তব্য লেখেন যা তাঁর মৃত্যুর পর এঙ্গেলস Marx on Feurbach নামে প্রকাশ করেন। পুরোনো বস্তুবাদীদের থেকে মার্ক্স স্বীয় বস্তুবাদের পার্থক্য কোথায় তাই এই আলোচনায় থিসিস আকারে পেশ করেছেন।

পুরনো বস্তুবাদকে তিনি যান্ত্রিক বা মেকানিক্যাল আখ্যা দিয়েছেন। ডেমোক্রিটাস-এপিকিউরাসের প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শন আলোচনার সময়ই মার্ক্সের এই স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী উঁকি দিয়েছিল।

কেবল-ব্রহ্মবাদের প্রতিবাদেই এসেছে কেবল-বস্তুবাদ, এক চূড়ান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে আর এক চূড়ান্ত মতবাদ! এইই জগতের রীতি।

আচার্য শঙ্কর যখন বললেন:

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

ব্রহ্ম একমাত্র সত্য; জীব ও জগৎ মিথ্যা।

কিন্তু জীব ও জগৎকে তো দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, তাদের সঙ্গে ব্যবহার চলে তবে তারা মিথ্যা হবে কেন? শঙ্কর বলেন, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ সত্য কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা। আমরা যে ওদের সত্য দেখি সেই দৃষ্টিই ভ্রান্ত দৃষ্টি।

শঙ্কর একা এই মতের প্রবক্তা নন—একান্ত বা কেবল-ব্রহ্মবাদ তাঁর বহু আগে থেকেই বর্তমান, এ একটি ধারা। শঙ্কর তাকে বাঙ্ময় করেছেন ও দার্শনিক যুক্তিভিত্তি দিয়েছেন মাত্র। একান্ত ব্রহ্মবাদ সামগ্রিক সত্যকে প্রকাশ করে নি—আংশিক সত্যকে সমগ্র সত্যের শিরোপা দিয়ে মতবাদিক জুলুম করেছে।

বস্তুজগৎ ও মানুষের ঐহিক জীবনকে নেই বলে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলেই তা উড়ে যায় না ও তাকে উড়িয়ে দেবার মরিয়া চেষ্টাকেই ব্রহ্মসাধনা বলা অন্যায়। এই ধরার ধূলিতে যার জন্ম সেই মানুষ যখন ধরার পূত ধূলিকে একান্তভাবে অস্বীকার করে বসে তখন সে শুধু মাতৃঋণ অস্বীকার করে তাই নয় নিজেকেও মিথ্যা করে ফেলে। তাই রামকৃষ্ণ সরাসরি বলেছিলেন: ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? তাহলে যে-তুমি ও-কথা বলছ সে-তুমিও মিথ্যা, তোমার কথাও মিথ্যা। মায়াবাদী কথিত পারমার্থিক দৃষ্টিতে মায়াবাদীও স্বয়ং যে নেই!

কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে প্রাচীন কাল থেকে একান্ত ব্রহ্মবাদীরা জগৎ ও জীবনকে হেয় ও অবজ্ঞেয় করে তুলেছেন, বলে এসেছেন এ এক বন্দীশালা মাত্র, নরকতুল্য, পাপের উদ্ভবভূমি। মানুষের জীবনযাত্রা পাপক্ষয় অথবা পাপসঞ্চয় মাত্র—তার কোনো মহত্তর মর্যাদা নেই, স্বকীয় গরিমা নেই। এতে ভোগ-সম্ভোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি; ব্রহ্মবাদীরা যাদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত সেই রাজন্যবর্গ, বণিককুল, ধনীরা ভোগময় জীবনই যাপন করেছে সর্বদেশে সর্বকালে। কিন্তু আপামর জনসাধারণকে শোষণ করার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ ও জীবন মায়া ও মিথ্যা একথা নিরন্তর প্রচারের ফলে জনগণকে হতমান, হীনস্মন্য ও সংগ্রামস্পৃহাহীন করে দেওয়া হয়েছে। এবং বস্তুজগতের স্বকীয়

পারমার্থদীপ্তি স্বীকার না করলে বস্তুমর্যাদাবোধহীন মানুষ বস্তুকে জানতে উৎসুক-আগ্রহী হয় না, বস্তু সম্পর্কে সচেতন হতে চায় না, বিজ্ঞানের অনুশীলনে উৎসাহ থাকে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা রুদ্ধ হয়ে যায়। একান্ত ব্রহ্মবাদ শেষ পর্যন্ত জ্ঞানকেই হত্যা করে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে অপরিণত অপরিচ্ছন্ন মন যুক্তিহীন হয়, উদ্ভট কল্পনার গলিঘুঁজিতে ভ্রমণ করে, বুদ্ধি খেই হারায়—আজগুবি তন্ত্রমন্ত্র বাসা বাঁধে, মানুষ দুর্বল হয়। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের সিংহনাদ স্তিমিত হয়ে গিয়েছে অপ্রাকৃত-অলৌকিক বিশ্বাসোৎপাদনকারী ধূর্তদের ভোজবাজীর তুকতাকে। মানুষ সর্বত্র অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস খুঁজে খুঁজে হয়রান ও দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ভারতের কথা যদি বলো, শঙ্করের মায়াবাদ প্রচারের পর ভারতের জাতীয় প্রতিরোধ শক্তিও ধ্বসে পড়ে—মুসলিম বিজয় ঘটে। জগৎ যখন মায়া কেন তবে প্রতিরোধ? কী হবে বস্তুজগতের দখল নিয়ে যুদ্ধে? 'মায়া মায়া' বলে তাত্ত্বিক তর্ক তুললেই যে জগৎ মায়া হয়ে যায় না তা আচার্য শঙ্করোত্তর ভারতে তুর্কী ইরানী খোরাসান আরবের অশ্বক্ষুরধ্বনিতে ও কোষমুক্ত তরবারি-ঝঙ্কারে প্রমাণিত হয়ে যায়। এ কথা সম্যক উপলব্ধি করেই মুসলিম শাসন কালে ভারতে হিন্দুমন মায়াবাদের নাগপাশ কেটে বেরিয়ে এসে নামরূপ সত্য, জীব ও জগৎ সত্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করে—দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ তারই পরিণতি ও মুসলিম শাসনের মধ্যেই সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক প্রতিরোধ সংগঠনে উদ্বুদ্ধ হয়।

একান্ত বা কেবল-ব্রহ্মবাদের প্রতিক্রিয়ায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত মত একান্ত বা কেবল-বস্তুবাদ স্থাপিত হয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সর্বত্রই এই ব্যাপারটি ঘটেছিল। আধুনিক যুগে কার্ল মার্ক্স এই কেবল-বস্তুবাদের প্রবক্তা। ব্রহ্মবাদ উপস্থাপিত করেন যেমন ব্রহ্মবাদী, মার্ক্সও তেমনি বস্তুবাদী রূপেই বস্তুবাদ উপস্থাপিত করেছেন—তিনি ভাবের ঘরে চুরি করেন নি। তিনি এত আপসহীন বস্তুবাদী যে মানুষের স্বপ্ন চিন্তা ও কাজকেও বস্তু আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন, পুরনো বস্তুবাদের সঙ্গে এইখানেই তাঁর স্বকীয় বস্তুবাদের পার্থক্য। পুরনো বস্তুবাদে ভাববাদের কিছু আশ্রয় ও অবকাশ ছিল; মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে সে অবকাশ মুছে গিয়েছে। ফয়েরবাখ সম্পর্কিত আলোচনায় মার্ক্স যে এগারোটি সূত্র লেখেন তার এক নম্বর সূত্রেই পাই:

The chief defect of all previous materialism (including that of Feurbach) is that things, reality, the sensible world are conceived only in the form of objects of observation, but not as the activity of sensuous men, not as practical activity, not subjectively. Hence, in opposition to materialism, the active side was developed abstractly by idealism, which of course does not know real sense of activity as such Feurbach wants sensible objects that are really distinguished from the objects of thought ; but he does not understand human activity itself as objective activity.

অর্থাৎ, ফয়েরবাখসহ পুরনো বস্তুবাদীদের মুখ্য ত্রুটি হল বস্তু বলতে তাঁরা শুধু ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুই বুঝেছেন; কিন্তু মানুষের কাজকর্মও বস্তু, বাস্তব। ফলে বস্তুবাদের বিরোধীরূপেই ভাববাদীরা কর্মময় দিকের বিকাশ দেখাতে পেরেছেন—যদিও কাজের স্বরূপ কী তা তাঁরা জানেন না। ফয়েরবাখ ভাবেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও চিন্তার বিষয় এক নয়—তিনি মানুষের কর্মকেই বস্তুরূপী বলে বুঝতে পারেননি।

এ হল এক আপসহীন যুক্তিপরায়ণ বস্তুবাদীর দৃষ্টি—কেবল-ব্রহ্মবাদী আচার্য শঙ্করের যথার্থ জবাবদাতা অদ্বিতীয় বস্তুবাদী (বস্তুই একমাত্র আছে, দ্বিতীয় কিছু নেই) আচার্য মার্ক্স!

শঙ্করের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির অর্থ এই যে, ব্রহ্মই আছেন, অপর কেউ নেই। ব্রহ্মের চেয়ে বড় কেউ নেই, তাঁর সমান কেউ নেই, তাঁর থেকে নিকৃষ্টও কেউ নেই। কারণ এমন কেউ থাকলেই ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয়। যদি জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের চেয়ে নিকৃষ্ট, ব্রহ্মের অন্তর্গত বা ব্রহ্মাশ্রিত বলি (যেমন আচার্য ভাস্কর, রামানুজ, মধ্ব ও নিম্বার্ক বলেছেন) তাহলে ব্রহ্ম ছাড়াও দ্বিতীয় সত্তা স্বীকার করা হয়। তাই শঙ্কর যে কোনো দ্বিতীয় সত্তা বা তত্ত্ব বাতিল করে দিয়ে বলেন ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় সত্য—অপর কেউ নেই, কিছু নেই। জীব ও জগৎ মিথ্যা।

মার্ক্স তদনুরূপভাবেই বলেন যে বস্তুই একমাত্র আছে—আর কিছু নেই। যাকে চৈতন্য বলি তা বস্তুজাত ও বস্তুরই প্রতিভাস, বস্তু-আশ্রয়ী তো বটেই। মানুষের মনের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, তা একান্তভাবে দেহাশ্রয়ী। মস্তিষ্কচ্যুত মন ও চৈতন্য কিছু হয় কি ?

ফয়েরবাখ-আলোচনার তৃতীয় সূত্রে পুরনো বস্তুবাদকে যান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে তা থেকে স্বীয় বস্তুবাদকে স্বতন্ত্র করে মার্ক্স বললেন : পুরনো বস্তুবাদ বলেছে মানুষ পরিবেশের দাস, কিন্তু মানুষ পরিবেশকে পালটেও দেয় তো! এই পালটানোর ক্ষমতা আসে তার চৈতন্য থেকে, কিন্তু চৈতন্য বস্তু-নির্ভর, বস্তুজাত। ঐ থিসিসের ছয় ও সাত নম্বর সূত্রে মার্ক্স মানুষের এই চৈতন্যের কাজকে সামাজিক কর্ম আখ্যা দিয়ে বললেন :

The essence of man is not an abstraction inherent in each particular individual. The real nature of man is the ensemble of social relations ···Feurbach does not see that the abstract individual whom he analyses belongs to a particular form of society.

অর্থাৎ মানুষের সারমর্ম প্রতি বিশেষ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বিমূর্ত কিছু নয়। মানুষের যথার্থ প্রকৃতি সামাজিক সম্পর্কের পিণ্ড মাত্র। ফয়েরবাখ দেখছেন না যে তিনি যে বিমূর্ত ব্যক্তির বিশ্লেষণ করছেন সেও বিশেষ সমাজের রূপে অঙ্গীকৃত।

কেন বেছে বেছে মার্ক্সকেই আমি বস্তুবাদের প্রবক্তা রূপে আলোচনার জন্য নিয়েছি তা এতেই স্পষ্ট হবে। তিনি নিরঙ্কুশ বস্তুবাদী : আর সকলের মধ্যে কুয়াশা আছে, ব্রহ্মবাদের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি আছে—মার্ক্স তা থেকে মুক্ত, স্বচ্ছ তাঁর দৃষ্টি, বস্তুবাদী যুক্তির চূড়ান্ত পরিণতি তাঁর হাতেই ঘটেছে। তাঁর সুবিধা ছিল, কেন না তাঁর সময়েও পরমাণু বিভাজিত হয়নি, পরমাণুই অন্তিম জগৎ-উপাদান রূপে গৃহীত ছিল এবং পরমাণু বস্তুকণা ভিন্ন আর কী! মার্ক্সের পরবর্তী কালে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে পরমাণু বিভাজন ঘটে যায় ও তার ফলে ক্রমে ক্রমে বস্তু সম্পর্কে ধারণা পালটে যায়! বস্তুবাদ ও ভাববাদ তথা চৈতন্যবাদ তথা ব্রহ্মবাদের পুরনো পরিভাষা বিজ্ঞানে বাতিল হয়ে এসেছে—বিজ্ঞান নবযুগে প্রবেশ করেছে, সেখানে এতাবৎকালের প্রচলিত ও পরিচিত পরিভাষা বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

শঙ্কর তাঁর কেবল-ব্রহ্মবাদের জয় ঘোষণা করে সগর্বে বলেছিলেন যে

ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ।

সব সৎ শাস্ত্র ও বেদান্ত ঘোষণা করছে যে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। এ দাবী টেঁকেনি। সৎ শাস্ত্র তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁর দাবীর অনুকূল নয়। নীলাচলে

পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য সাতদিন একনাগাড়ে মহাপ্রভুকে বেদান্ত পড়াবার পর জিজ্ঞাসিত হয়ে মহাপ্রভু বলেছিলেন :

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।

স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন ॥—চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা ৬ পরিচ্ছেদ।

ব্যাসের সূত্র ব্রহ্মসূত্র; আর এ ভাষ্য শঙ্করের বেদান্তভাষ্য—যা নির্মল ব্রহ্মসূত্রের সূর্যকিরণকে মেঘের মতোই আচ্ছন্ন-আবৃত করে দিয়েছে!

ব্রহ্মসূত্রের গোড়াতেই একটি সূত্র আছে :

ঈক্ষতের্ণাশব্দম্। ১।১।৫

ব্রহ্ম দেখেন; তাঁর দৃষ্টিপাতেই বিশ্বসৃষ্টি বিদ্যুদ্দামবৎ ঝলক দিয়েছে, স্ফুরিত হয়েছে। একান্ত ব্রহ্মবাদ ও একান্ত বস্তুবাদ দুয়েরই প্রতিবাদ এই সূত্র, অথবা দুয়েরই সমন্বয়-ইঙ্গিত এই সূত্র। এই জগৎ ও জীবনের উৎসমূল ঐ ব্রহ্মের প্রেমমধুর সলাজ দৃষ্টি! ছান্দোগ্য একথাই একটু বিস্তৃত করে বলেছেন—তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত (৬।২।১-৩) বা ঐতরেয় বলেন—ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি ১।১।৩—ঐক্ষত অর্থাৎ ঈক্ষণ করলেন তাই লোকসমূহ সৃষ্টি হল। কেন ব্রহ্ম ঈক্ষণ করলেন—কী দরকার পড়ল তাঁর? বৃহদারণ্যকে মধুবিদ্যার কথা বলতে গিয়ে ঋষি বলেছেন এই জগতে ও জীবনে মধু আছে, ব্রহ্মেও মধু আছে—একই মধু, অমৃত। ব্রহ্মপুরুষ ও বিশ্বপুরুষ পরস্পরকে মধু দিয়ে নিয়ত আপ্যায়ন করছেন। ব্রহ্মপুরুষ নিজ রশ্মি দ্বারা লোকসমূহের জীবনে প্রতিষ্ঠিত আর লোকসমূহও ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত প্রাণের দ্বারা (বৃহদারণ্যক ৫।৫।২)। ব্রহ্ম আমাদের জোগান রশ্মি-মধু, আমরা ব্রহ্মকে জোগাই প্রাণ-মধু। দুই দুইকে মধুজ্ঞানে যখন উপাসনা করে তখন সমগ্র সত্য—পরব্রহ্ম—সেখানে প্রকাশিত হন : দ্বয়োর্দ্বয়োঃ মধুজ্ঞানে পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্।

তাই শুধু ব্রহ্মই আমাদের দেখেন না, আমরাও ব্রহ্মকে দেখি। যদি একা তিনি দেখেন তবে অস্পষ্ট সে দেখা—মহাশূন্যে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে সে দেখা, অসৎ হয়ে যায় ব্রহ্মদৃষ্টিও। দেখা যখন ঈক্ষণ হয়ে ওঠে তখনই তা সৎ দর্শন, সত্যদৃষ্টি। সে দেখা চার চোখের মিলনের দেখা। তাঁর দুটি চোখের সঙ্গে আমার দুটি চোখ—তাঁর সমগ্র চক্ষুর সঙ্গে লোকসমূহের অগণিত চক্ষুর মিলন যে তাই! "মেনে অসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিঃ অসুপ্তদৃক্"—তাঁর দৃষ্টি

জেগে থাকলেও অনন্ত জীব যদি সুপ্ত থাকে তাহলে তিনি নিজেও 'আমি আছি' মনে করতে পারেন না, নিজেকে যেন অসৎই (অর্থাৎ অস্তিত্বহীন) মনে করেন। এ লৌকিক জগৎ ও জীবন ছাড়া একমেবাদ্বিতীয়মের এ কী দুরবস্থা! জীবের জীবনোত্তাপ না পেলে একা ব্রহ্ম যেন জীবনহীন শব হয়ে পড়ে থাকেন।

কেন দেখেন? নিজেকে জানতেই এই দেখার প্রয়োজন। সৃষ্টির উদ্দেশ্য আনন্দ, রসাস্বাদন। ব্রহ্মের পক্ষে তা আপনাকে আপনি আস্বাদন—আপনাকে নিবিড়ভাবে গূঢ়ভাবে জানা ও পাওয়া। ব্রহ্মসূত্রের পরের একটি সূত্রে বলা হয়েছে:

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ১।১।১২

তিনি আনন্দময় কেন? যেহেতু তাঁর অভ্যাস রয়েছে! তিনিই বিশ্বের উপক্রম; তাঁর ঈক্ষণই সমগ্র সৃষ্টির মূল, আবার তাঁরই অন্যোন্য মৈথুনের—স রেমে, তিনি রমণ করেন—ফলস্বরূপ এই রসঘন অমৃতময় উপসংহার। উপক্রমেরই উপসংহারে পরিণত হওয়ার পর্বে পর্বে অন্তর্লীন আছে—অভ্যাস। ব্রহ্মই সৃষ্টিমূল, ব্রহ্মের ঈক্ষণেই সৃষ্টি আবার ব্রহ্মই সৃষ্টির পরিণত ফল। তিনিই ফল, তিনিই রস—রসস্বরূপ। রামকৃষ্ণের ভাষায়, সিঁড়ি বেয়ে ছাতে উঠে দেখা যায় ছাতও যে বস্তুতে নির্মিত সিঁড়িও সে বস্তুতেই তৈরী—একই ইট চুণ সুরকি। একই সচ্চিদানন্দ। ত্যাজ্য-গ্রাহ্য আলাদা করার কিছু নেই, সবই গ্রাহ্য। অন্ন ব্রহ্ম। প্রাণ ব্রহ্ম। মন ব্রহ্ম। বিজ্ঞান ব্রহ্ম। আনন্দ ব্রহ্ম। (তৈত্তিরীয় ২।১—৫)। আনন্দেই সব বিধৃত, আনন্দে জাত ও আনন্দে সমাহিত। আনন্দই তাঁর স্থায়ী অভ্যাস।

ঈক্ষতের্নাশব্দম্—কথাটির নাশব্দম্-এর অর্থ, এই সত্যবাণী অশব্দ নয় অর্থাৎ এ শ্রুতিবাক্য-বেদোপনিষদ দ্বারা অসমর্থিত নয়। অর্থাৎ বেদ-উপনিষদেই এই ব্রহ্ম পরিচয় রয়েছে।

শঙ্কর এসবই ঝুটা বাৎ বলে উড়িয়ে দিয়ে ব্রহ্মই সত্য আর জগৎ ও জীবনকে মায়া, মিথ্যা, ভ্রান্তি বলেছেন। বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে কার্ল মার্কস ব্রহ্মকেই মায়া, মিথ্যা, ভ্রান্তি বলেছেন। তাঁর মতে জগৎ ও জীবনই একমাত্র সত্য।

তিনিও নতুন কথা বলেননি। প্রাচীন সাংখ্য দর্শন ঈশ্বর অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল। সাংখ্যকারের মতে অচেতন প্রধানই সৃষ্টিমূল—অর্থাৎ বস্তুজাত এ জগৎ। একান্ত ব্রহ্ম ও একান্ত প্রধান বা matter-এর ওপর ভর দিয়েই ব্রহ্মবাদী ও বস্তুবাদীর বিচারধারা এ কাল পর্যন্ত এগিয়েছে। সমগ্র সত্য

আছে উভয়ের পারস্পরিক স্বীকৃতিতে ও সমন্বয়ে। একপেশে মনোভাবের যতক্ষণ জয়জয়কার হবে ততক্ষণ কেবল—ব্রহ্মবাদী যতদূর সত্যের মর্যাদা পাবেন, কেবল—বস্তুবাদীও ততদূরই সত্যের মর্যাদা পাবেন—সত্যের তৌলদণ্ডে উভয়েই সমমর্যাদার অধিকারী। তাই রামকৃষ্ণের সাধন প্রসঙ্গে শঙ্কর যতটা আলোচনা পাবেন, মার্ক্সও ততটাই। কারও দর্শনই উপেক্ষাযোগ্য নয়। রামকৃষ্ণ একথাটা বোঝাতে বেলের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন—পুরো বেল বলতে শুধু তার শাঁস বোঝায় না, খোলা, বীচি ও শাঁস নিয়েই বেল হয়। খোলা বীচি বাদ দিলে বেলের ওজন কম পড়ে যাবে। জগৎ ও জীবন বাদ দিলে ব্রহ্মেরও ওজন কম পড়ে যাবে। সত্য হারাবে তার সমগ্রতা।

রামকৃষ্ণ বাদ দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না বলেই তাঁর সাধনাও অপরাপর ব্রহ্মবাদীদের মতো বা বস্তুবাদীদের মতো হয়নি। প্রথম লক্ষণীয়, তিনি তাঁর সাধনপীঠ নির্বাচন করলেন দক্ষিণেশ্বরে—ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজধানীর অতি সন্নিকটে। যীশুর সাধনক্ষেত্র ছিল এত নির্জন ও দুরূহ যে কেউ তার খোঁজ রাখে না, বাইবেলে তার উল্লেখ নেই। মহম্মদও হীরা পর্বতের গুহায় ধ্যান-ধারণা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সাধনা করেছেন ঘোর ঋষির আশ্রমে বারো বছর। বুদ্ধের তপোভূমি নির্জন অরণ্যপ্রদেশ। রামকৃষ্ণ আজন্ম কাটিয়েছেন গ্রামে ও নগরে—জনপদের পরিচিত আবেষ্টনীতে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেকালে পঞ্চাশজন কর্মচারী ছিল, দক্ষিণেশ্বর গ্রামের লোক আসা-যাওয়া করত, আসত সাধু ফকির কাঙালী বৈরাগীর দল—সর্বোপরি মথুরানাথ ও রাণী রাসমণি থাকতেন।

রাসমণি ইতিপূর্বে কালীঘাটে জমি ও বাড়ি কিনেছিলেন, মায়ের মন্দিরের কাছে কখনো কখনো থাকতেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর যে কয়েক বছর তিনি বেঁচেছিলেন সে সময়ে তিনি কালীঘাটের বদলে অধিকাংশ সময় এই ভবতারিণী-মন্দিরেই কাটাতেন। এঁদের সবার চোখের সামনে রামকৃষ্ণ তাঁর ঈশ্বরসাধনা করে গিয়েছেন। সাধনার ক্ষেত্র-নির্বাচন দেখেই বোঝা যায় যে তিনি মানুষকে, জগৎ ও জীবনকে ভয় পাননি, পালাতে চাননি তা থেকে, সরিয়ে দেননি এসব দুহাতে মায়া বলে, মিথ্যা বলে।

ধর্ম আপিং বলে মার্ক্সের যে অভিমত তারও মধ্যে কিছু সত্য আছে। যে ধর্মের কথা তিনি বলেছিলেন তা হল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, সংঘবদ্ধ ধর্ম। একথা অনস্বীকার্য যে সে ধর্ম প্রায়ই স্থিতস্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, শোষকদের মদত

দিয়েছে, জনসাধারণকে পদদলিত করতে সাহায্য করেছে। সে ধর্ম অধর্ম ও অন্যায়কেই মেনে নিতে নির্দেশ দিয়ে এসেছে। তেমন ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অনুচিত নয়।

তার চেয়েও বড় কথা আছে। সব ধর্মই গুণাশ্রয়ী—সত্ত্ব রজ ও তম গুণ অবলম্বন করে থাকে। আমরা যাঁদের বলি ধার্মিক মানুষ তাঁরা সাত্ত্বিক মানুষ নৈতিক মানুষ; ব্রহ্মবিৎ নন। রামকৃষ্ণ বলেন, তিন গুণই ডাকাত—সত্ত্ব গুণও তাই। সত্ত্বগুণ প্রশংসাযোগ্য কিন্তু তা ঈশ্বরপ্রাপ্তি করায় না। ঈশ্বর লাভের সাধনায়, ব্রহ্মোপলব্ধির তপস্যায়, সত্যকে জানার দুরূহ ব্রতে তিন গুণেরই পারে চলে যেতে হয়। গীতায় কৃষ্ণ অর্জনকে বলেছেন, নিস্ত্রৈগুণ্য ভব। ধর্মাধর্মের পারে যাও। সর্বধর্মং পরিত্যজ্যং মামেকং শরণং ব্রজ—সব ধর্ম, কুলধর্ম, পতিধর্ম, দুস্ত্যজ আর্যধর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র পরম সত্যের শরণ নাও। ধর্ম কিছু ঈশ্বর নয়—রামকৃষ্ণের উক্তি। তাই জগন্মাতার কাছে প্রার্থনায় রামকৃষ্ণ বলেন: মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য। এই নাও তোমার ভালো এই নাও তোমার মন্দ, এই নাও তোমার ধর্ম এই নাও তোমার অধর্ম···আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। ধর্মও অঞ্জলিস্বরূপ দান করতে হয় পরমের পাদপদ্মে—কেননা ধর্মও বন্ধন, তা বেঁধে রাখে। religion-এর লাতিন মূল হল religare-যা বাঁধে। যে শুধু ঈশ্বরকেই চায়, সত্যকেই চায় ধর্ম তার কাছে আপিংস্বরূপ—ও নেশা না কাটানো পর্যন্ত সত্য লাভ হয় না।

বস্তু থেকে কিভাবে চৈতন্য জাত হয় মার্ক্স এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। বস্তুর মধ্যে ডায়ালেকটিকস বা দ্বান্দ্বিকতা নিহিত আছে এবং তারই ফলে বিকাশের কোনো পরম্পরায় এসে পরিমাণগত পরিবর্তনকে ছাপিয়ে গুণগত পরিবর্তন এসে যায়—বস্তু থেকে প্রাণের উৎপত্তি হয়, এই তাঁর ব্যাখ্যা। কিন্তু চৈতন্য কি বস্তুর মধ্যে সম্ভাবনাকারে অন্তর্নিহিত ছিল, না, অন্তর্লীন দ্বন্দ্বের ফলে উৎপন্ন হল? চৈতন্য বস্তুনির্ভর একথা মানলেও বস্তু ও চৈতন্য কি স্বরূপে স্বতন্ত্র, স্বধর্মেই পৃথক? আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে বস্তু কি তা থেকে স্বভাবে স্বতন্ত্র চৈতন্যের জন্ম দিতে পারে? মার্ক্স উনিশ শতকের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন, সে বিজ্ঞান আজ বাতিল হয়ে গিয়েছে। বিশ শতকের অন্তিম লগ্নে বিজ্ঞান বস্তুর মর্ম যেভাবে ভেদ করেছে তাতে বস্তু ও চৈতন্যের পার্থক্যই অস্বীকৃত হয়ে আসছে—বস্তু ও চৈতন্য একই অস্তিত্বের দুটি বিভাব, দুটি মুখ, দুটি স্তর এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে।

মার্ক্সের তুলনায় প্রাচীন সাংখ্যকারের রায় এ বিষয়ে অনেক পরিমাণে আধুনিকতম বিজ্ঞানসম্মত। সাংখ্যকার বলেন :

মূলাভাবাদমূলং মূলম্। ৬৭

অর্থ—প্রকৃতি অমূল অর্থাৎ অনাদি ও নিত্যা ; তার অপর কোনো মূল (উপাদান-কারণ) নেই।

পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্। ৬৮

অর্থ—কারণপারম্পর্যানুসন্ধানে অর্থাৎ অমুক এর কারণ, অমুক আবার তার কারণ এ রকম অনুসন্ধান করতে করতে যে স্থানে গিয়ে অনুসন্ধান শেষ হয় সেই নিত্য বস্তুই প্রকৃতি। মূল কারণেরই এক নাম প্রকৃতি।

সাংখ্যশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ টীকাকার নবম শতকের বাচস্পতি মিশ্র তাঁর 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'তে প্রথম প্রণাম-মন্ত্রে প্রকৃতিকে প্রণাম করেছেন, ঈশ্বরকে নয়। (অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ॥ ১) আস্তিক বাচস্পতি—ভামতী টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে তিনি পরব্রহ্ম ও ভবকে নমস্কার করেছেন—সাংখ্যকারিকার টীকায় ঈশ্বরকে প্রণাম না করে ইঙ্গিত করেছেন যে সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নেই। বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় ব্যাপারে দায়িত্ব প্রকৃতির। এই প্রকৃতি অজ, অর্থাৎ জন্ম হয়নি তার, চিরকালই ছিল, আছে, থাকবে। লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থাৎ রজ সত্ত্ব ও তম—প্রকৃতি এই ত্রিগুণময়ী। সেই প্রকৃতিই লোকসমূহ সৃষ্টি করেছে। তার বিনাশও নেই। উৎপত্তি-বিনাশহীনা বলেই এ মূলাপ্রকৃতি। সে-ই উপাদান, আবার সে-ই কর্ত্রী—কেননা সে প্রজা সৃষ্টি করে ও নানা কাজ করে।

প্রকৃতিই বস্তু—জন্মধ্বংসহীন বস্তু। সে অচেতন, চৈতন্যহীন। কিন্তু চৈতন্যময় পুরুষের সংলগ্ন হয়েই সে আছে ; পুরুষের চৈতন্য প্রকৃতির মধ্যে আভাসিত হয়, দর্পণে যেমন ছায়া পড়ে ; অথবা সান্নিধ্যবশত পুরুষের চৈতন্য-স্বভাব প্রকৃতিকে তৎভাবে অনুরঞ্জিত করে। প্রকৃতিতে বুদ্ধি, মন, অহংবোধ ফুটে ওঠে পুরুষের প্রতিফলনে—কিন্তু বুদ্ধি, মন, 'আমি' বোধ প্রকৃতিজাত বলে বস্তুই। চৈতন্যস্বভাব একমাত্র পুরুষ।

সাংখ্যের এ সমাধানও পর্যাপ্ত বলে গৃহীত হয়নি পরবর্তী তত্ত্বদর্শীদের কাছে, তবু এতে অচেতন পদার্থে চৈতন্যের বিকাশের একটা হদিস পাওয়া যায়। মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় সে হদিশ নেই, আছে একটা অপ্রমাণিত প্রাক-সিদ্ধান্ত। দ্বান্দ্বিকতার বলে অচেতন পদার্থ এক লাফে সচেতন হয়ে উঠছে—

গুণগত পরিবর্তনকে লাফই বলা হয়—এটা ধরে-নেওয়া মত; প্রমাণিত সত্য নয়।

বিপরীত কোটি থেকে যাত্রারম্ভ করে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্ম বা পরমচৈতন্য কিভাবে পদার্থজগৎ হলেন এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বরং গোঁজামিল দেবার বদলে সরাসরি বললেন যে ব্রহ্ম জগৎ ও জীবন হননি। জগৎ ও জীবন এল কোথা হতে? শঙ্কর বললেন জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নয়—ব্রহ্মে ভ্রম দর্শন মাত্র: অথবা জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। এক বস্তুতে আর এক বস্তু মিথ্যা দেখাকেই বিবর্ত বলে—যথা দড়িতে সাপ দেখা।

> বিবর্তস্তু প্রপঞ্চোহয়ং ব্রহ্মণোহ পরিণামিনঃ। অনাদিবাসনোদ্ভূতো ন সারূপ্যমপেক্ষতে।
>
> (ব্রহ্মসূত্র ১।২।২১ শাঙ্কর ভাষ্য টীকা, ভামতী, কালীবর-বেদান্তবাগীশ সংস্করণ)

অর্থাৎ জগৎ ও জীবন ব্রহ্মের বিবর্ত, পরিণাম নয়। বিবর্ত কখনো সত্য হয় না। এখন সত্য মনে হলেও পরে ভুল ভেঙে যায়। দড়িকে সাপ মনে করা ভুল। কখনো কখনো সে ভুল আমরা করি, ভয়ও পাই, কিন্তু পরে ভুল ভাঙে। ওরকমই ব্রহ্মে জীব ও জগৎ ভ্রমরূপ বিবর্ত হয়—এ মিথ্যা বা মায়া। মহামায়াবী ব্রহ্ম মায়াশক্তিদ্বারা মিথ্যা জগতের সৃষ্টি করে আমাদের ভ্রান্ত করছেন। কিন্তু এটা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা, পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা নয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে জগৎ ও জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন—ব্রহ্মই আছেন, জগৎ ও জীবন নেই।

মহামায়াবী ব্রহ্ম মায়াশক্তিতে জগৎ রূপ ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন—এই মায়াটি কী? শঙ্কর বলেন:

> অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্বান্যত্ব-নিরূপণস্যাশক্যাত্বাৎ
>
> (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।৩, ২।১।১৪ শঙ্করভাষ্য)

অর্থাৎ মায়া অনির্বচনীয়া; তা সৎও নয়, অসৎও নয়। যার স্বরূপ নির্ণয় করতে পারা যায় না, অথচ যা স্পষ্ট প্রকাশ পায় এমন সব ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারই মায়া। মায়াই জগতের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব ঘটায়। চৈতন্য ব্যতীত মায়ার স্বতন্ত্র উপলব্ধি নেই, তাই মায়া পরাধীন। অসঙ্গ চৈতন্যকে সঙ্গসহ করে বলে মায়া স্বাধীন। কূটস্থ চৈতন্যকে অচেতন বস্তুরূপে প্রতীত করায় ও চৈতন্যের আভাসযুক্ত জীব সৃষ্টি করে (যেন আছে দেখায়)। পরমাত্মার

কূটস্থ স্বরূপের হানি না করেই তাঁতে জগৎ ভাসমান করায়—মায়া এমনই সামর্থ্যযুক্তা।

ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিঃশক্তিক বলেই পরক্ষণেই মায়াশক্তির অবতারণা করে শঙ্কর কতখানি ফ্যাসাদে পড়েছেন তা জীব গোস্বামী তাঁর "ভগবৎ সন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী"তে ভালো করে দেখিয়েছেন। যথাকালে সে আলোচনা করব।

বস্তু চৈতন্য নয়—বস্তু অচেতন। তাতে চৈতন্যের আবির্ভাব কিভাবে হয় মার্ক্স সেকথা বলতে গিয়ে দ্বান্দ্বিকতার কথা এনেছেন। শঙ্করের ব্রহ্মে দ্বন্দ্ব নেই, মার্ক্সের পদার্থ দ্বন্দ্বপীড়িত। শঙ্করের যা মায়া মার্ক্সের তাই-ই ডায়ালেকটিকস। শঙ্কর তর্কের পথ বন্ধ করেছেন এই বলে যে মায়া আছে (সৎ) একথাও বলা যায় না, মায়া নেই (অসৎ) একথাও বলা যায় না। তার স্বরূপ জানিনা কিন্তু স্পষ্ট তার কার্য তাই তা অনির্বচনীয়। মার্ক্সের ডায়ালেকটিকস অনির্বচনীয় নয়, অসৎ নয়; তা বিজ্ঞানপ্রমাণিত ও সৎ। কিন্তু বিজ্ঞান যখন পদার্থের ধারণাই পালটে দিচ্ছে তখন ডায়ালেকটিকসের ভবিষ্যৎ অজানা। সম্ভবত ডায়ালেকটিকস উপরিতলের বা কৃত্রিম সত্য, মূল সত্য নয়—আধুনিকতম বিজ্ঞানের ইঙ্গিত সেদিকে।

ভবিষ্যতের ইঙ্গিতের কথা এখন থাকুক। আমরা এখন অতীতের কথা বলছি। রামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন সে সময়ের কথা। শুধু এটুকু অনুধাবনীয় যে সত্যের কত বিচিত্র ও বিপরীত উপলব্ধি রামকৃষ্ণের সাধনা-দ্বারে স্বীকৃতি ও সমন্বয় দাবী করছিল।

রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরেই বাস করছিলেন। ঝামাপুকুরের পাট উঠে গিয়েছে। আপন মনেই থাকেন, মন্দিরের কোনো কাজ কর্মে লিপ্ত নেই, কারও সঙ্গেই কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কিন্তু আসা-যাওয়ার পথে রাসমণি ও মথুরের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ল। আকৃষ্ট হলেন তাঁরা। এই রূপলাবণ্যময় বিংশতিবর্ষীয় যুবক সত্যই তো নয়নানন্দকর। শুধু তো নয়ন নয়, নয়নের অন্তস্তলে যে প্রাণ ও মন তাকেও যে টানে! কেন?

হেতুটি তাঁর নিজের উক্তি থেকেই জানা যায়। শ্যামপুকুরে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, স্বামী সারদানন্দ (শরৎ) প্রভৃতিকে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন:

> ছেলেবেলায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এগারো বছরের সময় মাঠের মাঝে কি দেখলুম! সবাই বললে, বেহুঁশ হয়ে গিছিলুম,

কোনো সাড় ছিল না। সেই দিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলুম। যখন ঠাকুর পূজা করতে যেতুম, হাতটা অনেক সময় ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসতো, আর ফুল মাথায় দিতুম। যে ছোকরা আমার কাছে থাকতো, সে আমার কাছে আসতো না; বলতো, তোমার মুখে কি এক জ্যোতিঃ দেখছি, তোমার বেশি কাছে যেতে ভয় হয়।

জ্যোতির আবেষ্টনীতে ঘেরা ছিলেন কিশোর-যুবক রামকৃষ্ণ—ঈশ্বরীয় জ্যোতি। তাই অপার্থিব আকর্ষণ ছিল তাঁর। শুদ্ধচরিত্রা রাসমণি ও মথুরামোহনের ভক্তিময় দৃষ্টি এই নবীন যুবককে দেখে তাই স্বতঃই আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, এঁকে কি আরও আপন করে পাওয়া যায় না?

ধনী কর্তৃত্বসম্পন্ন লোকরা কাউকে আপন করে পেতে চাইলে তাকে নিজেদের কর্তৃত্ব জালে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করে। ওঁরা তাই রামকৃষ্ণকেও মন্দিরে চাকরি স্বীকার করাতে চাইলেন। মথুরামোহন রামকুমারকে বললেন, আপনার তদ্গত পূজায়ই সবটুকু সময় যায়, আর তাই-ই ভালো। কিন্তু ফুল ও ফুলমালায় মা ভবতারিণীকে নিত্য সাজাতে পারলে কত না আনন্দ হয়। মায়ের বেশভূষা করাবার ভার যদি আপনার ছোট ভাই নেন তবে সেদিকে আর ত্রুটি থাকে না।

রামকুমার বললেন, গদাই যেমন ভক্ত তেমনি শিল্পী। ও ভার ও নিলে তো ভালোই হয়। কিন্তু স্বাধীন স্বভাব ওর, ও কি কোনো চাকরি স্বীকার করবে?

রামকুমার যথার্থই বলেছিলেন। ভগবান ছাড়া আর কারও চাকরি করব না এই ছিল রামকৃষ্ণের মনোভাব। রামকুমার মথুরকে এ বিষয়ে আর এগোতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই ভাইকে ব্যাপারটি বলেছিলেন। রামকৃষ্ণ চাননি রাসমণি বা মথুরের মতো মানী লোকের মান ক্ষুন্ন করতে। তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার ফল তো তাই দাঁড়াবে। একথা ভেবে তিনি ঐখানেই একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকতেন—যাতে ওঁদের নজরে না পড়তে হয়।

ইতিমধ্যে তাঁর একজন সঙ্গী জুটেছিল: ভাগনে হৃদয়। তার নাম হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়, পিতা কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী,

নিবাস শিহড় বা শিওড়। হেমাঙ্গিনী ক্ষুদিরামের বোন রামশীলার মেয়ে। গদাধরের পিসতুতো বোনের ছেলে হৃদয়। হৃদয়রা চার ভাই, সে সেজো। বড় দুভাই রাঘব ও রামরতন, কনিষ্ঠ ভাই রাজারাম।

হৃদয়ের বয়স তখন ষোলো। লেখাপড়া বিশেষ কিছু হয়নি, পৈতৃক অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয়। কাজকর্মের খোঁজে সে গিয়েছিল বর্ধমান। সেখানে কয়েক মাস থাকার পর দেশের লোকদের মুখে সে খবর পেল যে রাসমণির মন্দির খুলে গিয়েছে, তারই বড় মামা (আপন মামা অবশ্য রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়) রামকুমার সেখানে প্রধান পূজকের পদ পেয়েছেন, ছোট মামাও মন্দিরেই আছেন। হৃদয় ছিল করিৎকর্মা, উদ্যমী, ভয়শূন্য ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন। সে ভাবল, মামারা যেখানে রাণীর আশ্রয় পেয়েছেন, আমিও সেখানেই যাই, একটা হিল্লে হবেই।

প্রায় চার বছর বয়সের পার্থক্য ছিল রামকৃষ্ণ ও হৃদয়ের মধ্যে—কিন্তু বিদেশে দেখা হতেই তাঁরা হয়ে গেলেন দুই বন্ধুর মতো। দুজনেই হয়ে উঠলেন পরস্পরের আশ্রয় ও অবলম্বন, দরদী, সখা। অবশ্য হৃদয় ছোট মামাকে শ্রদ্ধা ও মান্য করত।

হৃদয় ছিল দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সুশ্রী ও সুপুরুষ। কঠোর পরিশ্রমী, সদা উদ্যমী, অনলস, নির্ভীক, প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রতিকার-উপায় উদ্ভাবনে পটু। হৃদয় মামাকে অকৃত্রিম ভালোবাসত, কিন্তু উচ্চ ভাবের ভাবুক সে ছিল না। সে সংসার বুঝত, সাধারণ মানুষের ভাবগতি বুঝত, ইহমুখী দৃষ্টি ছিল তার। রামকৃষ্ণ ও হৃদয় যেন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুজন মানুষ, আর সেজন্যই তাঁরা পরস্পরকে আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্ক কোনদিন ছিন্ন হয়নি, হৃদয় পরিণত কালে দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছেড়ে গেলেও নয়। রামকৃষ্ণকে সে-ই দেখেছে সবচেয়ে কাছে থেকে, সবচেয়ে বেশি কাল; কিন্তু সে তার নিজ স্বভাবেই স্থির ছিল, মামার অত প্রাণঢালা সেবা করলেও মামার আদর্শ সে গ্রহণ করেনি। সে ছোট সুখ দুঃখের কারবারী, চেয়েছে তার ছোট সংসারকে প্রতিষ্ঠা দিতে, তাও পেরে ওঠেনি ভালো করে। ঐ সংসার কামনার ঠুলিতে চোখটি ঢাকা ছিল বলেই সব দেখে শুনে ও বুঝেও রামকৃষ্ণ-মহিমা গোচর হয়নি তার: সব চেয়ে কাছে থেকেও সে হয়নি সবচেয়ে কাছের জন। তারই ফলে যে দিব্যজননী সাধনকালে রামকৃষ্ণের দেহরক্ষায় হৃদয়কে নিযুক্ত করেছিলেন তিনিই তাকে উত্তরকালে সরিয়ে দেন রামকৃষ্ণের পূত সঙ্গ থেকে।

তাতেও রামকৃষ্ণ বিমুখ হননি হৃদয়ের প্রতি। তার জন্য ছিল তাঁর মন কোমলার্দ্র হয়ে। তিনি ভোলেননি হৃদয়কে।

ষোলো বছরের হৃদয় বিশ বছরের রামকৃষ্ণের অচ্ছেদ্য সঙ্গী হয়ে উঠল আসা মাত্র। রামকৃষ্ণ গঙ্গাতীরে তখন স্বহস্তে পাক করে খান—হৃদয় রাঁধার জোগাড়যন্ত্র করে দিত। সে নিজে মন্দিরের প্রসাদ পেত। রাতে রামকৃষ্ণ রান্নার হাঙ্গামা করতে পারতেন না, তখন মন্দিরের প্রসাদী লুচি খেতেন। রাতে ভবতারিণীকে লুচি ভোগ দেওয়ার রীতি ছিল। অন্ন প্রসাদ নয়, তবু রামকৃষ্ণ কখনো কখনো কেঁদে ফেলতেন লুচি খেয়ে। মাকে আক্ষেপ জানিয়ে বলতেন, মা, আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি? সেসময় গরীব কাঙালীরাও অনেকে রাসমণির মন্দিরের প্রসাদ খেতে আসত না। খাবার লোক জুটত না বলে প্রসাদান্ন অনেক সময় গরুকে খাওয়াতে হত অথবা গঙ্গায় ফেলে দিতে হত।

হৃদয়ের কাছে রামকৃষ্ণ ঈষৎ কুহেলিকাময় হয়েছিলেন তখনই। সে হয়তো রামকুমারকে কোনো বিষয়ে সাহায্য করতে গিয়েছে বা দুপুরে খেতে গিয়েছে, বা দুপুরে একটু দিবানিদ্রা দিয়েছে বা সন্ধ্যায় আরতি দেখছে,—ফিরে এসে দেখত ছোট মামা নেই। বহু খুঁজেও সন্ধান পেত না তাঁর। এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা কেটে গেলে মামা ফিরে আসতেন, প্রশ্ন করলে বলতেন: এখানেই তো ছিলাম। কোনো কোনোদিন খুঁজতে খুঁজতে হৃদয় দেখত ছোট মামা পঞ্চবটীর দিক থেকে ফিরছেন—ওদিকে তখন গাছপালায় ছাওয়া ছিল। হৃদয় ভাবত ছোটমামা নিশ্চয়ই শৌচে গিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণের এই ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্ধান-রহস্যের মর্ম হৃদয় ভেদ করতে পারেনি।

রামকৃষ্ণ এ সময় একদিন ইচ্ছা করেন মাটির শিবমূর্তি গড়ে শিবপূজা করবেন। গঙ্গা থেকে মাটি তোলা হল। গঙ্গামাটিতে দেখতে দেখতে শিব গড়ে ফেললেন তিনি—শিবের ডমরু ত্রিশূল ও ষাঁড়ও বাদ গেল না। মূর্তি শুকিয়ে গেলে তাতেই শিবপূজা করতে লাগলেন রামকৃষ্ণ তন্ময় হয়ে। হঠাৎ মথুর বেড়াতে বেড়াতে সেখানেই উপস্থিত।

ভাবতন্ময় পূজকের প্রতি যেমন, শিবমূর্তিটির প্রতিও মথুর তেমনি আকৃষ্ট হলেন। কী সুন্দর শিব! দিব্যভাবমণ্ডিত হয়ে উঠেছে মাটির শিব—নিমীলিত চোখে, প্রসন্নহাস্যমধুর ওষ্ঠপ্রান্তে এ কোন ভাবব্যঞ্জনা। এমন মূর্তি তো দেখিনি কখনো। মথুর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কোথায়

পেলে এ মূর্তি, কে গড়ে দিয়েছে? গর্বিত হৃদয় জানিয়ে দিল, এ তার ছোট মামারই কাজ। অমন দেবদেবীর মূর্তি গড়তে মামা সহজেই পারে। বিস্মিত, মুগ্ধ মথুর একটি ভিক্ষা চাইলেন ক্ষুদ্র হৃদয়রামের কাছে। তোমার মামার পূজা হয়ে গেলে মূর্তিটি আমায় দেবে? গর্বিত হৃদয় এবার বদান্য হল: হাঁ দেব। পূজাশেষে রামকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে হৃদয় শিবটিকে পৌঁছে দিয়ে এল মথুরের কাছে—তিনি ওখানেই তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে তখন রয়েছেন।

মথুর নিজে তন্ন তন্ন করে মূর্তিটি দেখলেন, প্রশংসমান হলেন তার শিল্পগুণে, কিন্তু মুগ্ধ হলেন তার ভাবদ্যুতিতে। রাসমণিকে দেখালেন—তিনিও দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। রাণীও মুগ্ধ হলেন। ভাবলেন, এ মূর্তি যার নির্মাণ সে তো দেবশিল্পী। মাটিতেই সে অরূপকে ব্যঞ্জিত করে তুলতে পারে!

এবার ওকে চাইই—আমার এ দেবপূজার আয়োজনে ওর যোগটি না ঘটলে পূজা যে আমার সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হবে না!

রাণীর ইঙ্গিত পেয়ে মথুরের নিজের ইচ্ছাও বলবতী হল। সুযোগও মিলে গেল। একদিন রামকৃষ্ণকে তিনি দেখতে পেলেন কিছু দূরে। রামকৃষ্ণও দেখেছেন। দেখে সরে পড়তে চেষ্টা করছেন, মথুরের চাকর এসে ডাক দিল। বলল: বাবু ডাকছেন তোমাকে।

হৃদয় কাছেই ছিল। রামকৃষ্ণকে অতি দ্বিধাগ্রস্ত দেখে সে জানতে চাইল কারণ। রামকৃষ্ণ বললেন: বাবুর কাছে গেলেই চাকরি করতে বলবে। হৃদয়: তাতে দোষ কী মামা? এমন গঙ্গাতীর, মন্দির, এখানে মহতের আশ্রয়ে চাকরি। তাতে তো ভালো বই মন্দ হবে না মামা!

রামকৃষ্ণ: ন্যাখ, চাকরি স্বীকার করলে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হবে। এখানে যদি পূজক হই তাহলে দেবীর অঙ্গের এত গয়নার জন্য দায়ী থাকতে হবে। ওসব হাঙ্গামা সইতে আমি পারবুনি বাপু। তবে তুই যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে ওসব ভার নিস তাহলে পূজা করতে আমি পারি।

না চাইতেই এক মেঘ জল! আরে, এখানে চাকরির জন্যই তো আসা। একটা স্থায়ী কাজের খোঁজেই এই অল্প বয়সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। তুমি তো সব জানো মামা। তুমি বাবুর কথায় রাজি হলে আমারও যে অন্নের পাকা বন্দোবস্ত হবে।

রামকৃষ্ণ তখন এগিয়ে গেলেন। মথুরবাবু সরাসরি প্রস্তাব দিলেন। রামকৃষ্ণ ঐ সর্তই জানালেন, হৃদয়কে সঙ্গী চাই। মথুর তখনই সর্ত মেনে

নিলেন। বললেন: তুমি হবে ভবতারিণীর বেশকারী, হৃদয় হবে তোমার ও তোমার দাদার সহকারী। হয়ে গেল চাকরি। হৃদয় খুশিতে ডগমগ। খুশি হলেন রামকুমারও। ছোট ভাই সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ঘুচল।

মন্দির প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই এই সব ব্যাপার ঘটে গেল। ভবতারিণীর বেশকারীর পক্ষে ভবতারিণীর অন্নভোগে অরুচি হওয়া মানায় না। অতএব রামকৃষ্ণের স্বপাক রান্নার পালাও চুকে গেল। কলকাতায় এসে মায়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ: ঠনঠনেতে ও দক্ষিণেশ্বরে। এবার মায়ের অঙ্গস্পর্শ করতে পারলেন তিনি। অথবা মা-ই রামকৃষ্ণের স্পর্শতৃষ্ণ হয়েছিলেন—এতদিনে তা পেলেন।

কিন্তু কয়েকদিন পরই, ভাদ্র মাসে, ঘটনা একটু অন্যদিকে মোড় নিল। জন্মাষ্টমীর পর দিন। সেদিন নন্দোৎসব। দুপুরে রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগ হয়ে গিয়েছে। এখন ঠাকুরদের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের সময়! পূজারী ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীমতীকে শয়ন করিয়ে এলেন শয্যায়। এখন নিতে এলেন গোবিন্দকে। নিয়ে যাচ্ছেন; স্থানটি জলে পিচ্ছিল ছিল; ক্ষেত্রনাথ পড়ে গেলেন। হাত থেকে বিগ্রহও পড়ে গেল পাথরের কঠিন মেঝেয়। পড়ে গোবিন্দজীর পা ভেঙে গেল। বিষ্ণু মন্দিরেই তখন রাধা-গোবিন্দের পূজাঘর ও শয়নঘর পৃথক ছিল—বিগ্রহদ্বয়কে একবার পূজাবেদীতে আনা হত, আবার শয়নঘরে শয়ন করাতে নিয়ে যাওয়া হত। সকালে আনা হত, দুপুরে নিয়ে যাওয়া হত; আবার বিকালে আনা হত, রাতে নিয়ে যাওয়া হত। ছোট বিগ্রহ, তাই আনা-নেওয়ায় অসুবিধা হত না। এই শয়নঘরে বিগ্রহ নিতে গিয়েই বিপত্তি।

হুলস্থূল পড়ে গেল। ক্ষেত্রনাথ নিজেও চোট পেয়েছিলেন, তদুপরি ভয়। রাণী ও মথুর খবর পেলেন। এখন উপায়? ভাঙ্গা বিগ্রহে পূজা নিষিদ্ধ। বিগ্রহ পালটাতেও রাণীর মন সরে না—ওঁরা তো শুধু পুতুল নয় তাঁর কাছে, ওঁরা যে জীবন্ত প্রাণধন। উভয় সঙ্কট। উপায় স্থির করতে রাণী পণ্ডিতদের সভা ডাকালেন। কলকাতার নামী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা দক্ষিণেশ্বরে সভায় এলেন, রাণীও উদার হাতে তাঁদের মর্যাদানুরূপ বিদায়-ব্যবস্থা করলেন। যাঁরা আসতে পারেননি তাঁদের কাছেও পাঁতি আনতে লোক গিয়েছিল। পণ্ডিতরা শাস্ত্রবিচার করে সর্বসম্মত রায় দিলেন—ভাঙা মূর্তি গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হোক। তার জায়গায় নতুন মূর্তি বসানো হোক।

রাণী নতুন মূর্তি তৈরী করতে শিল্পীকে বরাতও দিয়ে দিলেন। কিন্তু মথুর রাণীকে একটা কথা বললেন। ঐ কথা থেকেই বোঝা যায় রামকৃষ্ণের প্রতি রাণী ও মথুরের শ্রদ্ধা ও আস্থা জন্মেছিল। বললেন: পণ্ডিতদের রায় তো জানলাম। এখন ছোট ভটচাযের মতটি একবার নিলে হয় না? ওঁর কথা তো শোনা ভালো। রাণীরও এ বিষয়ে আগ্রহ ছিল।

ছোট ভটচায বিনাদ্বিধায় এক কথাতেই রায় দিয়ে দিলেন। বললেন: রাণীর জামাইয়ের পা ভাঙলে কি তাঁকে ত্যাগ করে আর একটি লোককে ঐ জামাইয়ের জায়গায় বসানো হবে? না, জামাইয়ের ভাঙা পায়ের চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলা হবে? এখানেও সেই একই বিধান। গোবিন্দজীর বিগ্রহের ভাঙা পা জুড়ে দিয়ে ঐ বিগ্রহের পূজা চলুক। ঐ বিগ্রহ গঙ্গায় বিসর্জনের দরকার নেই।

আশ্চয এ সমাধান—এত সহজ কিন্তু কারও মাথায়ই তো আসেনি আগে। কথাটি রাণীর প্রাণে গিয়ে লাগল। এমন মনের মতো কথা! প্রাণগোবিন্দকে কি সত্যই ফেলে দেওয়া যায়? সে কি মাত্র সখের জিনিস?

দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরের পণ্ডিত-সভা তখনো শেষ হয়ে যায়নি। পণ্ডিতরা সভাস্থলেই আছেন। রামকৃষ্ণের পাঁতি তাঁরা সকলে মানতে পারেননি। কারও কারও মতে এ অশাস্ত্রীয় বিধান। কিন্তু কোনো কোনো পণ্ডিত অন্তরের আলোয় আবিষ্কার করলেন, এই-ই উৎকৃষ্ট বিধান। তাঁরা সাধু-সাধু ধ্বনি করে উঠলেন।

রামকৃষ্ণ নিজেই নিপুণভাবে বিগ্রহের ভাঙা পা জুড়ে দিয়েছিলেন। সেই বিগ্রহই অদ্যাবধি পূজা পেয়ে আসছেন। জোড়ের চিহ্নটুকু পর্যন্ত লক্ষ্য করলেও দেখা যায় না। শিল্পী কিন্তু বরাত পেয়ে নতুন মূর্তি গড়ে এনেছিলেন। সেই নতুন মূর্তি মন্দিরেই রক্ষিত ছিল কিন্তু প্রতিষ্ঠা করা হয়নি তার। মথুরবাবুর মৃত্যুর পর সে চেষ্টা হয়েছিল শোনা যায়: অকল্যাণ ও বিঘ্ন এসে পড়ায় বারবারই সে ইচ্ছা স্থগিত রাখতে হয়েছে।

ক্ষেত্রনাথের চাকরি গেল—অমনস্কতার অভিযোগে। রাণীর একান্ত অনুরোধে রাধাগোবিন্দের পূজার দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হলেন রামকৃষ্ণ। ভবতারিণীর বেশকারীর বদলে তিনি হলেন রাধাগোবিন্দের পূজারী।

এই ঘটনার আর একটু ইতি আছে। বরানগরে গঙ্গায় রতন রায়ের ঘাট ছিল। নড়ালের জমিদার রতন রায় ঘাটটি করেন, তাই ঐ নাম। ঘাটের

পাশে একটি মন্দির ছিল। ঐ মন্দিরে দশমহাবিদ্যামূর্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। মন্দিরটির যত্নাদি ছিল না। এ মন্দিরে রামকৃষ্ণ আসতেন, মথুরবাবুও এসেছেন তার সঙ্গে। মন্দিরের দৈন্যাবস্থায় ব্যথিত রামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে বলে মাসিক দুমণ ভোগের চাল ও দুটি টাকার বন্দোবস্ত করে দেন। পরে একদিন ঐ মন্দিরে এসে মা দশমহাবিদ্যাকে দর্শন করে রামকৃষ্ণ ফিরে যাচ্ছেন এমন সময় বরানগরের জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠিত ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে অনেক লোক। আগে থেকেই চেনা ছিল বলে রামকৃষ্ণ এগিয়ে কাছে যেতেই জয়নারায়ণ তাঁকে নমস্কার ও সাদর আহ্বান জানিয়ে উপস্থিত সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন। কথায় কথায় জয়নারায়ণই জিজ্ঞাসা করলেন: দক্ষিণেশ্বরের গোবিন্দজী নাকি ভাঙা? রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন: তোমার কি বুদ্ধি গো? যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার তিনি কি কখনো ভাঙা হন?

তবু কথায় কথা বাড়তে পারে ভেবে প্রসঙ্গ পালটে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। অন্যান্য কথা তুলে এও তিনি বলেন যে সব জিনিসেরই অসার ভাগ ছেড়ে সার ভাগ নিতে হয়। অসারে কাজ কী, সারে মাতো।

জয়নারায়ণ কথার মর্ম বুঝেছিলেন। কোনোদিন আর ভাঙা মূর্তির প্রসঙ্গ তোলেন নি তিনি।

রামকৃষ্ণ বিষ্ণুঘরের পূজারী হলেন। যখন তা চাকরিই বটে তখন বেতনাদির কথা এই প্রসঙ্গে সেরে রাখা ভালো। রাণী রাসমণি এরূপ বরাদ্দ করেছিলেন:

শ্রীশ্রীকালী	মাসিক বেতন		বার্ষিক কাপড়	
শ্রীরামতারক ভট্টাচায		রামতারক	৩ জোড়া ৪॥•	
শ্রীশ্রীরাধাকান্তজী				
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য		রামকৃষ্ণ	৩ জোড়া ৪॥•	
পরিচারক				
শ্রীহৃদয় মুখোপাধ্যায়	৩॥•	হৃদয় মুখুজ্যে	ঐ	ঐ
(ফুল তুলিতে হইবে)		রাম চাটুয্যে	ঐ	ঐ

দৈনিক খোরাকী (প্রত্যেকের জন্য)

সিদ্ধচাউল /॥• সের, ডাল /৵ পোঃ

পাতা দুখান, তামাক ১ ছটাক, কাষ্ঠ /২॥•

এই বরাদ্দ করা হয় বাংলা ১২৬৫ সনে, ইংরেজি ১৮৫৮ খ্রীঃ। বরাদ্দ পাকাপাকি করা হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কৃত রাণী রাসমণির Deed of Endowment-এ। কথামৃতের সুরুতেই শ্রীম এটি উল্লেখ করেছেন।

এই দলিল থেকে কয়েকটি জিনিস জানা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ নামটি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গোড়া থেকেই বহাল হয়েছিল—এ নাম ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী, মথুরবাবু ইত্যাদি কারও দেওয়া নাম নয়। এটা পিতৃদত্ত নাম, সন্ন্যাস নাম নয়। চট্টোপাধ্যায় ভট্টাচায হয়েছেন, কেননা পূজারী ব্রাহ্মণকে ভট্টাচার্য বলে। আরও জানা যাচ্ছে যে রামকুমারের পর কোনো সময়ে ভবতারিণীর পূজারী হয়েছিলেন ক্ষুদিরামের কনিষ্ঠ ভাই রামকানাইয়ের পুত্র রামতারক। ভবতারিণীর পূজায় পাঁঠা ও মহিষ বলি হয় বলে রামতারক (এঁর নাম হলধারী) ১৮৫৯ বা ৬০ সালে ভবতারিণীর পূজা থেকে সরে এসে রাধাকান্তের পূজার ভার নেন। তখন রামকৃষ্ণ আবার ভবতারিণীর পূজার ভার নেন। তবু রাণীর দলিলে পূর্ব বরাদ্দের কথাই অবিকল থেকে গিয়েছে।

বন্দোবস্তাদি হলে রামকুমার তৃপ্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু বেশিদিন বাঁচেননি। ১৮৫৬-৫৭ খ্রীঃ, বাংলা ১২৬৩ সালের কোনো সময় তিনি মারা যান। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তিনি মাত্র এক বছর মন্দিরে ছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে আসছিল। ঐখানে থাকতে থাকতেই তিনি কনিষ্ঠ সহোদরকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীকালিকাপূজা, অন্যান্য দেবদেবীর পূজাবিধি ও মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। তাঁর ভবতারিণী-পূজায় ধীরে ধীরে ভ্রাতার সাহায্য তিনি নিচ্ছিলেন ও তাঁকেই পূজাভার দিয়ে তিনি দেশে চলে যান। স্বামী সারদানন্দের মতে ঐ সময় হৃদয় রাধাকান্তজীর পূজা করতে থাকেন। রামকুমার স্বগ্রামে স্বগৃহেই দেহ রক্ষা করেন।

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ যথাশাস্ত্র দশকর্মবিধি শিখে নিয়েছেন। কিন্তু দেবীর পূজারী হতে হলে শাক্ত দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক। সেজন্য এবং সাধন পথে অগ্রসর হতেও গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হয়। রামকৃষ্ণ এ অংশ বাদ দেননি। কলকাতার বৈঠকখানা বাজার নিবাসী প্রবীণ শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসতেন। মথুরবাবুদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। পরিচিতরা তাঁকে শুদ্ধচরিত্র ভগবদনুরাগী সাধক রূপে শ্রদ্ধা করতেন। ইনিই রামকৃষ্ণের দীক্ষাগুরু। দক্ষিণেশ্বরেই রামকৃষ্ণ এঁর কাছে দীক্ষা নেন। ইনি

কানে মন্ত্র দেওয়া মাত্র রামকৃষ্ণ ভাবাবেশে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। সে অবস্থা দেখে বিস্ময়াবিষ্ট কেনারাম আরও মুগ্ধ হন রামকৃষ্ণের ভগবদনুরাগ দেখে। তিনি প্রাণ খুলে নবীন শিষ্যকে আশীর্বাদ করেছিলেন: তোমার ইষ্ট দর্শন হোক।

রামকুমার মন্দির থেকে যাবার পর রামকৃষ্ণ মাতৃপূজার ভার নিলেন। অচিরেই তাঁর ব্যাকুল 'মা' 'মা' রবে, আর্ত কান্নায়, প্রাণোৎসারিত মধুর সঙ্গীত লহরীতে মন্দির ও মন্দিরপ্রাঙ্গণ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। যেন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ রায় (নাটোরের রাজা) প্রমুখ বাংলার মাতৃসাধকরাই নব তনুতে ফিরে এসেছেন এই মন্দিরে; যেন বাঙালীর সম্মিলিত মাতৃবন্দনা পবিত্র সুরধুনী তীরে জমাট বেঁধে একটি মানব রূপ ধারণ করেছে।

কিংবা আরও গূঢ় কিছু সত্য উন্মোচিত হচ্ছিল সেদিন।

রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে যে এক বছর ছিলেন ঐ সময়েই ভাইয়ের সাধক-পরিচয় জেনে গিয়েছিলেন। তিনি দেখতেন, রামকৃষ্ণ বিগতস্পৃহ, উদাসীন, নির্জনতাপ্রিয়। এমনকি কামারপুকুরে ফিরে যাবার কথাও তাঁর মুখে নেই, যেন কোনো আকর্ষণই নেই মা ও মাতৃভূমির প্রতি। পঞ্চবটীর জঙ্গলে তিনি একা সময় কাটান, নতুবা গঙ্গাতীরে একাকী পদচারণা করেন—সর্বদা অন্তর্মুখ। ধ্যানী ও যোগীর স্বভাব তাঁর, চোখের দৃষ্টিতে যেন জগৎ লুপ্ত, অন্য কোনো লক্ষ্যে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ। গদাই চাকরি করছে বটে, কিন্তু সংসারী হবে না কোনোকালে—রামকুমার একথা নিশ্চিত জেনেই দেশে ফিরে গিয়েছিলেন!

যোগী নয়, ঋষি নয়, রামকৃষ্ণের পূর্ণ সুস্থ ও সবল যৌবনদেহকে আশ্রয় করে তখন এক পুরুষ জেগে উঠছে। বেদে যাকে পুরুষ বলেছে এ সেই পুরুষ।

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে নারায়ণ ঋষি বলেছিলেন:

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।

এই দৃশ্যমান সব কিছুই, যা ছিল, যা আছে, যা হবে—সব সেই পুরুষই। কাঠ সংহিতা (৮।১২) ঐ কথাই জানিয়েছিলেন:

সর্বো বৈ পুরুষঃ।

সমস্ত পুরুষই।

জীবনের শেষ লগ্নে কাশীপুর বাগান বাড়িতে স্বমুখে রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে

বলেছিলেন : দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছু। নিজের হৃদয়ে হাত রেখে একথা বলায় নরেন্দ্রেরও কথার ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হয় নি। তবু সে কথার মর্ম বুঝেছে কিনা তা জানতে রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করেন : কী বুঝলি ? নরেন্দ্র বলে—যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে।

নরেন্দ্র ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছে দেখে রামকৃষ্ণ আনন্দিত হন। আনন্দে রাখালকে বলেন : দেখছিস ! একেই বলে বিদায় নেবার আগে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া—গূঢ় সত্য উদ্ঘাটন করা ! কথামৃতে এই কথাবার্তার তারিখ দেওয়া আছে ১৫ই মার্চ, ১৮৮৬।

এই সেই পুরুষ, কঠ উপনিষদ (১।৩।১১) যাঁকে বলেছেন :

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ

পুরুষই পরম তত্ত্ব, তাঁ হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, তিনি পরম গতি।

ঋক সংহিতায় (১০।৯০।৫) পুরুষের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে জীবের হৃদয়পুরে তিনি শয়ন করে থাকেন বলে তিনি পুরুষ ; শতপথব্রাহ্মণ (মাধ্য ১৩।৬।২ ১) আরও ব্যাপ্ত করে বলেছেন, লোকসমূহই পুর ; তাদের ভিতর তিনি শুয়ে আছেন বলেই তিনি পুরুষ। যাস্ক (নিরুক্ত ২।৩) দুই সংজ্ঞাকেই মেনে নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে যিনি জীবশরীরে ও সকল বিশ্ব পূর্ণ করে থাকেন তিনিই পুরুষ।

এই সর্বতোব্যাপ্ত পুরুষের আত্মবোধ রামকৃষ্ণচেতনায় উন্মীলিত হয়ে উঠেছিল—দক্ষিণেশ্বরের সাধনলীলার এইই গূঢ় কথা।

ঠনঠনেয় আড়াই বছর কালীর মুখোমুখি বসে রামকৃষ্ণ এই আত্মতত্ত্ব রহস্য বুঝেছিলেন। ঐ আড়াই বছর তাঁর জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাঁর পক্ষে সময়ের পরিমাপটি তো কম নয়—উদ্ভিন্ন যৌবনের আড়াইটি বছর। তাঁর দেহ মন তখন সম্পূর্ণ সুস্থ দৃঢ় নমনীয় প্রফুল্ল ও নবীন। ঐ দীর্ঘ সময়ে তাঁর অন্তর্জীবন বা ভাবজীবনের কথা কোথাও লেখা নেই। জীবনীকাররা ঐ সময়টি যেন এড়িয়ে গিয়েছেন।

কামারপুকুরেই চৈতন্যের পর্যাপ্ত উন্মেষ ঘটেছিল গদাধরের। তাঁর বাল্য-কৈশোর লীলার যে চিত্র আমরা পাই তা থেকে নিছক কাহিনীরস সংগ্রহ ও সম্ভোগ করাই তো বিধেয় নয়। গদাধর আত্মপরিচয়-অনবহিত ছিলেন না। কলকাতায় ঝামাপুকুরে যখন এলেন তখন দেখি তাঁর পূর্ব চাঞ্চল্য নেই, সমাহিত পুরুষ তিনি। এত গোপনচারী যে তাঁর তখনকার কথা বিশেষভাবে

কেউই জানে না। নবীন যৌবনের আড়াই বছর সময় গদাধর শুধু যজমান বাড়িতে পূজার ঘণ্টা নেড়ে, মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, কালী-ভুলুর সঙ্গে গল্প করে কাটাননি। তেমন হাল্কা চালের মানুষ তিনি ছিলেন না। তাঁর গম্ভীর সাধনজীবন কামারপুকুরেই সুরু হয়ে গিয়েছিল; ভাব, সমাধি এসব অভিজ্ঞতাও তখনকার। এমনকি তখনই ঈশ্বর রূপে পূজিত হয়েছেন তিনি—ঈশ্বরভাববাসিত হয়ে রয়েছেন। এগারো বছরের বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা আগেই বলেছি—যখন থেকে দিব্যআভায় বেষ্টিত হয়ে থাকতেন তিনি, লোকে সমীহা (awe) বোধ করত কাছে এলে। সেই মানুষ অপেক্ষাকৃত পরিণত দেহমনে কলকাতায় এসে আড়াই বছর গল্প আর গান করে কাটাননি।

প্রথম আগমনে কলকাতা দিয়েছিল তাঁকে নিবিড় নির্জনতা। কেননা এখানে গ্রামের পরিচিত জন ও বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে নেই, দাদাও অধ্যাপনা-কার্যে ব্যস্ত, গদাধর জনারণ্যে একা। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি বিশেষ ভাবে জগন্মাতার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন।

এই জগন্মাতার পরিচয় দিতে গিয়ে গৌতম ঋষি ঋগ্বেদে বলেছিলেন (১।৮৯।১০) অদিতিই জগতের মাতা—অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্। অদিতিই জাত এবং তিনিই জনয়িত্রী। বৃহস্পতি বলেছিলেন অদিতিই সব সৃষ্টি করেন আবার সংহারের ব্যবস্থাও তাঁর (ঋগ্বেদ ১০।৭২।৫)। তৈত্তিরীয় (১০।২১) অদিতিকে সর্বভূতানাং মাতা বলে বলেছেন তাই তাঁর সব সন্তানই আদিত্য। শতপথব্রাহ্মণে (মাধ্য ১০।৬।৫।৫) অদিতি শব্দের অর্থ বলা হয়েছে যে তিনি যা সৃষ্টি করলেন সেসবই খেয়ে ফেলতে চাইলেন। যেহেতু তিনি সবই অদন (ভক্ষণ) করেন—সর্বং অত্তীতি—তাই তাঁর নাম অদিতি। সেজন্য তাকে অশনায়া (অশন=খাদ্য, খাওয়া) রূপ মৃত্যুও বলা হয়েছে।

কঠোপনিষদ (২।১।৭) বললেন ঃ

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত।

অদিতি সর্বদেবতাময়ী। ইনি পরব্রহ্ম থেকে প্রাণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ইনি সর্বভূত-সমন্বিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছেন। সকল প্রাণীর হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট হয়ে তিনি অবস্থিত আছেন। ইনিই সেই। ইনিই ব্রহ্ম।

তিনিই বিশ্বভুবনের ধাত্রী—অদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য কর্ত্রী (মৈত্রাসংহিতা ২।৮।১৪)—আবার তিনিই বিশ্বভুবনকে গিলে ফেলেন।

অদিতিই কালী—কালপ্রসবিনী, কালপ্রত্যাহারিণী, কালেশ্বরী, কালকে কলয় করেন তাই কালী। রামকৃষ্ণ বলেন ইনি ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মের শক্তি, যথা অগ্নি ও তার দাহিকা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উক্তি:

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ৪।১

সেই এক দেবের কোনো রূপ ও বর্ণ নেই। তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে গূঢ় প্রয়োজনে বিবিধ শক্তি-যোগে বহু রূপ ও বর্ণময় এ বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। অন্তে তিনিই এ বিশ্বকে সংহার করেন। তিনি আমাদের শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন।

ঐ এক দেবই ব্রহ্ম; আর তাঁর ঐ শক্তিই মহামায়া। একটু পরেই (৪।৯) ঋষি বললেন, মায়ী এ বিশ্ব মায়া দ্বারা সৃষ্টি করেন—অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ—আবার মায়াই আমাদের এ জগতে আটকে রাখেন—অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।

ব্রহ্মের ইচ্ছায় এই মায়া শুধু জগৎকে প্রসব ও পালন করেন না, গিলেও ফেলেন—তাই বেদে এঁকে নাম দিয়েছে পিশংগিলা। শুক্লযজুর্বেদে ব্রহ্মোদ্যে অধ্বর্যু হোতাকে প্রশ্ন করেন:

কা ঈমরে পিশংগিলা?
ওরে, পিশংগিলা কী?
হোতা উত্তর দেন:
অজারে পিশংগিলা। (বাজসংহিতা, মাধ্য ২৩।৫৫-৫৬)
ওরে, অজাই পিশংগিলা।

অজা অর্থ যাঁর জন্ম নেই, যিনি অনাদি। যা পিশকে বা রূপকে গেলে (গিলতি) তাই-ই পিশংগিলা। মহামায়া জগৎকে প্রকাশ করেন আবার নাশ করেন। যেন গিলে ফেলেন। মহামায়াই পিশংগিলা।

কামারপুকুরের বৃন্দাবনে ছিল হাসির খেলা, ফুলদোলের দিন। সেখানে মৃত্যু ছিল, দারিদ্র্য ছিল, অন্যায় ছিল—কিন্তু বালক-কিশোরের স্বপ্নরঙীন মন শুধু জগতের আনন্দময় রূপেই বিভোর থেকেছে সেখানে। সে তো সমগ্র সত্য দেখেনি: সৃষ্টির শারদ কিরণোদ্ভাসিত রূপের আড়ালে যে মহা অমাবস্যারূপিণী কালরাত্রি মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়ে আছে—সে রূঢ় সত্য জানার বয়স হয়নি

গদাধরের। বাবার মৃত্যু দিয়েছিল বিষাদ, কিন্তু তা যেন ব্যক্তিগত। গ্রামের সাধারণ স্বল্পতুষ্ট নরনারীর আড়ম্বরহীন ঐতিহ্যসম্মত জীবনযাত্রায়ও আলোড়ন ছিল না, সংক্ষোভ ছিল না, তা শান্ত রসের আধার ছিল।

কিন্তু কলকাতা আলোড়নের ক্ষেত্র; তীব্র কাম, তীব্র ক্রোধ, তীব্র ক্ষোভের ক্ষেত্র। এখানে জীবন বেগবান, স্বার্থসংঘাত বিপুল। শ্রেণীশোষণ নির্মম, সকলেই মৃত্যু-উপাসক। এখানে সামরিক দুর্গ, অস্ত্রধারী সৈন্য ও পুলিশ, শাসক ও ক্রিমিনালের সুচির আঁতাত, রক্ষকই ভক্ষক। জীবিকার জন্য মানুষ ছোটে মনুষ্যত্ব বিকোতে, নারী তার নারীত্ব। শিশু-বালকরাও শ্রম-দাসত্ব বরণে বাধ্য। কলকাতা যুগপৎ জীবনপুরী ও মৃত্যুপুরী।

এখানে এসেই রামকৃষ্ণের মৃত্যুচেতনা উন্মীলিত হয়—তিনি দেখতে পান জীবগণ মুহুর্মুহু জন্মাচ্ছে আর মুহুর্মুহু মৃত্যুগ্রাসিত হচ্ছে। কলকাতায় এমন একটি দিন কাটেনা যেদিন এ নগরী শব ধারণ করেনি। চিতার আগুন নেভেনা এখানে—সবাই চিতা-প্রাপ্তও হয় না; অজানা অনামা সংকারহীন কত মৃত্যু! রামকৃষ্ণ কলকাতার পাদপীঠে কালীকে দেখলেন। "এই কলিকাতা কালিকা-ক্ষেত্র।"

অশনায়া মৃত্যু, পিশংগিলা মহাকাল—মহামায়াবী ব্রহ্মের মহামায়া! কে তুমি জীবনের উষা ও জীবনের অস্ত, উদয় ও বিলয়; কে তুমি জননী ও যম! আপন সত্যভেদী দৃষ্টির তীব্র দ্যুতি নিবদ্ধ করেছিলেন রামকৃষ্ণ জগন্মাতার মুখাবয়বে: উত্তর দাও হে অগম রহস্যময়ী!

রামকৃষ্ণের সাধনার লক্ষ্য ছিল যেমন ব্রহ্ম ও বস্তু জগতের সমন্বয় সাধন, এ দুই বিপরীতের অবিনাবদ্ধ রূপ আবিষ্কার, তেমনই জীবন ও মৃত্যুর রহস্যগ্রন্থি উন্মোচন এবং পরিণামে এই বিপরীতেরও মহাসমন্বয়। ব্রহ্মবিদের ব্রাহ্মী চেতনায় বস্তুজগৎ মায়িক ও মিথ্যা প্রতীত হতে পারে কিন্তু যাঁর উদর ভাণ্ড থেকে ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হয় সে মহামায়ার সন্তান তো কখনো বস্তুবিশ্বকে মায়িক ও মিথ্যা বলতে পারে না। তার কাছে মায়ার অর্থ মিথ্যা নয়, মায়া মা-ই বটে।

বেদান্তগুরু ব্রহ্মবিৎ তোতাপুরী মায়া বুঝতেন, মা বুঝতেন না। রামকৃষ্ণ হাততালি দিয়ে মায়ের গান করলে তোতাপুরী খোটা দিয়ে বলতেন: ক্যা রোটি ঠোকতে হো? পেটের রোগে জীর্ণ ও কাতর হয়ে দেহপাত মানসে তোতাপুরী গঙ্গায় ডুবতে যান গভীর রাতে। পারেন নি। গঙ্গার

জল যেন শুকিয়ে গেল—মাঝ গঙ্গা হেঁটে পার হয়েও দেখেন কোমর জল। গভীর নিশীথ-নির্জনতার বুকে তোতাপুরী-কণ্ঠে একটি বিস্ময় ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল: এ কেয়া দৈবী মায়া! বুঝলেন মায়া দৈবীই বটে, তিনিই মহাদেবী, তিনিই মা। পরদিন প্রভাতে তোতাপুরী রামকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর বিশ্বাস বদলে গেছে। তিনি মা মানেন। এ মায়ের ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হবার নয়।

নরমুণ্ডধারিণী, লোলজিহ্বাপ্রসারিতা কেন তবে এই বিশ্বজননী? জীব-পালিকা কেন এত ঘোরা নিষ্ঠুরা? ব্রহ্মময়ী তিনি, ব্রহ্মাজ্ঞায় বিশ্ব সৃষ্টি করে নাশে-বিনাশে এ উল্লাসে কেন মাতেন?

পুরাকালে রাজশ্রবস ঋষির বালক পুত্র নচিকেতা একবার জীবনমৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে যমের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর তপস্যায় মৃত্যুর সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। পৃথিবীতে তিনি বয়ে এনেছিলেন নাচিকেত অগ্নি, যার অপর নাম ব্রহ্মবিদ্যা—যার সাধনে মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করে শাশ্বত জীবনে উত্তীর্ণ হয়।

রামকৃষ্ণ তাঁর সাধনবলে সেই নাচিকেত অগ্নিকে শুধু পুনর্জীবিত করতেই নয়, আবিশ্ব নরনারীর ব্যবহারযোগ্য করে দিতে এসেছিলেন। মৃত্যুর অধিকার থেকে তিনি জীবনকে চিরমুক্ত করতে এসেছিলেন—ঐ তাঁর দুস্তর সাধনার গূঢ় অভিপ্রায়। এ তেমন সাধনা যার ফলে মায়া মা হয়ে দাঁড়ায়—কল্যাণময়ী শুচিস্নাতা সর্বরক্ষাময়ী মা। মা কাউকে কখনো মেরে ফেলেন না—তিনি তাঁর দুর্বল, রোগজীর্ণ, মৃত্যু-আক্রান্ত সন্তানের শিয়রে সারা দিন রাত জেগে থেকে অবিশ্রান্ত সেবা করেন, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শুধু প্রসব করলেই হয় না মাতা—রামপ্রসাদ যথার্থই বলেছেন। তিনি তাঁর গর্ভধারণের ক্লেশকালেও নিয়ত সন্তানকে পুষ্ট করে চলেন, নবজাতককে বাঁচিয়ে তোলেন স্তন্যপীযূষদানে, মায়ের চেয়ে আর কল্যাণকৃৎ আমাদের কে আছে! রামকৃষ্ণ কুটিল মায়ার লৌহপাশে আবদ্ধ, দুঃখজরামৃত্যুভয়ভীত মানব সাধারণকে গ্লানিমুক্ত জ্যোতির্ময় জীবনে নিয়ে যেতে এসেছিলেন ঐ মায়ার ভিতর থেকেই মাকে নিষ্কাশিত করে এনে, ছলনাময়ীর ছলনার মুখোশ ত্যাগ করিয়ে, মাকেও মায়াত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে।

রামকৃষ্ণ নিজেই সেই মা। নিজ মুখেই রহস্য ভেঙে তিনি বলছেন: আমি আপনাকে পু বলতে পারি না। (১৮৮৪ খ্রীঃ, ১১ই অক্টোবর)। পু অর্থ

পুরুষ। নিজের বুকে হাত দিয়ে যখন তিনি মাস্টারমশাইকে প্রশ্ন করলেন: আচ্ছা এতে কিছু আছে; তুমি কি বলো? মাস্টার অবাক হয়ে তাঁকে দেখলেন। ভাবলেন—ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে কি সাক্ষাৎ মা আছেন? মা কি দেহধারণ করে এসেছেন? জীবের মঙ্গলের জন্য। (১৮৮৩ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণেশ্বরে এই কথাবার্তা ও মাস্টারমশাইয়ের এই উপলব্ধি হয়)। এই উপলব্ধিই ব্যাপকাকার হলে গিরিশ, রাম প্রমুখ ব্যক্তিরা কালীপূজার রাত্রে জীবিত ও সাক্ষাৎ রামকৃষ্ণকেই কালীরূপে পূজা করেছিলেন।

ব্রহ্ম ও বস্তুজগৎ, নিরঞ্জন সত্য ও রূপময় জীবন, জীবন ও মৃত্যু সবই নিজের মধ্যে ধারণ করে ও স্বরূপতঃ জেনে রামকৃষ্ণ অমৃতের ঋতচক্র প্রকাশমান করতে চেয়েছেন এই মর্ত্যের ধূলিময় কোলে

মর্ত্য ও অমৃত—এই-ই আবহমানকালের দ্বন্দ্ব:

যচ্চামৃতং যচ্চ মর্ত্যম্। (ঋগ্বেদ ১।৩৮।৫)

যা অমৃত ও যা মর্ত্য। মর্ত্য অর্থে মৃত্যু দ্বারা দষ্ট, ক্ষয়িত, গ্রস্ত। যা মৃত্যুগ্রাসমুক্ত তাই অমৃত। শুক্লযজুর্বেদ (বাজসংহিতা, মাধ্যা, ৪০।১১।১৪) রায় দিলেন, মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মৃত্যুং তীর্ত্বা—অমৃত পায়—অমৃতমশ্নুতে। আমাদের মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও—মৃত্যোর্মামৃতং-গময়—ঋষির প্রার্থনা।

কিন্তু জগতের দিকে তাকিয়ে ঋষির বুঝতে বাকি ছিল না যে এ জগৎ মৃত্যুকবলিত।

ইদং সর্বং মৃত্যুনাপ্তং সর্বং মৃত্যুনাভিপন্নম্। (বৃহদারণ্যক ৩।১।৩)

এ সবই মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত, মৃত্যু দ্বারা বশীকৃত।

ইদং সর্বং মৃত্যোরন্নং (ঐ, ৩।২।১০)

এ সমস্তই মৃত্যুর অন্ন।

এই-ই মর্ত্যের ধর্ম—এখানে কোথায় সেই অমৃত-জ্যোতি?

ঋষির তৃতীয় নয়নে ধরা পড়েছে যে সে জ্যোতিও আছে এই মর্ত্যেই

ইদং জ্যোতিরমৃতং মর্ত্যেষু (ঋক ৬।৯।৪)।

ভরদ্বাজ ঋষির এ আশ্বাস বাণীর আলোয় রামকৃষ্ণের সাধনলীলার দিব্য লিপি পাঠ করতে হবে। তাঁর সাধনা সকল মানুষের মুক্তির সাধনা, মর্ত্যভূমিকেই অমৃত করার সাধনা, জীবনকেই জয়শ্রীমণ্ডিত করার সাধনা।

বেদমতে মৃত্যুও এক রকম নয়। মৃত্যু হাজার রকম। অথর্ববেদে বলা হয়েছে শত্রুও বহু, ব্যাধিও বহু, মৃত্যুও বহু। বেদে এই কয়টি মৃত্যুর বিশেষ উল্লেখ আছে:

ক্ষুধাই মৃত্যু। ভিক্ষু ঋষি বলছেন :

ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্বধং দদুঃ (ঋক ১০।১১৭।১)

দেবতারা ক্ষুধা দেন নাই, বধই দিয়েছেন। অর্থাৎ ক্ষুধা প্রাণনাশী।

রোগই মৃত্যু। পাপই মৃত্যু। জরাই মৃত্যু। সাপ ও হিংস্র প্রাণী থেকে মৃত্যু। আগুন থেকে মৃত্যু। তমঃই মৃত্যু—মৃত্যুর্বৈঃ তমঃ (বৃহদারণ্যক ১।৩।২৮)। অসৎ মৃত্যু।

ক্ষুধাই মৃত্যু—প্রশ্নটি সব যুগেই ছিল, এ যুগে অতি ব্যাপ্ত আকারে প্রশ্নটি উঠেছে। বেদ এ প্রশ্নের সমাধান করেন নি, কারণ বেদ মূলত elite—প্রাধান্য বজায় রেখে সমাজব্যবস্থার পাতি দিয়েছেন। বৈদিক বিধান জনগণমুখী নয়। শ্রেণীভেদযুক্ত সমাজ মেনে নিলে ক্রমে শ্রেণীশোষণ মানতে হয় এবং শ্রেণীশোষণ মেনে নিলে ক্রমে তার তীব্রতা বৃদ্ধিও মানতে হয়। বৈদিক সমাজভাবনা গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজভাবনার অনুকূল নয়। পুরোহিত, রাজা ও ধনীর শাসন ও শোষণ সামাজিক স্থিতি কিছুকালের জন্য দিতে পারে, সর্ব কালের জন্য নয়। সামাজিক স্থিতি থাকলেও প্রগতি ও বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে আসে। সমাজ অসাম্যতান্ত্রিক ও শোষণমূলক হয়ে ওঠে।

একা বেদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই, পৃথিবীর সর্বত্র ঘটনার গতি এরকমই হয়েছে। ফলে দরিদ্রের ক্ষুধা প্রাচীনকালেও ছিল, একালেও আছে। কিন্তু এখন মানুষের আত্মমহিমাবোধ জাগায় ক্ষুধার সমাধানের দাবী প্রবল ভাবে উঠেছে। সংখ্যালঘু জনের খাদ্য সম্ভারের বদলে সকল মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য চাই, পুষ্টি চাই। এই দাবীর ভিত্তিতে বহু ছোট ও বড় বিপ্লব হয়ে গিয়েছে।

রামকৃষ্ণ বলেছিলেন : খালি পেটে ধর্ম হয় না। আরও বলেছিলেন, অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা। অন্নই ব্রহ্ম। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের অন্নের গ্যারান্টি চাই। মানুষ কেন অন্নহীন থাকবে? অন্নের অধিকার প্রথমতম অধিকার।

যারা শুধু ব্রহ্ম মানে, কেবল-ব্রহ্মবাদী, শুধু ব্রহ্মসাধনাই করার পক্ষপাতী তারা মানুষের অন্নের প্রয়োজনের দিকে দৃকপাত করেনি। ভাববাদীদের প্রতি মার্ক্সীয় এ অভিযোগ অনস্বীকার্য। ব্রহ্ম থেকে অন্নের মহিমা ন্যূন নয়—ক্ষুধার্তই তা জানে। যার অন্ন নেই, তার ব্রহ্মও নেই। পায়ে হেঁটে ভারতের জনপদে ঘুরে ব্রহ্মবাদী বিবেকানন্দ একথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ভারত-

বাসীর অন্ন জোগাবার উপায় সংস্থানের জন্য তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন। যদিও শঙ্করের অনুগামী তবু স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ব্রহ্ম সত্য, অন্নও সত্য —এরূপই প্রতিভাত হয়েছিল।

মৃত্যুমুক্ত মর্ত্য দারিদ্র্য ক্ষুধা শোষণ অসাম্য দমন নিপীড়নমুক্ত মর্ত্য। রামকৃষ্ণের সাধনা মর্ত্যকে এই সর্বাঙ্গীণভাবে মৃত্যুমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে উদযাপিত। তাই বেদ-উপনিষদের পরিভাষায়, অতীতের সাধক সিদ্ধ ঋষি অবতারদের উপলব্ধি ও শিক্ষার সীমায় রামকৃষ্ণের সাধন-রহস্য সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা যায় না। সেজন্য নতুন পরিভাষা চাই, নতুন উপলব্ধি চাই, নতুন জ্ঞানালোক চাই। প্রাচীন তাতে খণ্ডিত, অস্বীকৃত ও অগ্রাহ্য হয়ে যায় না, কিন্তু নতুন বোধের আলোয় ভাস্বর না হয়ে উঠলে প্রাচীন ঐতিহ্য ও শিক্ষাও মৃতবৎ ও অকার্যকর মনে হয়। রামকৃষ্ণকে চিনতে নতুন প্রাণ, নতুন মন, নতুন বোধি ও জীবন্ত উপলব্ধি আবশ্যক—পুরনো বুলির জাবর কেটে তাঁর পদস্পর্শ করার সৌভাগ্য জন্মে না।

বেদে পুরুষ বলতে আমরা জেনেছিলাম যে প্রতি জীবের হৃদয়-পুরে যিনি আছেন ও লোকসমূহও যাঁর পুর তিনিই পুরুষ। বিশ্বজনমধ্যে তিনি শয়ন করে থাকেন। গীতায় এই বিশ্বজনমণ্ডলী-নায়ক পুরুষকেই বলেছে লোক-মহেশ্বর, তিনিই পুরুষোত্তম। বহু যুগ—যা তাঁর কাছে নিমেষ মাত্র—শয়ন করে থাকার পর মাঝে মাঝে তিনি উঠে বসতে চান, দাঁড়িয়ে উঠতেও চান। কেন চান, সে হয়তো তাঁর ইচ্ছা, সে হয়তো এই বিশ্বেরই প্রয়োজনে ও আকুতিতে। যখন তিনি উত্থিত হন তখন বিশ্বের মানব-চৈতন্যে একটা পরিবর্তনের সূচনা ঘটে, নতুন আশা ও স্বপ্ন জাগে, নতুন আদর্শ মানব-পরিমণ্ডলে উচ্চারিত, প্রচারিত ও প্রসারিত হয়, সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিপ্লব আসে। তিনি যখন উঠে দাঁড়ান তখন স্থিতস্বার্থ ও প্রচলিত জ্ঞান ও ধারণায় যেন একটা ভূমিকম্প ঘটে যায়—মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তন্ত্রের ভাষায় ব্যক্তির দেহে যেমন কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ ঘটে তেমনই মানব-সমষ্টির কুলকুণ্ডলিনীও জাগ্রত হয়—চৈতন্য স্বোত্তরণের প্রয়াসী হয়।

রামকৃষ্ণ আপনি পরম চৈতন্যপুরুষ, বেদবন্দিত পুরুষ—তাঁর আবির্ভাব নিখিল মানবসমাজে লোক-মহেশ্বরের অবতরণ ও আবির্ভাব। জীবহৃদয়ে তাঁরই জাগরণ। তাঁর সাধনা ব্যক্তির মুক্তিকে সুসাধ্য করতে এবং সমগ্র মানবজাতির মুক্তিকে সম্ভব করতে। মানবতার মুক্তিযুদ্ধের তিনিই অবিসম্বাদিত নেতা।

দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে রামকৃষ্ণের সাধনা ছিল মানবমুক্তির সাধনা। মুক্তি সর্বাঙ্গীণ অর্থে ও তাৎপর্যে। তা পার্থিব ও অপার্থিব; চৈতন্যের মুক্তি ও বস্তুগত আধারে মুক্তি; মানুষ তাতে ব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হবে, পরন্তু বাস্তব জীবনক্ষেত্রে যে সর্বাত্মক মুক্তির স্বাদ তার লভ্য তাও হবে তার করায়ত্ত। অন্নময় ব্রহ্ম, প্রাণময় ব্রহ্ম, মনোময় ব্রহ্ম, বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম, আনন্দময় ব্রহ্ম এই পূর্ণ ব্রহ্মেরই মুক্তি রামকৃষ্ণের সাধনলক্ষ্য। চাঁদা মামা সকলের মামা, ঈশ্বর সকলের মামা। ঈশ্বরে তথা ব্রহ্মে সকলের সমান অধিকার। সে অধিকারকে সংকুচিত করার অপচেষ্টা সভ্যতার উষাকাল থেকে চলে আসছে—যেন গঙ্গা প্রবাহকে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে কৃত্রিম বাঁধের সাহায্যে যাতে জনপদ শস্য শ্যামল না হয়ে উঠতে পারে, যেন আপামর তৃষ্ণার্ত মানুষ জল না পায়। পুরাকালে বৃত্রহা ইন্দ্র বজ্র হেনে এইসব কৃত্রিম অবরোধ ভেঙে দিয়েছিলেন। নদীর প্রবাহ পথকে করেছিলেন বাধামুক্ত, সকল জনপদ হতে পেরেছিল শস্যপূর্ণ। ঋগ্বেদে তাই আর্য ঋষি কৃতজ্ঞচিত্তে ইন্দ্রস্তবগাথা রচনা করেছিলেন। তাঁদের মন্ত্রমালা থেকে বুঝি, ইন্দ্র যে নদীকে মুক্ত করেছিলেন তা যেমন লৌকিক নদী, তেমনই চৈতন্য নদী।

বাঁধ যারা বাঁধে, নদীজলকল্যাণ-প্রবাহকে করে অবরুদ্ধ, জনপদের মানব সাধারণকে করে পীড়িত রিক্ত বুভুক্ষু তারাই অসুর ও দস্যু বলে বেদে নিন্দিত। তাদের বিরুদ্ধে শুধু দেবতারা নয়, স্বয়ং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সংগ্রামে রত হন যুগ থেকে যুগে। অসুরের দম্ভ ও দর্প, তার বলের গৌরব ও কূটকৌশল, তার মদগর্বিতা মানুষকে পীড়ন করে শোষণ করে দমন ও হনন করে আত্মসার্থকতা খোঁজে। দুর্বল মানুষের কাতর প্রার্থনায়—মানুষের মধ্যেই যে দৈবী ভাব ও দৈবী চেতনা তার আকুলতায়—স্বয়ং ব্রহ্ম-নারায়ণ যোদ্ধাবেশে হাজির হন। ইন্দ্র পরব্রহ্মের সেই যোদ্ধরূপ। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ সাধক অর্থে সংগ্রামী—আপামর মানুষের জন্য নিরন্তর সংগ্রামী। শুধু পার্থিব সম্পদ মানবকুলের মধ্যে সমবণ্টনের জন্যই তাঁর যুদ্ধ নয়—সে লক্ষ্য তাঁর সাধনা-সংগ্রামে সাঙ্গীকৃত—তিনি মানবচৈতন্যবারিরাশিকে অবরোধমুক্ত করতে চান। মানুষই অমৃত জ্যোতির তনয়, জ্যোতিঃস্বরূপ—অথচ বিত্তাপহারক দস্যুরা তার জ্যোতি লুণ্ঠন করেছে; লুকিয়ে রেখেছে সে জ্যোতিরাশি দুরতিগম্য গুহায়। জ্যোতির অভাবে মানুষ গাঢ় তমিস্রায় পথ হাতড়ে ফেরে, জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। রামকৃষ্ণ দস্যুর গুহাপুর থেকে ছিনিয়ে আনতে চান চেতনার আলো, ভেঙে

দিতে চান গুহার বন্ধ দ্বার ও প্রাচীর। আলোর সন্তান তোমরা, আলোয় স্নাত হও, আলোয় ভাসো। রামকৃষ্ণের সাধনা সর্ব মানুষকে আলোর উত্তরাধিকার ফিরিয়ে দেবার সাধনা।

দস্যু কারা? মানুষের মনোলোকে তারা বিরাজমান—দৃপ্ত অহংবোধ, স্বার্থবোধ, কাম লোভ হিংসা ক্রূরতা খলতা; বাইরে তাদেরই প্রসারিত রূপ শোষক পীড়ক দমনকারা ত্রাস-সন্ত্রাসসৃষ্টিকারীরা। ভিতরের ও বাইরের দস্যুরা মানুষের আলো চুরি করেছে—কারণ জ্যোতিষ্মান মানুষের ওপর তাদের অধিকার খাটে না। কার্ল মার্ক্স এই বাহিঃস্থ দস্যুদের সম্পর্কে, তাদের রচিত ও রক্ষিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দিয়েছিলেন এবং দাবী করেছিলেন :

> The standpoint of the old materialism is civil society; the standpoint of the new materialism is human society, a socialized humanity.

(পূর্বোক্ত ফয়েরবাখ থিসিস, ১০ নং সূত্র)

বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দাবী নবযুগেরই দাবী—যে যুগ মূলতঃ ও সর্বতোভাবে রামকৃষ্ণেরই যুগ। সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিধি-ব্যবস্থায় শুধু আইন শাসিত নাগরিক সমাজ গড়লেই চলবে না, মানবিক সমাজ গড়তে হবে, সমাজতন্ত্রায়িত মানবতার বিকাশ ঘটাতে হবে। পাশ্চাত্ত্য থেকে উত্থিত, বস্তুবাদীর কণ্ঠে উচ্চারিত এ বাণী ঈশ্বরেরই বাণী। তিনি বহু কণ্ঠে কথা বলেন, সব কণ্ঠই তাঁর—তাঁর বাইরে কিছু নেই, তাঁর দ্বিতীয়ও কিছু নেই।

রামকৃষ্ণের সাধনা তাঁর আপন মুক্তির সাধনা নয়, কেননা নিত্যমুক্ত শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তিনি। তাঁর ঈশ্বরলাভের সাধনাও অনাবশ্যক, কেননা তিনিই ঈশ্বর। তিনি সকল মানুষের হয়ে সাধনা করেছেন, রক্ত দিয়েছেন—তাই তাঁর সাধনা এত কঠোর ও দুরূহ, গূঢ় গভীর ও বহুব্যাপ্ত। মানুষেরই দেহপুরে, প্রাণলোকে, মনের চেতন-অবচেতন অংশে তমঃ-গুহা অগণন; তার সহজাত চৈতন্যের আলো ঐসব গুহায় লুক্কায়িত হয়ে যেন বা হারিয়ে গিয়েছে; তারই পরিণামে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনেও এত অন্যায় ও অনাচার। ঐ লুপ্ত রুদ্ধ আলোকরাশিকে জয় ও উদ্ধার করে আনতে হবে মানুষকে—আলোর প্রতিষ্ঠা দিতে হবে অন্তরে ও বাইরে। তাতেই হবে মনুষ্যত্বের মুক্তি, মানুষের মুক্তি, মানবিক সমাজের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। সে মানুষ হবে

শুভ্র শুদ্ধ চৈতন্যবান মানুষ—পৃথিবী তার পদভূমি কিন্তু আকাশ চুম্বিত তার শির। অন্তরস্থ দস্যুবৃন্দ ও বহির্জীবনের শোষক-পীড়ক দানবদের নাগালের বাইরে সর্ব শৃঙ্খল বিহীন স্বাধীন সবল মানুষ সে।

বস্তুবাদী যে মুক্তির স্বপ্ন দেখে তা খণ্ড মুক্তি; ব্রহ্মবাদী যে মুক্তির কথা বলে তাও খণ্ড মুক্তি। অন্নবিদ্যা আয়ত্তীভূত না হলে মৃত্যু অনিবায; ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্তীভূত না হলেও মৃত্যুই ধ্রুব। দুই বিদ্যাই আয়ত্ত করে দুই বিদ্যারই পরপারে যাবার আহ্বান রামকৃষ্ণের। যেখানে বিদ্যা আছে সেখানেই অবিদ্যা আছে; জ্ঞানের পিঠোপিঠি আছে অজ্ঞান। মানুষ, তুমি জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও। অবিদ্যা বন্ধন করে, বিদ্যাও বন্ধন করে অবিদ্যা লোহার শিকল, বিদ্যা সোনার শিকল—কিন্তু শিকলই। সব শিকল ছুঁড়ে ফেলে সর্ববন্ধনমুক্ত, মুক্তিস্বরূপ হও। এই অভিনব পূর্ণায়ত বাণী রামকৃষ্ণের। দক্ষিণেশ্বরে এই বাণীমন্ত্রেরই তিনি সাধনা করতে বসেছিলেন।

৯

ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে

মহাপ্রভুর জীবৎকালেও ভারতে ও বাংলায় রাজ্য ভাঙাগড়া হয়েছিল—রামকৃষ্ণের সাধনকালে ঘটে সিপাহী বিদ্রোহ, যাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধও বলা হয়েছে।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিল্লীতে বহলল লোদির শাসনামলে। তাঁর জন্মের তিন বছর পর, ১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে, বহললের ছেলে সিকন্দর লোদী সম্রাট হন। মহাপ্রভু নীলাচল যাবার পর ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে সিকন্দরের ছেলে ইব্রাহিম লোদী সম্রাট হন। নীলাচল লীলার শেষভাগে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাস্ত হন; পাঠান রাজত্ব শেষ হল; সম্রাট হলেন বাবর। মুঘল রাজত্বকাল সুরু হল।

বাংলায় মহাপ্রভুর জন্ম সনে নবাব ছিলেন জালালুদ্দীন ফতেশাহ। হাবসী বংশের রাজত্বকালে বাংলায় শান্তি ছিল না। হাবসী রাজাদের সেনাপতি আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসন দখল করে নেন। মহাপ্রভু যতদিন নরদেহে ছিলেন ততদিন বাংলায় হোসেন শাহী রাজত্ব তথা শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল।

ভারতে হিন্দু যুগের শেষভাগে শঙ্কর কেবল-ব্রহ্মবাদ বা অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি কেরলের লোক; কেরলে বহু পূর্বেই খ্রীস্টধর্ম ও শঙ্করের সমকালে ইসলামও অল্পস্বল্প এসে পৌঁছেছিল। শঙ্কর তাঁর দৈবী প্রতিভায় হয়তো ভাবীকালের প্রয়োজন বুঝতে পেরেছিলেন; তিনি জাতীয় ঐক্যের ও মানব-ঐক্যের একটি দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি ও সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। খ্রীস্টধর্ম ও ইসলাম একেশ্বরবাদী। তারা কেবল-ব্রহ্মবাদী বা অদ্বৈতবাদী নয়—কিন্তু হিন্দু বহু দেবদেবীর তুলনায় এক ব্রহ্মবাদ খ্রীস্টান ও মুসলমানের পক্ষে বোঝা সহজ। পরন্তু বহু দেবদেবীর-উপাসনা ও বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, জাতি-প্রথাদীর্ণ, উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র বৈষম্যে পীড়িত হিন্দুসমাজের ঐক্যের ভিত্তি হতে পারে সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—জগৎ ও জীবমাত্রেই ব্রহ্ম; এক ব্রহ্মেই বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের বিবর্ত, বিভ্রম, ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে—এই মতবাদ।

কিন্তু কেবল-ব্রহ্মবাদ তথা মায়াবাদ জগতের প্রতি মানুষকে বিরক্ত, উদাসীন, নিস্পৃহ করে দিতে পারে। জগৎ যখন মায়া ও মিথ্যা তখন জাতীয় জীবনের মতো, আশু স্বার্থ থেকে দূরবর্তী জাগতিক ব্যাপারে, কে মাথা ঘামায়, কে যুদ্ধ করে? অতএব শঙ্করের শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু মন মুসলমানের আক্রমণের মুখে জাতীয় প্রতিরোধ রচনা করেনি। শঙ্কর সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন জাতীয় চেতনা উদ্বোধনের অগ্রদূত রূপে; তিনি ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসীদের দশ নামযুক্ত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে, সুশৃঙ্খল বিন্যাস দিয়ে একটি দৃঢ়বদ্ধ সংগঠন গড়ে দিয়ে যান। সন্ন্যাসীরা রমন্ত: অর্থাৎ ভ্রমণশীল থেকে ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে গিয়েছেন, জনসাধারণকে দর্শন ও নীতি শিক্ষা দিয়েছেন, ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত রেখেছেন। শঙ্কর ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করে এক একটি বেদবাক্যকে সাধনমন্ত্র রূপে নির্দেশিত করে যান—দ্বারকায় সারদা মঠ, মন্ত্র—তত্ত্বমসি; বদরিকায় জ্যোতির্মঠ, মন্ত্র—অয়মাত্মা ব্রহ্ম; নীলাচলে গোবর্ধন মঠ, মন্ত্র—প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম; রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী মঠ, মন্ত্র—অহং ব্রহ্মাস্মি। আপামর ভারতবাসী যাতে নিজেদের ব্রহ্ম অতএব এক এবং পরম শক্তিমান মনে করে তারই ব্যবস্থাপত্র ছিল শঙ্করের এ কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য।

কিন্তু ফল হল বিপরীত। শঙ্করের জন্মের (৬৮৬ খ্রীঃ) চুয়ান্ন বছর আগে ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের থানায় (বোম্বাইয়ের কাছে) মুসলমান সৈন্যদল এসে পৌঁছেছিল। ব্রোচে, দেবল-উপসাগরে (সিন্ধু), অল-কিকানে আল্লা হো আকবর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল; কাবুল তাদের দখলে গেল, সিন্ধু গেল; মুহম্মদ বিন কাশিম বৌদ্ধ অন্তঃশত্রুদের সহায়তায় যখন সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরকে পরাস্ত করে মূলতানে এসে পৌঁছলেন এবং গোটা সিন্ধু উপত্যকায় অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত সবুজ পতাকা উড্ডীন হল—মারবাড়, মালব, উজ্জয়িনী, কাথিয়াবাড়েও হজরত মহম্মদের নাম বিঘোষিত হল, শঙ্কর তখনো বেঁচে। দ্বারকার সারদা মঠ তো কাথিয়াবাড়েই।

হিন্দু ভারত শঙ্করের অদ্বৈতবাদের তথা মায়াবাদের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু তাতে বৌদ্ধ মত যতটা দমিত হল ইসলাম সে তুলনায় কণামাত্রও নয়। পঞ্জাবের রাজা জয়পাল সবুক্তিগিনকে বাধা দিতে যেদিন এগিয়েছিলেন তিনি সেদিন একা; কোনো হিন্দু রাজা তাঁকে সঙ্গ দেয়নি। সবুক্তিগিনের ছেলে গজনীর মামুদ জয়পালকে ১০০১ খ্রীস্টাব্দে হারিয়ে দিলেন।

জয়পাল মনোদুঃখে আত্মহত্যা করেছিলেন—হিন্দুরাজমণ্ডলের সমবেত শক্তির সাহায্য বা সমর্থন পাননি বলে। এই গজনীর মামুদ কাথিয়াবাড়ে সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন; ইনি মথুরা পযন্ত ছুটে এসে মন্দির পুড়িয়েছিলেন।

সেদিনের বিষণ্ণ হিন্দু মন শঙ্করের মায়াবাদ-তত্ত্বের বিপদ বুঝতে দেরি করেনি। ভাস্করাচায উঠে দাঁড়ালেন মায়াবাদ খণ্ডন করতে। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য লিখলেন তিনি যা শারীরক-মীমাংসাভাষ্য নামে খ্যাত এবং শঙ্কর যত নষ্টের গোড়া বলে তিনি প্রতিপন্ন করতে চাইলেন। বৌদ্ধবাদকে খণ্ডন করেছেন বলেই হিন্দু সমাজে শঙ্করের বিপুল প্রতিপত্তি হয়েছিল; কিন্তু ভাস্কারাচার্য শঙ্করের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলে ধিক্কার জানালেন। মাধবাচায "শঙ্কর-বিজয়" গ্রন্থে দাবী করেন যে স্বয়ং শঙ্করের সঙ্গেই ভাস্করের তর্কযুদ্ধ হয়েছিল; দাবীর স্বপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তবু ভাস্কর তাঁর "ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদ-অভেদবাদ" নামে খ্যাত গ্রন্থে বললেন, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় বটে কিন্তু তাঁর দুটি রূপ আছে: কারণরূপ ও কার্যরূপ। কারণরূপে তিনি এক, কার্যরূপে বহু। যেমন সোনা কারণ; বালা, দুল, হার কার্য। এক কারণ সোনাই কাযে বহু রূপ নিয়েছে। অতএব ব্রহ্ম কারণরূপে অভিন্ন, কিন্তু কাযরূপে ভিন্ন ভিন্ন। অভিন্ন কারণ রূপটি ব্রহ্মের সত্য, আদিম, স্বাভাবিক রূপ। কার্যরূপটি আগন্তুক, ঔপাধিক (উপাধিযুক্ত) কিন্তু সত্য। নির্বিশেষ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় উপাধি দ্বারা সবিশেষ ও বহু হয়েছেন—জগৎ আকারে পরিণত হয়েছেন। শঙ্কর বলেন, উপাধি মিথ্যা; ভাস্কর বলেন, না মিথ্যা নয়। শঙ্কর বলেন, যা নিত্য তাই-ই সত্য; ভাস্কর বলেন: কেন, অনিত্যও সত্য। আগুন নিত্যই গরম, কিন্তু আগুনে লোহা দিলে যখন গরম হয়ে ওঠে সে গরম অনিত্য কিন্তু সত্য। সে যতক্ষণ গরম ততক্ষণ তাতে হাত দিলে পুড়বে তো! ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা সত্য, নিত্য ও স্বাভাবিক—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সব কালেই সে অভিন্নতা থাকে। ব্রহ্ম থেকে জীবের ভেদ ঔপাধিক, নিত্য নয়, কিন্তু সত্য। সৃষ্টি ও স্থিতিতে সে ভেদ সত্য, প্রলয়ে ও মোক্ষে সে ভেদ লুপ্ত হয়ে যায় বলেই তা অনিত্য। ঘট ভেঙে গেলে ঘটের আকাশ (space) মহাকাশের সঙ্গে এক হয়ে যায়। উপাধির বিনাশে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা ফিরে আসে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে (৪।৪।৫ সূত্র) ভাস্করের কথা:

জীবপরয়োশ্চ স্বাভাবিকোঽভেদ ঔপাধিকস্তু ভেদঃ স
তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে।

ভাস্কর জগৎ ও জীবনকে সত্য বললেন, শঙ্করের মিথ্যাত্ব থেকে জগৎ ও জীবনকে মুক্ত করে আনলেন—তবু ঔপাধিক অতএব অনিত্য বলায় জগৎ ও জীবন যেন পর্যাপ্ত মর্যাদা পেল না। রামানুজ তাই ভাস্করাচার্যকে প্রচ্ছন্ন শঙ্করমতবাদী বলে চিহ্নিত করেছেন।

রামানুজ জন্মেছিলেন সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠনের দশ বছর পর ১০৩৬ খ্রীস্টাব্দে। শিক্ষাগুরু যাদবপ্রকাশের সামনেই কিশোর রামানুজ শঙ্করভাষ্যকে খণ্ডন করেছিলেন বলে যাদবপ্রকাশ তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছিলেন। পরিণত বয়সে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে শঙ্করমত খণ্ডন করে রামানুজ বলেন: কেবল-ব্রহ্ম মিছে কথা; ব্রহ্মই একমাত্র সত্য নয়: জগৎ ও জীবনও সত্য—হাঁ, ব্রহ্মাশ্রিত তারা, ব্রহ্মের বাইরে নেই;—কিন্তু ব্রহ্মের অন্তর্গত হলেও চিৎ ও অচিৎ, জীবন ও জগৎ সত্য। ব্রহ্ম সমগ্র—জগৎ ও জীবন তাঁরই অংশ, তারা ব্রহ্মে স্বগত-ভেদ। (অংশ-অংশী ভেদকে স্বগত ভেদ বলে)। এই ভেদটুকুর জন্য তারা ব্রহ্ম থেকে বিশিষ্ট, ধর্মতঃ ভিন্ন, কিন্তু ব্রহ্মের মতোই সত্য। অভেদের দিক থেকে দেখলে সত্য এক—জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। কিন্তু ভেদের দিক থেকে দেখলে সত্য তিনটি—ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ। এই হল রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—ধর্মতঃ ভিন্ন বস্তুর স্বরূপগত অভিন্নতা।

রামানুজের দুশো বছর পর আসেন মধ্বাচার্য। তখন ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভাস্কর রামানুজদের প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি। হিন্দুর জগৎ-ঔদাসীন্য, জগৎকে মায়া বলে বুঁদ হয়ে থাকা কমতে সুরু করেছে। সোমনাথ লুণ্ঠনের পর দেড়শো বছরেও ইসলাম ভারত জয় করতে পারেনি। বরং গজনীর সাম্রাজ্যই টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। মুহম্মদ ঘোর ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে ভারত বিজয়ে এলে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজ তাঁকে যেদিন যুদ্ধে হারিয়ে দেন সেদিন কনৌজের রাজা জয়চাঁদ দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও পৃথ্বীরাজ বহু রাজপুত রাজার সাহায্য পেয়েছিলেন। পরের বছর অবশ্য ঐ তরাইনেই পৃথ্বীরাজ বন্দী ও নিহত হন। এর পরই উত্তর ভারত, বিহার ও বাংলা চলে যায় মুসলমান শাসনাধীনে। ১২৩৮ খ্রীস্টাব্দে মধ্বাচার্যের যখন জন্ম হয় তখন সুলতানা রজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে।

মধ্বাচাযের কাজই হয়ে দাঁড়ায় সারা ভারত ঘুরে ঘুরে শঙ্করের মায়াবাদ

খণ্ডন করা। তিনি বিশেষ করে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল ভাবে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার ওপর জোর দেন। তিনি নিরঞ্জন নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বকে গৌণ করে দিয়ে বলেন: ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহবান ও তাঁতে কোনো ভেদ নেই—স্বগত ভেদও নেই: আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ স্বগত-ভেদ-বিবর্জিতাত্মা। (মহাভারত তাৎপর্য-নির্ণয় ১।১১)

অর্থাৎ ব্রহ্ম হাত পা মুখ পেট সমেত আনন্দমূর্তি। সর্বত্রই তিনি আছেন। তাতে কোনো ভেদ নেই। জীবসমূহ তাঁরই প্রতিচ্ছায়া। আকাশে সূর্যকিরণের প্রতিবিম্ব ঘটে, ঐ হল ইন্দ্রধনু। তা ক্ষণিকের—কেননা উপাধিযুক্ত তাই অনিত্য। কিন্তু জীব ব্রহ্মের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব, তাই নিত্য। জীব শ্রীহরির নিত্য অনুচর। ঈশ্বর পূর্ণ, জীব স্বল্প—এটুকু পার্থক্য মাত্র। ঈশ্বর কর্তা—প্রযোজক কর্তা। জীবও কর্তা—প্রযোজ্য কর্তা। মুক্ত হলেও ঈশ্বর ও জীবে এই ভেদ থেকেই যাবে। জগৎ অনিত্য কিন্তু সত্য।

নিম্বার্ক মাটির পৃথিবী ও মাটির মানুষকে মর্যাদা দিতে আরও এগোলেন। তিনি বললেন, ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ পৃথক—এই ভেদ বাস্তব, স্বাভাবিক ও নিত্য। ব্রহ্ম ও জীবে স্বভাব ও ধর্মগত ভেদ আছে; ব্রহ্ম কারণ, জীব ও জগৎ কার্য; ব্রহ্ম শক্তিমান, জীব ও জগৎ তাঁর দুটি শক্তি; ব্রহ্ম সমগ্র, জীব ও জগৎ তাঁরই অংশ; ব্রহ্ম ধ্যেয়, জ্ঞেয় ও প্রাপ্তব্য; জীব ধ্যাতা, জ্ঞাতা ও প্রাপক। তবু ব্রহ্ম এবং জীব-জগতের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ যেমন সত্য, স্বাভাবিক অভেদও সমভাবে সত্য। কারণ থেকে কার্য গুণে ও কাজে ভিন্ন কিন্তু স্বরূপে অভিন্ন।

শঙ্কর থেকে নিম্বার্ক পর্যন্ত ক্রমেই দেখি উপাস্যও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে—নিরঞ্জন অরূপের বদলে ধ্যানের ধন হয়ে উঠছেন রূপময় ভগবান। শঙ্করের ইষ্ট ছিলেন নির্গুণ ব্রহ্ম, লভ্য ছিল কেবলাত্মজ্ঞান। ভাস্কর সে ব্রহ্মকে একটু গুণযুক্ত করে নিয়ে ইষ্ট স্থির করলেন, সত্যজ্ঞানমনন্তলক্ষণম ব্রহ্ম এবং লভ্য বা প্রয়োজন নির্ণয় করলেন জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় ও শক্তিমান হওয়া। প্রতীকোপাসনা অর্থাৎ নামরূপযুক্ত প্রতীকে ব্রহ্মধ্যান তাঁর মতে অসঙ্গত নয়। রামানুজ ব্রহ্ম কথাটা বলাই ছেড়ে দিলেন—বললেন, পরতত্ত্ব হল ভগবান নারায়ণ বাসুদেব; ইষ্ট শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ এবং লভ্য বা প্রয়োজন হল সর্বদেশে সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় ভগবানের দেখা পাওয়া ও তাঁর সেবা করা। মধ্বেরও পরতত্ত্ব ব্রহ্ম নন—বিষ্ণু ভগবান, ইষ্ট রমাপতি, প্রয়োজন বা লভ্য সুখানুভূতি। নিম্বার্কের ইষ্ট রাধাকৃষ্ণ,

পরতত্ত্ব ভগবান বাসুদেব এবং লভ্য বা প্রয়োজন বিষ্ণুদর্শন যার ফলে হবে মানুষের পূর্ণ বিকাশ।

মহাপ্রভু এই সব ধর্মসিদ্ধান্ত ও দর্শনের খোঁজ রাখতেন কিন্তু মানেননি এর কোনোটাই। তিনি অদ্বৈতবাদী কিন্তু মায়াবাদী নন। তিনি বললেন, জীব ও জগৎকে (প্রকৃতিকে) ঈশ্বর থেকে পৃথক তত্ত্ব বললে অদ্বৈতহানি ঘটে—ওরা পৃথক তত্ত্ব নয়, শক্তি। পরতত্ত্ব, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে নির্বিশেষ ও নিঃশক্তিক বললে সর্বশক্তিমানের পূর্ণতার হানি হয়। সশক্তিক পরতত্ত্বই পরব্রহ্ম। শক্তির ক্রিয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব। তিনি ভেদহীন, অদ্বয়, অখণ্ড। শক্তিমান থেকে শক্তিকে পৃথক করা যায় না—শক্তিমান ও শক্তি মিলেই এক অদ্বিতীয় বস্তু বা তত্ত্ব। তবু অগ্নি ও তার দাহিকা, ব্রহ্ম ও শক্তিকে পৃথক পৃথক নামে ডাকাই ভালো। শক্তি স্বাভাবিক বিচিত্র বটে কিন্তু তাতে শক্তিমানের অদ্বয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। আগুন ও দাহিকা এক নয়—তাই ভেদ ; আগুন ছাড়া দাহিকা হয় না তাই অভেদ। শক্তিমান ও শক্তির সম্পর্ক তাই ভেদাভেদ। এই যুগপৎ ভেদাভেদ চিন্তাসামর্থ্যের বাইরে তাই অচিন্ত্য।

পরতত্ত্বের শক্তি স্বাভাবিকী, আগন্তুক নয়। তাই শক্তিমান থেকে শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—তা অবিচ্ছেদ্য। চুলে সুগন্ধি তেল মাখলে চুল গন্ধময় হয়, কিন্তু ঐ গন্ধ আগন্তুক, পরে থাকে না। কিন্তু আগুনের দাহিকা শক্তি আগন্তুক নয়, অবিচ্ছেদ্য। জীব ও জগৎ ব্রহ্মে আগন্তুক অতএব অনিত্য নয়—ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য শক্তি তারা। জগৎ ও জীবনসহ ব্রহ্ম অদ্বয়।

মহাপ্রভুর অনুগামী হয়ে জীব গোস্বামী শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন, রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজত ভ্রম, অতএব ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম এই দৃষ্টান্তেও ভুল আছে। দড়িতে এমন একটি শক্তি আছে যা কেবল দড়িতেই সাপের ভ্রম জন্মায় ; ধামাতে তো সাপের ভ্রম হয় না। শুক্তিতে এমন শক্তি আছে যাতে রজতের ভ্রম হতে পারে, মাটির হাড়িকে তো রুপো মনে হয় না। কেবল অজ্ঞানই যদি নিজ সামর্থ্যে ভ্রম জন্মাতে পারত তবে কবি ঝলসানো রুটির উপমায় চাঁদ স্মরণ করতেন না, যে কোনো বস্তুর সঙ্গে যে কোনো বস্তুর উপমা হতে পারত বা যে কোনো বস্তুতে অপর যে কোনো বস্তুর ভ্রম হত। হয় না। সাপ বা রুপোর ভ্রম জন্মায় দড়ি বা শুক্তির নিজস্ব শক্তি প্রভাবে। ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয় কারণ ব্রহ্মে তেমন শক্তি আছে। মানুষের অজ্ঞান-অবিদ্যাই ভ্রমের কারণ নয়। আপন অজ্ঞাতসারে নিজের দেওয়া দৃষ্টান্তেই শঙ্কর

পরোক্ষভাবে শক্তি স্বীকার করেছেন। যদি বল, ব্রহ্ম আনন্দময় বা আনন্দস্বরূপ তবে তাঁর শক্তি স্বীকার করা হয়। কেননা আনন্দের মধ্যে সক্রিয়তা-শক্তি রয়েছে। সক্রিয়তাহীন, শক্তিহীন কেবল আনন্দ নেই। শঙ্কর ব্রহ্মকে মহামায়াবী বলায় তাঁকে শক্তিমান স্বীকার করাই হল; নিঃশক্তিক নপুংসক মায়াবী মায়াশক্তি দিয়ে জগৎ রূপ ভ্রান্তি সৃষ্টি করলেন কি ভাবে? ব্রহ্মের যদি শক্তি না থাকে তবে কোথা থেকে এই মায়া এসে তাঁকে আশ্রয় করল? মায়াই বা জগজ্জনকে বিমূঢ় করার এত শক্তি পেল কোথায়?

জগৎ ও জীবন মিথ্যা নয়, অনিত্যও নয়— মহাপ্রভু এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। ভগবান থেকেই জগৎ ও জীবনের সৃষ্টি। সেই সত্যময় পুরুষ কি মিথ্যা সৃষ্টি করেন? আমাদের মনে ভ্রান্তি জন্মিয়ে তিনি কি আমাদের ঠকাতে চান? তিনি কি ঠগ-জোচ্চোর? জীব গোস্বামী বললেন, সত্যসংকল্প পরমেশ্বরের সংকল্প থেকে তাঁর মায়াশক্তি দ্বারা যে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে তা তুচ্ছ, মায়িক বা মিথ্যা নয়। চিন্তামণি কৃত্রিম সোনা সৃষ্টি করেন না, বাস্তব সোনাই প্রকাশ করেন। সত্যস্বরূপ পরমাত্মার সৃষ্ট জগৎ সত্য, মিথ্যা নয়।

তাহলে এ জগৎ ও জীবন সৃষ্টি হল কি ভাবে? এ প্রশ্নের জবাবেই মহাপ্রভুর শক্তি-পরিণামবাদ ঘোষণা। ছান্দোগ্য উপনিষদ যে বলেছিলেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই সবই ব্রহ্ম—তাহলে ব্রহ্ম জগৎ ও জীবনরূপ পরিণাম পান। দুধ থেকে দই হয়, মাটি থেকে ঘট। দই দুধের পরিণাম, মাটি ঘটের। কারণ থেকে সত্য কার্য সৃষ্টিই পরিণাম। কারণ সত্য, কার্যও সমভাবে সত্য। কারণরূপ দুধ সত্য, কার্যরূপ দইও সমান সত্য। একটি সত্য-তত্ত্ব থেকে অপর একটি সত্য-তত্ত্বের উদয় হলে তাকে যখন অপর বস্তু বলেই মনে হয়, তাই-ই পরিণাম। এতে তত্ত্ব অন্যরূপ হয়ে যাচ্ছে না, তত্ত্ব থেকে অন্যরূপ ভাব হচ্ছে মাত্র। জীব গোস্বামী বলেন:

তত্ত্বতোঽন্যথাভাবঃ পরিণাম ইতি এব লক্ষণং ন তু তত্ত্বস্যেতি।

(পরমাত্মসম্বন্ধীয় সর্বসম্বাদিনী)

ব্রহ্মরূপ তত্ত্ব থেকে জগৎ ও জীবন রূপ ভাব হচ্ছে, ব্রহ্ম অন্যরূপ হয়ে যাচ্ছেননা। মূল বস্তু নিজে অবিকৃত থেকে যদি অন্য ভাব ধারণ করে তবে সেই অন্য ভাবই পরিণাম। কর্তাও ব্রহ্ম, কর্মও ব্রহ্ম। জীব গোস্বামী বলেন:

তস্মাদ্বিকারাদিস্বভাবেন মতোঽপি পরমাত্মনোঽচিন্ত্যশক্ত্যাদিনা পরিণামাদিকং ভবতি চিন্তামণ্যয়স্কান্তাদীনাৎ সর্বার্থপ্রসব-লোহচালনাদিবৎ।

(পরমাত্মসন্দর্ভঃ ৭২ অনুচ্ছেদ)

নির্বিকারত্ব ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ স্বভাব; তাই পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তিবলে পরিণাম ঘটলেও তিনি নির্বিকারই থাকেন। চিন্তামণি স্বরূপগত স্বধর্মেই সর্বপ্রয়োজন প্রসব করে, চুম্বক স্বস্বভাবে লোহাকে চালায়, ব্রহ্মও স্বধর্ম ও স্বস্বভাবেই জগৎ হন।

শঙ্কর বলেছিলেন, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। বিবর্ত অর্থ প্রতীতি মাত্র; মূল বস্তুর একটুও পরিবর্তন হয়নি, কোনো ঘটনা ঘটেনি তাঁতে। তবু তাকে অন্য বস্তু বলে প্রতীত হওয়াই বিবর্ত। দড়ি দড়িই আছে, কিন্তু সাপ বলে ভ্রম হচ্ছে। কারণে মিথ্যাকার্য-প্রতীতিই বিবর্ত। দড়িই সত্য, সাপ সত্য নয়। শঙ্করের মতে কারণ থেকে কার্য উৎপন্নই হয় না, ব্রহ্ম জগৎ ও জীবনে পরিণতই হন না। প্রতীতিটি ভ্রান্তি মাত্র।

জীব গোস্বামী বললেন, একমেবাদ্বিতীয়মের একম্ বলতে এই বোঝায় যে জগতের উপাদান-স্বরূপ ব্রহ্ম এক, বহু নন। অদ্বিতীয়ম বলতে বোঝায়, ব্রহ্ম একমাত্র নিজ শক্তিতেই সহায়বান। বিশ্বসৃষ্টিতে কুমোরের মতো মাটি বা অন্য বস্তুর সহায়তা তিনি নেন না। অতএব জগৎ সৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনো পদার্থ যুক্ত হয়নি, আর কোনো কর্তাও নেই। তাই জগৎ ও জীবন সৎ।

শঙ্কর বলেছিলেন, জলে ও আয়নায় এক সূর্যের বহু প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেরূপ এ জগতে পরমাত্মার সদৃশ বহু আত্মপ্রতিবিম্ব দেখা যায়। জীব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব। জীব গোস্বামী এ মত খণ্ডন করে বললেন, জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। কারণ সূর্য সাবয়ব ও খণ্ডিত। এবং সূর্য ও জলের মধ্যে দূরত্ব আছে। ব্রহ্ম নিরবয়ব, নির্বিশেষ, সর্বব্যাপী। ব্রহ্মের কিরণচ্ছটা কার ওপর পড়বে? ব্রহ্ম বই দ্বিতীয় বস্তু তো নেই—সূর্য ও জল যেমন পৃথক বস্তু ব্রহ্মের বেলা তো তা হয় না। এবং ব্রহ্মের সঙ্গে দূরত্বই বা কার আছে? তিনি সর্বব্যাপী—তাঁর থেকে দূরবর্তী কোনো কিছুই নেই। তাই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হয় না। জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নয়।

জীব পরমাত্মার অংশ, অণু। চৈতন্যস্বভাবে ব্রহ্ম ও জীব একই—কিন্তু চেতনার ব্যাপ্তিতে উভয়ের পার্থক্য। ব্রহ্ম বিশালতম চৈতন্য, জীব অণু-চৈতন্য। পরব্রহ্ম আগুন, জীব আগুনের স্ফুলিঙ্গ। আগুন একস্থানে জ্বললে বহুদূর পর্যন্ত তার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্ম আগুন, জগৎ তাঁর জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না আগুন নয়, আবার আগুন থেকে ভিন্নও নয়। স্ফুলিঙ্গ অগ্নিকুণ্ড নয়, কিন্তু আগুনই বটে। তাই জগৎ ও জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়, অভিন্নও নয়।

ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ই চিৎস্বরূপ। দুটি চৈতন্যময় পুরুষ পরম প্রীতির নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত। তত্ত্বমসি—তুমিই সেই, শঙ্করের অর্থ। জীব গোস্বামী বললেন, না, তা নয়। তৎ অর্থ সেই পরোক্ষ ব্রহ্ম। ত্বম্ অর্থ তুমি আমার প্রত্যক্ষ মানুষ। পরোক্ষ চৈতন্য-পুরুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ চৈতন্য-পুরুষের নিত্য যোগ—'অসি' ক্রিয়া অন্বয় বা যোগের দ্যোতক, ঐক্যের নয়।

মহাপ্রভু তাঁর এই ব্রহ্ম-জগৎ-জীবনবাদ তথা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বিশেষভাবে চার জনের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। পুরীতে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তিনি বলেছিলেন, জীবের অস্থি ও বিষ্ঠাও মহা পবিত্র—শঙ্খ জীবের অস্থি আর গোবর জীবের বিষ্ঠাই তো! বললেন:

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥

তিনিই অপাদান কারক। কারণ তাঁ থেকে সবাই জন্মায়। তিনি করণ কারক কারণ তাঁ দ্বারাই সবাই জীবিত থাকে; তিনি অধিকরণ কারক কারণ তাঁতেই সবাই প্রবেশ করে। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ—এই উভয়ের পার্থক্য। আরও বললেন:

পরিণাম-বাদ ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগত মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র হয়॥

আগেই বলেছি, ব্যাসসূত্র অর্থ ব্রহ্মসূত্র। মহাপ্রভু স্পষ্টতই এখানে শঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে তিনি ব্রহ্মসূত্রের বিকৃত ভাষ্যের সাহায্যে বিবর্তবাদ স্থাপন করেছেন। জীব মিথ্যা মায়া নয়, দেহে আত্মবুদ্ধি করাটুকুই শুধু জীবের পক্ষে মিথ্যা, মায়া ও মোহ। জীব অণুচৈতন্য—চেতনায় ঈশ্বরসম, এটাই সত্য বোধ। জগৎ নশ্বর বটে কিন্তু মিথ্যা নয়—এইই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত। বস্তুতঃ তিনি জগৎ ও জীবনকে যত মহিমান্বিত করে দেখেছেন আর কোনো তাত্ত্বিক-দার্শনিক তেমনটি দেখেননি। এবং জগৎ ও জীবন মহাপ্রভুর

দর্শনে শুধু স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বললেও কম বলা হয়; স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়েই তারা ব্রহ্মের সঙ্গে চির-অন্বিত, নিত্যযুক্ত, অভেদ এই কথা বলে জগৎ ও জীবনের মহত্তম কুলপরিচয়, জাতিপরিচয় ও স্বরূপ-পরিচয় তিনি উদ্ধার করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু-সার্বভৌমের এই সংলাপ আছে।

কাশীতে প্রকাশানন্দ ও অপরাপর মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মহাপ্রভু বলেছিলেন:

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ॥

ঈশ্বর যেন জ্বলন্ত আগুন—তারই এক কণা স্ফুলিঙ্গ হল জীব। ঈশ্বর শক্তিমান; জীব শক্তি। গীতা ও বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদিতে এ কথার প্রমাণ আছে। জগৎ ও জীবন ঈশ্বরের বিবর্ত নয়, পরিণাম। ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছাক্রমে জগৎ ও জীবন রূপে পরিণাম পান। কিন্তু তাঁর অচিন্ত্য শক্তির জন্যই তিনি অবিকারী থাকেন। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা এই শঙ্করমতখণ্ডন মেনে নিয়ে মহাপ্রভুকে বেদময় মূর্তি সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে স্বীকার করেছিলেন—শঙ্করকে কেউ এত বড় বলেনি। (চৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ) পুনরপি আর একদিন কাশীতে প্রকাশানন্দকেই মহাপ্রভু বলেছিলেন:

সৃষ্টির পূর্বে ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে।

এখানে যে 'আমি' তা ভগবানের 'আমি'—এগুলি ভগবদ্বাক্য। সৃষ্টির আগেই তিনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান, সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ তাঁতেই থাকে। আবার জগৎ ও জীবন সৃষ্টি করার পর তিনি তারই মাঝে থাকেন। যত প্রপঞ্চ দেখ—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সব তিনিই হয়েছেন। প্রলয়কালে এসব

তাঁতেই লয় পায়; একা তিনি পূর্ণভাবে বিরাজ করেন তখন। (ঐ, মধ্যলীলা, পঁচিশ পরিচ্ছেদ)।

ঐ একই গ্রন্থের মধ্যলীলার উনিশ থেকে পঁচিশ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে পৃথক পৃথক ভাবে মহাপ্রভু তাঁর দর্শন বলেছিলেন। প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি বলেন, একটি চুলের আগাকে একশো ভাগ করে তার এক ভাগকে আবার একশো ভাগ করলে যে অতি ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায় অগণিত চিৎকণ জীব তারই মতো অতি ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র; তবু জীব চিৎকণ—চৈতন্যধর্মে ঈশ্বরীয়। জীব ঈশ্বর নয় কেননা সে ব্যাপকত্ব তাতে নেই, সে অণু। কিন্তু রামকৃষ্ণের ভাষায়, ছোট সাপও সাপ, জাত কেউটের বাচ্চা।

বারাণসীতে সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু ঐ কথাই বলেছিলেন যে মানুষ মহান শক্তিধরই বটে, তাই স্বরূপে সে কৃষ্ণের নিত্য দাস; অর্থাৎ সদাই কৃষ্ণসঙ্গক্ষম। বলেছিলেন, কৃষ্ণের তিনটি স্বাভাবিক শক্তি-পরিণতি আছে: চিৎশক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি। জীব কৃষ্ণকে ভুলে বহির্মুখী অবস্থায় থাকে বলেই মায়া তাকে সংসার-দুঃখ দেয়, কখনো স্বর্গে ওঠায় কখনো নরকে ডোবায় রাজা যেমন দণ্ডযোগ্য জনকে শাস্তি দেন, তেমনই। ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গিয়ে সে ঈশ্বরকে ভুলে যায়, ভুলে যায় আপন স্বরূপ। তাই শরীরটাকেই সে আত্মা বলে ভাবে। ঈশ্বর ভিন্ন অপর বস্তুতে তার তখন অভিলাষ জন্মে—তা থেকেই আসে মৃত্যুভয়। ঈশ্বরের মায়াশক্তিই এসব করায়। আবার জীব যখন কৃষ্ণোন্মুখ হয় তখন মায়াশক্তি হার মেনে সরে যায়। কৃষ্ণ কে? তিনিই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব—স্বয়ং অদ্বৈতস্বরূপ তিনিই ব্রজেন্দ্রনন্দন!

সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর।।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্বৈশ্বর্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্য ধাম॥
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥
ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে॥
পরমাত্মা যিঁহো তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব অবতংস॥

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥
অনন্ত শক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম ॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হল সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন ॥
মায়াদ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে ॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে হয় দাহশক্তি ॥

সকলের আদিতে যে সমগ্র সত্তা বর্তমান, বেদে তাকে পরব্রহ্ম বলেছে— মহাপ্রভু বললেন, না সে এক নওল কিশোর—সেই সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয়. চিদানন্দ তার দেহ। সেই কিশোর কৃষ্ণ, তিনিই স্বয়ং ভগবান, সকল ঐশ্বর্যময়। জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁকেই ব্রহ্ম বলে, যোগমার্গের সাধক তাঁকে বলে পরমাত্মা, ভক্তের কাছে তিনি ভগবান। কিশোর কৃষ্ণই তিন রকম সাধকের কাছে এই তিন রূপে প্রকাশিত হন—মূলে তিনি এক। মূলে সে এক গোপ তনয়, গোপ অভিমান তার—ব্রজেন্দ্রনন্দন সে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম তারই অঙ্গের আভা—সূর্যের কিরণ যেমন আমাদের চোখে জ্যোতির্ময়, ব্রহ্মও তেমনই জ্যোতিঃপুঞ্জের প্লাবন। রামকৃষ্ণ প্রথম কালীদর্শনের সময় এই জ্যোতির প্লাবনই দেখেছিলেন, যেন গলিত রূপার স্রোতে দিগ্বিদিক ভেসে যাচ্ছিল। এইই ব্রহ্ম-দর্শন। মহাপ্রভু বললেন, এই নির্বিশেষ জ্যোতিঃস্বরূপকে ব্রহ্মই বলো, আর নিষ্কল নির্বিকার নিষ্ক্রিয় শান্তমনন্তম জ্ঞানলক্ষণম পরমাত্মাই বলো—সবই ঐ ব্রজগোপের এক এক অংশ মাত্র। অর্থাৎ অরূপকে ছাপিয়ে উঠেছে রূপ, নিরাকারকে অতিক্রম করে গিয়েছে সাকার, সাকার সাবয়ব মানুষ মূর্তিই মূল সত্যের স্বয়ংরূপ। কৃষ্ণই আত্মারও আত্মা—ভগবানের ঐ পূর্ণরূপের অনুভব ভক্তি দ্বারাই সম্ভব। সেই এক বিগ্রহেরই অনন্ত স্বরূপ হয়— যে যেমন মনোভাব পোষণ করে সে তেমন ভাবেই তাঁকে উপলব্ধি করে। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি—তার মধ্যে তিনটি প্রধান; ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ও

ক্রিয়াশক্তি। এই তিন শক্তি ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এই তিন শক্তি মিলেই প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি হয়। তিনিই সৃষ্টি করেন এ বিশ্ব মায়া-দ্বারে, তাই এ জগ-সংসার মায়াক্ষেত্র, মায়িক। জড় বা অবচেতন প্রকৃতি বা প্রধান সৃষ্টিমূল নয়। সাংখ্যমত বা বস্তুবাদ খণ্ডন করলেন মহাপ্রভু এখানে। ঈশ্বরশক্তি বিনা সৃষ্টি সম্ভব নয়। ঈশ্বরই স্ব-ইচ্ছায় স্বশক্তিতে যা সৃষ্টি করলেন তা মিথ্যা ও ভ্রান্তি হতে পারে না—তার সত্যতা, তাৎপর্য ও অর্থ আছে। প্রকৃতি সৃষ্টি করে—বস্তু থেকে বস্তু উৎপন্ন হয়—কিন্তু তাও ঈশ্বরশক্তি সহায়ে। লোহা গরম হতে পারে, হাত পোড়াতে পারে—কিন্তু আপনা-আপনি এ ক্ষমতা লোহা অর্জন করে না। আগুনের দাহিকাশক্তি লোহায় সঞ্চারিত হলেই লোহা তেতে ওঠে—দাহশক্তি লোহার নিজস্ব নয়। সৃষ্টিশক্তি প্রকৃতির নিজস্ব নয়।

কেবল-ব্রহ্মবাদ ও কেবল-বস্তুবাদ দুইই নিরাকৃত করে মহাপ্রভু নামরূপ-ময়তাকে, জগৎ ও জীবনকে পরম সমাদর জানিয়েছেন। সত্য রূপবঞ্চিত নয়, রূপও সত্যবঞ্চিত নয়। ব্রহ্মে মায়ার অধ্যাসে জগৎ-বিভ্রম রচিত হয়নি, ব্রহ্ম মায়াস্পর্শাতীত, তাঁতে অধ্যাস হয় না। কিন্তু মায়া তাঁরই বহিরঙ্গা শক্তি। সেই মায়া-দ্বারে, তিনি আপন ইচ্ছা জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে অগণন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের অণ্ড অর্থাৎ প্রসূত পদার্থ। তা কি বাজে ব্যাপার হয়? ব্রহ্মাণ্ড অলীক বস্তু—যথা আকাশকুসুম—নয়। তা আগন্তুক অস্থায়ী ব্যাপার—যথা ইন্দ্রধনু—নয়। ঈক্ষতের্নাশব্দম—যাঁর ঈক্ষণে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল তিনি এক পুরুষই বটে, নির্বিশেষ জ্যোতিঃপ্রবাহের আবার ঈক্ষণশক্তি কী? এবং পরম পুরুষের ঈক্ষণ বা দৃষ্টি মিথ্যাপীড়িত, মিথ্যাময় হতে পারে না—তাঁর দৃষ্টির সৃষ্টিও মিথ্যা নয়। জীব গোস্বামী বলেন, মায়ার দুটি অংশ—নিমিত্ত ও উপাদান। নিমিত্ত মায়াশক্তির দুটি বৃত্তি, বিদ্যা ও অবিদ্যা। অবিদ্যা বন্ধন করে, বিদ্যা মুক্তি দেয়। অবিদ্যা মায়ার আবার দুটি বৃত্তি—আবরণাত্মিকা, যা জীবে অবস্থান করে জীবের স্বাভাবিক নিজ জ্ঞান আবৃত করে; বিক্ষেপাত্মিকা, যা বিষয় জ্ঞানদ্বারা জীবকে স্বরূপবোধ থেকে বিক্ষিপ্ত করে। উপাদান মায়া-শক্তিই জগৎ সৃষ্টির উপাদান, প্রধান প্রকৃতি বা বস্তু রূপে যা খ্যাত।

মহাপ্রভু জগৎ ও জীবনকে বস্তুপরিণামবাদ বলে স্বীকার করেননি, শক্তি-পরিণামবাদ বলে মেনেছেন। সে শক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি। যেমন সুতাসমূহই বস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি ব্রহ্মের শক্তিই জগৎ ও জীবনরূপে আত্ম-

প্রকাশ করেছে। মহাপ্রভু বললেন, জানলা দিয়ে রাশি রাশি ধূলিকণা উড়ে আসে, পুরুষের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে তেমনই কত কত ব্রহ্মাণ্ড বেরিয়ে আসছে।

সেই আদি পুরুষরূপী কৃষ্ণের বহুতর প্রকাশ, বহুতর বিকাশ—অগণন ব্রহ্মাণ্ডময় ও সকল ব্রহ্মাণ্ডেরও অতীত তিনি। তবু তাঁর শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম প্রকাশ ব্রজে—মানব কিশোর রূপে।

প্রয়াগে ত্রিবেণীর ওপর এক বাসাঘরে বসে মহাপ্রভু যখন রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামীর বাবা বল্লভকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন যমুনার অপর পারে আড়ৈল গ্রামে বাস করছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মনেতা বল্লভাচার্য। ইনি খবর পেয়ে সমাদরে মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে নিয়ে যান। আড়ৈল গ্রামের রঘুপতি উপাধ্যায় মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করে কয়েকটি স্বরচিত শ্লোক শোনান, যা মহাপ্রভুকে অপার আনন্দ দিয়েছিল। শ্লোক কয়টি এই :

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে
যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।

সংসার-ভয়ে ভীত হয়েছেন যাঁরা তাঁরা কেউ বা শ্রুতি, কেউবা স্মৃতি, কেউবা মহাভারত মেনে ভজন করুন। এ ভবভয়হরণে আমি নন্দকেই বন্দনা করি যাঁর আঙিনায় পরব্রহ্ম বাঁধা রয়েছেন।

মহাপ্রভু বললেন, আগে কহ। রঘুপতি দ্বিতীয় শ্লোকটি পড়লেন :

কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি
কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে
গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম।

কার কাছে বা একথা বলব, কেই বা আমার একথা বিশ্বাস করবে—যে যমুনার তীরে কুঞ্জমধ্যে গোপবধূদের সঙ্গে বিহার করেন স্বয়ং পরম ব্রহ্ম।

মহাপ্রভুর দেহমন আউলে গেল প্রেমাবেশে। বললেন : কহ। রঘুপতি তৃতীয় শ্লোক পড়লেন :

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ।

কৃষ্ণের নানা রূপের মধ্যে শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ রূপ ; নানা ধামের মধ্যে

ব্রজ ধামই শ্রেষ্ঠ ধাম ; নানা বয়সের মধ্যে কৈশোরই শ্রেষ্ঠ বয়স ;
নানা রসের মধ্যে শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ।

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু রঘুপতিকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর প্রেমোন্মত্ত হয়ে নাচতে লাগলেন। ঈশ্বরেরও শ্রেষ্ঠ রূপ মানব রূপ—বৈষ্ণবের ধ্যানে ক্রমে সেই উপলব্ধি আরও নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছিল। তাই বৈষ্ণবের গান :

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।

গলিত রূপার মতো জ্যোতিঃপ্রবাহের মধ্যে রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল শ্যামারূপ ; ব্রহ্মজ্যোতি ঐ শ্যামারই অঙ্গ-আভা। রামকৃষ্ণের কালী-দর্শনে, কালীর সঙ্গে কথা বলায়, হাসায়, কাঁদায়, অভিমান এমনকি ফচকিমি করায় বাঙালীর সর্বোত্তম সাধনসিদ্ধান্তই নতুনভাবে প্রমাণিত-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেদ-উপনিষদ শঙ্করাদির সকল ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ব্রহ্মানুভবকে ছাপিয়ে গিয়েছে তা। পরব্রহ্মই শ্যামা ; নির্বিশেষ নিরঞ্জন সর্বব্যাপী সর্বাতীতকে ছাপিয়ে ওঠে বাংলার শ্যামশ্রীমণ্ডিত সেই মেয়েটি যে রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিয়েছিল, আর রামকৃষ্ণের কাছে আদরে-আবদারে, অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে, কৌতুকে ভ্রূ নাচিয়ে, পাঁয়জোর বাজিয়ে ছুটোছুটি করে শান্তত্তুষ্ট হয়ে আনন্দ-লীলা করেছিল। সেই শ্যামাই ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী, জীবকুলের জননী। আর বৈষ্ণব সাধক কবির নরলীলাও বাদ থাকেনি—নরশরীরধারী রামকৃষ্ণই শ্যামার স্বরূপ ; এই তাঁর লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরই শ্রেষ্ঠ ধাম।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালেই নব্যযুগের ইয়োরোপ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল—এই ঘটনাটির গুরুত্ব তুচ্ছ করা যায় না। ভাস্কো ডা গামা ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে কালিকট বন্দরে পৌঁছেছিলেন—তখন দিল্লীতে সুলতান সিকন্দর শাহ রাজত্ব করেছেন, চেষ্টা করছেন প্রাণপণ শাহী শাসন রক্ষা করতে, প্রাদেশিক শক্তিগুলিকে দমন করতে, কেন্দ্রীয় শাসন দৃঢ় করতে—সাফল্য নিতান্তই অস্থায়ী হচ্ছিল। ভাস্কো ডা গামা পথ দেখাবার পর ১৫০০ সালের মার্চ মাসেই লিসবন থেকে তেরোখানি জাহাজ নিয়ে ভারতের পথে রওনা হয়েছিলেন পেড্রো আলভারেজ ক্যাব্রাল। পোর্তুগীজরা এত দ্রুত দক্ষিণ ভারতে একটা শক্তিভূমি গড়ে ফেলল ও স্থানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে লাগল যে ১৫০৯ সালে আলফোন্সো দ্য আলবুকার্ক ভারতে পোর্তুগীজ শক্তির গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। এক বছর পর তিনি গোয়া দখল করে

ফেলেন। ইনি একটি অদ্ভুত নীতি নেন—পোর্তুগীজরা যাতে এদেশে ভারতীয় মেয়েদের বিয়ে করে বসতি করে তাতে তিনি উৎসাহ দেন। পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে তিনি ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করে ফেলেন—পশ্চিম উপকূল বরাবর যার প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। উপকূল-সরণি বেয়ে ধাবিত মহাপ্রভু এই বিদেশী শক্তি ও তাদের খ্রীস্টীয় ধর্ম সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন তা মনে হয় না।

শুধু কি খ্রীস্টীয় ধর্ম? ইয়োরোপে তখন রেনেশাঁসের ভাবান্দোলনের প্লাবন বইছে—অস্তমিত মধ্যযুগ, অস্তমিত মধ্যযুগীয় সমন্বয়; নবযুগের নতুন বাণী ভাব-সংঘাত ও জগৎ জুড়ে শক্তি-সংঘাত সৃষ্টি করেছে—ভারত সে সংঘাতবলয়-ভুক্ত হবেই।

ইয়োরোপের খ্রীস্টান জগতে একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে জগৎ ধ্বংস হবে, মারা যাবে সব মানুষ। সালটি যখন চলে গেল, সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল মানুষ। রোমান সভ্যতার ভাঙা দেয়াল পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল তারা। ভারতে যেমন হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সংঘাত বাধছিল—ইয়োরোপেও খ্রীস্টান-মুসলিম সংঘাত মানুষের মন অনেকখানি দখল করেছিল: খ্রীস্টানরা মুসলমানদের ভূমি পর্যন্ত আক্রমণ করতে চেয়েছিল—বারবার তাই ক্রুসেড যুদ্ধ হয়। একটা নতুন অসন্তোষ ও অতৃপ্তি জন্ম নিয়েছে মানুষের মনে, তারা বেরিয়ে পড়েছে নতুন ভূমির সন্ধানে, এমনকি দলবদ্ধ তীর্থযাত্রায়। বানিয়ান বা চসারের কাব্যে পাচ্ছি এই তীর্থযাত্রীদের কথা।

দেহ ও আত্মার চরম বিচ্ছেদের কথা ঘোষিত হচ্ছে—দেহ অন্ধকার পূতিগন্ধময়; আত্মা শুদ্ধ ও সুন্দর। আত্মার প্রকাশ প্রেমে, প্রেম সার্থক দেহধর্মাতীত প্রিয়মিলনে। সেবা ও নিষ্ঠাময় অনুরাগই সে প্রেমের সারাৎসার, দেহসম্ভোগ নয়। ত্রুবাদুর কবিরা এই প্রেমের গরিমা গাইলেন। এবং তাঁদের চাপে পড়ে যে চার্চ চিরকাল God the Father-এর কথা বলে এসেছে, কোনোদিন ভগবতী বিশ্বজননীকে মানেনি, সে এখন মেরী মাতার উপাসনা প্রবর্তন করল—খ্রীস্টীয় চার্চে এই প্রথম স্বীকৃত হল যে ঈশ্বরের পিতৃরূপই শুধু নেই, আছে তাঁর মাতৃরূপও। ত্রুবাদুর কবিরা নরনারীর প্রেমের এমন ধারণা পর্যন্ত প্রচার করলেন যে প্রেম স্বর্গীয় ভাব, নারী দেবীস্বরূপা—তাঁর সামান্যতম ইচ্ছা পালনেও জীবন ধন্য হয়, কিন্তু কখনো তাঁর দৈহিক সান্নিধ্যে যেতে নেই।

প্রেমকে দেহবোধমুক্ত করাই প্রেমের সাধনার পথ—প্রেমপাত্রীর কাছ থেকে দূরেই থাকতে হবে, বিবাহের প্রশ্ন ওঠেই না। ক্রবাদুর কবিদের এ মনোভাব শুধু কাব্যিক ছিল না, এ ছিল ধর্মীয় প্রত্যয়জাত দৃষ্টিভঙ্গী। সে ধর্ম Catharism নামে খ্যাত, খ্রীস্টধর্মের বিরোধী, বুলগেরিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে ও দক্ষিণ ফ্রান্সে তার প্রসার হয়েছিল—প্রোভেন্সেই ক্রবাদুরদের আবির্ভাব। চার্চ ক্যাথারিজম ও ক্রবাদুরদের হেরেটিক বা ধর্মবিরোধী ফলে ফতোয়া দিয়েছিল। কেননা নারীকে দেবী বললে স্নেহ করুণাকেই প্রাধান্য দিতে হয় —জগজ্জননী করুণাময়ী তো বটেই; কিন্তু চার্চ ক্ষমতা, অথরিটি ও মর্যাদা-দম্ভের সেবক চিরকাল। অথচ খ্রীস্টান আবহেই ক্রবাদুরদের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী কবি দান্তে দিব্য প্রেম ও দিব্য নারীর অমর কাব্য লিখে গেলেন ঐ মধ্য যুগেই। দান্তে তেরো-চোদ্দো শতকের লোক (১২৬৫-১৩২১ খ্রীঃ)।

মহাপ্রভু জয়দেব ও চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কাব্য আনন্দে আস্বাদন করতেন —এঁদের মধ্যবর্তী সময়ের কবি দান্তে ওঁদেরই মতো মানবিক প্রেমকে এমন নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধতা দিয়েছিলেন যা শুধু রুচিশোভন নয়, আমাদের হৃদয়কে যা অম্লান উত্তরণের পথে নিয়ে যায়। যৌবনে রচিত 'লা ভাইটা নুওভা" বা 'নবজীবন' কাব্যেও দেখি বিয়াত্রিচের পুণ্যময় স্বর্গীয় উপস্থিতি; তাঁর দৃষ্টিপাতে মানুষ হয় মহনীয়, মন্দমনা হয় ধ্বংস।

মহাপ্রভু যে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন, রামকৃষ্ণও যে পার্থক্য মেনে নিয়েছেন ও গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে পার্থক্যের ওপর, সে পার্থক্যের আভাস ফুটে উঠেছে একদিকে খ্রীস্টীয় ভক্তিতত্ত্ব, আর একদিকে ক্রবাদুর ও দান্তের প্রেমবাদের পার্থক্যের মধ্যে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতই এ পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন—কিন্তু ভাব ও উপলব্ধি তো দেশ বিশেষের সম্পত্তি নয়। জাতীয় মনের পিছনে রয়েছে বিশ্বমন। সকল যুগ ও সকল দেশের ভিতর দিয়ে বিশ্বমন নিজেকে অভিব্যক্ত করেছে। আমি বিশ্ব-পটভূমিতে বিশ্বমনের অভিব্যক্তির ধারাটিকে এ কারণে ধরতে চাইছি যে রামকৃষ্ণ বিশ্বপুরুষ, তাঁর সাধনা বিশ্বস্তরের সাধনা—সর্ব মানবের সত্য সাধনা ও উপলব্ধির পরিণত-পূর্ণ ফসল তাঁতে এবং নবীন পূর্ণায়ত বিশ্বমানবতার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠাই তাঁর সাধনা ও সংগ্রামের লক্ষ্য। তিনি শুধু ভারতীয় ঐতিহ্য ও আত্মার পুনর্জাগরণের তপস্যা করেছিলেন এরূপ মত তাঁকে সংকীর্ণ পরিচয়ে আবদ্ধ করে,—রামকৃষ্ণের পূর্ণ স্বরূপকে খণ্ডিত ও ছিন্ন করে দেয়। সে

ভাবে দেখলে যেন তাঁর অঙ্গেই অস্ত্রাঘাত করা হয়। প্রকাশানন্দের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ এনেছিলেন মহাপ্রভু আপন সম্পর্কেই ; ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের দৃষ্টিকোণ সম্বল করে রামকৃষ্ণকে যাঁরা দেখেছেন ও দেখিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে আমি সেই একই অভিযোগ তুলছি :

কাশীতে পঢ়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥

—চৈতন্য ভাগবত : মধ্যখণ্ড : তৃতীয় অধ্যায়।

খ্রীস্টধর্মে মধ্যযুগে ভক্তির কথা তুলেছিলেন ফ্লোরার জোয়াচিম (জন্ম ১১৩০ খ্রীঃ); যিনি বলেছিলেন জগৎ একদিন প্রেম-শাসিত হবে—শান্ত প্রেমপূর্ণ চিত্তে মানুষ ঈশ্বরধ্যানে ডুবে যাবে। রামানুজের ভক্তিবাদ ঐ একই সময়ে সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এ যখন দেখি তখন মনে হয় বিশ্বমনের অভিব্যক্তি তো কোনো দেশে বাঁধা পড়ে না! জোয়াচিম আর এক মহাজনের পূর্বাভাস মাত্র; তিনি আসিসির সন্ত ফ্রান্সিস (১১৮২-১২২৬)। ফান্সিসকে লোকে বলত ঈশ্বরভক্তির ক্রবাদুর ; এত মাতোয়ারা ছিলেন ঈশ্বর-প্রেমে যে ঈশ্বরকথা বলতে বলতে খুলে পড়ত তাঁর বেশবাস ; বলতেন, আত্মা বদ্ধ নয় বস্ত্রে ও অট্টালিকায়, ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে হয় আপন নগ্নতায়। পিতার ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধনৈশ্বর্য ছেড়ে তিনি হয়েছিলেন গরীব মানুষ—কেননা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে ধন লাগে না, বরং ঐশ্বর্য মূঢ় করে। অট্টালিকা স্থাবর; সেবক হবে গতিশীল, তাই অট্টালিকায় বাসের কী প্রয়োজন? জীবনযাপনে আমরা হব স্রষ্টার অনুগত, সৃষ্টির অনুগত নয়। আর তাঁর সৃষ্টিতেই বা ভেদ আনব কেন? মানুষ, পশু, পাখি, তরুলতা সবই তাঁর, অতএব সবই সমান প্রিয় আমাদের। এমনকি কুষ্ঠ রোগীও, যাদের পা ধুয়ে দিতেন ফ্রান্সিস। আর পাখিরাও তাঁর ভাষা বুঝত, পশুরা তাঁকে হিংসা করত না। জীব মাত্রকেই তিনি ভালোবাসতেন।

সন্ত ফ্রান্সিস ঈশ্বরপ্রেমপ্রবুদ্ধ হয়েই জগৎ ও জীবনকে মর্যাদা দিয়েছিলেন, যদিও সম্ভোগবাদকে নয়। তাঁর ধারাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যান সন্ত টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৬-১২৭৪)। দান্তে তাঁকে বলেছিলেন 'স্বর্গীয় জ্ঞানের শিখা' এবং লোকেরা বলত 'ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনের জন্য নির্বাচিত পুরুষ'। অ্যাকুইনাস বলেছিলেন, ঈশ্বর যে আছেন তা পঞ্চবিধ প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম প্রমাণ, বিশ্বে সব জিনিসই গতিবিধৃত—কিন্তু বস্তুতে নিহিত গতি-

সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে একজন গতিদাতা চাই—যা কিছুই গতিশীল তারই একজন গতিদাতা আছে। ঈশ্বরই আদি গতিদাতা, যদিও তিনি নিজে অচল অটল—unmoved mover. দ্বিতীয় প্রমাণ, সবেরই কারণ আছে, ঈশ্বরই সর্বকারণকারণ—uncaused cause. তিন, যা জন্মায় তা মরে—সবই অনিত্য। এক নিত্যবস্তু অবশ্যই আছে, যা থেকে সব জাত হয়—ঐ বস্তুই ঈশ্বর। চার, সবেতেই কিছু কিছু উৎকর্ষ আছে—তর তম আছে—ঈশ্বরই সর্বোত্তম। পাঁচ, এ বিশ্ব উদ্দেশ্যবিহীন নয়, সবই চলেছে উদ্দেশ্য অভিমুখে, নিয়ম মেনে। ঈশ্বরই সেই উদ্দেশ্য, সব নিয়ম তাঁরই নিয়ম।

ঈশ্বর আছেন কিন্তু তিনি কী ও কেমন? আমরা তা জানতে পারি না, কেননা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত তাঁর স্বরূপ। অনির্বচনীয় তিনি, বাক্যে তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। আমরা শুধু জানি তাঁর অস্তিত্ব (an sit), জানি না তাঁর স্বরূপ (quid sit) তাঁর স্বরূপ শুধু অনুমানে জানা যায় নেতিপথে—কী তিনি নন, সেই বিচার করে। যথা স্বরূপে তিনি পদার্থ নন, কোনো মানবিক গুণভূষিত তিনি নন, কেননা গুণাতীত তিনি; তিনি পচেন না, নড়েন না, মরেন না, জন্মেন না ইত্যাদি। পৃথিবীর কোনো বস্তু ও প্রাণী সম্পর্কেই একথা বলা যায় না যে তার অস্তিত্ব ও স্বরূপ—existence ও essence একই—একমাত্র ঈশ্বর সম্পর্কেই তা বলা যায়। কেননা, তিনি অস্তিত্বহীন (অসৎ) একথা কখনো বলা যায় না; জগতের আর সব বস্তু ও প্রাণীই কখনো অস্তিত্ববান, কখনো অস্তিত্বহীন। সব বস্তু ও প্রাণীতে সম্ভাবনা নিহিত আছে—সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তোলার জন্য সচেষ্ট তারা। কিন্তু পূর্ণ বিকাশ বা pure act একমাত্র ঈশ্বর। আত্মা ও দেহ একত্র মিলে গঠন করে জীবন, কিন্তু দেহের মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু হয় না, হয়তো আত্মা আবার নতুন দেহ গ্রহণ করে। মানুষের পরম মঙ্গল ঈশ্বর লাভে, কিন্তু বিষয়ই মন টানে মানুষের—চায় সে সুখ, অর্থ ও ক্ষমতা। জ্ঞানস্বরূপ, সংকল্পস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরে ঘৃণা নেই, রাগ দ্বেষ নেই, আছে শুধু অপার প্রেম। তিনিই আবশ্যক সত্তা—necessary Being—আর সব কিছুই আপতিক সত্তা—contingent being. এ সৃষ্টি তাঁর, তা থেকেই জাত। বিশ্বের কোনো উপাদান কারণ নেই, আছে শুধু নিমিত্ত কারণ—সে নিমিত্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা। শূন্য থেকে এ বিশ্ব তিনি সৃষ্টি করেছেন, ex-nililo. প্রত্যেক জীবই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত—স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি রূপে। কিন্তু এ সম্পর্ক

যুক্তির সম্পর্ক—relatio rationis—মনুষ্যযুক্তি; ভগবান নিজে এ যুক্তিতে আবদ্ধ নন। কেননা আমরাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল, তিনি আমাদের ওপর নন। স্বয়ম্ভূ, স্বয়ম্ভর, স্বাধীন সরল ঈশ্বর অনন্ত ইচ্ছাময় কিন্তু প্রাপ্তকাম। অপ্রাপ্য তাঁর কিছু নেই। তিনি সৃষ্টি করেছেন কিছু পাবার লোভে নয়, শুধু নিজেকে দান করতে, নিজের মঙ্গলশক্তিকে উজাড় করে দিতে—intendit solum communicare suam perfectionem quae est ejus bonitas—সব প্রাণীতে তাঁর মঙ্গলময়তা সঞ্চারিত করাই তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মানুষের কর্তব্য ঈশ্বর লাভ অর্থাৎ ঈশ্বরীয় মঙ্গল আপন সত্তায় ফুটিয়ে তোলা। জগতে যে অমঙ্গল দেখি ঈশ্বর তা সৃষ্টি করেননি; কিন্তু মঙ্গলবোধ জাগ্রত করতেই অমঙ্গলবোধের প্রয়োজন ঘটেছে। প্রয়োজনটা এই যে মানুষ যেন স্বাধীনভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসে, বাধ্য হয়ে নয়। সে চাইলে অমঙ্গলকেও বেছে নিতে পারে—নিয়ে থাকে। এ জগৎ মানুষের স্বয়ম্বর-সভা; ঈশ্বর চান মানুষ সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও স্বাধীন চিত্তে তাঁকে বরণ করুক।

মধ্বাচার্য ও টমাস অ্যাকুইনাস সমসময়ে জীবিত ছিলেন ও তাঁদের ভাবনার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তাও নয়। উভয়েই জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য ঈশ্বর জেনেও জগৎ ও জীবনকে উপেক্ষা করেননি।

অ্যাকুইনাসের ভক্তিও বৈধী ভক্তি, যেমন মধ্বের। বৈধী ভক্তি থেকে রাগানুগা ভক্তির পথে পা বাড়াবার ঝোঁক ভারতের মতো সর্বত্রই দেখা দিয়েছিল। ইসলাম ধর্মের আশ্রয়ে সম্ভূত সুফি মতবাদ এমনই একটি পদক্ষেপ। ত্যাগ বৈরাগ্য ও ঈশ্বরপ্রেমমগ্নতাই সুফিদের বৈশিষ্ট্য। এঁরা সোনা ও কাদা, টাকা ও মাটি সমান মনে করতেন। ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট ব্যক্তিগত বাসনার বলিদান তাঁদের ধর্ম ছিল। কোরানের ৫৬ সুরায় এঁদের বলা হয়েছে মুকরামুন, ঈশ্বরের সমীপবর্তী; তাঁরা জানেন হক ও খালক, স্রষ্টা ও মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক। কী সেই সম্পর্ক? একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্ম বা হকের ভাবনিচয় এই সৃষ্টি—অর্থাৎ সৃষ্টি হবার আগে এ বিশ্ব ছিল তাঁর অন্তরে ভাব রূপে—কিন্তু স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক ভেদের, তারা অভিন্ন নয়। শিল্পী কুকুর আঁকার আগে তাঁর মনে ভাব রূপে কুকুর ছিল; কিন্তু আঁকা হয়ে গেলে পটের কুকুর আর শিল্পী তো এক নন। সুফিরা বলেন, বস্তুর সারধর্ম হল ঈশ্বরের ভাব, কিন্তু বস্তু প্রকাশিত বা সৃষ্ট হয়ে গেলে তা জাগতিক বস্তু মাত্র। বস্তু ভাব রূপে ঈশ্বরের ধাত থেকে অভিন্ন, কিন্তু বস্তু রূপে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদাত্ম্যহারা। কিন্তু বস্তুর সারধর্ম

ঈশ্বরের ভাব বলেই বস্তু অনিত্য হতে পারে না, ঈশ্বরের মতোই নিত্য। ঈশ্বর স্বাধীন, আমরা তাঁর অধীন, ঈশ্বর এক আমরা বহু, তিনি খানিক (স্রষ্টা) আমরা মখলুক (সৃষ্ট), তিনি রব্‌ব্‌ ও মালিক (প্রভু) আমরা মরবুব ও মমলুক্‌ (দাস ও ভৃত্য), তিনি ইলাহ (পূজ্য) আমরা মানুহ (পূজারী)— ঈশ্বরের সঙ্গে এই আমাদের পার্থক্য। মানুষ কখনোই ঈশ্বর হয় না। তত্ত্বমসি-র ব্যাখ্যায় শঙ্কর ও সব বৈষ্ণবাচার্যদের এই একই মতপার্থক্য ঘটেছে; বৈষ্ণবরা কখনো মানেননি যে মানুষ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হয়।

ঈশ্বর ও জীব এক নয়, কিন্তু একান্তভাবে পৃথকও নয়; কারণ কোরাণই বলেন: মানুষের ধমনী যত তার নিকট, আমি তদপেক্ষাও তার নিকটতর; তুমি যা দেখ ও যা দেখনা তদপেক্ষাও আমি নিকটতর (৫৬/৮৫); পূব ও পশ্চিম সবই ঈশ্বরাধিকারভুক্ত, যে দিকেই তাকাও সব দিকেই তাঁর অস্তিত্ব; তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ (২।১১১৫); ঈশ্বর সব বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন (৪।১২৬); তুমি যেখানেই থাক, ঈশ্বর তোমার সঙ্গেই থাকেন (৫৭।৪); আদি ও অন্ত, বাহির ও ভিতর সবই তিনি জানেন (৫৭।২)। ঈশ্বর জগৎ ও জীবন থেকে একান্ত পৃথক হলে সব কিছুর আদি ও অন্ত, বাহির ও ভিতর জানতে পারতেন না; বিশ্বাতীত হতে পারতেন না বিশ্বব্যাপ্ত। ঈশ্বর সবই জানেন, কেননা সারাংশে সব বস্তুই তাঁর ভাব মাত্র—তিনি নিজের ভাব নিজে জানেন। তিনি অজ্ঞ, তাঁর ভাবও অজ্ঞ—এই ভাবই জ্ঞেয় এবং ভাবই তাঁর জ্ঞান। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানে পার্থক্য নেই—সবই ঈশ্বরীয়। সুফিরা বলেন, সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব হল ঈশ্বর নিজের ভাবের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করেন। এরূপে নিজেকে ব্যক্ত করেও ঈশ্বর যা ছিলেন তাই-ই থাকেন— নিজেকে বহুধা বিভক্ত করেও তিনি একই থাকেন। তিনি তাঁর ভাব বস্তুর আকার ও উপাদানের ওপর অর্পণ করেন। ঈশ্বরই একমাত্র অস্তিত্ববান— তিনি আদি অন্ত, বাহির ও ভিতর। যা প্রকাশিত আর যা অব্যক্ত সব কিছুরই অন্তর্নিহিত সত্তা তিনি। হজরত মহম্মদ বলেন: হে ঈশ্বর, তুমিই বাহ্য প্রকাশ, তোমার ওপরে কিছু নেই: তুমিই অন্তঃস্থিত, তোমার নিচে কিছু নেই। তুমিই আদি, তোমার আগে কিছু ছিল না; তুমিই অন্ত, তোমার পরে কিছু নেই।

বিভিন্ন বস্তুর রূপের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যই তিনি সব বস্তুর বাহ্য ও আন্তর অবস্থা হয়েছেন। ইব্‌ন-অল্‌ অরবী বলেন: তিনি সকল

জাগতিক বস্তুর সারধর্ম হয়ে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। আবদল করীম জীলী বলেন : সুফির দৃষ্টিতে ঈশ্বরই আছেন, আর কিছু নেই। আমি যখন দেখি তখন আসলে ঈশ্বরই দেখেন, যখন শুনি তখন ঈশ্বরই শোনেন, যখন কথা বলি তখন তিনিই কথা বলেন ইত্যাদি। কেননা শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, বাকশক্তি, জীবন, জ্ঞান, ইচ্ছা সবই তাঁর। একমাত্র ঈশ্বরই কর্তা। স্বর্গ-মর্ত্য সকল বস্তুরই অধিকার তাঁর। জ্ঞাতা (হক) জ্ঞেয়ের (খল্ক) মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং তা করে নিজেকেই জানেন। তাঁর স্বরূপ ও অস্তিত্ব essence ও existence এক। স্বরূপ ও অস্তিত্ব দ্বৈত নয়, অদ্বৈত। আবার ঈশ্বর ও তাঁর ভাবরাশি এক নয়– ভাবই ঈশ্বর নয়। ভাবই যেহেতু বস্তুতে রূপান্তরিত হয় ও বস্তুই জ্ঞেয় অতএব ঈশ্বর ও বস্তু তথা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় তাদাত্ম্য নয়, এক নয়—অতএব দ্বৈত। ঈশ্বর এবং জগৎ ও জীবনের মধ্যে এই গূঢ় দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্ক যিনি জানেন তিনিই সুফি। সুফি জানেন যে স্বরূপে তিনি ঈশ্বরের ভাব মাত্র। ভাব হিসাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সমভাবে তিনি নিত্য। সুফির প্রবৃত্তি, সংস্কার বা শাকিলাৎ অনুসারে ঈশ্বর বাহ্য সুফি রূপে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন। এজন্য সুফির কোনো স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র জীবন, জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি নেই। সুফি বলেন :

> যখন অহং বোধ হারিয়ে আমি তাঁকে পাই তখন আমার মৃত্যু হয়, 'আমি' থাকে না। ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনে শুধু তাঁকেই দেখি, দুই এক হয়ে যায়।

এই অবস্থাকে কেউ বলেন হুনূল (একীভূত হওয়া), কেউ বলেন ইত্তিহদ (তাদাত্ম্য), কেউ বলেন ওয়ুসুল (মিলন)। আমি যে ইব্‌ন্-অল্ অরবীর কথা বলেছি তিনি দক্ষিণ স্পেনের মানুষ, টমাস অ্যাকুইনাসের ঈষৎ পূর্ববর্তী (১১৬৫—১২৪০ খ্রীঃ)। জালালুদ্দীন রুমী এঁরই ভাবশিষ্য এবং কবি দান্তের ওপরও এঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জালালুদ্দীন রুমী ও তাঁর শিষ্যরা ছিলেন দরবেশ, ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত নৃত্য করতেন তাঁরা। রুমী বলেন : সূর্য উঠলে না থাকে চাঁদ, না তারকা। ঈশ্বর অন্তরে উদিত হলে থাকে না 'আমি'। আমার অনস্তিত্বের মধ্যে ফুটে ওঠে ঈশ্বরের অস্তিত্ব—আশ্চর্য এ ঘটনা। সুফি পরিভাষায় এই হল ফণা। সৃষ্ট হবার আগে মানুষ ছিল ঈশ্বরের অন্তরের ভাব, ফণা অবস্থায় আবার হয়ে যায় সেই ভাবমাত্র—একমাত্র ঈশ্বরই তখন বিরাজমান থাকেন।

লক্ষণীয়, রামকৃষ্ণ যখন ইসলামে দীক্ষা নেন তখন তিনি তা নিয়েছিলেন একজন স্থফি দরবেশের কাছে। বাংলা ও ভারতে স্থফি সাধকরা সাত আট শতাব্দী থেকেই এসেছেন ও বাংলায় ইসলামের বাণী তাঁরাই প্রথমাবধি প্রচার করে আসছিলেন। এঁরা আসতেন চট্টগ্রাম বন্দরে বণিকদের সঙ্গে। ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু আগে থেকেই আরব ছিল ভারতীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রপথ। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর সমুদ্রপথে ভারতীয় বাণিজ্য মুসলমানদের হাতে চলে যায়। স্থফি সাধকরা বাণিজ্যপথে ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে এসেছেন, তখন অস্ত্রের সাহায্যে বা প্রলোভনের সাহায্যে ইসলাম ধর্মের প্রচার হয়নি বাংলায়, তত্ত্ব ও সাধকজীবনই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল বাঙালীকে। বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া দখলের পর রাজনৈতিক অবস্থা পাল্টালেও মুসলিম স্থফি সাধকরা তখনো ভগবৎ প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। এই ইশ্লামিক তথা স্থফি ঐতিহ্য মহাপ্রভুর সময়ে বাংলায় স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তার কোনো প্রভাব হিন্দুর মনন-চিন্তনে পড়েনি তা তো নয়!

কিন্তু আমরা রেনেশাঁসের কথা বলছিলাম—যার ঢেউ ইয়োরোপ থেকে ভারতেও আছড়ে পড়েছিল মহাপ্রভুর জীবৎকালেই। ইয়োরোপের সেদিনের ঐতিহ্যেও মরমিয়া সাধনার বাণী তো অনুপস্থিত ছিল না। প্রাচীন কালের কথা বাদ দিলেও দান্তের সমসাময়িক জার্মাণ জন বা মেইস্টার একহার্টের (১২৬০-১৩২৭) মতো মরমিয়ার সাক্ষাৎ পাই আমরা, যিনি বৈধী ভক্তির বদলে রাগানুগা ভক্তিমার্গের কথা প্রচার করায় চার্চের কোপভাজন হয়েছিলেন। স্বয়ং পোপ জন একহার্টের বাণীকে ধর্মদ্রোহিতা বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু একহার্ট ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভের—প্রিয়মিলনের কথাই বলেছিলেন, বাহ্য ধর্মপ্রচারে জোর দেবার বদলে।

একহার্ট বলেন, ঈশ্বর ও অস্তিত্ব এক। কেউ যদি প্রশ্ন করে: ঈশ্বর কী? যথোচিত উত্তর হল: সৎ। জীবের স্বরূপ ও অস্তিত্ব পৃথক, কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ ও অস্তিত্ব এক। দ্বৈতের পরপারে তিনি এক, অদ্বৈত। ঈশ্বরই জানিয়েছেন আমাদের: I am who am—আমি আছি। কিন্তু তিনি অস্তিমাত্র নন, জ্ঞানস্বরূপও। জ্ঞানস্বরূপ বলেই তিনি আছেন। জ্ঞানমূলেই তিনি ক্রিয়াশীল, সৃষ্টিশীল। জগৎ তাঁর ভাব মাত্র। তাঁর চিন্তাই স্বজন। ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই। যদি জীবকে ঈশ্বর থেকে পৃথক রূপে দেখি তবে তারা শূন্যই। জীবসমূহ আছে তাঁর ভিতরে, অংশ রূপে। এছাড়া তাদের পৃথক

সত্তা নেই। ঈশ্বরে ও জীবে দূরত্ব নেই, কেননা জীবের মধ্যে ঈশ্বর অনুপ্রবিষ্ট। আবার ঈশ্বর ও জীবে দূরত্ব অনেক, সম্পূর্ণ বিপরীত কোটিতে অবস্থিত উভয়ে, কেননা ঈশ্বর একম্, জীব বহু। তিনি অসীম, আমরা সীমিত। আমাদের লৌকিক অভিজ্ঞতায় বস্তুই বাস্তব, নীরেট; ঈশ্বর ধূসর। কিন্তু প্রকৃত সত্য বিপরীত: ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

এই ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুজগৎ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরে চলো আপন অন্তরে, সেখানে দেখবে তুমি তিনিই—তুমি তাঁরই স্ফুলিঙ্গ—scintilla; তুমিই জ্ঞানস্বরূপ—intelligere. অন্তরের গূঢ় প্রদেশে প্রবেশ করলেই নাদ শ্রুত হবে—দিব্যের সঙ্গে হবে রভস মিলন। তুমি অন্তরে বসে তাঁকে স্মরণ কর, তাঁর শরণ নাও: তুমিই তিনি হয়ে যাবে—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। যদি তা না হও, যতক্ষণ তা না হও ততক্ষণ ঈশ্বরে বাস পরিপূর্ণ সম্ভবে না। যতক্ষণ জীবস্বভাব তোমাতে কিছুও অবশিষ্ট থাকে ততক্ষণ তুমি ঈশ্বরকে প্রতিহত করবেই। নাশ কর এ জীবস্বভাব। সৎ-অসতের পারে চলে যাও, সৃষ্টির পারে অস্পষ্ট আলো হয়ে ওঠো। এ হল প্লটিনাস-উক্ত the flight of the alone to the Alone, অদ্বৈত অদ্বৈতে মেশে। আত্মা ফিরে যায় তার সত্য কেন্দ্রে।

একহার্টের শিষ্য জন টলার (১৩০০-৬১) বললেন, হাঁ, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা চাই—কৃপাশক্তিই তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটায় আমাদের। কৃপা বিনা গতি নেই। কৃপায় তিনি আমাদের আত্মাকে বিদ্ধ করেন, আমাদের ইচ্ছা ও উদ্যমকে কৃপায় অঙ্গীকার করেন তিনি, তবে তো তাঁর নাগাল পাই। একহার্টের আর এক শিষ্য জন রুশিব্রোয়েক বললেন, তাঁর সঙ্গে মিলনমধুর ক্ষণে তাঁর দ্বারা যেন গ্রাসিত হয়ে যাই, নিমজ্জিত হয়ে থাকি তাঁতে—তবু 'আমি' থাকে, রসরসিকের আমি, ভক্তের 'আমি', সেব্যসেবকের 'আমি'।

ফরাসী মিস্টিক জন গার্সল (১৩৬৩-১৪২৯) বললেন: একহার্ট scintilla-র কথা বলেছেন, তা ঠিক। কিন্তু ঈশ্বর তো শুধু জ্ঞানস্বরূপ নন, প্রেমস্বরূপও। তাঁকে পেতে জ্ঞানমার্গ অনুসরণ আবশ্যক, কিন্তু আরও চাই প্রেম, synderesis. ত্যাগ বৈরাগ্যময় সাধনা চাই বই কি, কিন্তু তাঁর কৃপাই সম্বল, তবেই তো আসবে মিলনোল্লাস; অস্থায়ী ভাবোন্মাদনা নয়, আসবে স্থায়ী ও স্থির তাদাত্ম্যবোধ। মানুষ তখন হয়ে উঠবে ভগবৎসদৃশ। তবু ভক্তের স্বতন্ত্র সত্তা থাকবে—মিলনেও ঈশ্বর ও তাঁর ভক্ত দুজন, একম্ নয়।

গার্সলের অনতিকাল পরে আমরা এসে পৌছাই আধুনিক যুগে—রেনেশাঁসী মানবতাবাদের কালে। শ্রীচৈতন্যদেবের কাল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সময়াভিমুখে কালস্রোত দ্রুত ধেয়ে গেল। মহাপ্রভুর লীলা সম্বরণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ের মধ্যে ব্যবধান তিন শো বছরের। এ দীর্ঘ সময়ে ভারতে রাজনৈতিক উত্থান-পতন হয়েছে কিন্তু দার্শনিক জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে নতুন কোনো প্রশ্ন ও উত্তর শোনা যায়নি। সেই পুরনোরই যেন জাবর কাটা চলছিল। পাঠান রাজত্ব গিয়ে মুঘল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হল; তাও হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ভারতের প্রভুত্ব নিয়ে কত প্রতিযোগিতা, কত দ্বন্দ্ব, কত রক্তপাত হয়ে গেল; মারাঠা মুঘল ইংরেজ ফরাসী ইত্যাদি শক্তির কত সমারোহ, কত ষড়যন্ত্র! অবশেষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাইনবোর্ডের তলে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল ইংরেজ শাসন। এ কয়েক শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ভিন্ন আর কোনো মৌলিক দর্শনের অভ্যুদয় হয়নি ভারতে। দর্শন চর্চা ছিল, শাস্ত্র ও কাব্যাদির চর্চাও ছিল কিন্তু জিজ্ঞাসা যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে; গতানুগতিকের বাইরে যেন যেতে মানা। বহুদিন পর আবার নতুন করে দর্শন ও ধর্মজিজ্ঞাসা সুরু হল রামমোহন রায়ের উদ্যমকে কেন্দ্র করে; তিনি কিছু প্রশ্ন তুললেন, কিছু বিচার আনলেন, সাধারণ মানুষের জন্য বাংলা ভাষায় বেদান্তসার ও উপনিষদের অনুবাদ প্রচার করলেন, এমনকি ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম থেকে প্রেরণা ও ভাবাদর্শ সংগ্রহ করেছিলেন। মানুষটি রাজসিক ও বিষয়ভোগী, বৈষয়িক; ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য তাঁর না ছিল ব্যাকুলতা, না সাধনা। কিন্তু যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে ব্রহ্মবিচার তিনি উপস্থিত করেছিলেন আর তাতে কিছু আলোড়ন উঠেছিল—নিরন্তর বিষয়ভাবনার মধ্যে বসেও ব্রহ্মভাবনাও যে একটা আবশ্যকীয় বিষয় হয়ে উঠতে পারে এই সম্ভাবনাটি তিনি দেখিয়েছিলেন আর নবযুগে ব্রহ্মবিতর্কের তিনি সূত্রপাত করে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্বল ছিল শাস্ত্রপাঠ ও প্রতিভা, ব্রহ্মোপলব্ধি নয়। তাই তাঁর সিদ্ধান্তগুলিও টেঁকসই হয়নি। যতটা শাস্ত্রানুমোদিত ততটা সেগুলি মূল্যবান হতে পারে কিন্তু ব্রহ্মবিচারে যথার্থ অধিকারীর কণ্ঠস্বর তাঁর ছিল না। তবু তাঁর উদ্যম জড়তাময় নিশ্চল পরিস্থিতিতে ঢেউ তুলেছিল আর সেটুকুই তাঁর ইতিবাচক দান। আবার ভারতবর্ষে—সেকালের রাজসভার মতোই একালের রাজধানীতে ব্রহ্মবিচার উত্থাপিত হল এবং রামমোহনের ব্রহ্মসভার যে পরিণাম দেবেন্দ্রনাথ-

অক্ষয়কুমার-রাজনারায়ণ-কেশবচন্দ্র-শিবনাথাদির হাতে ঘটল তাতে বেদ-উপনিষদের মান্যতা-অমান্যতা, ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ, হিন্দুধর্ম ও খ্রীস্টধর্ম তথা ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা-অপ্রাসঙ্গিকতা, জ্ঞান ও ভক্তি, সংসার ও বৈরাগ্য এসব বহুবিধ আলোচনার ঢেউ বইতে লাগল—দেশের শিক্ষিত ও ভাবুক লোকরা সে আলোচনায় সোৎসাহে যোগ দিলেন। এই আলোচনা, বিতর্ক, প্রচার, তদবলম্বনে দল গড়া ও দল ভাঙা যখন পুরোদমে চলছিল ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত রাতে ঘুম হচ্ছে না এমন মানসিক অবস্থা বহুজনের মধ্যে উদয় হল—তখন সেই কলগুঞ্জনের মধ্যে রামকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন—সমাধিমগ্ন নিমীলিত নয়ন, দিব্য হাসিতে উদ্ভাসিত আনন, সপ্রেম সম্বোধন!

মহাপ্রভুর জীবৎকালে ইয়োরোপের নবযুগের যুগমূর্তি ভারতের দরজায় করাঘাত সুরু করেছে মাত্র। রামকৃষ্ণের কালে দেশ ইয়োরোপের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলের অধীন। শুধু সিংহাসনে প্রভু বদল ঘটেনি, ভাবমণ্ডলই পালটে গিয়েছে। এখন জিজ্ঞাসা নতুন ও প্রখর, জীবনবোধ স্বতন্ত্র, দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নতর। এখন আর শুধু পুরোনো কথা সম্বল করে বসে থাকা চলে না, অভ্যস্ত বৃত্তে পদচারণার অবকাশ নেই, এখন যুগপ্রয়োজন অভিনব। মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন:

"এ যুগের যে সমস্যা সে সমস্যা শুধুই কোন এক দেশের এক সমাজের সমস্যা নয়, সারা জগতের সমস্যা; সেই সমস্যা ইতিপূর্বে ভারতের কোন যুগে এমন ভাবে সমাধান দাবী করে নাই। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এ যুগে পশ্চিম ভূখণ্ডের মনুষ্যসমাজই সর্বাপেক্ষা জীবিত বা জীবন্ত, প্রাচ্য প্রায় মুমূর্ষু; এই অতি জীবন্ত সমাজই জীবন-সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহা তুলিয়াছে তাহারই বিষবাষ্পে সমগ্র জগৎ মূর্ছিতপ্রায়। এবার সেই পাশ্চাত্ত্যের মানুষই বেতাল বা ব্রহ্মপিশাচের মত এমন এক দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে—যাহার উত্তর দিতে না পারিলে মানুষের আর রক্ষা নাই। সে প্রশ্ন এই—মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য কি? মানুষ অর্থে দেহধারী জীব—আত্মা নয়। মানুষ হিসাবেই মানুষের জীবনের কোন সদর্থ আছে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর এ পর্যন্ত কোন ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষ দেন নাই। ধর্ম অর্থাৎ ভগবানের ভয় দেখাইয়া কোথাও মানুষকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, কোথাও ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা অনুগ্রহস্বরূপ মানুষকে ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা মৃত্যুর পরে পুরস্কারের আশা দিয়া মানুষকে দুঃখ বরণ করিতে বলা হইয়াছে।

জগৎ যে একটা বন্দীশালা, মানুষের জীবনে যে সত্যকার স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্র মর্যাদা নাই—মানুষ যে বড় দুর্বল, দুর্গতি যে তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে, এবং তাহা ভুলিবার একমাত্র উপায় চিত্তকে জগৎ-মুখী না করিয়া ভগবৎ-মুখী করা—আমাদের দেশেও শেষে ইহাই হইয়াছিল জীবন-সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা। এ দেশেও ঐতিহাসিক কালে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি মানবগুরুগণ যে সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই জগৎকে তেমন মর্যাদা দেওয়া হয় নাই, এই মনুষ্য-জীবনের কোন স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য স্বীকার করা হয় নাই। ইহাও সেই উপদেশের দোষ বা অপূর্ণতা নয়, যে যুগে যে সমস্যা প্রধান হইয়া উঠে, যুগাবতারগণ সেই সমস্যারই সমাধান করেন। মানুষের আত্মা ও তাহার প্রকৃত স্বরূপ, ব্রহ্ম ও সৃষ্টি—এ সকলের যে তত্ত্ব তাহাই সনাতন; ভারতবর্ষ তাহাকে যে রূপে দর্শন করিয়াছে ও তদনুযায়ী সাধনার যে মন্ত্র নির্দেশ করিয়াছে তাহাতে যে কোন গুরুতর অসঙ্গতি আছে, এ পর্যন্ত কোন তত্ত্বজিজ্ঞাসু সে অভিযোগ করিতে পারেন নাই। আবার, প্রতি যুগের সমস্যা-সমাধানে, অর্থাৎ মানুষের যুগোচিত পিপাসানিবারণে, সেই যুগাবতার মহাপুরুষগণ যে নূতনতর উপায় নির্দেশ করিয়াছেন তাহা অভিনব হইলেও সেই সনাতন মূলতত্ত্বের বিরোধী হয় নাই। কিন্তু এ যুগের এই সমস্যা যে কারণে যেরূপ দুরূহ, এবং সর্ব-সমাজের মানবমণ্ডলীর পক্ষে একই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন আর কখনও হয় নাই। মানুষকে ছোট করিলে চলিবে না, ভগবান বা ব্রহ্মকে সকল মূল্য দিয়া সেই ব্রহ্মকে অতি ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়া মানুষকে তাহার বেদীমূলে উৎসর্গ করা চলিবে না। মানুষের মূল্যও প্রমাণ করা চাই। ঠিক এই কাজ পূর্বে আর কেহ করেন নাই—কারণ, সে প্রয়োজন হয় নাই—মানুষের মনে তাহার নিজ জীবনের মূল্যবোধ এমন করিয়া পূর্বে জাগে নাই।" (বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ৭-৯)

রামকৃষ্ণের সাধনা প্রসঙ্গেই মোহিতলাল এই উক্তি করেছিলেন এবং তাঁর অভিমতের সারবত্তা অনস্বীকার্য। তবু তিনি প্রশ্নটিকে ছোট করেই দেখেছেন, প্রশ্ন আরও ব্যাপক: বর্তমান কাল আরও বিশাল ও মৌল সমস্যা বুকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এবং রামকৃষ্ণ তারই মুখোমুখি হয়েছিলেন। মোহিতলালের দীর্ঘ রচনাংশ উদ্ধৃত করার হেতু, একজন গভীরদর্শী পূর্বসূরী কিভাবে যুগসমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণের সাধনলক্ষ্যকে দেখে গিয়েছেন তা জানানো। মোহিতলাল আরও গভীর একটি কথা এই প্রসঙ্গেই বলেছিলেন: হিন্দু

সনাতনকে মানে বলেই যুগকেও মানে,—কালের ধারায় সেই এক সনাতনকেই যুগের রূপ ধারণ করতে হয়, সেজন্য সনাতন মিথ্যা হয়ে যায় না। কৃষ্ণ-বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্যের দেশেও যুগে যুগে সনাতনকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তাই যাকে যুগসমস্যা বলি তা সনাতনেরই সমস্যা, মানবজীবনেরই মৌল সমস্যা—নতুন কালে, নতুন ভাবে ও নতুন ভাষায় তারই উচ্চারণ ও সমাধান ঘটে।

রামকৃষ্ণ যখন এসেছেন তখন দুটি ব্যাপার ঘটে গিয়েছে—ইতিপূর্বের মানব-ইতিহাসে যা আর কখনো ঘটেনি। প্রত্যেক দেশ ও জাতি স্বাতন্ত্র্য-বোধে দীপ্ত থেকেও এক বিশ্ব ও এক মানবজাতির বোধে পৌঁছেছে; এবং অন্যদিকে ব্রহ্মাণ্ড ও মানবজাতির অতীত ইতিহাস অনেক বেশি পরিমাণে জেনেছে। ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবে দেখার সুযোগ আগে ছিল না—কারণ দু চার শতাব্দীর বেশি ইতিহাসের তথ্য তখন জানা যেত না, যা জানা যেত তার অনেকটাই স্মৃতিকথা ও পুরাণ। মহাদেশে ও মহাকালে ব্যাপ্ত মহাজীবনের খোঁজ বিশেষভাবে আধুনিক কালের দান; পৌরাণিক গল্পকথার বদলে মানুষের সামগ্রিক আত্মপরিচয় আধুনিক কালেই তথ্যভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে লাভ করা সম্ভব হয়েছে। রামকৃষ্ণের জগৎ পুরাণের জগৎ ছিল না, তা আধুনিক বিচার-বিশ্লেষণময় বিজ্ঞানের যুগ; সূর্যদেব এখন সপ্তাশ্ববাহী রথের রথী নন, তিনি একটি অগ্নিপিণ্ড মাত্র। পৃথিবীর চারদিকে ঘোরার বদলে, সূর্যই পৃথিবীকে তার চারদিকে ঘোরাচ্ছে। এই সব নতুন জ্ঞান মানুষের বিশ্বদৃষ্টি পালটে দিয়েছে এবং রামকৃষ্ণ এই নতুন বিশ্বদৃষ্টিকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। সে নতুন বিকাশমান দৃষ্টিভঙ্গী ও মানুষের নতুন মনোলোকের সন্ধান না নিলে রামকৃষ্ণের সাধনার স্বরূপ বোঝা যাবে না।

আধুনিক যুগে যে অর্থনৈতিক কাঠামো বিকশিত ও জয়ী হয়েছিল তা হল পুঁজিবাদ; টাকা যার সচল রথচক্র। শুধু চাকা নয়, প্রভুও। এগারো শতকেই এর আভাস দিয়ে "প্রকৃতির অভিযোগ" পুস্তকে লিলের অ্যালেন লিখেছিলেন: Not Caesar now, but money is all. টাকার দোষ অনেক, অর্থই অনর্থ বটে, কিন্তু গ্রাম্য মানসিকতার সীমিত জগতে, সামাজিক রীতি-প্রথার অনড় শাসনে, প্রচলিত মূল্যবোধের অপরিবর্তনীয়তায় টাকার অর্থনীতি আনে গতি, দিগন্তকে করে দেয় বিস্তৃত, ব্যক্তিমনকে করে স্বাধীন। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শোষণ আছে, কিন্তু ইতিপূর্বের সব অর্থনীতিতেই তো শোষণ ছিল। তবু

পুঁজিবাদ যুক্তিবাদ-আশ্রয়ী, বিজ্ঞান-আশ্রয়ী, গতিশীল। আত্মনির্ভরতা, আত্মস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বের বোধ দিয়েছিল তা মানুষকে—ভগবৎমুখী না করে তা হয়তো মর্ত্যমুখী করেছে মানুষকে, অহংচেতনাকেও স্ফীত করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছে আত্মপ্রত্যয়, উদ্যমে আস্থা, বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তিতে নিপুণতা। পুঁজিবাদের আর এক চরিত্রলক্ষণ ছিল স্বগ্রাম বা স্বদেশের মধ্যে অর্থনীতির ভিত্তিকে আটক না রেখে সারা বিশ্বকে শোষণজালের মধ্যে টেনে আনা—হোক শোষণমূলক তবু তা বিশ্ব-অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। যার প্রয়োজনে উন্নত হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, সাম্রাজ্যের দাপট সত্ত্বেও মানুষকে তা পরস্পরের নিকটস্থই করেছে। এবং পুঁজিবাদী আওতার মধ্যেই উঠেছে সাম্যের দাবী, ন্যায়বিচারের আহ্বান। চোদ্দো শতকেই ওয়াইক্লিফ যখন প্রতিবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়ে বলছিলেন, ঈশ্বরের সামনে সব খ্রীস্টানই সমান তখন তাঁর সেই সাম্যের বাণীকে আশ্রয় করেই জন বল পার্থিব সাম্যের দাবী জানালেন ঃ

> কখনোই ইংলণ্ডের ভালো হবে না যতক্ষণ সম্পত্তির মালিকানা না সমাজের হয়, দাস ও ভদ্রলোকের ভেদ না ঘোচে, আমরা সবাই সমান না হই।

কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছে ইংলণ্ডে ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দে ও জার্মানীতে ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দে; ক্রমওয়েলের সময় হয়েছিল Digger আন্দোলন। তাই মার্টিন লুথার যখন I protest বলে প্রটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলন স্থরু করলেন তখন কৃষকরা মনে করেছিল লুথার তাদের লোক—লুথার এতে বিপদ গণেছিলেন অবশ্য।

এই আবহে তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে পালটেছিল তা না অনুধাবন করলে মহাপ্রভুর সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাধনা ও বাণীর পার্থক্য বোঝা যায় না। চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের জীবন ও দর্শনের সাদৃশ্য নিয়ে গ্রন্থকাররা বই লিখেছেন—সে সাদৃশ্য আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু রামকৃষ্ণ চৈতন্যের পুনরাবৃত্তি নন, তিনি নতুন মানুষ, পূর্ণতর আদর্শের প্রতিমূর্তি,—নতুন তাঁর কাল, নতুন তাঁর লক্ষ্য, নতুন তাঁর সাধনা ও সংগ্রাম। তিনি এক-বিশ্ব ও অখণ্ড মানবতার যুগের মানুষ—তাঁর সাধনমূলে আছে সারা বিশ্বের মুক্তিকামনার দিব্য বেদনা। মহাপ্রভুর লীলাসম্বরণের দশ বছর পর কোপার্নিকাসের তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল; তখন থেকে মানুষের বিশ্ববীক্ষায় যে আমূল পরিবর্তন এসেছে তার হিসাব না নিলে নবযুগের নতুন সাধনার রহস্য অগম্যই থেকে যাবে।

পোল্যাণ্ডের কোপার্নিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩) বাংলার শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬—১৫৩৩) সমসাময়িক, বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি ছিলেন যাজক। যৌবনে ইতালিতে এসেছিলেন, রেনেশাঁসের ভাবধারায় স্নাত হয়েছেন, রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, ধর্মীয় প্রত্যয়ে রোমান ক্যাথলিক। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে এই বিশ্বাসে তিনি যৌবনেই পৌছান, কিন্তু চার্চ অরাজি হবে ভেবে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেননি। তিনি যে বছর মারা যান সে বছরই—মৃত্যুর পর—তাঁর বই Revolutionibus Orbium Coelestium বেরোয়। বইখানি তিনি উৎসর্গ করে যান পোপকে। পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল নয়—তাহলে পার্থিব মানুষ বিশ্বের সেরা জীব গণ্য হবে কেন? খ্রীস্টীয় সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব এই প্রশ্নে এমন আঘাত পায় যাতে চার্চ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিকতার তত্ত্ব দর্শনে প্রয়োগ করার ফলে ইতালীয় সন্ন্যাসী জিওর্ডানো ব্রুনোকে (১৫৪৮-১৬০০) চার্চ পুড়িয়ে মারে। ব্রুনো বলেছিলেন: তোমাদের দণ্ডাদেশ শুনে আমি যতটা ভয় পেয়েছি, সত্যের বাণী শুনে তোমরা সে তুলনায় অনেক বেশি ভয় পেয়েছ।

কোপার্নিকাস মানুষের বিশ্ববীক্ষায় যে পরিবর্তন আনার সূচনা করে দিয়ে যান তা দৃঢ়তর রূপ পায় আধুনিক বিজ্ঞানের তিন প্রবর্তকের সাধনায়—জোহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০), গ্যালিলিও গ্যালিলাই (১৫৬৪-১৬৪২) ও আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭)। এঁদের ও আরও বহু বিজ্ঞানসাধকের তপস্যায় বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণা পালটে গিয়েছে, জীবন সম্পর্কে এসেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে। ফলে মানুষের আত্মপরিচয়ও পুরনো পরিভাষায় আর আবদ্ধ থাকতে পারেনি। আত্মজিজ্ঞাসার ধরণ পালটেছে।

নতুন আত্মস্বরূপজিজ্ঞাসার প্রথম বাণীরূপ দিয়েছিলেন রেনে দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০)। তাঁকে বলা হয় আধুনিক দর্শনের জনক। দেকার্তে যখন তাঁর দর্শনের সূত্রগুলি প্রথম লেখেন—১৭ই নভেম্বর, ১৬১৯—তখন ভারতের শেষ বড় দর্শন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন রচনার কাজ সবে সমাপ্ত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করে কেবল বাংলায় পাঠিয়েছেন—সম্ভবত দেহরক্ষাও করেছেন সম্প্রতি।

মহাপ্রভু যেদিন নরলীলা সম্বরণ করেন তারপরও তাঁর প্রধান পার্ষদরা বেঁচেছিলেন। বাংলায় অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ

সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার, রামানন্দ বসু, বংশীবদন, পরমানন্দ, গৌরীদাস পণ্ডিত, রামচন্দ্র কবিরাজ, অনন্ত দাস, কানুরাম দাস, চন্দ্রশেখর আচার্য, পণ্ডিত জগদানন্দ—স্বয়ং শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বেঁচেছিলেন। নীলাচলে রামানন্দ রায়, স্বরূপ দামোদর (ইনি বৃন্দাবনে চলে যান বলে শোনা যায়), গদাধর প্রমুখরা ছিলেন। বৃন্দাবনে বসে যে সাধক মনীষীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর জীবৎকালেই গ্রন্থাদি লিখতে সুরু করেন। সনাতন ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে দেহ রক্ষা করেন। তিনি ও রূপ ষোলো শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমূহ বিন্যাস করেছেন। এঁদের পর এঁদেরই ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী ষোলো শতকের শেষে ও সতেরো শতকের প্রথমে বৃন্দাবনে বৈষ্ণব সমাজের নেতা ছিলেন। তিনিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে সুগ্রথিত ও সুগঠিত করে দিয়ে যান এবং তিনজন প্রতিভাবান তরুণ বৈষ্ণবকে সেই দর্শনে পাঠ দিয়ে বাংলায় তা প্রচারের ভার দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এই তিনজন হলেন শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ।

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীগণ বিগত হলে ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সকল সিদ্ধান্ত বৃন্দাবনে বসেই বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত কাব্যে সম্পুটিত করেন। মহাপ্রভুর লীলা সম্বরণের ৮১ বছর পর বৈষ্ণব সমাজের কাছে বেদতুল্য এই দার্শনিক চৈতন্যজীবনী লেখা হয়। কবিরাজ গোস্বামীর বয়স তখন ৮৮ বছর।

তারই চার বছর পর দে কার্তে একদিন মিলিটারি ব্যারাকে বসে—সামরিক কাজ সরিয়ে রেখে সারাদিন যাবত তাঁর দর্শনের মূল সূত্রগুলি লিখেছিলেন। তিনি তখন মাত্র তেইশ বছরের যুবা।

ঘটনা স্থল অতি দূরের—ভারতে ও ফ্রান্সে,—জাতি পরিচয়ও ভিন্ন। তবু ঘটনাসাদৃশ্য দেখে মনে হয় যে বয়োবৃদ্ধ যুগাচার্য প্রাচীন দর্শনের সারাৎসার সুগ্রথিত করে রেখে চলে যাচ্ছেন আর নবীন জিজ্ঞাসু নবতর মনোভঙ্গী ও প্রশ্ন নিয়ে ভিন্ন দিগন্তে উদিত হচ্ছেন—মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় সনাতনই নতুন যুগমূর্তিতে আবির্ভূত হচ্ছে।

দে-কার্তে বললেন, সত্য কী? যা কিছু সত্য ও নিশ্চিত বলে এতদিন জেনেছি তা সবই ইন্দ্রিয়জ্ঞানগোচর। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের প্রতারিত

করে। যা প্রতারিত করে তার ওপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও স্মৃতিনির্ভর জ্ঞান—এর মধ্যে গণিতের প্রমাণও পড়ে (দেকার্তে গণিতে মৌলিক অবদান রেখে গিয়েছেন, আধুনিক গণিতের আরম্ভ যে Analytial Geometry থেকে তা তাঁরই সৃষ্টি)—আমি এ দুইকেই অবিশ্বাস করেছি। আমি ধরে নিচ্ছি কোনো অসামান্য শক্তিশালী প্রতারক শয়তান আমাকে প্রতারণা করতে ফাঁদ পেতেছে। আমি যা কিছু দেখি সবই মায়া, সেই শয়তানের পাতা ফাঁদ মাত্র। আমার স্মৃতিতে যেসব বস্তু আছে সেসবের কখনো অস্তিত্ব ছিল না। আমি আরও ধরে নিচ্ছি যে আমার কোনো ইন্দ্রিয় নেই, দেহ, আকার (form), ব্যাপ্তি (extension) এসবই আমার মনের মায়াকল্পনা। তারপরও কী অবশিষ্ট থাকে? এমন একটা জিনিস অবশিষ্ট থাকে যার সম্পর্কে সন্দেহ চলে না। সে হল 'আমি'। আমি যদি না থাকতাম তবে ধূর্ততম শয়তানও আমাকে প্রতারণা করতে পারত না। আমি যখন ভেবেছি যে সবই মিথ্যা, যে "আমি" তা ভেবেছে সে আমি তো আছে! আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি—এটা এমন নীরেট সত্য যে কোনো সংশয়বাদীই এ সত্য উড়িয়ে দিতে পারে না। নির্দ্বিধায় আমার দর্শনের প্রথম সূত্র এই।

এই যে যুক্তি, I think, therefore I am, cogito ergo sum, এ দেকার্তের cogito নামে খ্যাত। যে পদ্ধতির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছেছেন সে পদ্ধতিকে বলা হয় Cartesian doubt—কার্তেসীয় সংশয়। সব বিষয়কেই সন্দেহ করা চলে কিন্তু যে চিন্তা করে তার অস্তিত্বকে সন্দেহ করা চলেনা। কেননা যে সন্দেহ করে তার নিশ্চয়ই অস্তিত্ব আছে—চিন্তাকার্য, সন্দেহকার্য নতুবা হয় কিভাবে? আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। এইই নিশ্চিত জ্ঞান।

আমার দেহ নেই, হাত নেই, পা নেই, ইন্দ্রিয় নেই—এসবই ভাবা যায়। কিন্তু চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন 'আমি-'কে ভাবা যায় না। দেহ, রূপ, ব্যাপ্তি এসব বাতিল করে দিলে যা থাকে তা চিন্তা। চিন্তা থাকলেই 'আমি' থাকে, চিন্তা না থাকলে 'আমি' থাকে না। আমি চিন্তা করি এটুকুই আমার সারাৎসার—আর সব, যথা দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি অবান্তর। দেহ না থাকলেও এই 'আমি' থাকে।

দেকার্তে জিজ্ঞাসা করছেন, কেন এই Cogito স্বতঃসিদ্ধ সত্য? কেননা

এ স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। কারও পক্ষেই চিন্তা করা ও সঙ্গে সঙ্গে না-থাকা অসম্ভব—এই সুস্পষ্ট জ্ঞান থেকেই এসেছে নিশ্চিতি। নিশ্চিত জ্ঞানের কষ্টিপাথর পেয়ে গেলেন দেকার্তে। সব কিছুর সত্যতা বিচার করতে হবে এই কষ্টিপাথরে যাচাই করে। যা আমি সুস্পষ্ট সত্য বলে স্বতঃই বুঝতে পারি, অনিবার্যভাবে যাকে আমার প্রজ্ঞা সত্য বলে গ্রহণ করে, তাই-ই সত্য। প্রসঙ্গত, 'চিন্তা করা' কথাটিকে খুব ব্যাপ্ত অর্থে নিয়েছেন দেকার্তে। সন্দেহ করা, বোঝা. ধারণা করা, স্বীকার ও অস্বীকার করা, সংকল্প, অনুভব ও কল্পনা করাও তাঁর মতে চিন্তা করা। চিন্তাই মনের সার, মন সতত‌ই চিন্তা করে—এমনকি গভীর ঘুমের সময়ও।

আমাদের মনে তিন রকম প্রত্যয় আছে—সহজাত, বাইরে থেকে পাওয়া আর নিজেদের সৃষ্টি। সহজাত প্রত্যয়ই মূল। এ প্রত্যয় ঈশ্বরের দান। ঈশ্বর পূর্ণ অনবদ্য পুরুষ রূপে প্রতীত হন। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ বলে তিনি পূর্ণ। তাঁর ত্রুটি নেই বলে তিনি অনবদ্য। অসীম, সর্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান তিনি। আমরা অপূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত, সসীম, অজ্ঞ, অল্প শক্তিমান। তাই ঈশ্বর-প্রত্যয় আমাদের সৃষ্ট নয়—অপূর্ণ যে সে পূর্ণতার প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারে না। সসীম অসীমতার প্রত্যয় স্ব-উদ্ভাবন করতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরই তাঁর প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারেন। পূর্ণতার সঙ্গে অপরিচিত আমরা পূর্ণতার প্রত্যয় গড়িনি। পূর্ণ পুরুষই এই প্রত্যয় আমাদের মনে স্থাপন করেছেন। আর কোনো পথে তা আসেনি। এই প্রত্যয় যে আমাদের মনে আছে তা থেকে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে! পূর্ণতাস্বরূপ substance বাস্তবে না থাকলে আমার মনে তাঁর প্রত্যয় দেখা দিত না। কেননা প্রত্যয়টি আমিও সৃষ্টি করিনি, বাহ্যবস্তুও (কেননা তা সসীম ও ক্ষণভঙ্গুর) সৃষ্টি করেনি। আমি সসীম substance, বস্তুও সসীম substance, আমার মনে substance-এর প্রত্যয় তাই আছে। ঈশ্বরপ্রত্যয় substance-এর প্রত্যয়ের সঙ্গে যোগ করেছে অসীমতার প্রত্যয়। অসীমের প্রত্যয় ইতিবাচক—নেতিবাচক নয়। আলোর অভাব অন্ধকার, অসীম তেমন কোনো কিছুর অভাববাচক নয়। বরং সসীমের তুলনায় অসীমের বাস্তবতা বেশি। তাই সসীমের প্রত্যয়ের আগেই অসীমের প্রত্যয়ের উদ্ভব হয়েছে।

ঈশ্বরের প্রত্যয় ইন্দ্রিয় পথে আসেনি। ইন্দ্রিয়ের ওপর বাহ্য বস্তুর ক্রিয়া থেকেই ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যয় আসে। এক্ষেত্রে তা হয়নি। ঈশ্বরপ্রত্যয় আমরা

সৃষ্টি করিনি, এমনকি এতে কিছু আমরা যোগও করিনি, বিয়োগও করিনি। তাই ঈশ্বরপ্রত্যয় সহজাত।

প্রত্যয়ের উৎস ঈশ্বরের অস্তিত্ব। তিনি পূর্ণ বলেই আমাদের মধ্যে পূর্ণতার ধারণা এসেছে, তারই আলোয় নিজেদের ও বস্তুসমূহকে অপূর্ণ বলে বুঝি। আর কোনো প্রত্যয় অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবী দ্যোতক নয়, যথা আকাশ-কুসুম প্রত্যয় আছে, অস্তিত্ব নেই। একমাত্র ঈশ্বরপ্রত্যয় ও ঈশ্বর-অস্তিত্ব অবিচ্ছেদ্য ও অবশ্যম্ভাবী সম্পর্কবদ্ধ। পূর্ণতম সত্তার প্রত্যয়ের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব আছে। আমরা ভাবি না ভাবি ঈশ্বর আছেন। আমাদের কল্পনা-নির্ভর তিনি নন।

কাল অগণিত মুহূর্তের পপম্পরা মাত্র—কিন্তু এক মুহূর্ত আর এক মুহূর্তের হেতু নয়। গত মুহূর্তে আমি ছিলাম, সেই অস্তিত্ব আমার বর্তমান মুহূর্তের অস্তিত্বের হেতু নয়। মুহূর্তপরম্পরায় বিস্তৃত আমার অস্তিত্বপরম্পরা। তাহলে এক মুহূর্তে আমি মরে পরমুহূর্তে আমি বেঁচে উঠছি কি? না। আমার চৈতন্য এক অখণ্ড সত্তায় বিধৃত। সেই চৈতন্যই "আমি"। সে মরে না। সে সৎ। সেই চিন্তা করে। চিন্তাস্বরূপই চৈতন্যস্বরূপ তথা সৎস্বরূপ। কাল মরে—আমার মৃত্যু নেই।

আমি সৎ কেননা ঈশ্বর সৎ। যিনি সৎ তিনি সত্য। সত্যস্বরূপ প্রতারক হতে পারেন না। তিনি আমাদের প্রতারণা করেন না। তিনি চেতনার স্বাভাবিক আলো আমাদের দিয়েছেন। তা থেকেই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ভাব-সমূহের উদয়। চৈতন্যই জ্ঞানের নিশ্চিন্ত ও নির্ভরযোগ্য উৎস। জ্ঞানের এই নিশ্চিত ভিত্তি না থাকলে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মকানুন এমনকি নিজের অতীতও জানতে পারত না—একমাত্র বর্তমান মুহূর্তটুকুই গোচর হত। স্মৃতি ও যুক্তি হয়ে যেত অচল। নিরীশ্বরবাদীও খুঁজে পেত না ঈশ্বরকে অস্বীকার করার যুক্তি—তার যুক্তি দাঁড়াবার মাটি পেত না। ঈশ্বর আমাদের যুক্তি দিয়েছেন, তবু আমরা ভুল করি কেন? কামনা, সংস্কার, আবেগ ও অমার্জিত চিন্তা আমাদের যুক্তিকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করে। দোষ আমাদের। ঈশ্বর প্রতারক নন। আমরাই আত্মপ্রতারক।

বিশ্বে তিনরকম সৎবস্তু বা substance আছে। "দর্শনের সূত্র" গ্রন্থে দেকার্তে বলছেন substance হল an existent thing which requires nothing but itself in order to exist. যার অস্তিত্বের জন্য কোনো

কিছুর দরকার হয় না, নিজেই নিজের অস্তিত্ব বিধান করে তাই-ই সৎ বস্তু। অসীম সৎবস্তু রূপে ঈশ্বর নিজেই তাঁর অস্তিত্বের কারণ। ঈশ্বরের অনুমোদনের ফলে আর দুটি সৎ বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে—মন ও পদার্থ। এদের অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের সহযোগিতা ভিন্ন আর কিছুর প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরই এদের স্রষ্টা, এদের অস্তিত্বের জন্য এরা ঈশ্বরের ওপরই নির্ভরশীল। তিনি এদের ওপর নির্ভরশীল নন।

মনের স্বধর্ম চিন্তা, পদার্থের স্বধর্ম ব্যাপ্তি। এরা একসঙ্গেই থাকে, দেহেই মন থাকে, দুইই ঈশ্বরসৃষ্ট—কিন্তু আপন আপন স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে দেহ ও মন পৃথকই থাকে। উভয়েই স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। তবে এদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক আছে। মন দেহকে ও দেহ মনকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। ঈশ্বরের বিধান দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হলেও পদার্থের স্বাধীনতা নেই, মনের স্বাধীনতা আছে। মানুষ স্বাধীন।

পোপ দেকার্তের রচনাবলীকে নিষিদ্ধ গ্রন্থতালিকাভুক্ত করেছিলেন (১৬৬৩ খ্রীঃ)—তার হেতু খ্রীস্টধর্মকে নাড়া দিয়েছিল দেকার্তের দর্শন। কিন্তু আমরা স্পষ্টই বুঝি যে ভারতে অনুশীলিত দার্শনিক প্রত্যয়ের সঙ্গে দেকার্তের সিদ্ধান্তের মিল অনেক, বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রতিফলন যেন ঘটেছে সে সিদ্ধান্তে। এই সাদৃশ্য আছে বলেই আমি সতেরো শতকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সমাপ্তি ও দেকার্তের অভ্যুদয়ের কাল-সন্নিহিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। ভাবের বীজ কোথায় গিয়ে পড়ে কে জানে? তাছাড়া ভাব তো দেশবিশেষের ও যুগবিশেষেরও সম্পত্তি নয়—যে ভাবে সত্য নিহিত থাকে বিশ্বজনীনতাই তার লক্ষণ।

দেকার্ত মানুষকে চৈতন্যস্বরূপ বলে চিহ্নিত করেছেন। তার অস্তিত্বেরও উৎসমূল তার চৈতন্যস্বরূপতা। ঈশ্বরই পরম চৈতন্য, যেন জ্বলন্ত জ্বলন, আর মানুষ তারই স্ফুলিঙ্গ। মানুষ চিৎ কণ। স্ফুলিঙ্গই অগ্নিকুণ্ডের ওপর নির্ভরশীল, অগ্নিকুণ্ড কখনো স্ফুলিঙ্গের ওপর নির্ভরশীল হয় না। পদার্থ বা জড়ও ঈশ্বরজাত। পদার্থ বা জড়ও সৎ। মহাপ্রভু বলেছিলেন, জড় ঈশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি, জীবন তটস্থা শক্তি—অর্থাৎ মানুষ জড় নয়, চৈতন্যস্বরূপ কিন্তু জড়যুক্ত। তট যেমন জল ও ডাঙ্গার মাঝামাঝি, মানুষও ঈশ্বর ও জড়ের মাঝামাঝি; সে স্বরূপে ঈশ্বরসত্তা কিন্তু জড়সত্তাস্পৃষ্টও। আধুনিক দর্শনের

প্রবর্তক দেকার্তে পৃথিবীর আর এক প্রান্ত থেকে তৎকালে ভারতের সর্বশেষ-উচ্চারিত দর্শনের বাণীকে গ্রহণ করেছিলেন। ইয়োরোপ আধুনিক যে বিশ্ববীক্ষা আনল তা অভিনব বটে, কিন্তু ভারতে উপলব্ধ সত্যের ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়েই সে অভিনবকে গ্রহণ করতে বাধা ঠেকে না। খ্রীস্টধর্ম আঘাত পেতে পারে, পোপও ভয় পেতে পারেন, কিন্তু সত্য জিজ্ঞাসা ও সত্য বাণীকে ভয় পাবার মতো কোনো দুর্বলতার প্রশ্রয় তো আমাদের ধর্মে ও দর্শনে ছিল না!

মানুষ চৈতন্যস্বরূপ, তাই সৎ—চিৎ ও সৎ যুগপৎ ভাবেই থাকে। পরম সৎ ও পরম চিৎই ঈশ্বরে-মানুষে যেখানে মেশামেশি হয়ে যায় তেমন মনুষ্য-রূপ দেকার্তে ভাবেন নি, বাংলার কবি তাও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এমন একজন জীবন্ত জাগ্রত মানুষকে স্বচক্ষে দেখেই কবি কর্ণপুর তাঁর মহাকাব্যের প্রথম পংক্তিতেই বলেছিলেন: সচ্চিদানন্দসান্দ্রো সে পুরুষ তো আমাদেরই মাঝে আছেন। শুধু আছেন না, নাচেন। শুধু নাচেন না, তাঁর নৃত্যের উল্লাস তিন লোকে উপচে পড়ে। এবং ঐভাবে উল্লাস উপচে দেওয়াও তাঁর করুণা:

> স্বীয়ৈর্লীলাবিলসিত রসৈঃ পাদসেবাবিলাসৈ-
> র্লাস্যোল্লাসৈর্যদয়মমকরোৎ পূর্ণপূর্ণাং ত্রিলোকীম্।
> মন্যে ভূয়স্তদিহ করুণা সৈব নিত্যং নবীনা
> ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণমতুতরাং তামিমাং জীবলোকঃ॥
>
> —কবিকর্ণপুরঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম। ১ম সর্গ।

দেকার্তে এতদূর কল্পনা করতে পারেননি; তিনি ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ বুঝতেন, রসরূপ বোঝেননি। রসো বৈ সঃ—এতটা পাশ্চাত্যে জানা হয়নি। তাঁর উল্লাসও যে তাঁর করুণাই—উপলব্ধির সে উত্তুঙ্গ শিখরে পশ্চিমী মানুষের পৌঁছতে এখনো বাকি! তবু কবি যখন সেই দিব্যকরুণাকে বারবার প্রণাম করতে জীবলোককে আহ্বান করলেন তখন পশ্চিমী মনও যে দ্বিধা করবে তা তো মনে হয় না। কারণ দেকার্তেও কৃপায় বিশ্বাসী। তাঁরই উক্তি এই যে সেখানে দেকার্তীয় সংশয়ও খাটে না।

ফরাসী দেকার্তের হল্যাণ্ডীয় শিষ্য বারুক স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) দেকার্তের দর্শনকে অদ্বৈতবাদের দিকে নিয়ে যান। তিনি ইহুদী কিন্তু ইহুদী সংঘ তাঁর দার্শনিক মতের জন্য তাঁকে স্বধর্ম থেকে বহিষ্কৃত করে এই ভীষণ অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করেছিল: দিনে সে অভিশপ্ত হোক, রাতে সে

অভিশপ্ত হোক, শয়নে-জাগরণে, ঘরে বাইরে সে অভিশপ্ত হোক, ঈশ্বর যেন কখনো তাকে ক্ষমা না করেন, কখনো তাকে গ্রহণ না করেন, ঈশ্বরের ক্রোধ ও বিদ্বেষ যেন এই লোকটিকে দগ্ধ করে।

কেন এই অসহনীয় ঘৃণা স্পিনোজার প্রতি? কারণ ইহুদী ধর্মে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের স্থান নেই, ঈশ্বর শুধু ভয়ের পাত্র; কঠোর শাস্তিদাতা। স্পিনোজা বলেছিলেন, ঈশ্বরকে ভালোবাসাই পরম মঙ্গলকর—আর সব সুখ ও শুভই অস্থায়ী। স্পিনোজার মতে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু অর্থাৎ অসৎ, নেই। দেকার্তের দেওয়া substance-এর সংজ্ঞা স্বীকার করেই তিনি বলছেন যে substance (এটা মধ্যযুগীয় পারিভাষিক শব্দ। বর্তমানে একেই reality বলে) তিনরকম নয়। একটিই substance আছে, তাই-ই ঈশ্বর। যার অস্তিত্ব অপর কিছুর ওপর নির্ভর করে না, তাই-ই সৎ—এবং তা অসীম। সসীম বস্তু মাত্রই—তা মনই হোক আর পদার্থই হোক বা আত্মাই হোক অপরের ওপর নির্ভরশীল। সসীম বস্তু বিশেষিত হয় সীমা দ্বারা; অর্থাৎ সীমার বাইরে তা নেই। all determination is negation—বিশেষীকৃত হলেই নাস্তিকৃত হয়ে যায়। একমাত্র একটিই সত্তা আছে যা অস্তিমূলক এবং তিনি সম্পূর্ণতই অসীম অনন্ত। সেই সত্তা স্বয়ম্ভূ—তার স্বরূপই সত্তা। চিন্তা ও ব্যাপ্তি মন ও পদার্থের ধর্ম বটে কিন্তু তা ঈশ্বরেরই গুণ—এমন অনন্ত গুণ তাঁর আছে। তিনি অনন্ত বলেই আমাদের সীমিত মনের নাগালের বাইরে। তাই তাঁকে বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। ব্যক্তির আত্মা বা পদার্থখণ্ডসমূহ দিব্য সত্তারই বিভাব—তারা পৃথক things নয়। স্পিনোজা কালের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁর মতে কাল মায়া মাত্র। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এভাবে ভাগ করে ইতিহাসকে দেখা ভুল—সবই সত্য বর্তমান। ঈশ্বর কালাধীশ, সন তারিখ অবান্তর তাঁর কাছে। দুর্ঘটনা ও শুভ ঘটনা, উন্নতি ও অবনতি খণ্ড কালদৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয়—সমগ্র কালবোধে পৌঁছলে দেখি সবই তাঁর ইচ্ছা। ভালো মন্দ মানুষের খণ্ড দৃষ্টিতে; ঈশ্বরের অখণ্ড দৃষ্টিতে অশুভ নেই। জ্ঞানী ব্যক্তি ঈশ্বরের চোখে জগৎকে দেখেন, sub specie aeternitatis—শাশ্বতের বিভাব রূপে।

সেভাবে দেখতে শিখলে পদার্থের বা মনের স্বাধীন ইচ্ছা থাকা সম্ভব নয়—যা কিছু ঘটে সবই ঈশ্বরের দুর্জ্ঞেয় স্বভাবের প্রকাশ; তাই যা ঘটে তাই-ই ঘটে, অন্যভাবে ঘটত না, ঘটানো যেত না। বিপ্লবীরা, সমাজসংস্কারকরা

মূঢ় চিত্ত; তারা ভাবে তারাই জগৎ ব্যাপারটায় পরিবর্তন আনে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাই পরিবর্তন রূপে ফুটে ওঠে। সব যদি তাঁর ইচ্ছা তবে জগতে পাপ কেন, অন্যায় কেন, নিষ্ঠুরতা কেন? ওগুলি খণ্ড দৃষ্টিতে লব্ধ প্রতীতি, ঈশ্বরের সমগ্রতায় পাপ নেই। তাই-ই ভালো যা ইতিবাচক; তাই-ই মন্দ যাতে নেতিবাচকতা রয়েছে। কিন্তু নেতিবাচকতা থাকতে পারে শুধু মানুষের দৃষ্টিতে ও কাজে। ঈশ্বরে negation নেই, তাই আমাদের কাছে যা পাপ, অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা মনে হয় সমগ্রতার অংশরূপে দেখলে তা অমন মনে হয় না।

স্পিনোজা মনে করেন মানুষের মন ঈশ্বরকে জানার উপযুক্ত কারণ ঈশ্বরই মন রূপে আছেন। মন তাঁরই। জ্ঞান চার রকম: শ্রুতজ্ঞান, অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞান, অনুমানজাত জ্ঞান এবং বস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি। এই শেষোক্তটিই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। তাই সত্য প্রত্যয়ের কোনো বাহ্য প্রমাণের দরকার নেই। সত্য প্রত্যয়ের লক্ষণ স্পষ্টতা, বিশিষ্টতা, ঔজ্জ্বল্য ও সুনির্দিষ্টতা। দেকার্তের মতও তাই। মানুষ সত্য জ্ঞান থেকে ভ্রষ্ট হয় অবিদ্যার দরুণ, অবিদ্যা বা অজ্ঞান না থাকলে যাকে দুর্ভাগ্য বলি তাও মধুর। একথা বলার অধিকার স্পিনোজার ছিল কেননা সারা জীবন তিনি দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছিলেন। তিনি ঘাতকের হাতে পড়েছেন, ক্রুদ্ধ উন্মত্ত জনতার মুখে পড়েছেন, প্রলোভনের মুখে পড়েছেন, সর্বদাই অকুতোভয় অনিন্দ্যনীয় তাঁর আচরণ। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাই বলেন: Spinoza is the noblest and most lovable of the great philosophers সামান্য কাচ পালিসের ক্ষুদ্র পেশায় কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি; হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার পদ ও ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের বৃত্তিদানের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এমনকি পৈতৃক সম্পত্তিও; মাত্র তেতাল্লিশ বছরে যক্ষ্মারোগে তিনি মারা যান। তিনিই বলে যান, মনের মহত্তম সিদ্ধি ও মঙ্গল ঈশ্বরজ্ঞান লাভ। সে জ্ঞান হলে বোঝা যায় যে জগতে অশুভ নেই—অশুভের ধারণা অজ্ঞানের লক্ষণ। ভগবান অশুভ জানেন না—কেননা সমগ্রতা থেকে ছিন্ন হলেই অশুভের প্রতীতি জন্মে; অন্যথা নয়। তাই "the knowledge of evil is an inadequate knowledge"। তাই যাই ঘটুক জীবনে মনের প্রশান্তিতে তা মেনে নিতে হয়। আমরা বিশ্বের অংশ।

বিশ্বের ছন্দ মেনে চলব আমরা। তা না চলাটাই বন্ধন—মোহ বন্ধন। যে সমগ্রের reality জানে সে মুক্তপুরুষ হয়ে যায়।

আবেগ মন্দ নয়, কিন্তু passion মন্দ। আমাদের আবেগ যখন বাইরের বস্তু, ঘটনা বা মানুষ দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন তাকে বলে প্যাশন—আসক্তি। আবেগ নিয়ে যায় ঈশ্বরপ্রেমে ; আসক্তি করে তোলে আমাদের ঈশ্বরবিমুখ। ঈশ্বরপ্রেম আত্মবিৎ করে আমাদের। তখন চিন্তা ও আবেগ যুক্ত হয়ে যায়—জ্ঞান ও ভক্তি এসে একত্রে মেলে। সত্যকে জানাই আনন্দ। এতে নেতিবাচক কিছু নেই। ঈশ্বরপ্রেম হল "a part of the infinite love wherewith God loves himself." দিব্যপ্রেমের উল্লাস আনন্দকেও ছাপিয়ে যায়। ঈশ্বরপ্রেমে দেহমনের সব অংশ ব্যাকুলিত হয়—গোটা সত্তাই স্ফুরিত-কদম্ব (অর্থাৎ কদম্ব ফুলের মতো স্ফুরিত) হয়—কেননা আসলে মানবতনু দিব্যতনুই বটে। সব ঈশ্বরময় দেখাই ঈশ্বরপ্রেম—when all objects are referred to God, the idea of God will fully occupy the mind.

ঈশ্বরকে ঘৃণা করা যায় না—বরং ঈশ্বরপ্রেম অহৈতুকী নিষ্কাম প্রেমে নিয়ে যায়। ভগবান আমাকে ভালোবাসেন কিনা সে খোঁজে আর আমার দরকার থাকে না, স্পৃহাও না। ঈশ্বর নির্বিকার—তাঁতে বিকার এলে তিনি ঈশ্বর থাকেন না ; তাই আমার ভালোবাসা তাঁতে উদ্বেলতা রূপ বিকার আনুক এ কোন ভক্ত চাইবে ? ঈশ্বর আত্মপ্রেমিক—আর আমরা সবাই তাঁর আত্মই ; তিনিই। তিনি আমাদের পৃথক ও খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপে জানেন না ; জানেন সবটাই সমগ্র—আর সমগ্রই তিনি। তাই ব্যক্তির খণ্ডরূপ ও তাতে আলোড়ন-বিলোড়ন ঈশ্বর সত্তায় বিকার আনে না।

মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব থাকে না সত্য বটে ; কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমিকের ভাবতনু শাশ্বত বর্তমান থাকে ঈশ্বরমানসে। প্রেমের মৃত্যু নেই। ব্যাপ্তিগুণযুক্ত সৎ—Res Extenso (অর্থাৎ জড় পদার্থ) ও চিন্তাগুণযুক্ত সৎ—Res Cogitans (অর্থাৎ মানুষ)—পরম সতের দুই বিভাব মাত্র—অতএব স্বরূপে অনশ্বর তারা।

স্পিনোজার দর্শন ইয়োরোপীয় দর্শনকে প্রভাবিত করেছে বটেই, বিশেষত প্রভাবিত করেছিল রোমান্টিক আন্দোলনকে। তাঁর অদ্বৈতবাদ—ঈশ্বর-জীব-জগৎ-অভেদবাদ—ফিকটে, শেলিং ও হেগেলকে অতএব পরোক্ষে মার্ক্সকেও

প্রভাবিত করেছে; গ্যয়টে তাঁকে গুরু মানতেন; কোলরিজ, ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলি আলো পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল স্পিনোজার মতকে মিস্টিক মতের সমগোত্রীয় বললেও স্পিনোজা intellectual love of God বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ওপরই জোর দিয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ওপর তাঁর ঈশ্বরভাবনা দাঁড় করিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে ঈশ্বর mathematical necessity ও scientific law. স্পিনোজা ছিলেন একজন গণিতবিদ ও যুক্তি-আশ্রয়ী। তবু এই প্রাকৃতিক আইনকানুনের ভিত্তিস্বরূপ ঈশ্বরের ধ্যানেই স্পিনোজা সংক্ষুব্ধ জীবন-পরিবেশেও পেয়েছিলেন অন্তরের অক্ষুব্ধ শান্তি; তাই নোভালিস তাঁকে ঈশ্বর-উন্মাদ মানুষ রূপে অভিহিত করেছিলেন। কার্তেসীয় সংশয় তিনিও প্রয়োগ করেছিলেন এবং দেকার্তের মতোই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জগতের কোনো কিছু সম্পর্কেই নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব নয়—একমাত্র ঈশ্বরজ্ঞানই জ্ঞান, কেননা সে জ্ঞান বোধিলব্ধ। ঈশ্বর-জ্ঞানের আলোয় আর সব কিছুকে আমরা জানতে চেষ্টা করতে পারি মাত্র। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেননি, তিনিই জগৎ ও জীব হয়েছেন—তিনিই পদার্থ, তিনিই মন। তাঁর বাইরে কিছু নেই বলেই অপর কিছুই তাঁকে সীমিত করে না এবং ক্ষোভিতও করে না। তাঁর বাইরে কিছু নেই বলেই তাঁর অপ্রাপ্য কিছু নেই, তাই তিনি অকাম। তাই তাঁর কোনো উদ্দেশ্য নেই, পরিকল্পনা নেই, মতলব নেই, সংকল্পও নেই। আমরা যুক্তি হাতড়াই, কেননা অজ্ঞাতকে জানতে চাই আমরা; তিনি সবই জানেন বলে তাঁর যুক্তির দরকার নেই। শিব ও সুন্দর আমাদেরই কল্পনা; তিনি সমগ্র বলে শিব-অশিব, সুন্দর-অসুন্দর তাঁতে নেই। তিনি এক ও অপরিবর্তনীয় আবার Natura naturans—বহু ও পরিবর্তনশীল হন। তিনিই জড় ও মন বলে প্রতিটি বস্তুর দুটি বিভাগ আছে—একই সঙ্গে তা দেহযুক্ত (ব্যাপ্তি আছে) ও মনযুক্ত (চিন্তা আছে) আমার মন হল আমার দেহের ভাব (idea); আমার দেহ হল আমার মনের বস্তুরূপ! গভীরে বা স্বরূপে তারা একই বস্তু। পদার্থের গঠন যত কম জটিল, মনও তত কম বিকশিত; পক্ষান্তরে মনোচেতনা যত বিকশিত দেহও তত জটিল। উদ্ভিদ থেকে মানুষ পর্যন্ত এইই বিবর্তন-সূত্র।

স্পিনোজার দর্শন আমাদের কাছে নতুন কিছু ঠেকে না, তাঁর সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্ত—অধিকতর যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের সাধক-

দার্শনিকরা প্রচার করেছিলেন। যা নতুন ও যুগলক্ষণ তা এই যে জগৎ ও জীবনকে ঈশ্বরতত্ত্বে সাঙ্গীকৃত করার চেষ্টা—সে চেষ্টাও জীব গোস্বামীর মতো সূক্ষ্ম যুক্তি দ্বারা মহিমান্বিত নয়। স্পিনোজা জ্যামিতিক ও গাণিতিক পরিভাষা ও মডেল ব্যবহার করলেও তাঁর চিন্তায় অস্বচ্ছতা ছিল; প্রকাশে আরও। তাই তাঁর রচনা দুরূহ, টীকা ভাষ্যকাররাও হিমসিম খেয়েছেন। তবু আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে ঈশ্বরভাবনায় অঙ্গীকৃত করে নেবার লক্ষণটাই আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক—রামকৃষ্ণ বারবার বিজ্ঞানের কথা বলেছেন। বলেছেন, বিজ্ঞানী হও। জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে বিজ্ঞান।

রামকৃষ্ণের আগে পর্যন্ত ভারতে ও বিশ্বে ঈশ্বর সাধনা ছিল জ্ঞানলাভের সাধনা। সে জ্ঞান প্রাকৃতিক জ্ঞান নয়, তত্ত্বজ্ঞান। জাগতিক জ্ঞানের স্পর্শ ছিল না ঈশ্বরজ্ঞানে, জাগতিক বিদ্যাকে বলা হত অবিদ্যা। ঈশ্বরজ্ঞানই বিদ্যা। যদিও উপনিষদ হুঁশিয়ার করেছিলেন যে যারা শুধু অবিদ্যার (পদার্থ জ্ঞান) অনুশীলন করে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে ও যারা শুধু বিদ্যার (তত্ত্বজ্ঞান) অনুশীলন করে তারা গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করে—তবু ঈশ্বরসাধকরা এ কথায় কান দেননি। তারই ফলে শঙ্কর কেবল-ব্রহ্মবাদের ওপর সম্পূর্ণ জোর দিয়েছিলেন, যেমন তাঁর আগে বুদ্ধদেব কেবল-নির্বাণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। উভয়ের কাছেই জগৎ মায়া ও অকাম্য, পরিহার্য—জন্মমরণচক্র থেকে চিরমুক্তিই একমাত্র সাধ্য।

ক্রমেই কিন্তু ঝোঁকটা বাড়ছিল মায়াবাদ থেকে সরে গিয়ে লীলাবাদের ওপর—সেই মতে জগৎ ও জীবন মায়া নয়, ঈশ্বরীয়; সাধ্যও নয় মুক্তি লাভ; ঈশ্বরে ভক্তি লাভই হল পরম সাধ্য। নিত্য কৃষ্ণ নিত্য জীব নিত্য ধাম—এই তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন শঙ্কর-পরবর্তী বৈষ্ণব সাধকরা; মহাপ্রভু-প্রচারিত দর্শনে এই লীলাবাদ ও অহৈতুকী ভক্তিবাদ পূর্ণতম বিকাশ লাভ করেছিল। তবু রামকৃষ্ণ তাতেই সন্তুষ্ট হননি। তাঁর সাধনলক্ষ্য ছিল আরও দূরবিসারী।

তা বুঝতেই আমরা আধুনিক বিশ্বমনীষার অভ্যুদয়-ধারা ও নবতর সত্যোপলব্ধির গূঢ় বার্তা অনুশীলনের প্রয়োজন অনুভব করেছি। সব কণ্ঠই ভগবানের কণ্ঠ, সব সত্য বাক্যই তাঁর বাক্য—তা ভারত থেকেই ধ্বনিত হোক আর বিশ্বের অপর কোনো প্রান্ত থেকেই উচ্চারিত হোক। বেদ থেকে মহাপ্রভু পর্যন্ত সত্যোপলব্ধির যত ধারা ছিল—এমনকি চার্বাক মত ও বৌদ্ধবাদও রামকৃষ্ণে স্বীকৃত; কিন্তু পরবর্তী কালের ধারাগুলিও তো বাদ দেননি তিনি।

সব সাধক ও দার্শনিকই পূর্ববর্তী আচার্যের মত খণ্ডন করে স্বীয় মত স্থাপন করেছেন—যথা বুদ্ধ বেদমত খণ্ডন করেছেন, শঙ্কর বুদ্ধমত; ভাস্কর শঙ্করমত; রামানুজ ভাস্করমত; মহাপ্রভু শঙ্করমত ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ কারও মত খণ্ডন করেননি। সমন্বয়াচার্য তিনি, সকল ভাব ও সত্যের সমন্বয় করেছেন। তাঁর মহতী বাণী—যত মত তত পথ।

এই সর্বগ্রহিষ্ণু ঔদার্যের আলোয়ই রামকৃষ্ণের মনকে বুঝতে হবে। দক্ষিণেশ্বরে সাধকের আসনে বসে কী তিনি চাইছিলেন? ঈশ্বরকে? স্বয়ং ঈশ্বর ঈশ্বরলাভের কোন সাধনা করবেন—কী প্রয়োজন তাঁর? বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই—জীবনের পারে মরণোত্তর মুক্তি বা আত্মার মুক্তিই নয়—সত্তার মুক্তি, চৈতন্যের মুক্তি ও আনন্দের মুক্তি, মুক্তি অর্থে সহজ অবাধতা—ছিল তাঁর সাধ্য—তাই-ই তাঁর লক্ষ্য। ঐ অখণ্ড জীবনের মুক্তি—অদ্বৈতের মুক্তি, দ্বৈতেরও মুক্তি; আলো ও অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বিদ্যা ও অবিদ্যা, চেতনা ও অচেতনা, ঈশ্বর ও জড়—সবের ন্যায্য স্বীকৃতি ও সার্থকতা, সকলের সুষম সমন্বয় ও এই সকলের পারে, খণ্ড-অখণ্ডের পারে, দ্বৈতাদ্বৈতের পারে এক পূর্ণতম সমগ্রতায় মানবজাতির উত্তরণ—এই ছিল রামকৃষ্ণের তপস্যার লক্ষ্য। এমন সাধনা জগতের ইতিহাসে আর কেউ কখনো করেননি।

তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ব্রহ্মবাদ ও বিজ্ঞানবাদ দুইই তাঁর সাধনায় স্থান পেয়েছে—আমিও সে কথা বোঝাতে শঙ্কর ও দেকার্তে, মহাপ্রভু ও কোপার্নিকাস, জীব গোস্বামী ও স্পিনোজার দর্শন পাশাপাশি আলোচনা করছি। এঁরা সবাই তুল্যমূল্য সেকথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই সত্যদ্রষ্টা—পূর্ণ অখণ্ড সত্যের আংশিক দ্রষ্টা। প্রত্যেকেই জীবনবোধের নতুনতর উচ্চারণ করেছেন এবং কোনো উচ্চারণই সর্বৈব মিথ্যা নয়। সমগ্রতাই রামকৃষ্ণ—বর্জন যাঁর বৈশিষ্ট্য নয়; সর্বস্বীকৃতি ও অভিনব উপলব্ধি এবং অভিনব নির্মাণ যাঁর অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার দান। সে প্রজ্ঞাও লৌকিকী নয়—দিব্য প্রজ্ঞা, দিব্য প্রতিভা তাঁর। আর সকলেই জ্ঞানী, তিনিই বিজ্ঞানী। "আমি সব লই, নিত্যও লই, লীলাও লই"—রামকৃষ্ণের উক্তি। নিত্য ও লীলার এই যুগপৎ গ্রহণে বিশ্বের সব ভাব ও সত্যোপলব্ধিকে গ্রহণ করা হয়। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের তপস্যা সেই বৈশ্বানর অগ্নি যা সর্বভুক, সর্বদাহনকারী, সর্বপরিপাককারী। পরিপাক শেষে যে অনবদ্য অখণ্ড বস্তু তিনি সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর তপস্যার ফল, তাঁর যজ্ঞচরু তা সর্ব মানবের অমৃত

ভোগ, অন্ন ও পরমান্ন দুইই। তাই তাঁর উক্তি: আমি রেঁধে ভাত বেড়ে রেখে গেলাম, তোরা সবাই আনন্দ করে খা। বলতেন: দুধ কেউ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। বেদ এই দুধের কথা শুনিয়েছিল, কৃষ্ণ তা স্বদেহে দেখিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ তা আমাদের পান করে তৃষ্ণা মেটাতে ও হৃষ্টপুষ্ট হতে বাটি ভরে সাজিয়ে রেখেছেন। সে দুধে সবার অধিকার রয়েছে —সকল মানুষের। কেননা সকল মানুষ আলোয়-অন্ধকারে সে অমৃতেরই অন্বেষণ করছে—তা কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে, কি প্রাচীন কালে কি এ যুগে। সকলের সব সৎ অন্বেষণ আপন সত্তায় ধারণ করে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের তপস্যা-ভূমিতে বসেছিলেন।

ইয়োরোপে রক্ষণশীল ইহুদী ও খ্রীস্টানরা—অর্থোডক্সরা—স্পিনোজাকে আক্রমণ করেছিল কারণ তিনি ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে এক বস্তু বলে প্রচার করেছেন, এতে নাকি ঈশ্বরের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। রামকৃষ্ণ বললেন: ঈশ্বরই সব হয়েছেন, তিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন (এটা সাংখ্যের পরিভাষা, এর অর্থ গোটা সৃষ্টিটাই), তিনিই এ জগৎ ও জীবসমূহ। স্পিনোজার সত্যোপলব্ধির যথার্থ স্বীকৃতি ইয়োরোপ দেয়নি, দিয়েছেন রামকৃষ্ণ। ঈশ্বর ও জগৎ এক? স্পিনোজা বলেন আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে একথা বলা শোভা পায় না, বলা ভুল; মন যখন বস্তুসমূহকে contingent না দেখে necessary দেখে, অর্থাৎ স্বরূপে দেখে তখনই ঈশ্বর ও জগৎ একাত্ম—নতুবা নয়। এবং শুদ্ধ মনের স্বভাবই হল বস্তুকে কালাতীত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা, স্বরূপে দেখা। কিন্তু আমাদের প্রাকৃত মন শুদ্ধ অবস্থায় নেই, আবর্জনায় আচ্ছন্ন হয়েছে সে মন, অবিদ্যার আবর্জনা। অবিদ্যা সরে গেলেই শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মার প্রকাশ হবে—রামকৃষ্ণ বলেন, এ তিনই এক। শুদ্ধ মন সত্য দেখে, সমগ্র দেখে; খণ্ডছিন্ন করে দেখে না realityকে—তাই দেখে যে সব অস্তিত্বই পরম সৎ—নিত্যবস্তু। মন্দিরের কোশাকুশি, ফুল, মায় দেয়াল পর্যন্ত সবই চিন্ময় দেখেছিলেন রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে বসে। "জগৎ যেন তাঁতে জরে রয়েছে"—তিনি দেখেছিলেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো সরব দাম্ভিক বস্তুবাদী স্বীকার করেছেন যে স্পিনোজার দর্শন "is a blueprint for the future elaboration of a corpus of unified science, one of the outstanding mounments of world philosophy" (Wisdom of the West). বিজ্ঞানের ঐক্য

ও সংহতি স্পিনোজার দর্শনের ভিত্তিতেই সম্ভব—তাই আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়েছিলেন স্পিনোজার ঈশ্বর-কল্পনায়। তিনি বলেছিলেন, যে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাসবান তা স্পিনোজার ঈশ্বর এবং তাঁর শেষ জীবনের অক্লান্ত সাধনা ব্যয়িত হয়েছিল যে Unified Field Theory-র প্রতিষ্ঠাকল্পে, যাতে বিশ্বের সব শক্তি এক মূলীভূত শক্তিরই প্রকাশ বলে প্রমাণিত হবে, তার মূলে প্রেরণা এসেছিল স্পিনোজার অদ্বৈতবাদ থেকে। রামকৃষ্ণের দিব্য প্রতিভায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এই সব জ্ঞানই সমন্বিত হয়েছে; সেই সমন্বয়ের সাধনাই ছিল তাঁর তপস্যার একটি মুখ্য লক্ষণ।

অতি দূর প্রান্তে বসে সমন্বয়ের দার্শনিক প্রয়াস করেছিলেন লাইপজিগের ডঃ গটফ্রিড উইহেলম লাইবিনিৎজ (১৬৪৬-১৭১৬)—যিনি সমকালের তাত্ত্বিকদের ভয়ে তাঁর গভীর চিন্তাগুলি প্রকাশ করেননি; তাঁর মৃত্যুর দুশো বছর পর, বর্তমান শতকের গোড়ায়, তাঁর শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপিগুলি বেরোতে সুরু করে। ফলে লাইবিনিৎসের পূর্বেকার ভাবমূর্তি খসে পড়েছে, এখন উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর এক নতুন মূর্তি! তিনি বলেছিলেন, পদার্থ ও গতি আসলে শক্তিরই প্রকাশ; দেশ ও কাল পদার্থ ও গতি-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ ব্যাপার নয়; দেশ ও কাল একান্তভাবে সম্পর্কিত; অতএব শক্তিই মৌল reality. আমাদের আন্তর অভিজ্ঞতায়ও শক্তিকেই বিশেষভাবে জানি আমরা কেননা শক্তি মনোচৈতন্যময়। বিশ্ব যে শক্তির প্রকাশমূর্তি সে শক্তি চেতনাময়ী শক্তি, চৈতন্যস্বরূপ শক্তি। এই শক্তি অগণিত কেন্দ্রে স্ফুরিত, সব কেন্দ্রই চৈতন্যময়। কেন্দ্রগুলি অণুসদৃশ তাই তাদের বলি চিদণু—monad. বিশ্ব এক, রিয়ালিটিও এক—কিন্তু চিদণু অগণিত বলে এবং তারা প্রত্যেকে চৈতন্য-কণা বলে লাইবিনিৎস ultimate realities-এর কথা বলেছেন, অর্থাৎ স্পিনোজার অদ্বৈতবাদের বিপরীতে তিনি বহুবাদ স্থাপন করেছেন। চিদণু বা monad চৈতন্যের সরলতম কেন্দ্র। ব্যাপ্তি পদার্থ বা জড়ের গুণ একথা দেকার্তে ও স্পিনোজা বলেছিলেন। লাইবিনিৎস বললেন চিদণুতে ব্যাপ্তি নেই, অতএব তা পদার্থ নয়, তা অনশ্বর, অমর। অবশ্য পরম মোনাড ঈশ্বর এই অগণিত মোনাডের স্রষ্টা; তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো মোনাডকে ধ্বংস করতে পারেন। ঈশ্বরও মোনাড বটে কিন্তু তিনি পরম ও আদি; তিনিই সৃষ্টিমূল; অতএব অপরাপর মোনাডের সঙ্গে তাঁর ধর্মগত ও গুণগত পার্থক্য এতই যে মোনাডের আলোচনায় তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। যেমন

ঈশ্বর ও জীব চৈতন্যস্বভাবে এক হলেও তাঁদের মধ্যে ধর্মগত ও গুণগত পার্থক্য এত যে তাঁদের তুলনা হয় না।

প্রতিটি মোনাডই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যবান; একের সঙ্গে অপরের গুণগত মিল নেই। যদি দুটি মোনাড সম্পূর্ণ একরকম হত তবে তো তারা একই হয়ে যেত। কোনো দুটি জিনিসই—গাছের দুটি পাতাও—ঠিক একরকম নয়। তবে দুটি মোনাডের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য নেই, অর্থাৎ কেউ বড় কেউ ছোট নয়—কারণ মোনাড তো চিদণু বা আত্মা। প্রতি আত্মার স্বাতন্ত্র্য আছে—প্রতি আত্মা বা মোনাডই বিশ্বকে নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিবিম্বিত করে। যেমন একটি নগরকে নানা দিক থেকে দেখা যায়—প্রতিদিকের দেখাই সত্য, অথচ প্রতি দিকের দেখাই স্বতন্ত্র। মোনাডের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে—সে পরিবর্তন আভ্যন্তরীণ। প্রতি মোনাড চেষ্টা করে পরম সত্যকে স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর ও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর রূপে প্রত্যক্ষ করতে। প্রতি উচ্চতর perception-এর সঙ্গে আসে আনন্দ। আনন্দ কাকে বলে? ক্রমোর্ধ উৎকর্ষের চেতনাই আনন্দ। উৎকর্ষের বিপরীত দিকে গতি হল দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনা। দুঃখ হল অধঃগমনশীল নিকৃষ্টতার চেতনা।

জড় পদার্থে নিহিত মোনাড গুণবিকাশে নিম্নতর স্তরে রয়েছে—জ্ঞান, স্মৃতি বা চিন্তাশক্তি যেন লুপ্ত তাতে। আসলে কিছুই লুপ্ত নয়, থাকে সব সুপ্তাকারে। একটি মোনাড তার বর্তমান অবস্থায় এসেছে অতীত থেকে বিকাশ-পর্যায়ে; ভবিষ্যৎও তাতেই নিহিত। প্রাণীদেহে সব মোনাডগুলি পুঞ্জিত হয় একটি আত্মা-মোনাড (ame) কে কেন্দ্র করে। প্রাণী আত্মা-চালিত তাই তার আচরণ যান্ত্রিক হয় না, যান্ত্রিক ব্যাখার সাহায্যে প্রাণীর আচরণ ব্যাখ্যা করা যায় না, যেমন দেকার্তে করতে চেয়েছিলেন।

মানুষের মধ্যে এই মোনাড অতিরিক্ত যা পেয়েছে তা হল মনোচৈতন্য (spirit বা espirit)। এই স্পিরিট এতদূর চিন্তাক্ষম যে আত্মস্বরূপ ও ঈশ্বরস্বরূপকে সে জানতে চায়। জানতে কিন্তু সে বাধা পায়, কেননা সমগ্র ও অখণ্ডকে প্রত্যক্ষ করার বদলে সে খণ্ড বা ছিন্নবিচ্ছিন্নকেই দেখে, শোনে ইত্যাদি। যেমন সমুদ্রতীরে প্রতিটি ঢেউয়ের পৃথক পৃথক ধ্বনি তার কাণে আসে—অখণ্ড সমুদ্রসত্তার ধ্বনি নয়। এত অগণিত ঢেউয়ের পৃথক পৃথক ধ্বনি তার শ্রবণশক্তি তথা মনকে বিভ্রান্ত করে, অখণ্ডবোধে নিয়ে যায় না। এই লক্ষ লক্ষ ধ্বনি আসলে nothing হয়ে দাঁড়ায়। এই petites perceptions

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষতা বিভ্রান্তিকর। এবং মনের তলে তলে, অবচেতনে ও অচেতনে এইসব petites perceptions পুঞ্জ পুঞ্জ দাগ বা অভিজ্ঞতা-কণা সঞ্চয় করে যায়। চেতন মন সে সবের খবর রাখে না।

পরম মোনাড বা পরমাত্মাই ঈশ্বর। একমাত্র তিনিই স্বতঃসিদ্ধ, অসৃষ্ট। তিনি আর সব মোনাডের স্রষ্টা। পরমাত্মার বা ঈশ্বরের দেহ-দেহী ভেদ নেই —তাঁর আত্মাই তাঁর দেহ। তাঁর দেহ পদার্থগঠিত নয়, অপর কোনো মোনাডের সাহায্যেও গঠিত নয়। শাশ্বত শিব সুন্দর তিনি। যা আছে আর যা হবে সবেরই উৎসমূল তিনি। তিনি অদ্বৈত বা মূল সরল substance বা reality—তাঁরই সৃজনেচ্ছায় তাঁ থেকেই স্ফুরিত হয়েছে এই অগণিত মোনাড বা আত্মাসমূহ। সূর্য থেকে যেমন কিরণরাশি বিনির্গত হয়, ঈশ্বর থেকে তেমনই অসংখ্য আত্মা বেরিয়েছে ক্রমাগত fulgurations-এর দ্বারা। কিরণমালা সূর্য থেকে বেরিয়ে গেলেও সূর্যের শক্তি যেমন অক্ষুন্ন থাকে অসংখ্য আত্মা বেরোলেও পরমাত্মা অব্যয় অক্ষয় থাকেন। ঈশ্বরই Power, সব কিছুর উৎস; ঈশ্বরই জ্ঞান, সব ভাব তাঁতেই আছে; তিনিই সংকল্প, সব পরিবর্তন ঘটান।

তাওই ব্রহ্মাণ্ড—কেননা প্রত্যেক চিদণু বিশ্বসত্যকে প্রতিবিম্বিত করে। কোনো দুটি প্রতিবিম্বন এক রকম নয়। কিন্তু সমগ্র বিশ্বসত্য কোনো একটি প্রতিবিম্বনে ধরা পড়ে না—সব প্রতিবিম্বনই সত্যের আংশিক প্রতিবিম্বন। তাই প্রত্যেক চিদণুর জ্ঞানের পাশাপাশি আছে অজ্ঞান-বলয়। প্রত্যেক চিদণু অপর যাবতীয় চিদণুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই একটি চিদণুর কম্পনও আর সব চিদণুকে প্রভাবিত করে—প্রভাবের মাত্রা নিকটের চিদণুতে বেশি, দূরের চিদণুতে কম।

যে চিদণু যত উৎকর্ষে পৌঁছেছে ও সত্য-প্রত্যক্ষতা যার যত স্বচ্ছ সে তত ক্রিয়াবান; যে চিদণু যত হীন উৎকর্ষের অধিকারী তার কর্মক্ষমতাও তত কম। ঈশ্বর সব চিদণুকে সমভাবে গড়েছেন তবু গুণবিকাশে সবাই সমস্তরে নেই। কিন্তু ঈশ্বর যাবতীয় চিদণুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করেন—তাই ব্রহ্মাণ্ড নৈরাজ্য-পীড়িত নয়। চিদণুগুলিকে ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করলে সব ঘড়িগুলি একই সময় দিচ্ছে; সব ঘড়ির স্রষ্টা যে একজন। তাই বিশ্বে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও সুষমা রয়েছে। সব ঘড়ির কাঁটাগুলি একসঙ্গে চলছে ও একই সময় বলছে বলে মনে হয় যে তারা পরস্পরকে চালাচ্ছে;—আসলে কেউ কাউকে চালাচ্ছে না, ঈশ্বরই সবের একক চালক।

জড়ও চিদণু সমবায়ে গঠিত, তাই জড় বলে কিছু নেই, সবই চৈতন্যময়। যাকে জড় পদার্থ বলে ভ্রম করি তার ক্ষুদ্রতম কণাও জীবন্ত—পুকুরে যেমন মাছ কিলবিল করে, নিম্নতম পদার্থ কণায় তেমনি চৈতন্য কিলবিল করছে। তাই microorganism-এর প্রতিটি ক্ষুদ্রতম কণা একটি পুকুর—ঐ কণাকেও যদি আরও সূক্ষ্মভাগে ভাগ কর তবে সূক্ষ্মতম ভাগও চৈতন্য-পুকুর। চৈতন্যকে শেষে আর ভাগ করা যায় না—তুমি ক্লান্ত হয়ে যাবে, কিন্তু চৈতন্য অখণ্ডই থেকে যাবে।

জগতে জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। আত্মা দেহবিযুক্ত হয় না। দেহের সংকোচ প্রসারণ ঘটায় মাত্র। সংকোচনকে আমরা বলি মৃত্যু, প্রসারণকে জন্ম। আত্মাতেই ভাবী সব সম্ভাবনা বীজাকারে নিহিত থাকে, ক্রমে তা পরিদৃশ্যমান হয় মাত্র। [ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে এ কথাই উপদেশ করা হয়েছিল, ক্ষুদ্রবীজ থেকে জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়। রামকৃষ্ণের উক্তিও অনুরূপ]। মৃত্যুতে দেহের একটা গঠন ভেঙে যায় বটে কিন্তু ঐ গঠন পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে উপাদানরূপে ছড়িয়ে পড়ে; সেই উপাদান আবার সম্মিলিত হয় নব নব দেহে। দেহ পার্থিব আইন-কানুনের অধীন, কিন্তু আত্মা তা নয়। আত্মা চলে পরমের অভিমুখে, আত্মার চলন উদ্দেশ্যযুক্ত। দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্য ঈশ্বরের বিধান।

বাহির থেকে আমরা জ্ঞান পাই না; বাহির থেকে লব্ধ জ্ঞান অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট, ভ্রান্তিময় ও ক্ষণিক—তাই তা জ্ঞানপদবাচ্য নয়। তাই লাইবিনিৎস বলেন, মোনাডের কোনো জানলা নেই। জ্ঞান ভিতরেই আছে, স্বতঃসিদ্ধ, স্বতস্ফূর্ত। যা দেখি শুনি তা হল perception. কিন্তু যাকে দেখি শুনি তাকে প্রকৃত জানা হল apperception. একমাত্র মানুষের আত্মা বা espirit এই apperception-এ সক্ষম—উদ্ভিদ বা পশুর আত্মা নয়। তাই মানুষই হতে পারে আত্মবিৎ, শাশ্বত সত্যের জ্ঞাতা।

লাইবিনিৎসের মতে শাশ্বত সত্য—verites eternelles—অখণ্ডনীয়। কিন্তু বর্তমান বিষয়সমূহ—যা নিয়ে আমাদের প্রাত্যহিক কারবার—শাশ্বত সত্যের আলোয় তাদের সম্পর্কে স্থির জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। এই সব বিষয় সম্পর্কে যা আমরা জানি তা হল contingent truths বা truths of fact—verites du fait. ইন্দ্রিয়গোচর এ সব সত্য। কিন্তু প্রতিটি contingent truth (কন্টিনজেন্ট বলে তাকেই যা necessary বা আবশ্যকীয়

নয়)-এর পিছনে পর্যাপ্ত হেতু থাকে ; সে হেতুর অন্বেষণে যাত্রা করলে আমরা পরম হেতুতে পৌঁছব—তাই জগতে আইন শৃঙ্খলা আছে, নৈরাজ্য নেই। কোনো ঘটনাই আকস্মিক ঘটে না। তবু আমাদের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা আছে ; আমাদের ভ্রান্তির কারণে আমরা ভুল নির্বাচন করতে পারি, করি। ঈশ্বরও অনবরত নির্বাচন করেন—বহু বিপরীত সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে বেছে নেন—কিন্তু তাঁর ভুল হয় না, কেননা তাঁতে ভ্রান্তি নেই। মানুষ ভুল করে বটে, তবু সে চৈতন্যের সন্তান, ভ্রান্তিমুক্ত হবার পুরো সম্ভাবনা তার আছে।

ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কেন পাপ ও অন্যায়? লাইবিনিৎস বললেন, পাপ ও অন্যায় দেখাও বিশ্বকে খণ্ডভাবে দেখার পরিণাম। জগতের সামান্য একটা অংশের সঙ্গে মাত্র আমাদের পরিচয় ঘটে, তাও অল্প সময়ের জন্য। আমরা তো দেশকালাতীত অখণ্ড সত্যকে জানি না—তাই ভ্রান্ত হয় আমাদের ধারণা। হাঁ, জগতে মন্দ আছে—ভালোর পৃষ্ঠপট রূপে ; শীতল জল পানের আনন্দ থাকত কোথায় যদি পূর্বাহ্নে ছাতিফাটা তৃষ্ণার ক্লেশ না থাকত? জুডাস ইস্কারিঅট যীশুকে ধরিয়ে না দিলে মানবজাতির জন্য দিব্যপুরুষের আত্মদান ও নবোত্থান পেতাম কি? রাবণ সীতাহরণ না করলে রামায়ণ কাব্য দাঁড়াত না। সোনায় খাদ না মেশালে অলঙ্কার গড়া যায় না। তুমি যদি খাদটুকুই দেখে যাও, সোনা না দেখতে চাও ; জগতে অমঙ্গল ও পাপ দেখছ, দেখছনা সে অমঙ্গল ও পাপকে ধারণ করেই মহতী মঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে তবে সে তোমার ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন দৃষ্টির লক্ষণ। তুমি সমগ্রকে দেখনি, দেখেছ তোমার পছন্দমাফিক একটি হীন অংশ।

এই হীনম্মন্যতা থেকে উঠে দাঁড়ালে তুমি দেখবে পশুপাখিরও আত্মা আছে বটে কিন্তু তুমি মানুষ, তুমি ঈশ্বরের প্রতিমাস্বরূপ, তুমি তাঁকে শুধু স্রষ্টা বলে জানো না, জানো রাজাধিরাজ রূপে, জীবনেশ্বর রূপে, পিতা রূপে ;—তাঁকে এমন আপনার আত্মীয় বলে জানলে তোমাদের নিয়ে তিনি গড়ে তুলবেন City of God, ঈশ্বর-নগরী, সর্বোৎকৃষ্ট রাজ্য। ব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টাই ভক্তজনদের হৃদয়-রাজা, পরিচালক ও পরিপোষক।

লাইবিনিৎস জড়কে স্বীকার করেননি, বলেছেন সবই চৈতন্য। তিনি সাংখ্যের মতোই বহু পুরুষবাদ বা চিদণু স্বীকার করেছেন। কিন্তু সাংখ্য ঈশ্বর মানেনা। তিনি স্রষ্টা ঈশ্বর মানেন। সাংখ্য প্রকৃতিকে মানে, লাইবিনিৎস প্রকৃতি মানেন না। তাঁর মতে চিদণু জড় নয়, কেননা তার

পরিমাণ নেই ; তা জ্যামিতিক বিন্দুও নয়, কেননা জ্যামিতিক বিন্দুরও ব্যাপ্তি আছে, চিদণুর ব্যাপ্তি নেই জগৎ চিদণু দিয়ে গড়া তাই অন্তিম সত্যে জাতিভেদ নেই, ভেদবোধ ভ্রান্ত দৃষ্টির পরিণাম, ভেদ অভেদে গ্রথিত— Identity of Indiscernibles, চিদণু ও আত্মা মাত্রেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবান, কিন্তু প্রাক-নির্দিষ্ট সামঞ্জস্যে বিধৃত। এই সামঞ্জস্য-ধৃত বিশ্বেও metaphysical evil আছে বটে, কিন্তু মঙ্গলকেই পুষ্টি করার জন্য তার অবস্থান। একদিন আমরা তা জানবই, কেননা জ্ঞানের ক্ষুধা appetition—আত্মার ধর্ম ; ক্ষুধা থাকলে ক্ষুধাতৃপ্তিও হবেই।

জ্ঞানের ক্ষুধা লাইবিনিৎসের স্বদেশে জার্মানীতে এমনভাবে জ্বলেছিল যার ফলে আধুনিক দর্শনের শ্রেষ্ঠ দান আমরা সেখান থেকেই পেয়েছি—পেয়েছি কাণ্ট, হেগেল ও মার্ক্সের দর্শন।

ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) দাবী করেছিলেন তাঁর Critique of Pure Reason (হুমায়ুন কবিরের অনুবাদে, 'শুদ্ধ প্রজ্ঞার সমালোচনা')-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় যে জ্যোতির্বিদ্যায় যেমন কোপার্নিকাস বিপ্লব এনেছিলেন, দর্শনের ক্ষেত্রেও তিনি তেমনই বিপ্লব এনেছেন। সে বিপ্লব এই যে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান আমাদের মনঃপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করে—মন বা চেতনাই ব্রহ্মাণ্ডমূল। এতদিন দার্শনিকরা সত্তার স্বরূপ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন, কাণ্ট জ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে ব্যস্ত হলেন। তাঁর মতে জ্ঞানের অস্তিত্ব সংশয়াতীত, কেননা জ্ঞানের অস্বীকারও জ্ঞানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যথার্থ জ্ঞানে বিশ্লেষণ ও সমন্বয় দুইই স্থান পায়।

অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের জ্ঞানের আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু সমগ্র জ্ঞান অভিজ্ঞতাজাত নয়। অভিজ্ঞতারও দুটি অংশ আছে ; একটি সংবেদন-প্রাপ্ত, অপরটি ধী-শক্তির স্বকীয় ভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত। বাহ্যবস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে আমাদের মানসিক শক্তিকে সক্রিয় করে, তা থেকে পাই সংবেদন-জাত জ্ঞান —একে বলি প্রত্যক্ষোত্তর জ্ঞান। কিন্তু সংবেদন-নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ-পূর্ব জ্ঞানও আছে। আমাদের মনের প্রকৃতি ও গঠন থেকেই সে জ্ঞানের উদ্ভব। উহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা।

প্রত্যক্ষপূর্ব (a priori) বা বিশুদ্ধ জ্ঞান সর্বদেশে ও সর্বকালে সত্য—তার ভুল নেই। কিন্তু ইন্দ্রিয়জাত বা সংবেদন-প্রাপ্ত জ্ঞান অস্থায়ী ও অর্থশূন্য হতে পারে, হয়। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান স্থান ও কালসীমায় বদ্ধ। বিশুদ্ধ জ্ঞান সর্বজনীন।

কমলা লেবুর আকার স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ ইন্দ্রিয়গুলি দেয়। তাতে যে যে প্রতীতি হয় তাই-ই সংবেদন-প্রাপ্ত জ্ঞান। কিন্তু আকার স্বাদ-গন্ধ স্পর্শের অনুভূতি তো ভিন্ন ভিন্ন; কে তাদের একত্রিত করে একটা একীভূত প্রতীতিতে দাঁড় করাল? ইন্দ্রিয়দ্বারে আগত নানা ধারণা ও অনুভূতি বিশৃঙ্খল এলোমেলো জনতার মতো, তাদের সুশৃঙ্খল বিন্যাস না হলে তা জ্ঞানপদবাচ্য হয় না।

সংবেদনগুলিকে সুবিন্যস্ত করতে মন তাদের দেশ ও কালে স্থাপন করে। দেশ-কাল দ্রব্য নয়; এগুলি ধারণাও নয়; intuition বা Anschauung—স্বজ্ঞা। দেশ ও কাল-বোধ সংবেদন-প্রাপ্ত নয়, পরন্তু সংবেদন-প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও ধারণাগুলিকে বিন্যস্ত করার পক্ষে অপরিহার্য শুদ্ধ জ্ঞান। দেশ-কাল জ্ঞান প্রত্যক্ষপূর্ব। এমন একটা অবস্থা ভাবতে পারি যেখানে কমলা লেবু নেই, কোনো বস্তুই নেই। তখনও দেশ ও কাল থাকবে। বস্তু অন্তর্হিত হলেই দেশ-কাল অন্তর্ধান করে না, তাই দেশকাল বিষয় নয়, বিষয়জ্ঞানও নয়, অব্যবহিত জ্ঞান। এখানে লাইবিনিৎসের বিরোধিতা করছেন কাণ্ট। কাণ্টের মতে দেশ ও কালবোধ আমাদের মনের নিয়ম, মনের প্রকৃতি না পাল্‌টালে এই বোধ কোনোদিন কোথাও পালটাবে না। অর্থাৎ মনের অতীত হলেই দেশকালবোধাতীত হওয়া সম্ভব।

কাণ্টের মতে দেশ ও কাল একটি বোধ মাত্র—মনের বাইরে দেশ কাল নেই। মন বাহ্য জগতের সংবেদনকে দেশ ও কালবোধ দ্বারা গ্রহণ করে। মনই এই বোধের উৎসমূল। কোনো বস্তুই দেশ ও কালে নেই, আমাদের মনই দেশ ও কালের পোশাকে বস্তুকে সজ্জিত করে নেয়। বাহ্যবস্তুকে মন এই রীতিতেই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে, কিন্তু একদিন অভ্যাস বদল করে যদি বাহ্য বস্তুর ওপর থেকে দেশ-কালের পোশাকটি সরিয়ে নিই, তবে বস্তুর সে নগ্ন চেহারা কেমন হবে? জানিনা। আমাদের জ্ঞানের বাইরে দেশ-কালবর্জিত বস্তুর স্বরূপ কী, বস্তু স্বরূপত (Thing-in-itself) কী তা জানি না। তেমনি জানিনা আত্মার স্বরূপ কী। চিৎ ও জড় কোনো বিষয়কেই আমরা স্বরূপত জানি না; জানি ততটুকু মন যতটুকু ও যেভাবে জানায়।

তাই সংবেদন-প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ধারণা বা অনুভূতিকে দেশকালে সজ্জিত করে বিন্যাস দিলে প্রতীতি মাত্র হয়, জ্ঞান হয় না। প্রতীতিকে বিশ্বজনীনতা দান করে বুদ্ধি। সংবেদনগুলি দেশ ও কালের মুদ্রালাঞ্ছিত হয়ে বুদ্ধির দ্বারে

হাজির হলে বুদ্ধি তাদের বারোটি category-র আকারে গ্রহণ করে শ্রেণীবদ্ধ করে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। বারোটি ক্যাটিগরি হল—Unity, Plurality, Totality (এগুলি পরিমাণবাচক) ; Reality, Negation, Limitation (এগুলি গুণবাচক) ; Substance, Causation, Reciprocity (এগুলি সম্বন্ধবাচক) ; Possibility and Impossibility, Existence and Non-Existence, Necessity and Contingency (এগুলি অবস্থা বাচক)। কমলালেবু থাকলে তার সংবেদন ইন্দ্রিয়দ্বারে পৌছয় ; দেশকালে স্থাপন করে সে সংবেদনগুলিকে বিন্যস্ত করে একটি বাহ্যবস্তু রূপে প্রতীতি দেয় মন ; বুদ্ধি ক্যাটিগোরিজের আকারে ঐ বাহ্য বস্তু-প্রতীতিকে নিয়ে তাকে চিহ্নিত করে দেয় কমলা লেবু বলে। তখন যেখানে যখনই কমলালেবু দেখি তাকে চিনতে পারি। কমলা লেবুত্ব একটি বিশ্বজনীন প্রত্যয়।

কিন্তু এই বহু ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত-সংবেদনকে মন ও বুদ্ধি সর্বজনীন প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে, self এই গোটা ব্যাপারটিকে ধারণ করে আছে বলে। self কী ? জানিনা। তবে আমাদের অভিজ্ঞতায় তাকে 'আমি' রূপে অনুভব করি। সব চিন্তা ও ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই 'আমি', কিন্তু 'আমি' নিজে চিন্তা নয়, ধারণা নয়। এই আমিই নিজস্ব একটি জগৎ সৃষ্টি করে নেয়। আর সে জগৎ একান্তভাবে ব্যক্তিগত জগৎ নয় ; অপর মানুষরাও তাতে আছে ; তাদের জগৎবোধের সঙ্গে আমার জগৎবোধেরও মিল আছে। ব্যক্তি খুশি মতো প্রকৃতির নিয়ম পালটাতে পারে না। যদিও জগৎ মনেরই সৃষ্টি তবু তা বাস্তব জগৎ—আমাদের সবার জগৎ-অভিজ্ঞতা অনুরূপ। তাই জগৎ-প্রত্যয় নিছক প্রত্যয় নয়, বাস্তব। বাস্তব অর্থে সর্বজনীন ও আবশ্যক-contingent নয়।

আমাদের প্রত্যেকের চোখ, কান, মন আছে—ব্রহ্মাণ্ড মনেরই সৃষ্টি, অভিজ্ঞতাও স্ব স্ব তবু জগৎ কারও ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় সংবেদনজাত ও মনঃকল্পিত ব্যাপার নয় কেন ? কেন দেশ-কাল ও ক্যাটিগোরিজ আমার ব্যক্তিগত অভিলাষের সৃষ্টি নয় ? কারণ বোধ ও বিচার শক্তি স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে নেই—তা আছে Bewusstsein ueberhaupt—এ ; সাধারণী চৈতন্যে ; consciousness in general-এ। সাধারণী চৈতন্যের অর্থ সর্বব্যাপী চৈতন্য। উপরের বর্ণনা থেকে মনে হতে পারে যে ইন্দ্রিয়-সংবেদন, দেশকালে তাকে স্থাপন, ধারণা, ক্যাটিগোরিতে রাখা, বিচার এসব কালপরম্পরায় সাধিত হয়ে থাকে—

অর্থাৎ একটি আগে আসে, তারপর পরপর অন্যগুলি। কাণ্টের মতে তা নয়। সবগুলি একই সঙ্গে উদিত হয়—এইই কাণ্টকথিত কালের যৌগপদ্য—simultaneity. একটি অভিজ্ঞতায় সবগুলি একসঙ্গে বর্তমান—পূর্বাপর নেই। ধারণাবিহীন প্রত্যক্ষীকরণ অথবা প্রত্যক্ষীকরণবিহীন ধারণা (Percepts without concepts ও vice versa) তাৎপর্যহীন, শূন্য, নিরর্থক। যখনই কোনো বস্তুর মুখোমুখি হই তখন সংবেদন, দেশ-কাল, ক্যাটিগোরিজ যুগপৎ উদিত হয়—কেন? কারণ একটি সত্তায়—একটি অহম্‌-এ সবই বিধৃত। কাণ্ট একেই বলেন synthetic unity of apperception বা transcendental unity of apperception বা অলৌকিক অহংজ্ঞান। সংবেদনগুলি বাইরে থেকে আসে বটে, যথা ফুলের বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ ও রূপের সংবেদন—কিন্তু সেগুলি একত্ব লাভ করে ফুল-প্রত্যয় জন্মায় এই অতীন্দ্রিয় আত্মজ্ঞান। আমাদের সব প্রত্যয়ের সঙ্গে "আমি চিন্তা করছি" এই প্রত্যয়ও যুক্ত থাকে—প্রতি প্রত্যয়ের সঙ্গে 'অহম্‌'-এর প্রত্যয় স্বতঃই উদ্ভূত হয়; জ্ঞান যে আমার জ্ঞান বলে মনে করি তার ভিত্তি এই। এই অহংবোধই সব জ্ঞানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-নির্ভর জ্ঞানই তো সব নয়, ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান আছে, যা ইন্দ্রিয়-সংবেদন-জাত নয়, দেশকালের মুদ্রাপ্রাপ্ত নয়, কার্যকারণের ছাপ পড়েনি যার ওপর। মানুষের মন নিজেকে নিজের সীমামধ্যে আটক রাখতে রাজি হয় না, প্রত্যক্ষের গণ্ডী অতিক্রম করে যেতে চায়। প্রত্যক্ষের বাইরে যা রয়েছে তাই-ই তত্ত্ববিদ্যার বিষয়।

বুদ্ধি দিয়ে আত্মা ও ঈশ্বরকে জানা যায় না কিন্তু বুদ্ধির একটি কার্যকরী ভূমিকা আছে। তা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা আমাদের জানিয়ে দেয়। পাখি আকাশে ওড়ে; সে ভাবে যদি বাতাসের প্রতিরোধ না থাকত তবে সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আকাশ সত্যই বায়ুহীন শূন্য হলে পাখি ধপাস করে পড়ে যেত, ওড়া হত না। যুক্তিবুদ্ধি ঐ বাতাসের মতোই আমাদের জ্ঞানকে সীমিত করে দেয়; কিন্তু সীমায় প্রতিহত হয়েই আমরা বুঝি যে আমাদের অভিজ্ঞতার অতীত এক অতীন্দ্রিয় সত্তা বা reality আছে—ক্যাটিগোরিজের সাহায্যে যে প্রাকৃত বিজ্ঞান আমরা গড়ে তুলেছি তা দিয়ে ঐ রিয়ালিটিকে জানা যায় না। এই প্রাকৃত জগৎ ঐ রিয়ালিটি নয়।

অহম্‌-বোধ আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রেই কার্যকরী—তার

বাইরে তার এক্তিয়ার নেই। অহম্‌ আত্মা নয়। অহম নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর। অহম্‌ অভিজ্ঞতা-নির্ভর, আত্মা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। আত্মা যুক্তিবুদ্ধির অগোচর। তাই যে বস্তুবাদীরা আত্মা নেই বলেন তাঁরা না জেনেই তা বলেন।

জগৎ মনের সৃষ্টি, দেশকালও তাই, কিন্তু ঈশ্বর হলেন ens realissimum —সবচেয়ে রিয়াল ও সর্বোত্তম সত্তা, অনন্ত, সর্বদর্শী, সর্বক্ষমতাধর, সব কিছুই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধির গোচর নন তিনি, বিজ্ঞান তাঁর নাগাল পায় না, দর্শন তাঁকে জানতে পায় না—দেকার্তে স্পিনোজা লাইবিনিৎসদের চেষ্টা তাই বৃথাই হয়েছে। কথা সাজিয়ে তাঁকে জানা যায় না, প্রমাণ করা যায় না তাঁর অস্তিত্ব। পকেটে টাকা আছে ভাবলেই কি টাকা থাকে? হাত দিয়ে দেখতে হয় আছে কি না। হাত দিয়ে ভগবানকে স্পর্শ করার ক্ষমতা বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের নেই। জগৎ স্রষ্টার কথাই বা বল কেন? কুমোর যেমন মাটি দিয়ে ঘট গড়ে, ঈশ্বরও যদি তেমনই জগৎ গড়ে থাকেন বস্তু-উপাদানের সাহায্যে, তবে তিনি না হয় একজন বড় আকারের কুমোরই! এ তো limited ঈশ্বর—অসীম অনন্ত তাঁকে তবে বলা কেন? বাস্তব বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে প্রত্যহের কাজ চলে, বস্তুকে জানা যায়, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপকে জানা যায় না।

কর্তব্য পালনেই সুখ, ক্রমাগত উৎকর্ষ লাভেই আনন্দ—কিন্তু মানবজীবনের সীমা আছে, সব কর্তব্য কি পালন করা যায়, উৎকর্ষের চরমে কি ওঠা যায়? কাণ্ট তাই অমরতায় আস্থাশীল। এই মৃত্যুতে জীবনের সমাপ্তি নয়। অনন্ত জীবন অনন্ত কাল;—তাই করো, হও। প্রতি মানুষকে মনে করো রাজা, সেবা করো তার। ঈশ্বরদৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখলে এই উদার বোধ আসে, খণ্ডিত মানবদৃষ্টিতে দেখলে আসে না।

সুন্দরকে যখন দেখি তখন বিস্ময়ে আবিষ্ট হই, ভয়ে ত্রাসিত হই না। উপরে নক্ষত্রপুঞ্জিত আকাশ আর আমার অন্তরে নৈতিক বোধ—এর চেয়ে পরম সুন্দর আর বিস্ময়কর কী আছে? কোথা হতে এল এরা? আমার মনেরই সৃষ্টি? তবে তো আমি এই বস্তুপিণ্ডরূপ জগৎ থেকে মহীয়ান—কেননা আমি যে চৈতন্যময়, তাই তো স্রষ্টা হতে পারি। তাই তো আমিই অনুভব করতে পারি যে গোটা ব্রহ্মাণ্ডে অনুস্যূত আছে উদ্দেশ্যময়তা। সব অংশ এক সমগ্রের সেবারত, সমগ্র প্রাণিত করছে অংশগুলিকে—কিছুই ফ্যালনা নয়।

উদ্দেশ্যবোধ ভিতর থেকেই নাড়া দিচ্ছে আমাদের, জারিত করছে। তা থেকেই অনুমান করি যে এ ব্রহ্মাণ্ড পরম চৈতন্যেরই বহিঃপ্রকাশ। অনুমান করি; কিন্তু জানি না। বুদ্ধি তো আমাদের জানার অধিকার দেয়নি। ঈশ্বর তর্ক-প্রতিষ্ঠ নন, কান্ট একথা বলায় হাইনে বলেছিলেন যে কান্ট খুনী, তিনি ঈশ্বরকে খুন করেছেন। কিন্তু কান্ট তা আদৌ করেননি—তিনি উপনিষদীয় বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করছিলেন যে তাঁকে যুক্তি তর্ক মেধা ও প্রবচনের দ্বারা পাওয়া যায় না। রামকৃষ্ণের উক্তি: পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাজি টিপলে এক ফোঁটা জলও পড়ে না। ঈশ্বর স্বয়ম্বেদ্য, মানুষের যুক্তিতর্ক তাঁর কাছে পৌঁছয় না—কান্টের এই বাণী প্রজ্ঞা-বাণী।

স্বয়ম্বেদ্য ঈশ্বর ইতিহাসবেদ্য হন—কালাতীত তিনি দেশে ও কালে নিজেকে প্রকশিত করেন, এমনকি বিকশিত, অতএব কালস্বরূপকে কাল-দর্পণে জানা যায়—কান্টের প্রতিবাদে জার্মাণীতেই উত্থিত হয়েছিল এ বাণী—সে বাণী জর্জ উইলহেলম ফ্রিডরিশ হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১)। হেগেল পরম মন বা পরম আত্মার কথা বলেছেন, কাল-পরম্পরায় যাঁর আত্ম-উন্মোচন ঘটে এবং মানুষের যুক্তিবোধে যিনি প্রথম আত্মবিৎ হয়ে ওঠেন।

সত্য হল সমগ্র; অংশগুলি তাৎপর্য লাভ করে সমগ্রের সঙ্গে সম্বন্ধের কারণে। সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কোনো অংশেরই আর মূল্য থাকে না, সত্যতাও থাকে না; অংশগুলির জোড়াকেও সমগ্র বলে না। সমগ্রই সত্য, আর সব যতক্ষণ তার অংশ ততক্ষণ সত্য। দেশ ও কাল যদি বিচ্ছিন্নতা ও বহুত্বকে প্ররোচিত করে তবে দেশ ও কালও মিথ্যা হয়ে যায়।

হেগেলের প্রসিদ্ধ বাক্য: the real is rational, and the rational is real. যে বাস্তব প্রত্যক্ষ তাকেই যৌক্তিক বলা যায় না সব সময়; ভ্রান্তি, পাপ ও নিষ্ঠুরতাকে কি যুক্তিযুক্ত বলে মানতে হবে? হেগেল তা বলতে চাননি। বলেছেন, ঘটনাসমূহ তো অযৌক্তিকই হয়ে থাকে—কিন্তু যখন তাদের সমগ্রের মধ্যে দেখি তখন তাদের চরিত্র পালটে যায়—দেখি সবই যৌক্তিক। এই সমগ্রকে হেগেল বলেছেন Absolute—পরম আত্মা। Absolute ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। একা ব্রহ্মই বিরাজ করেন। দ্বিতীয় নেই। কিন্তু Absolute বা Reality-র অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আছে, যারা ঐ পরমের দ্বারাই প্রাণিত এবং শুধু তাঁরই সেবা করে।

এই যে মুহূর্তটি, যখন একটি গাছের তলে আমরা বসে আছি, এই মুহূর্তটি

কি স্বয়ম্ভূ? কেন আমরা এখানে মিলিত হয়েছি?—এর তো পূর্ব কারণ আছে, কারণপরম্পরা আছে, প্রস্তুতি আছে, এবং ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত একটি উদ্দেশ্যও আছে। পূর্বাপর সব মুহূর্ত ও জীবনধারা থেকে এই মুহূর্তটিকে কি একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করা চলে? করলে কি তার আর তাৎপর্য অবশিষ্ট থাকে? আমাদের জীবনের ধারাবাহিক সব মুহূর্তকে একটা organic বা প্রাণিক সমগ্রতায় বিধৃত রূপে দেখতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা, বর্তমানের অনুভব ও ভবিষ্যতের প্রস্তুতি সবই রয়েছে সে সমগ্রতায়। এখনই আমি যে বক্তা এই কি আমার ব্যক্তিত্বের পর্যাপ্ত পরিচয়? আমার এই ক্ষণের মুখের কথাটাই আমার সত্য পরিচয় কিনা—আমার অতীত ও বর্তমানের কথা, কাজ ও আচরণের সঙ্গে এই ক্ষণের বাগবিভূতি কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা খতিয়ে না দেখলে বিচার করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। হেগেলের এই দৃষ্টিভঙ্গীই the organic theory of truth and reality নামে খ্যাত হয়েছে।

আমি সমাজের একজন। সমাজ আজই আকাশ থেকে পড়েনি, হাজার হাজার বছরের সংঘর্ষ ও সমবায়ের ভিতর দিয়ে কোটি কোটি মানুষ এ সমাজ গড়েছে। সে মানুষরাও বিবর্তিত হয়েছিল মানবেতর প্রাণী গোষ্ঠী থেকে, যারা বিবর্তিত হয়েছিল কোনো সময়ের এককোষী প্রাণী থেকে। প্রাণের আবির্ভাবের আগে কোটি কোটি বছর কাটিয়েছে পৃথিবী সূর্যবৃত্তে অক্লান্ত ঘুরে। সূর্য ও তার মণ্ডল এসেছে ব্রহ্মাণ্ড থেকে—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল পনেরো হাজার কোটি বছর আগে। তারও আগে ছিল কোনো না কোনো ইতিহাস। অতএব আমার বাবু বৃত্তান্তও ইতিহাসে বিধৃত একটি কমা চিহ্ন বই তো নয়!

পরমই এই সব হয়েছেন এবং এইসব হওয়া নিয়েই তিনি সমগ্র। দেশ-কালের কোনো একটি বিন্দুতে পরম বসে নেই, সব দেশ ও কাল তাঁর অনন্ত আলিঙ্গনে রয়েছে। সে পরম যেন এতদিন নিজেকে জানতেন না, এখন মানুষের চেতনার দর্পণে তিনি দেখেছেন তাঁর আত্মরূপ, জেনেছেন নিজেকে। নিন্দুকরা ঠাট্টা করে বলে, হেগেলের দর্শন পড়েই তিনি নিজেকে জানতে পেরেছেন! কথাটা এই যে আমরা তো মহাবিশ্বের অংশ—তাই বিশ্বের কানুনই আমাদের যুক্তিরও কানুন—তাই যা যুক্তিযুক্ত তা-ই real আর যা real তা-ই যুক্তিযুক্ত। আসলে পরম যে মানুষের ওপর নির্ভরশীল ও জগতে মানুষের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত তিনি চৈতন্যস্বরূপ ছিলেন না একথা হেগেল

বলতে চাননি। তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল যে ক্ষুদ্র মনের অধিকারী হয়েও মানুষ পরমকে জানতে পারে—তাই মানুষ কম নয়, তার মহিমা কম নয়, তার আত্মসম্মান ও দায়িত্ববোধও কম হওয়া উচিত নয়।

হেগেলের পরম বিমূর্ত অস্তিত্ব মাত্র নয়, তা concrete, কেননা এই ব্রহ্মাণ্ডসহই তিনি আছেন, এসব বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু যখন এসব কথা বলি তখন তিনি কী নন সে কথাও তো এসে পড়ে। হেগেলের মতে, যখনই কারও সম্পর্কে ইতিবাচক কিছু বলা হয় তখন নেতিবাচকও তো কিছু থাকবেই। রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তাহলে তো স্বীকার করাই হল যে রামচন্দ্র গৌড়ের বাসিন্দা ছিলেন না। আমরা সবাই আর সবাইয়ের সঙ্গে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত। এই ইতি-নেতির দ্বন্দ্ব আছে—হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের এই হল সূত্রপাত। তাঁর মতে প্রত্যেক থিসিসের (ইতিবাচক প্রস্তাব) মধ্যেই নিহিত আছে তার অ্যান্টি-থিসিস (নেতিবাচক প্রস্তাব)। এই দুয়ের দ্বন্দ্ব মীমাংসিত হয় উচ্চতর সমন্বয়ে—যেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর দ্বন্দ্ব aufgehoben হয়, নিরস্ত হয়। নতুন সিদ্ধান্ত জন্ম নেয়।

সব দ্বন্দ্বই নিরস্ত হয় পরমের ধ্যানে, হেগেল যাকে Absolute Idea বলেন। পরম অজ্ঞেয় নন, জগৎও মায়া নয়। যে কোনো একটি বস্তু, ঐ গাছের যে পাতাটি নড়ছে তা থেকেই ধ্যান সুরু করলে দেখব ও কত সম্পর্ক-জালে আবদ্ধ: গাছের অপরাপর পাতাগুলি ও শাখা-প্রশাখার সঙ্গে, বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন-অক্সিজেনের সঙ্গে, ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্গে—এবং গোটা বিশ্বের সঙ্গে। একটা সামান্য গাছের পাতা থেকে ধ্যান সুরু করলে সমগ্র বিশ্বের ধ্যানে পৌছাই। যেহেতু বিশ্বনাথ বিশ্বে অনুস্যূত ও বিশ্বাতীত অতএব বিশ্বনাথ তথা পরমের ধ্যানে পৌছাই। সেখানে দ্বন্দ্ব নেই।

ধ্যানই বিশ্ব—Ideaই Absolute একথা বলে হেগেল চমকে দিয়েছেন পাশ্চাত্ত্যের বুধজনকে; ভাবই বিশ্ব ও বিশ্বনাথ। ভাব আমাদের মনের সৃষ্টি এরকম আমরা জানি, কিন্তু হেগেলে বলেন ভাবই বস্তু, ভাবই reality. যিনি পরম তিনি আসলে পরম ভাব। তাই আমরা আমাদের ভাব দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, মনীষা দিয়ে তাঁকে ধরতে পারি—সে যে ভাবের মানুষ অভাবে কি তায় যায় গো চেনা? পরম ভাবই বিশ্বাত্মা আর তিনিই চিন্তা করেন, ভাবেন। বিশ্বের গড়ন আর আমাদের মনের গড়ন এক সুষমার সম্পর্কে ধরা আছে

—কেননা সমগ্রের অংশ বিশ্ব ও আমরা। তাই মনের ভাব বিশ্বভাবের সঙ্গে মিশে যায়। তাই আমরা তাঁকে জানি।

পরম ভাবও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে আত্ম-উন্মীলন করেন। একটি থিসিসে সত্যের একটি অংশ প্রকাশিত হয়। তারই অ্যান্টি-থিসিসে সত্যের আর একটি অংশ প্রকাশিত হয়। দুটি অংশ পরস্পর-বিপরীত মনে হয়। বিপরীত যে নয় তা বোঝা যায় উভয়ের সমন্বয়ে—দুইই সেখানে ঠাঁই পেয়েছে কিন্তু পৃথক পৃথক সত্তাসহ ঠাঁই পায় নি, এক অভিনব অভিন্নতায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছে। সমন্বয় মানে মিলন নয়, জোড় মেলা নয়, সমন্বয়ের অর্থ এক অভিনবের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু পরমের চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশ তো তা নয়। অতএব সমন্বয়টি নতুন থিসিস রূপে দাঁড়াবে ও মুখোমুখি হবে অ্যান্টি-থিসিসের চ্যালেঞ্জের; আবার নতুনতর অভিনবের প্রকাশ ঘটবে নতুন সমন্বয়ে। সত্য এইভাবে দ্বান্দ্বিকতা-আশ্রয়ী হয়ে ক্রমেই পূর্ণতর আত্ম-উদ্ঘাটনের লক্ষ্যাভিমুখে সততই চলেছে ক্ষান্তিহীন গতিতে।

অস্তিত্ব থাকলেই নাস্তিত্ব থাকবে, সত্তা থাকলেই অসত্তা। এই দুই বাদী-প্রতিবাদী, Being ও Nothing-এর সমন্বয় বৃহত্তর সত্তা Becoming-এ বা হওয়ায়। হওয়া কথাটির মধ্যেই নিহিত আছে গতি। আমরা কিছু আছি তো বটেই কিন্তু আবার অনেক কিছুই নয়। যা হই ও যা নই এই দুয়ের দ্বন্দ্ব আমাদের উদ্বুদ্ধ করে নতুন গুণ অর্জনে, নতুন কিছু হতে। সাহসী আছি, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে যে সাহসী নই। বিপদের ঝুঁকি যেখানে কম সেখানে সাহসী, ঝুঁকি বেশি হলে সাহসে কুলোয় না। আমারই ভিতর সাহসী ও ভীরু দুই সত্তার যুগপৎ উপস্থিতি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, যাকে বলি বিবেক দংশন। দ্বন্দ্ব শান্তি পায় চরিত্রের নতুন বিকাশে—সাহসী-ভীরুর যুগল তখন আমাতে এক অভিনব দৃপ্ত সমন্বয় পেয়েছে। এই নতুন চরিত্র তথা নতুন মানুষ হয়ে ওঠাতেই আমি সার্থক; এবং হয়ে ওঠার তো কোনো শেষ নেই, হয়ে ওঠা আমাদের চলতেই থাকবে জীবনভোর। বিশ্বও ক্রমাগত হয়ে উঠছে। জগৎ ও জীবন এই ভবন, হয়ে ওঠা; তা সত্তা আর অসত্তা মাত্র নয়। এই হল হেগেলের লজিক বা যুক্তিতত্ত্ব। যা আগে ছিল না, তা-ই হচ্ছে। কথাটা তাও নয়। যা আগে প্রকাশিত ছিল না, তা-ই প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বৈতভূমিতে এই হল অদ্বৈতের লীলা। হেগেলের এই মত ভারতীয় আমাদের চমকে দেয় না। আমাদের দিশী মত তো এরকমই। হেগেল

যখন বলেন যে এই সব ভবন বা হয়ে ওঠার পরিপূর্ণতাই পরম তখন তা স্বীকার করতে আমাদের বাধে না। সব সত্তা, সব অসত্তা, সব অস্তি সব নাস্তি, সব ভাবনা পরমেই সমাহৃত। তাই আগের দার্শনিকরা যে বলেছিলেন যে শুধু সত্তাই পরম—অস্তিত্বই reality, (দেকার্তে স্পিনোজার substance). হেগেল সেকথার প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন, হাঁ, না ও হাঁ-না-এর পরপারে হওয়া সব মিলেই পরম। আমি নিত্য ও লীলা দুই-ই লই; আকার-নিরাকার আবার আকার-নিরাকারের পরপার—ঈশ্বর এসবই এবং আরও কত কিছু—রামকৃষ্ণের উক্তি। হেগেলের বাণীর সমর্থন আছে এই জীবন্ত উপলব্ধিতে।

যতক্ষণ শুধু সত্তাকে নিই ততক্ষণ কার্যকারণ সূত্রে সব ঘটনাকে দেখি। মনে হয়, কারণ আছে তাই কার্য হবেই—এইই জগতের সুদৃঢ় নিয়ম। কিন্তু যখন সমগ্র বা পরমের বোধ নিয়ে দেখি তখন বুঝি যে সব অংশই সমবায়ী, পরস্পরকে পুষ্ট করে, পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল—তখন কার্যকারণের লৌহ-নিয়মের বদলে আভাসিত হয় স্বাধীনতা; মুক্ত মনেই আমরা পরস্পরকে সাহায্য করছি, মদত দিচ্ছি, কেননা ঐভাবে আমরা পরমের সেবা করছি। জ্ঞানই মুক্ত করে মানুষকে, অজ্ঞানই বদ্ধ করে। ক্যান্সার হলে লোক মরে; ক্যান্সার কারণ, মৃত্যু কার্য। এ লৌহনিয়মকে চিকিৎসক ভাঙতে পারছে না, কারণ ক্যান্সার-নিরাময়ের ঔষধ জানা নেই। অজ্ঞতার জন্য ডাক্তার বদ্ধ হয়ে আছেন, অসহায়; ক্যান্সারে রোগী মরবেই তিনি জানেন, এ বিষয়ে তাঁর স্বাধীনতা নেই। ঔষধ আবিষ্কৃত হলে ডাক্তার অসহায় থাকবেন না, বদ্ধ থাকবেন না, মৃত্যু necessity থাকবে না—ডাক্তার স্বাধীনভাবে রোগীর চিকিৎসা করবেন। যদি ভাবি ঘটনাশৃঙ্খলে আবদ্ধ আমি ঘটনাসূত্রের একটি যোগ (link) মাত্র তবে আমি বদ্ধ; যদি আমি সমগ্রের বা পরমের সঙ্গে এক হই তবে আমি মুক্ত। পরমের জ্ঞানই মুক্তিজ্ঞান। স্পিনোজা যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলেছিলেন—intellectual love of god—হেগেল সেজন্য তাঁর সম্পর্কে সপ্রশংস; কেননা পরমের বোধে পৌঁছবার ঐ তো উপায়। অপরাধী কারাদণ্ড পেয়ে কারাগারে বদ্ধ থাকে; যখন সে ভাবে যে কেউ তাকে বন্দী করেনি, শাস্তি দেয়নি, স্বীয় কর্মফলই তাকে ভোগাচ্ছে তখন মনে সে মুক্তই হয়ে যায়, থাকেনা কারও ওপর রাগ-ক্ষোভ।

হেগেলের মতে সত্য বা reality চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্য ভিন্ন আর কোনো রিয়ালিটি নেই। চৈতন্য যখন আত্মবিৎ হয় তখনই নিজেকে পরম বলে জানে।

কিন্তু চৈতন্যের প্রতিবাদী (anti-thesis) রূপে আছে জড় প্রকৃতি ; পরমাত্মা বাহ্যজগৎ রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। চৈতন্য ও জড়ের সমন্বয় হয়েছে মানুষে। পশু ও প্রাণীতেও চেতনা আছে, কিন্তু মানুষেই চেতনা আত্ম-সচেতন। তার যুক্তিবোধ আছে, মন আছে, আত্মা আছে। পরম চৈতন্য জড় জগতে আত্মপ্রকাশিত হবার পর মানুষে এসে আত্মবিৎ হচ্ছেন ; কিন্তু পুরোভাবে হতে পারেন না যতক্ষণ না মানুষ পরমকে জানে। যে মানুষ পরমকে জেনেছে সে চৈতন্যস্বরূপ হয়ে উঠেছে, ফিরে পেয়েছে তার দিব্য স্বভাব, হয়েছে পূর্ণ মুক্ত ; দর্শনে-বিজ্ঞানে শিল্প-সাহিত্যে সমাজে-রাজনীতিতে সে তখন যথার্থ ভাবে বাঁচে, পরিপূর্ণতম ভাবে বাঁচে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরমের প্রতিবিম্বন ঘটায়।

মানুষের ইতিহাসেও পরম চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ দেখেছেন হেগেল। ফলে ইতিহাসে ঈশ্বর, না, ঈশ্বরের ইতিহাস, কী বলব তা ভেবে পাই না মানব-ইতিহাসকে। যেসব দার্শনিকের কথা আমরা আলোচনা করেছি তাঁরাই আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ইয়োরোপীয় দার্শনিক। তাঁদের দর্শনের দুএকটি দিক বেছে নিয়ে আমরা আলোচনা করিনি, তাঁদের দর্শনের গোটা রূপটিই আমরা তুলে ধরেছি, অন্ততঃ মুখ্য অংশটুকু। এঁদের দর্শন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ইংলণ্ডে—লক হিউম বেন্থামদের দ্বারা। ইংরেজ দার্শনিকদের দর্শনে বড় ভূমিকা নেই, অতি গৌণ তাঁরা। তাই তাঁদের আলোচনা আমি করিনি। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে ইন্দ্রিয়বেদ্য অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের ভিত্তি—এর চেয়ে গভীরতর কোনো জ্ঞানভিত্তি নেই, এবং জগৎকে যেমন দেখি তা তাই-ই, এর পিছনে ব্রহ্মবস্তুর কল্পনা করে লাভ নেই। এঁদের নাম empiricists. ফরাসী ভলতেয়ার, দিদেরো, কণ্ডিলাক ও হেলভেশিয়াস প্রমুখ দার্শনিকরা ইংরেজদের বাস্তব বুদ্ধির প্রশংসা করতেন। তাঁরা ছিলেন যুক্তিবাদী। আঠারো শতকে এই যুক্তির পূজা চরমে ওঠে। ফরাসী বিপ্লবের কালে এক সুন্দরী মহিলাকে যুক্তিদেবী সাজিয়ে প্যারিস নগরীতে জৌলুসমণ্ডিত মিছিল বেরিয়েছিল। বলা হচ্ছিল যে পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা কেটে যাবে যুক্তি মেনে চললে—যুগটাকে বলা হত যুক্তির যুগ। এজন্য কাণ্ট-হেগেল প্রমুখের দর্শনে যুক্তির এত বন্দনা। ব্রহ্মের কথা বলতেও এঁরা যুক্তির কথা বলতেন, কেননা ওটাই ছিল যুগগ্রাহ্য পরিভাষা। কিন্তু তাঁদের ভিতরের কথাটি যে আলাদা ছিল—যুক্তির তুলনায় অনুভবের দিকেই ছিল তাঁদের ইঙ্গিত তা দেখিয়েছি। কাণ্ট তো যুক্তির

সীমানা দেখিয়ে যুক্তির অসম্পূর্ণতাই জ্ঞাপন করতে চেয়েছেন। যুগের পরিভাষাকে কেউই অগ্রাহ্য করেন না; কিন্তু পরিভাষাই তো বক্তব্য নয়। পরিভাষাকেই প্রধান করে তুলে তার ওপর সব লক্ষ্য নিবদ্ধ করলে বক্তব্য অনুধাবন করতে বাধা হয়; আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনায় এই বাধা অনেকেই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মর্মবস্তুতে প্রবেশ করলে দেখি আধুনিক যুগের মানুষের মূল সত্যানুভব দেকার্তে থেকে হেগেল পর্যন্ত প্রধান দার্শনিকদের বাণীতে পর্যাপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং রামকৃষ্ণের সাধনায় এই পৃথক পৃথক সত্যানুভব অপরূপ সমন্বয় লাভ করেছে। তাঁর সাধনার তাই-ই লক্ষ্য ছিল।

তিনি বলেছেন: যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে। যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ।

> নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহতারি।
> কারে নিন্দো কারে বন্দো দোনো পাল্লা ভারী॥

বেদে যাঁর কথা আছে তন্ত্রে তাঁরই কথা পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। (৩রা জুলাই ১৮৮৪, বলরাম ভবনে উক্ত)

রামকৃষ্ণের এই উক্তির মধ্যে এই ইঙ্গিতও নিহিত আছে যে আধুনিক দর্শনে ও বিজ্ঞানেও সেই এক সচ্চিদানন্দেরই কথা আছে—Reality, Substance, Absolute তাঁরই নাম। তিনি নিত্য, তাই সৎ; তিনি লীলাময় তাই ব্রহ্মাণ্ড হয়েছেন। পরিভাষার খোসা ছাড়ালে সত্যানুভবের যে সার বস্তু পাই তাতে বুঝি যে এক একজন দার্শনিক সত্যের এক এক অংশ অনুভব করেছিলেন। এক আংশিক সত্য ও অপর আংশিক সত্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়—এদের মধ্যে সমন্বয় করার প্রতিভা কারও ছিল না। এবং মানুষী প্রতিভার সে সামর্থ্যও থাকে না। মন অংশই দেখে, প্রতিভাবান দার্শনিকের মনও। কারণ তাঁরাও দ্বৈতভূমির লোক। সকল আপাত বিরোধীর সমন্বয় করতে পারেন অদ্বৈত পুরুষ স্বয়ং। তিনি এসে সমন্বয় না করলে যুগের মুক্তি ঘটে না—জ্ঞান উন্নত ভিত্তিতে দাঁড়ায় না। উন্নত সমন্বয়ের অভাবে খণ্ড জ্ঞান মানবমনে সংশয় ও ভ্রান্তি সৃষ্টি করে ও সমাজে বিদ্বেষ ও হানাহানি আনে। খণ্ড জ্ঞানের ভূমিকা তাই ধ্বংসাত্মক। সক্রেটিস-প্লেটো-আরিস্ততলের মতো

জ্ঞানী মনীষীদের দ্বারা সেবিত গ্রীক সভ্যতা ভেঙে পড়েছিল তার মূল কারণ খণ্ড জ্ঞানের দৌরাত্ম্য—সোফিস্টরা এই খণ্ড জ্ঞান সূত্রে প্রাপ্ত যুক্তিধারা এত চরমে টেনে নিয়ে যান যে তার আঘাতে কোনো মূল্যবোধ, প্রথা, ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান আর টিঁকতে পারেনি, সব ভেঙে গুড়িয়ে যায়। গ্রীক সভ্যতাকে জয় করে উত্থিত হয়েছিল রোমান সভ্যতা। সে সভ্যতায় বড় যোদ্ধা, বড় রাষ্ট্রনেতা, বড় কবি ছিলেন—কিন্তু সক্রেটিসের মতো জ্ঞানী জন্মাননি। মাঝারি মাপের দার্শনিক সম্বল করে খণ্ড জ্ঞানসমূহের সমন্বয় করা সম্ভব নয়; বড় দার্শনিকের পক্ষেও জ্ঞান-সমন্বয় অসম্ভব, কেননা যথার্থ জীবন্ত সমন্বয় দ্বৈতভূমির চেতনায় ঘটে না তাই রোমান সভ্যতাও উত্তরোত্তর সমাধান-অসম্ভব সমস্যার আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। তখন সমগ্র সভ্য পাশ্চাত্ত্য জগৎকে সমন্বয়ের আলোয় উদ্ভাসিত করে যীশুর জীবন ও বাণী। তাই সক্রেটিস-প্লেটো-আরিস্ততল প্রমুখ মহা মহা মনীষীদের দর্শনের চেয়েও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে যীশুর বাণী—সাদরে সে বাণীকে গ্রহণ করে পশ্চিমী জগৎ। খ্রীস্টীয় আদর্শই পতনোন্মুখ গ্রীকো-রোমান সভ্যতাকে নতুন শক্তি ও স্বাস্থ্যে সঞ্জীবিত করেছিল।

সেদিনও ইয়োরোপের ভিতর থেকে সমন্বয়ের প্রজ্ঞাবাণী আসেনি, এসেছিল এশিয়া থেকে—নাজারেথ নামক একটা অখ্যাত গ্রাম থেকে। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানে—প্রযুক্তিবিদ্যায়—দর্শনচিন্তায় মহা সমৃদ্ধ ইয়োরোপ খণ্ড খণ্ড জ্ঞান সঞ্চিত করেছে—জানেনি তাদের সমন্বয়। তাদের চূড়ান্ত বিকশিত মনীষার পক্ষেও এই সমন্বয়ের আলো লাভ সম্ভব ছিল না। কিন্তু আধুনিক ইয়োরোপের সমস্যা তো কেবলমাত্র তাদেরই সমস্যা নয়। আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে জাগ্রত ও উদ্যমশীল সমাজ বলে ইয়োরোপ আধুনিক বিশ্বমনের অনুভবকেই বাঙ্ময় করতে পেরেছে—কিন্তু সমস্যা সর্বজনীন, জগতের কোনো অংশ এই সমস্যার বলয়-বহির্ভূত নয়। মোহিতলাল মজুমদারের উদ্ধৃত উক্তিতে এ কথাটাই বলা হয়েছিল।

আধুনিক জগৎ খণ্ড জ্ঞানের প্লাবনে এতদূর ভাসিত যে অবশেষে মানুষের সব ধ্রুব মূল্যবোধ, কল্যাণবোধ, আদর্শবোধ, জীবনলিপ্সা পর্যন্ত চূর্ণিত হয়ে যাচ্ছে। সমাজে ও রাষ্ট্রে বিলাসী শক্তিসমূহের উদ্ভব ও পরাক্রমে মানবসমাজই ধ্বংসের সম্মুখীন। একজন মনীষী সমাজতত্ত্ববিদ লিখেছেন:

Modern man in the west first took shape in a period

of cultuaal distintegration : a slow, painful, largely unconscious process whose meaning did not become plain to him until all hope of arresting it had disappeared.

—Lewis Mumford : The Condition of Man,

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বাক্য।

এইই আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মানুষ সম্পর্কে নির্মম সত্য—এইই তার নিয়তি। শুধু পাশ্চাত্যের নয়, গোটা আধুনিক বিশ্বই পাশ্চাত্য-প্রভাবিত ও পাশ্চাত্যগ্রাসিত বলে এই-ই আধুনিক মানুষের নিয়তি : তার ব্যক্তিত্ব ও জীবনই বিশ্লিষ্ট হয়ে চূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু সমকালীন সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে যে তথ্যটি গোচর হয় নি তা এই যে এই অনিবার্য নিয়তিই যাতে শেষ পর্যন্ত মানবনিয়তি না হয়ে ওঠে—ঐ ক্রূর নিয়তিকেও যাতে পরাস্ত করা সম্ভব হয় সেজন্য পৃথিবীর আর এক প্রান্তে এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে এবারেও একটি মানুষ এসেছিলেন—সব খণ্ড জ্ঞান যাঁর তপস্যার আলোয় সমাহৃত ও সমন্বিত হয়ে অভিনব হার্দ্য অখণ্ড জীবন্ত উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে—খণ্ড জ্ঞানের বিষ যে অদ্বৈত পুরুষ স্বকণ্ঠে ধারণ করে মানুষের সঞ্জীবনী অমৃতে রূপান্তরিত করেছেন।

হেগেল তাঁর সময়ে একটা জ্ঞান-সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন এবং জগৎ ও জীবনের একটি সামগ্রিক ধারণা গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি সফল হন নি। কিন্তু তাঁর শিষ্য কার্ল মার্ক্স এরূপ একটি সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনের প্রেরণা পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে। মার্ক্সও যে বিফল হলেন ও একপেশে, একদেশ-দর্শী, dogmatic দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করলেন এতেই বোঝা যায় যে মানব-মনীষা মাত্র সম্বল করে প্রকৃত সমন্বয় ও কলুষমুক্ত অভিনব সৃষ্টি সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয় তা হেগেলের ইতিহাস-দর্শন অনুধাবন করলেই বোঝা যায়।

হেগেলের মতে মানুষের ইতিহাস স্তর-পরম্পরায় পরমের আত্ম-উন্মীলনের কাহিনী—ইতিহাসের গতিশক্তি পরমই জোগান। তাই কোনো যুগকে তার পূর্ব ও পরের যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না ; এবং ইতিহাস শুধু যুদ্ধের, শুধু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বা শুধু শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস নয়। সবই পরমের আত্মপ্রকাশ—তাই ইতিহাসের গতিচ্ছন্দ বুঝতে হলে একটি যুগের সমগ্র সংস্কৃতিকেই নিতে হয় ; বিচ্ছিন্ন বিচার নিরর্থক। লাইবিনিৎস ও নিউটন বহু দূরে বসে একই সঙ্গে differential calculas আবিষ্কার করলেন

কিভাবে? এটা আপতিক ঘটনা নয়—এক ভাবই উভয়কে আন্দোলিত করেছে,—এক ভাবই ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিতে তখন অস্মপ্রকাশ-উন্মুখ ছিল। কালাতীত, নিরাকার, নৈর্ব্যক্তিক নির্দিষ্ট কালে. আকারে ও ব্যক্তিতে concrete রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চান—মানুষের ইতিহাস তারই ফলে গড়ে ওঠে। তারই ফলে প্রত্যেক যুগ চরিত্রবৈশিষ্ট্য পেয়ে যায়—আমরা বলি রেনেশাঁসের যুগ, বিপ্লবের যুগ ইত্যাদি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন সাহিত্য, শিল্প, রণনীতি কোনো কিছুই যুগলক্ষণ এড়াতে পারে না।

মানুষের ইতিহাস পরমের বাস্তব রূপ-সৃষ্টির ইতিহাস। এই ইতিহাসে সংঘর্ষ ও বিপ্লবের প্রয়োজন ঘটে—মহতী বিনষ্টিরও প্রয়োজন ঘটে। সব সময়ই বাদী ও প্রতিবাদী শক্তি দ্বন্দ্বরত হয়। উভয় পক্ষই মনে করে যে সত্য তারই হাতে অতএব তার প্রস্তাবিত সমাধানই শ্রেষ্ঠ সমাধান। কিন্তু উভয় পক্ষই একদেশদর্শিতাদোষদুষ্ট; তাই উভয়ের মারয়া প্রয়াস সংকটকে তীব্রতর করে। কিন্তু এ দ্বন্দ্বে জয়ী হয় না কোনো এক পক্ষ, বিনাশ ঘটে উভয়েরই। তখনই পূর্বের ধারাবাহিকতায় যেন ছেদ আসে, একটা উল্লম্ফন ঘটে যায়, তাকে বলি বিপ্লব। পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শুধু রাজনীতিতে নয়, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিকলায়, অর্থনীতিতে, শিল্পে সাহিত্যে এমন বিপ্লব ঘটে—যদিও রাজনৈতিক বিপ্লবই বেশি নাটকীয়। বিপ্লবেও গতি থামে না। নবজাত ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত আবার তার প্রতিবাদীর জন্ম দেয় এবং সুরু হয় দ্বন্দ্ব বিনাশ ও নব সৃষ্টির পর্যায়। এভাবে সত্য ক্রমশ তার আংশিক প্রকাশ থেকে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রকাশের দিকে এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে চলার পদ্ধতিটি দ্বান্দ্বিক। দ্বন্দ্বই ইতিহাসে গতি ও প্রগতির উৎসমূল।

পরম ভাবই রিয়ালিটি—মানুষে এসে তিনি আত্মচেতন, আত্মবিৎ হয়েছেন। এই যে বারবার তিনি দ্বন্দ্ব ও তার উন্নততর নিরসন—Aufhebung—ঘটাচ্ছেন—এ তো উদ্দেশ্যহীন নয়। তাঁর উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য তাঁরই ক্রমপরম্পরায় ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর আত্ম-উপলব্ধি। তাই তাঁর প্রতি পদক্ষেপে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায়—ধর্ম ও সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, সভ্যতা ও বর্বরতার বিরোধ ও বিনাশ, রক্তাক্ত বিদ্রোহ ও যুদ্ধের অট্টহাস্য। প্রতি পদক্ষেপে পরম তাঁর পূর্ণতর আত্মচেতনার দিকে এগোন, মানবতাও এগোয় একটি ধাপ।

হেগেল জাতিকে মনে করেছিলেন পরমের এই পর্যায়ক্রমিক আত্মপ্রকাশ-লীলার মুখ্যবাহন। তাই জাতীয় সত্তা, জাতীয় বোধ, জাতীয় দর্শন, জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় নিয়তি ইত্যাদি খুব গুরুত্ব পেয়ে যায় সেকালে এবং নেপোলিয়নোত্তর ইয়োরোপে জাতীয়তাবাদের প্লাবন আসে। ফরাসী বিপ্লবের ভাবুকরা শিখিয়েছিলেন যে বিশ্বের সব মানুষ ভাই-ভাই, ভুল শিক্ষাই বিচ্ছেদবোধ সৃষ্টি করেছে, জাতীয় সীমানাও অবান্তর। নেপোলিয়নের হাতে পরাস্ত জার্মানীর আহত অভিমান এই জাতিসত্তালোপের তত্ত্বে তৃপ্তি পায়নি। হেগেলের ইতিহাস-দর্শন পীড়িত জার্মান মানসকে সঞ্জীবিত করেছিল—পিটার্সবুর্গ ও মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ও ফরাসী বিপ্লবের তত্ত্বের বদলে এই নতুন জাতীয়তাবাদে আস্থাকে বরণ করে। হেগেল বোঝালেন যে জাতির ঐতিহাসিক ভূমিকার metaphysical বা পারমার্থিক আবশ্যকতা আছে। পরম ভাবের তনু যে জাতি। এই ঐতিহাসিক অবস্থান মেনেই আমাদের চলতে হবে, বুঝতে হবে যে আমরা একটা নির্দিষ্ট সমাজের লোক—বায়বীয় আন্তর্জাতিকতা শূন্য বস্তু। মানতে হবে এই বাস্তবতা, কেননা পরমের কানুনই ইতিহাসের কানুন (laws)।

তাহলে ইতিহাস পরমের ক্রমাগত স্বয়ংস্বচ্ছ হবার ইতিহাস। পরমচৈতন্য আত্মচেতন হচ্ছেন—ইতিহাস ঐই চৈতন্যের চেতনালাভের কাহিনী। তাই হেগেলের মতে সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটে চৈতন্যের ক্ষেত্রে—সক্রেটিস, বুদ্ধ যীশুরাই বিপ্লবের মহত্তম নেতা। রাজনৈতিক বিপ্লব সে তুলনায় সামান্য ব্যাপার।

সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মহলে কদর হলেও হেগেলের দর্শন জ্ঞান-সমন্বয়ের ভিত্তি হতে পারেনি, মনে হয়েছে এ যেন একটা দেশ ও কালের দ্বারা অনুরঞ্জিত মত বিশেষ মাত্র। The real is the rational and the rational is the real হেগেলের এই উক্তি অবশ্যই রক্ষণশীলদের খুব কাজে এসেছিল: প্রতিষ্ঠিত বাস্তবই একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা ও পরমের ঈপ্সিত, একথা মানলে সুবিধা হয় কার? প্রাশিয়ান রাষ্ট্রই পরমের অন্তিম অভিব্যক্তি; তাই ডায়ালেকটিক পদ্ধতিরও ওখানেই সমাপ্তি। অতঃপর প্রাশিয়ান রাষ্ট্রই অজর অমর হবে। একথায় তৎকালীন প্রাশি[illegible] শাস[illegible] খুশি হ[illegible] [illegible]কালের গতিচ্ছন্দে এসব বাচনিক বিলাস[illegible] [illegible] উড়ে গেছে—[illegible]কোথায় গেল সে প্রাশিয়ান রাষ্ট্র? [illegible] হেগেলপ[illegible] [illegible]তাই [illegible] মান [illegible]র্থে ব[illegible]

বাক্যের শেষাংশটুকুই শুধু গণ্য—the rational is the real. তাই চাই যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন, সব অযৌক্তিককে হঠাও। এই যুবাদের মধ্যে মার্ক্স ও ছিলেন। তিনি হেগেলের পরমকেও মানতেন, তবে পরম আত্মা নয়, পদার্থ। তাঁর মতে এক অদ্বৈতই আছে—সে অদ্বৈত ব্রহ্ম নয়, পদার্থ। মার্ক্সের এ বস্তুবাদও আংশিক সত্যের প্রতিফলন ; কেবল-ব্রহ্মবাদের প্রতিক্রিয়াজাত এ মত, প্রতিবাদী মত, অ্যান্টি-থিসিস। উন্নততর জ্ঞান-সমন্বয়ের ভিত্তি একদেশিক মত হতে পারে না। তাই মার্ক্সীয় মতও বহু মতের মধ্যে যুদ্ধমান একটি মত—তা বিজ্ঞান নয়।

রামকৃষ্ণ সমন্বয় করেছেন—একথার অর্থ এই নয় যে তিনি বিভিন্ন দর্শনের সিদ্ধান্তগুলির সমন্বয় করেছেন। তিনি দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, অন্তত আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শনের বাগবিতণ্ডার সঙ্গে নয়। একের বক্তব্যের সঙ্গে অপরের বক্তব্যের যোগ ঘটানোকে সমন্বয় বলেও না। প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য এক জিনিস নয়। পাণ্ডিত্যের স্বভাব বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করা, তুলনামূলক বিচার করা ও কোনো মতের পক্ষপাতী হওয়া বা নিরপেক্ষ থাকা। প্রতিভা আপন অগোচরেই পরিপার্শ্ব থেকে প্রচলিত মতগুলিকে আত্মসাৎ করে ও নতুন মত সৃষ্টি করে। দিব্য প্রতিভা শ্রুত ও অশ্রুত, স্ফুট ও অস্ফুট সব বাণীর মর্মবস্তুকে এক অখণ্ড বস্তুর আকার দেয়।

রামকৃষ্ণ এরও ঊর্ধ্বে। তিনিই সমগ্র সত্য, অদ্বৈত সত্য,—সত্য তিনি জ্ঞানের দ্বারা জানেন না, সত্যস্বরূপ তিনি। সব আংশিক সত্য তাঁর সত্তাতেই বিধৃত—সেই সত্তাই সমগ্র ও অখণ্ড সত্য। বিশ্বে যত মানুষ সত্য উপলব্ধি করেছে—হোক আংশিক—তা তাঁর বাইরে নেই। তিনি বিভিন্ন উপলব্ধির সমন্বয় করেননি, তিনিই সমন্বয়-বিগ্রহ। প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান অখণ্ড সত্যকে জানার কাজে ব্যাপৃত ; নিরন্তর সত্য-আবিষ্কারের অভিযান করে চলেছেন মনীষী, জ্ঞানী, ভাবুক ও সাধকরা—সে আবিষ্কারের সমাপ্তি নেই। কারণ তাঁদের সব অনুসন্ধানই দ্বৈতভূমিতে দাঁড়িয়ে ; অদ্বৈতের খণ্ড খণ্ড আলো সেখানে এসে পৌঁছায় মাত্র, অদ্বৈত তার সমগ্র স্বরূপে প্রকাশিত হয় না এখানে। তাই ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে সত্যকে দেখেন ও জানেন মনীষীরা ; সকলের দেখাতেই সত্যের আংশিক উদ্ভাসন ঘটে ; তাই মুনিদের মতভেদের অন্ত নেই।

আধুনিক যুগের প্রধান দার্শনিকদের কথা বলেছি ; এঁদের শেষজন হেগেল

রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বেই দেহরক্ষা করেন। আধুনিক যুগজিজ্ঞাসা এঁদের পরও এগিয়েছে, হেগেলেই আধুনিক দর্শন পরিসমাপ্তি লাভ করেনি। সে পরবর্তী কথা আমরা পরে আলোচনা করব। এখানে স্মরণীয় এই যে রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে যখন তপস্যা করতে বসেছিলেন তখন তাঁর পূর্ববর্তী সকল জিজ্ঞাসা, অন্বেষণ ও উপলব্ধিকে আত্মসাৎ করে নিয়েই যুগের ও মানবতার পূর্ণ মুক্তির পথ নির্মাণে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। ওই তাঁর সাধনার মূল কথা। স্বয়ং পরম বলে পরমের স্বরূপ তিনি জানতেন—সে জানার জন্য নতুন করে সাধনার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। ঈশ্বরলাভ তাঁর সাধনার উদ্দেশ্য নয়—কেননা ও তো তাঁর চির সিদ্ধ বস্তু! জগৎ ও জীবনকে সত্যময় ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তাঁর আবির্ভাব; তাই-ই তাঁর সাধন লক্ষ্য। সেজন্যই এযুগে সত্যের যে নব পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হচ্ছিল—আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে সজীব ও উদ্যমী মহাদেশে সত্যের যে বাণীমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল তার সংবাদ না নিলে রামকৃষ্ণের সাধনার বিশালতা ও গভীরতা বোঝা যায় না। সত্যোপলব্ধির দেশবিদেশ ও জাতিবিচার হয় না। সত্যবাণী বিশ্বজনীন। তাই রামকৃষ্ণ যে যুগে এসেছেন ও সাধনা করেছেন সে যুগের জিজ্ঞাসার স্বরূপ বুঝতে পাশ্চাত্য মনীষীদের কণ্ঠস্বর শুনতে হয়। রামকৃষ্ণও যে বিশ্বজনীন।

১০

রামকৃষ্ণের সাধন লক্ষ্য

সত্যই rational এবং সত্যই real. সব সত্যকামীরই এই বক্তব্য। আমরা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় সতত যার মুখোমুখি তা actual বটে, কিন্তু real নয়, অতএব rational নয়, সত্যও নয়। আমাদের প্রাকৃত দৃষ্টিতে আমাদের অভিজ্ঞতাটুকুই একমাত্র নিশ্চিত ব্যাপার। অভিজ্ঞতা যা দেখায় তা হল fact. মানবজাতির জন্মকাল থেকে এ পর্যন্ত নিরন্তর সম্মিলিত প্রয়াসে ও অভিজ্ঞতায় ক্রমে ক্রমে আমরা fact জানছি; কিন্তু পুরা facts জনাতে পারিনি। জানা যায় না। আমরা অংশই জানি, সমগ্রকে নয়। তাই জানার অভিযান কোনোদিন শেষ হবে না। জ্ঞানীমহলে একথা স্বীকৃত যে পুরা facts বিধৃত আছে Reality-তে। সত্যই রিয়ালিটি। আমরা actual কে জানি আমাদের আংশিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায়, Real কে নয়।

actual নানা অসঙ্গতিতে, স্ব-বিরোধিতায়, অন্যায়ে ও মায়ায় ভরা। এই actual-এর কর্তৃত্ব, চাপ ও পীড়ন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টাই জ্ঞানীর, শিল্পীর ও বিদ্রোহীর চেষ্টা। সাধকেরও। রিয়ালিটির অভিমুখে এগোতে হলে actual কে নাকচ করার দরকার পড়ে। তাই নেতি নেতি বিচার ও ত্যাগ।

রামকৃষ্ণ বলেন, জ্ঞানী—হোক সে ব্রহ্মজ্ঞানী—actual কেই জানে, রিয়ালকে নয়। ভাষাটি তাঁর নয়, বলা বাহুল্য। scientistও এই জ্ঞানী সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এই জ্ঞানীর জ্ঞান সর্বদাই আংশিক, একপেশে। সাধারণ প্রাকৃত মানুষ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকে তফাৎ আছে। সাধারণ মানুষ চোখে-দেখা, কানে-শোনা তথ্য নিয়ে চলে। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি খতিয়ে দেখেন, যন্ত্রের সাহায্যে দেখেন ও শোনেন, গবেষণাগারে বিচার বিশ্লেষণ করেন, তীব্র বুদ্ধির রশ্মিসম্পাতে তথ্যের ভিত্তিতেই সামান্যীকৃত নিয়ম ঘোষণা করেন। ব্রহ্মজ্ঞানী হয়তো আরও বেশি। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সহায়ে তিনি আরও খানিকটা বেশি জানেন। পদার্থজ্ঞানের অতিরিক্ত ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর হয়।

রামকৃষ্ণ বলেন, সাধারণ মানুষ যদি পিঁপড়ে তবে ব্রহ্মজ্ঞানীরা বড়জোর ডেঁয়ো পিঁপড়ে, তার বেশি নয়। সব জ্ঞানই অংশ জ্ঞান। তাই যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞান আছে, যার আলো বোধ আছে তার অন্ধকার বোধ আছে, সুখবোধ যার, দুঃখবোধ থেকে তার ত্রাণ নেই। তাই রামকৃষ্ণ একটি নতুন কথা বলেছেন, জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাও, বিজ্ঞানী হও। তাঁর 'বিজ্ঞানী' শব্দটি তাৎপর্যে নতুন। তার অর্থ সায়েন্টিস্ট নয়।

দক্ষিণেশ্বরে তিনি বিজ্ঞানের সাধনা করেছিলেন। প্রচলিত অর্থে বিজ্ঞান নয়। Reality বা অখণ্ড সত্যকে একবারে জানাই শুধু নয়, তৎস্বরূপ হওয়াই রামকৃষ্ণ-কথিত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য। যিনি Reality স্বরূপ অথবা স্বরূপেই অখণ্ড অদ্বৈত সত্যমূর্তি তাঁর মনেই একথা উদয় হওয়া সম্ভব। আর সকলের পরিণাম,—যেমন মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। আল্লা পর্যন্ত নয়। সাধক হয়তো আল্লার নূর পর্যন্ত দেখে। আল্লাস্বরূপ হয় না। অথবা স্বরূপে সে আল্লা নয়।

আমি কার্ল মার্ক্সের কথা বলেছি। তিনি রামকৃষ্ণের সমসাময়িক। তিনিও মহাতপস্বী, মহাসাধক। সত্যের জন্য সর্বত্যাগী। actualকে অতিক্রম করে real-এর সন্ধান করেছেন। তাঁর একনিষ্ঠ অতন্দ্র সাধনায় ফাঁকি ছিল না। যা সত্য জেনেছেন তার সঙ্গে আপস করেননি। অপরিসীম দুঃখ বরণ করেছেন তবু লক্ষ্যচ্যুত হননি। যুগজিজ্ঞাসা, সত্যজিজ্ঞাসা তাঁর জীবনে ও কর্মে বাঙ্ময়। সেজন্যই তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলব্ধ সিদ্ধান্তগুলি উপেক্ষা করে রামকৃষ্ণের বিজ্ঞান আলোচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। আলোচনা তাতে অসম্পূর্ণ থাকে, রামকৃষ্ণের বিজ্ঞান বস্তুটি কী তাও বোঝা দুষ্কর হয়। একই যুগে দুজন মানুষের সাধনা ও সাধনফল সত্যের কোন ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমাদের দেখায়? সত্য নিরঞ্জন। তা দেশ, জাতি ও মত বিশেষের সম্পত্তি নয়। মার্ক্সের বাণীও সত্যের বাণী এবং রামকৃষ্ণের সমসময়েই তা উচ্চারিত। রামকৃষ্ণের অখণ্ড দৃষ্টিতে কোনো সত্যোপলব্ধিই তো উপেক্ষিত হয়নি। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তা হয় না। তাঁর রাগদ্বেষ নেই। তিনি খণ্ডতার ঊর্ধ্বে, দ্বৈতকে ছাপিয়ে তাঁর বিজ্ঞানে মার্ক্সের জ্ঞান নিশ্চয়ই ঠাঁই পেয়েছে। মার্ক্সীয় তত্ত্বোপলব্ধি রামকৃষ্ণের সমগ্রতায় অঙ্গীকৃত।

হেগেলের শিষ্য মার্ক্স সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনের আর একটি ধারাকে মেনেছিলেন। প্রাচীন কালেও এই ধারা বর্তমান ছিল—ভারতে ও

ইয়োরোপে। আধুনিক যুগে এই ধারার সূত্রপাত করেন ইংরেজ ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬)। বারো শতকেই রোজার বেকন বলেছিলেন, আকাশের দিকে না তাকিয়ে মাটিতে দৃষ্টি রেখে পথ চল। ফ্রান্সিস তাঁরই ভাবশিষ্য। তিনি যুগপৎ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, কিন্তু কোনোটাই তেমন বড় ভাবে নন। তিনি সংঘবদ্ধ বিজ্ঞান-চর্চার কথা প্রথম বলেছিলেন ও তাঁরই প্রেরণায় ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬৬২ খ্রীঃ)। বেকন বলেন যে ইন্দ্রিয়-জাত জ্ঞানই জ্ঞানের উৎস। এই জ্ঞানকেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে পরিশুদ্ধ ও ব্যাপক করে নিতে হবে। বৈজ্ঞানিক সুসংস্কৃত জ্ঞানই হতে পারে দর্শনের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি।

বেকনের সেক্রেটারি টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) গুরুর চেয়েও একটু বেশি এগোন, হন বস্তুবাদী। তিনি বলেন, যা কিছু অস্তিত্ববান তাই পদার্থ, গতিই পরিবর্তন। পদার্থ ও গতিই জগতের প্রথম ও শেষ সত্য। পরম রিয়ালিটি হল গতিবিধৃত পদার্থ। পদার্থের পরপারে কিছু নেই। ফলে ব্যক্তির অহংবাদ ও সুখবাদের ভিত্তিতে হবস তাঁর নীতিশাস্ত্র ও রাজনৈতিক দর্শন গড়ে তোলেন। মানুষ শুধু তার স্বার্থ মেনে চলে ও তাই চলা উচিত—এই তাঁর মত। বল প্রয়োগ ও প্রতারণাই রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সঙ্গত গুণ বলে তিনি তিনি দাওয়াই দেন। রাজা সর্বশক্তিমান, তিনি কোনো অন্যায়ই করতে পারেন না, এও তাঁর মত। প্রজারা রাজার হুকুম মুখ বুজে মানতে বাধ্য। স্বার্থপর লোক পারস্পরিক নিরাপত্তার স্বার্থে একটি সামাজিক চুক্তি করে মাত্র—এই তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা।

জন লক (১৬৩২-১৭০৪) বস্তুবাদী, জ্ঞান বলতে তিনিও ইন্দ্রিয়নির্ভর জ্ঞান ও যুক্তিকেই বোঝেন, ঈশ্বরের ধারণাও মানুষের মন-গড়া বলে তাঁর অভিমত। যদিও ঈশ্বর নামে একজন আছেন একথাও তিনি অস্বীকার করেননি।

আইরিশ জর্জ বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩) এম্পিরিসিষ্টই বটে, কিন্তু পদার্থের অস্তিত্ব সম্পর্কেই তাঁর সন্দেহ; যা আছে তা মনেই আছে। আমাদের মনই দেখে, শোনে, ধারণা করে তার বাইরে কোনো কিছুই নেই। বস্তু আছে আমার চেতনায়; আমার চেতনা নির্ভরশীল 'আমি আছি' এই বোধের ওপর; বোধটি আছে মনে। মনের চিন্তার বাইরে কিছু নেই, আমিও না, বস্তুও না। অবশ্য ঈশ্বরে বিশ্বাস বার্কলিও করেন।

ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) মনেই সব আছে একথা স্বীকার করেই

স্থাপন করেন প্রত্যক্ষতাবাদ—বার্কলির self বা ঈশ্বরের গুরুত্ব কমিয়ে দিলেন বা প্রায় অস্বীকার করলেন।

ব্রিটিশ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদী বা empiricistদের ধারা ফরাসী দেশে সমাদৃত হয়েছিল। ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) স্বদেশে গোলমাল বাধিয়ে ইংলণ্ডে আসেন ও বহুদিন সেখানে থেকে হয়ে পড়েন ইংরেজি আদব-কায়দা ও দর্শনের ভক্ত, বিশেষত লকের দর্শন তাঁকে ভাবায়। সে যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক ভলতেয়ার গোটা ইয়োরোপকে empirical চিন্তাধারায় দীক্ষিত করেছেন বলা যায়। তিনি নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু মনে করতেন যে ঈশ্বরের মতোই পদার্থও অনাদি। ফলে ঈশ্বরের ক্ষমতা সীমিত, পদার্থের দ্বারাই তিনি সীমিত। লাইবিনিৎসকে অতিশয় ব্যঙ্গ করেছিলেন তিনি যা ঘটে তাই-ই সর্বোত্তম একথা বলার দরুণ, 'ক্যাণ্ডিড' উপন্যাসে লাইবিনিৎসকে ব্যঙ্গ করতেই এঁকেছেন প্যাঙ্গোলাসের চরিত্র। ডেনিস দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৫), এটিয়েন বনেট গু কণ্ডিলাক (১৭১৫-১৭৮০), হেলভেসিয়াস (১৭১৫-১৭৭১) ইংরেজি দর্শনের বক্তব্যই প্রচার করেছেন ফরাসী ভাষায় ও স্বস্ব অভিরুচি অনুসারে; ভিয়েডরিক ভন হলব্যাক (১৭২৩-১৭৮৯) প্রচার করেছিলেন খোলাখুলি বস্তুবাদ। আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন তিনি। এঁদের সঙ্গেই আমরা পৌছাই ফরাসী বিপ্লবের যুগে, যার অন্যতম দার্শনিক জ্যঁা জ্যাক রুশো। তিনি যতটা তাঁর রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্বের জন্য খ্যাত, পরমার্থ প্রসঙ্গের জন্য ততটা নন।

কার্ল মার্ক্স হেগেলের শিষ্য হলেও ভাববাদী তথা ঈশ্বরবাদী না হয়ে হলেন আপসহীন বস্তুবাদী এবং গুরুর কাছ থেকে ডায়ালেকটিকস বা দ্বন্দ্বতত্ত্ব গ্রহণ করে বস্তুবাদকে সংস্কৃত করে দ্বান্দ্বিক বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রচার করলেন—এতাবৎকাল প্রচলিত বস্তুবাদকে যান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে। আগেই বলেছি, কেবল-ব্রহ্মবাদের প্রতিক্রিয়াক্রমেই এসেছিল মার্ক্সীয় কেবল-বস্তুবাদ; যা এক আংশিক সত্যের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে আর এক আংশিক সত্য দিয়েই প্রতিবাদ জানানো। কিন্তু হোক আংশিক, তবু সত্য অনুপস্থিত নয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদে। অতএব তার সন্ধান নেওয়াই বিধেয়।

মার্ক্স ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা করে দার্শনিক রীতিসম্মতভাবে আস্ত একটা বই লেখেননি—তাতেই মার্ক্সবাদীরা নানারকম ব্যাখ্যার সুযোগ পেয়েছেন, যার সবটাই মার্ক্সসম্মত নয়। ১৮৪৩-৪৮ সালে মুখ্যত প্যারিসে বসে ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে তিনি এই বিষয়ে কিছু লিখেছিলেন—এসবই ত্রিশ বছর

বয়সের আগেই লেখা। পরবর্তীকালে শিষ্যরা এই সব লেখার যে অর্থ দাঁড় করান তাতে মার্ক্স খুশি হননি। ১৮৪৫-৪৬ সালে ছয়শো পাতার ঠাসবুনোট একটি বই তিনি লিখেছিলেন, The German Ideology. তাতেই, বিশেষত তার দীর্ঘ ভূমিকায় মার্ক্স ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব গুছিয়ে লিখেছিলেন। বইটি তাঁর জীবদ্দশায় বেরোয়নি। ফলে এ বইয়ের বক্তব্যের কী কী সমালোচনা হতে পারে তা তিনি জেনে ও জবাব দিয়ে যেতে পারেননি।

এই বইয়ে মার্ক্স বলেছেন যে মানবজাতির ইতিহাস একটি সমগ্র প্রবাহ, পুনরাবৃত্তি তাতে হয় না। জীবনের শেষভাগে একজন রুশ পত্রদাতাকে তিনি লিখেছিলেন যে রোম সাম্রাজ্যের প্লেবিয়ান ও আধুনিক শিল্পযুগের প্রলিতারিয়েতের মধ্যে অনেকটা মিল থাকলেও তারা স্বতন্ত্র বিষয়, স্বতন্ত্র চরিত্রের অধিকারী—তাদের মধ্যে অমিলও কম নয়। তাই একটা ছাঁচে ফেলে কোনো ঐতিহাসিক যুগ বা বিষয়কে বোঝা যায় না, বুঝতে হয় তার স্বাতন্ত্র্যসহ।

ইতিহাস একটি প্রবাহ, তার প্রতিটি মুহূর্তের নতুন বৈশিষ্ট্য থাকে বা জ্ঞাত বৈশিষ্ট্যগুলির নতুন যোগ-সমন্বয় ঘটে। প্রতিটি মুহূর্ত সেই অর্থে নতুন ও স্বতন্ত্র হলেও ইতিহাস জুড়ে কয়েকটি কানুনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এম্পিরিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সেসব কানুনের সন্ধান করতে হয়, অতীন্দ্রিয়বাদের ভুয়ো আলো পরিহার্য। জীবন নিরালম্ব নয়, আছে তা সমাজে, অতএব সামাজিক পরিবেশের প্রকৃতিতেই খুঁজতে হবে উত্তর। সমাজের বিকাশ ঘটে ক্রমাগত দ্বন্দ্বের ফলে—বিপরীত শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের ফলেই আসে অগ্রগতি। অগ্রগতি টানা ধারায় হয় না; দ্বন্দ্ব এমন তীব্র সংকটমুহূর্ত ঘনিয়ে তুলতে পারে যখন একটা ধ্বংসকর ব্যাপার ঘটে যায়, একটা বিস্ফোরণ যেন—তখন পরিমাণগত পরিবর্তনের বদলে গুণগত পরিবর্তনই ঘটে যায়, একটা নতুন যুগের আবির্ভাব হয়। আমরা তাকে বলি বিপ্লব।

কোন কোন শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটে? হেগেল বলেছিলেন যে আধুনিক কালে এই দ্বন্দ্ব ঘটছে জাতির সঙ্গে জাতির—জাতিই এযুগে বিশ্ব-আত্মার প্রকাশ-মাধ্যম। মার্ক্স বিশ্ব-আত্মা মানেন না, জাতিই ইতিহাস প্রবাহের প্রধান বাহন, তাও মানেন না। তিনি বললেন: দ্বন্দ্ব ঘটছে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর—শ্রেণী হল উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি বিশেষ অবস্থানের দ্বারা যে যে সামাজিক গোষ্ঠীর জীবন নিয়ন্ত্রিত তাদের নিয়েই। সামাজিক উৎপাদন-কর্মে একজন ব্যক্তি যে অংশ নেয় তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় তার অবস্থান।

উৎপাদন-শক্তির চরিত্র ও বিকাশের কোন স্তরে তা রয়েছে তারই ওপর নির্ভর করে ব্যক্তি কোন অংশ নেবে তা। সমাজে আমরা পরস্পরের সঙ্গে যে সম্পর্কে আবদ্ধ হই তার মূলে আছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক। উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিকানার ওপরই নির্ভর করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

মানুষ তার পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুলতে চায়। এজন্য সে জগতের ওপর ও নিজের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনে অভিলাষী—ঐটই মুক্তি। ধ্যানের সাহায্যে এ কর্তৃত্ব আসে না। আসে কাজের সাহায্যে, শ্রমের দ্বারা। মানুষ সচেতনভাবে পরিবেশকে ও পরস্পরকে রূপান্তরিত করতে পারে শ্রমেরই সাহায্যে। সেজন্য চিন্তা, সংকল্প ও কাজের ঐক্য চাই। তত্ত্ব ও আচরণের সাযুজ্য দরকার। শ্রম মানবজগতকে ও মানুষকেও রূপান্তরিত করে। পশুরা তা পারেনা—তারা কেবলই নিজেদের পুনরাবৃত্ত করে। মানুষ নতুন থেকে নতুনতর হয়ে ওঠে। তাই পশুর ইতিহাস নেই, মানুষের আছে। সমাজের ইতিহাস হল মানুষের আবিষ্কারধর্মী শ্রমের ইতিহাস—যা মানুষের কামনা, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গী, প্রকৃতি ও অপর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক এসব কিছুকেই পরিবর্তন করে দেয়। মানুষের অন্যতম আবিষ্কার হল শ্রমবিভাগ। আদিম সমাজেই এ আবিষ্কারটি ঘটেছিল। ফলে সমাজের উৎপাদন সামর্থ্য বেড়ে গিয়েছিল, জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির চেয়েও উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল। এই সম্পদ-সঞ্চয়ের ফলে অবকাশভোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হল, ফলে সংস্কৃতিরও। কিন্তু অভিশাপ এল আর একদিক থেকে—সৃষ্টি হল অবকাশভোগী শ্রেণীর, যারা উদ্বৃত্ত সম্পদ কুক্ষিগত করল। জনসাধারণকে বঞ্চিত ও দাবিয়ে রাখার সাহায্যেই এটা সম্ভব ছিল; তাদের খাটতে বাধ্য করে ও সেই পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করে শোষক শ্রেণীর উদ্ভব হল। সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হল শ্রেণীতে-শ্রেণীতে—নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিত; শোষক ও শোষিত। প্রযুক্তিকলায় প্রগতি এল তার ফলে, এটা শুভ, কিন্তু শোষণের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বাড়ল, এটা ইতিহাসের অগ্রগতির অনিবার্য খেসারত। হেগেল বলেছিলেন, এভাবে বিশ্বাত্মা নিজেকে উপলব্ধি করতে চাইছে; মার্কস বললেন, হেগেলের বিশ্ববীক্ষা সৎ, কিন্তু ব্যাখ্যাটি অসৎ। বস্তুত হেগেলের মতও তাঁর সামাজিক পরিবেশজাত, এইটা না বোঝাতেই হেগেল তাঁর তত্ত্বকে পরম সত্যের সীলমোহর পরিয়েছেন। তা যদি হয়, তাহলে বলতেই হয় যে মার্কসের মতও তাঁর সামাজিক পরিবেশজাত, তাৎক্ষণিকত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও বিদ্ধ;

তাকেও শাশ্বত সত্যের মর্যাদা দেওয়া চলে না। হেগেল যদি শ্রেণীস্বার্থের দায়ে পড়ে myth প্রচার করে থাকেন, তবে মার্কসীয় মানসের পিছনেও শ্রেণীস্বার্থের দোলা নেই এবং তিনিও যে আর একটি বিকল্প myth প্রচার করছেন না সেকথা বলার ধৃষ্টতা হবে কার? মহাকাল কারও ধৃষ্টতাই মার্জনা করেন না—বুর্জোয়ারও না, প্রলিতারিয়েতেরও না। উভয় শ্রেণীর শ্রেণীবুদ্ধি-আক্রান্ত দার্শনিকই কালচিহ্নিত খর্ব সত্য প্রচার করেছেন।

মার্ক্সের মতে মানুষ ক্রমাগত তার প্রযুক্তিবিদ্যায়, উৎপাদন-ব্যবস্থায়, উৎপাদন-সম্পর্কে, ভাবধারায়, মূল্যবোধে, আদর্শে ও নিজেতে রূপান্তর আনছে। এই নিরন্তর রূপান্তরণ সব কাজ ও সৃষ্টির মূল রহস্য। ফলে কালাতীত সত্য, আদর্শ, লক্ষ্য ও শাশ্বত মানবিকতা বলে কিছু নেই। বর্তমান যুগের কথা যদি বল তবে এরও বৈশিষ্ট্য শ্রেণীযুদ্ধ; শ্রেণীযুদ্ধই এযুগের ব্যক্তি ও সংঘ-সমূহের দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করে দিচ্ছে। এযুগের সংস্কৃতির ঐতিহাসিক সত্য হল এই। এ সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে সঞ্চয়ের ওপর এবং ঐ সঞ্চয় কে আত্মসাৎ করবে তা নির্ভর করে সেই শ্রেণী যুদ্ধের ওপর। এ যুদ্ধ হয়তো বিবদমান সব পক্ষকেই উন্মূল করে দেবে। কিন্তু এ যুদ্ধ ঐতিহাসিক বলেই, কালসীমায় আবদ্ধ, চিরন্তন নয়। অতীতেও শ্রেণীসংগ্রাম হয়েছে, এক একটি পর্যায়ে ঘটেছে তার উপশম; এবারও ঘটবে। মানুষের ইতিহাসে একমাত্র স্থায়ী উপাদান হল মানুষ নিজে। তার সংগ্রাম তার পছন্দনির্ভর নয়—সংগ্রাম হল মনুষ্যত্বের সার, essence—প্রকৃতিকে জয় করা ও নিজের উৎপাদনী শক্তিকে যুক্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত করা সে সংগ্রামের উদ্দেশ্য। মানুষের অন্তর ও বাহিরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে এই লক্ষ্য সাধিত হলে। তাই জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি নয়—কর্মই ধর্ম। মানুষ ও তাঁর সম্পর্ককে রূপ দিয়েছে তার কর্ম। শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীসংগ্রাম কর্মকে কলুষিত করেছে। মানবতার অপহ্নব ঘটেছে, বিকৃত মানবসম্পর্ক রচিত হয়েছে। প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে সচেতন ও অচেতন ছলচাতুরির আশ্রয় নেয় মানুষ—আপন দৃষ্টিকেও করে তোলে সে আচ্ছন্ন। মার্ক্স যখন একথা বলেন তখন তিনি মায়াকেই স্বীকার করেন কার্যত। অবিদ্যা ও মায়াই আচ্ছন্ন করে মানুষের মুক্ত দৃষ্টি—স্বার্থপ্রবুদ্ধ সে মায়া ও অবিদ্যা; ফলে সত্য দেখার বদলে মিথ্যাই মানুষ দেখে, দেখতে চায় বলে। একথা যখন বুঝি ও

তদনুযায়ী কর্মপন্থা নিই তখন শ্রম আর মানুষকে অনৈক্য ও দাসত্ববদ্ধ করে না, মুক্ত করে। সে মুক্ত মানুষ তখন হয়ে ওঠে সৃজনশীল, তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি স্ফুরিত হয়, সমাজে আমরা সবাইয়ের সঙ্গে প্রীতিমধুর সমবায়িক ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ হই। যুক্তিরও মুক্তি ঘটে তখন।

কিন্তু শ্রমের ভূমিকা সম্পর্কে মার্ক্স বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। কখনো তিনি বলেছেন যে মুক্তস্বভাব মানুষের সৃজনশীলতা ও শ্রম সমার্থক, সুখের সার, যৌক্তিক সুষমাস্থাপক তা—ব্যক্তির অন্তরে ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সুষমা স্থাপন করে শ্রম। আবার কখনো কখনো বলছেন যে শ্রেণীযুদ্ধের অবসানে শ্রেণীহীন সমাজে শ্রম খুবই কমে যাবে। কিছু পরিমাণ শ্রম অবশ্য সব সময়ই থাকবে তবে তা শোষিত দাসদের শ্রম নয়। মুক্ত মানুষ স্বাধীনভাবে যেসব নীতি-নিয়ম রচনা করবে তা মেনে নিজেদের সমাজায়িত জীবন গড়ে তুলবে অল্প শ্রমের সাহায্যে। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের শেষে তিনি বলছেন যে 'আবশ্যকতার রাজ্য' (the realm of necessity) সরে গিয়ে তখন আসবে খাঁটি 'স্বাধীনতার রাজ্য' (the realm of freedom). তবু ভিত্তিতে একটি আবশ্যকতার ক্ষেত্র—অর্থাৎ শ্রমের ক্ষেত্র থাকবেই।

মার্ক্স বলেন যে মানুষের চেতনা তার সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে না, তার সামাজিক সত্তাই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে সামাজিক উৎপাদনে মানুষ অংশ নেয় তাতে অনিবার্যভাবেই ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ধার না রেখেই সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে তাদের আবদ্ধ হতে হয়। উৎপাদনের শক্তি ও কলা যেরকম বিকশিত হয়েছে উৎপাদন-সম্পর্ক তদনুরূপ হয়। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপরই গড়ে ওঠে সমগ্র সম্পর্কসৌধ। অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরই দাঁড়ায় আইন ও রাজনীতির উপরিকাঠামো। জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা। কিন্তু বিকাশের এমন একটি পর্যায় আসে যখন উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের বনিবনা হতে চায় না; অসামঞ্জস্য দেখা দেয় তাদের মধ্যে। উৎপাদন-সম্পর্ক তখন উৎপাদন-শক্তির অনুকূল না থেকে প্রতিকূল হয়ে ওঠে। তখন আসে ক্রান্তিকাল। উৎপাদন-শক্তিকে অবরুদ্ধ রাখা চলে না, তার অগ্রগতি অনিবার্য; অতএব সে অগ্রগতির পথে যা-ই বাধা দেয় তাকেই ভেঙে গুড়িয়ে দিতে হবে। অর্থনৈতিক ভিত্তি পালটালে আইন, রাজনীতি, আদর্শ ও

মূল্যবোধের উপরিকাঠামোও পালটাবেই। কোনো ভাবাবেগ দিয়ে এ নিয়তি আটকানো যায় না।

বাস্তব জীবনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বই মানুষের চেতনায় ফুটে ওঠে, চেতনাকে রূপ দেয়। একজন মানুষ নিজের সম্পর্কে কী ভাবে তা দিয়ে তার বিচার হয় না। একটা যুগের মনীষীরা কী ভাবেন তা দিয়েও তেমনই ঐ যুগের বিচার হয় না। দেখতে হবে ঐ যুগের উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের সংঘাত কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। ঐ যুগের চৈতন্যও তদনুযায়ী রূপ নেয়। যতক্ষণ একটি সমাজব্যবস্থায় সকল উৎপাদন-শক্তির নিঃশেষে বিকাশ না ঘটে ততদিন ঐ সমাজব্যবস্থা টিঁকে থাকে। যতদিন উচ্চতর উৎপাদন-সম্পর্কের বস্তুভিত্তি না গড়ে ওঠে ততদিন ঐ উৎপাদন-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তাই মানুষ সমস্যা যতটুকু সমাধান করা সম্ভব ততটুকুই করতে চায়। আসলে সমাধানের যোগ্য বাস্তব পরিবেশ রচিত হয়েছে বলেই সমস্যাকে সমস্যা বলে চেনা যায়। তাই যুগে যুগে সমস্যা পালটায়, সমাধানও। যা সম্ভব তাই-ই ঘটে। What is real is rational—মার্ক্স না চাইলেও এই হেগেলীয় যুক্তিতে তিনি ফিরে এলেন।

দ্বন্দ্বের শেষ ক্ষেত্র বুর্জোয়া সমাজ। এবার দ্বন্দ্ব শেষ হবে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায়। আর নতুন দ্বন্দ্ব উঠবে না। ডায়ালেকটিকস থেমে যাবে। নতুন সমাজব্যবস্থা থিসিস হয়ে উঠবে না। প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্টি-থিসিস দেখা দেবে না। অন্তিম শান্তি আসবে। এইই কমিউনিস্ট সমাজ। এতকাল মানুষের ইতিহাস ছিল প্রাগিতিহাস। কমিউনিস্ট সমাজ পত্তন হলেই সুরু হবে প্রকৃত মানুষের ইতিহাস। দ্বন্দ্বহীন জয়যাত্রা চলবে তখন একটানা। নিরবধি কাল।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে মার্ক্স স্বয়ং এভাবেই খণ্ডিত করে দিয়েছেন। কারণ ইতিপূর্বে বস্তু ছিল, তাতে দ্বন্দ্বও ছিল; তারই ফলে তাতে যত বিবর্তন ও বিকাশ ঘটা সম্ভব হয়েছে; একসময় আসবে যখন বস্তু থাকবে, কিন্তু দ্বন্দ্ব থাকবে না; বিবর্তন ও বিকাশ থাকবে কিন্তু তা দ্বন্দ্ববাহিত হবে না—একথা বললে দ্বন্দ্ব বস্তুর স্বরূপধর্ম বলে স্বীকার করা হয় না; দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে বস্তুর আপতিক ধর্ম—কোনো এক সময় বাস্তবে তা আকস্মিক সঞ্চারিত হয়েছে ও কোনো একসময় বস্তু থেকে তা বিলীন হয়ে যাবে। যা আবশ্যিক নয়, আপতিক মাত্র—তা বস্তুর স্বরূপ ব্যাখ্যায় কতখানি কাজে লাগতে পারে? দর্শনের পরিভাষায় মার্ক্সের ভাবনা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এই যে অদ্বৈত থেকে

দ্বৈতের আবির্ভাব ঘটেছে আবার অদ্বৈতের অভিমুখেই তার যাত্রা চলেছে। অদ্বৈতে পৌঁছালেই অখণ্ড শান্তি। তখন শ্রম নয়, কর্ম নয়, জ্ঞান প্রেম ও সৃজনশীলতাই হবে মুখ্য। অর্থাৎ চৈতন্যের স্ফূর্তি ও চৈতন্যের আস্বাদনই মানুষের মুক্তির অবস্থা। 'কমিউনিস্ট ইশতেহারে' মার্ক্স এরকম মুক্ত অবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

পরিণামে যদি তাইই হয় তবে দ্বন্দ্ব-অধ্যুষিত কালেও চৈতন্যময় মানুষ সাময়িক দ্বন্দ্বোদ্বেলতার উর্ধে উঠতে পারবে না কেন এ প্রশ্ন থেকে যায়। যখন মার্ক্সীয় আলোয় ইতিহাসের অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয় তখন কালের ঘূর্ণাবর্তের স্বরূপ বুঝেই মানুষ উদ্দীপ্ত চৈতন্যে সে ঘূর্ণাবর্তের উর্ধে উঠতে পারে নিশ্চয়ই? নতুবা মার্ক্স স্বচ্ছল পিতার পুত্র হয়ে নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সর্বহারার শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক হলেন কেন? কিন্তু সেকথা বলাও ভুল। তিনি প্রলিতারিয়েতের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতেও সংগ্রাম করেননি। তিনি চেয়েছেন মানবতার মুক্তি—বিপ্লবের পর প্রলিতারিয়েত থাকবে না, বুর্জোয়াও থাকবে না, কোনো শ্রেণীই থাকবে না—থাকবে উপাধিবিহীন মানুষ। মানুষের মুক্তি সংগ্রামের বাহন মাত্র সর্বহারা শ্রেণী—নতুন প্রভু ও শোষকশ্রেণী হয়ে ওঠা তাদের লক্ষ্য নয়।

মার্ক্স বলেছিলেন, মানুষের চিন্তা ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার শ্রেণীগত অবস্থান দ্বারা, সে কি শাসক শ্রেণীর ভিতরে আছে না বাইরে আছে তার দ্বারা। এই কথায় সত্য আছে; পুরো সত্য নেই। মার্ক্স সেমিটিক মানসতার অধিকারী ছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে—তাই 'আমার মতই একমাত্র সত্য মত' এই মতুয়ার বুদ্ধি তাঁর ছিল। আংশিক সত্যকে পুরো ও একমাত্র সত্য বলে হুঙ্কার দেওয়ায় তিনি এ যুগের বৃহত্তম ভ্রান্তিরও স্রষ্টা। শ্রমই একমাত্র সত্য—প্রেম নয়, জ্ঞান নয়, ভক্তি নয় এও যেমন মূঢ়ের উক্তি, তেমনি শ্রেণী অবস্থানই সকল মানুষের চিন্তা, আচরণ তথা চেতনার নিয়ন্ত্রক এও তেমনই মূঢ়ের উক্তি। মার্ক্স শোষিতের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এখানে তাঁর মহত্ত্ব; কিন্তু বিপ্লবের অব্যবহিত পর কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত অন্তর্বর্তী কালে প্রলিতারিয়েতদের ডিক্টেটরশিপ হবে এই বিধান দিয়ে বিপ্লবের লক্ষ্য মানবমুক্তি—নিজের এই সিদ্ধান্তকেই পরাস্ত করেছেন। বিপ্লবোত্তর কালের ইতিহাস তিনি বা এঙ্গেলস দেখে যাননি। দেখলে তাঁর ভ্রমমুক্তি হত। যেসব দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব হয়েছে সেসব দেশে শোষণ বন্ধ হয়নি,

শ্রেণীদ্বন্দ্ব বন্ধ হয়নি, দমনপীড়ন বেড়েছে, রাষ্ট্র লুপ্ত হবার বদলে সর্বাত্মক ও অতি স্থূল ও দৃঢ় হয়েছে, আমলাতন্ত্রের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে, মুক্ত সমাজ ও মুক্ত মানুষের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। প্রতিবাদীর পরিণাম হয়েছে ভয়ঙ্কর—জল্লাদবৃত্তিতে মার্ক্সবাদীরা রেকর্ড স্থাপন করে গিয়েছে। ইতিহাসই মার্ক্সের অনেক সত্য বাণীকে প্রমাণিত করেছে, আবার ইতিহাসই মার্ক্সের ভ্রমাত্মক বাক্যগুলির অসারতা দেখিয়ে দিয়েছে। রাশিয়ায়, চীনে ও অপরাপর দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব মানবেতিহাসের এক নতুন পদক্ষেপ; জগতের লাঞ্ছিত, শোষিত মানুষের পক্ষ থেকে এত বড় প্রতিবাদ ও জয় ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি; মানুষের চিন্তা ও কর্মে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন মার্ক্স ও মার্ক্স-বাদীরা। কিন্তু একদেশদর্শী মতবাদ ও তৎপ্রসূত একদেশদর্শী কর্মপন্থার পরিণাম যা হওয়া স্বাভাবিক, মার্ক্সবাদের বেলাও তাইই ঘটেছে। নতুন সমস্যা, নতুন দ্বন্দ্ব, নতুন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। যার সমাধান মার্ক্সবাদে নেই। খণ্ড দৃষ্টি কালখণ্ডেই সীমাবদ্ধ প্রতিহত হয়। মার্ক্সের প্রভাব তাই এক শতাব্দীর মধ্যেই চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে অবক্ষয়ের ধারায় ক্রমাবনতিতেও পৌঁছে গেল। মার্ক্সীয় বিপ্লবও তাবৎ বিশ্বে ক্ষয়ীভূত হয়ে আসছে। আছে হয়তো তার কিছু অবশেষ এখনও, কিন্তু বিশ শতকের সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তার নেই। কালপ্রভাবিত মত কালসীমায়ই আবদ্ধ থাকে; কাল—অতিক্রমী হয় না।

রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে বসার পূর্বাহ্নে মার্ক্সের উপরোক্ত বাণী গ্রথিত হয়েছিল। ঐ বাণীর মধ্যে নিহিত যে অংশটি সত্যোপলব্ধিজাত—বস্তুবাদী দর্শনের মধ্যে যে সত্যাংশটুকু—তা অঙ্গীকার করেই রামকৃষ্ণ তাঁর সাধনাসনে বসেছিলেন। তিনি দূর বাংলার নিভৃত প্রান্তের একজন যুবক, লেখাপড়া সামান্য শিখেছিলেন, ইংরেজি জানতেন না, পাশ্চাত্য দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের কোনো পাঠ নেননি। কিন্তু পড়ে জানা পরোক্ষ জানা, তার মূল্য স্বল্প। তিনি সত্য জানতেন তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে, প্রত্যক্ (subjective) দৃষ্টিতে। দেশকালের অথবা ভাষাজ্ঞানের বাধা তাতে থাকে না। তিনি স্বতঃজ্ঞানের দ্বারাই সত্যের হৃদয় ভেদ করতেন, যত্ন ও ক্লেশে আয়ত্ত বিদ্যার হিসাবকষা প্রয়োগের সাহায্যে নয়। যদি তাঁকে যুগাবতার বলি তবে গোটা যুগই তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল—তা শুধু ভারতের যুগ নয়, আবিশ্ব আধুনিক যুগ। সেজন্যই এ যুগের মূল উপলব্ধিগুলির সন্ধান নিয়েছি।

রামোপাসক পরিবারের সন্তান, গয়াধামের বিষ্ণুসংকল্পজাত জাতক, আশৈশব রামপূজারী রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে প্রথমেই কালীদর্শনের আশায় ব্যাকুল হলেন! সাধনার গতিভঙ্গীর এ পরিবর্তন কি আকস্মিক বা অহেতুক ছিল? নাকি সজ্ঞান, সচেতন ও অনিবার্য ছিল এ নিবাচন, এই নতুন লক্ষ্য নির্ণয়? রামকৃষ্ণ মনের খেয়াল খুশিতে চলতেন না। তাঁর সাধনা তাঁর কাছে প্রাণছেঁড়া ব্যাপার ছিল—তরল মনের যথা-ইচ্ছা ব্যাপার ছিল না। যৌবনে যথারীতি সাধনা উদযাপনের উপক্রমেই তিনি তাঁর ইষ্ট নির্বাচন করেছিলেন রাম নয়, রাধাকৃষ্ণ নয়, শীতলা বা ধর্মঠাকুরও নয়—স্বয়ং কালী। কেন কালী?

কারণ কালী মৃত্যুময়ী দেবী, মহামায়া, মহাগতিশীলা। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যে ভবতারিণী-মূর্তির পায়ের কাছে তিনি বসলেন তিনি তো চলার জন্য পা বাড়িয়েই আছেন, সামরিক কুচ-এর ভঙ্গীতে। তাঁর চলার তাণ্ডব ছন্দে ব্রহ্মাণ্ডের বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে, ব্রহ্মাণ্ডই হয়ে উঠছে নিরন্তর ঘূর্ণমানা, চপল নৃত্যশীলা। হাতে খড়্গ ও নরমুণ্ড, নৃমুণ্ডমালা কটিদেশে দোলায়িত। তিনি হনন করেন।

কিন্তু কেন এ হনন, এ হননের স্বরূপ কী? মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ কালীর নির্মোহ হননের কাছে যেন ফিকে হয়ে যায়। কালীর মহাবেগময়ী পদক্ষেপ ডায়ালেকটিকসকে হার মানায়;—হার মানায়, কিন্তু অস্বীকার করে না; ডায়ালেকটিকসের চেয়েও তাঁর চরণ ভঙ্গিমা নিশ্চয়াত্মিকা, প্রতিরোধচূর্ণকারী, অকম্পিত। কিন্তু তাঁর হননের মধ্যে আরও বৈশিষ্ট্য আছে যা ডায়ালেকটিকস তত্ত্বকে ধারণ করেই আরও পূর্ণায়ত সত্যের দিশা দেয়।

হন্ ধাতুর অর্থ হনন, হন্ ধাতুর অর্থ গতি। "হন্ হিংসাগত্যোঃ"। গতিবিধৃত হিংসাই হন্। নিছক হিংসা, হিংসার জন্যই হিংসা, ক্লীবের হিংসা, বিদ্বেষীর হিংসা হন্ নয়। গড়ার জন্যই ভাঙা দরকার; বিকাশের জন্যই জঞ্জাল সরাতে হয়। গতানুগতিককে চূর্ণ করেই নবীনকে স্বাগত জানানো সম্ভব। বহমান জীবনধারাকে পরিস্রুত করতেই মৃত্যু প্রয়োজন। মৃত্যু জীবনের অন্ত নয়, নেতি নয়। মৃত্যু জীবনকে নাকচ করে দেয় না। মৃত্যু জীবনকে মার্জিত করে, জমে-ওঠা জড়তা, মোহাসক্তি, অজ্ঞানবদ্ধতা, ক্ষয়ে যাওয়া আধারকে চূর্ণ করে মৃত্যু জীবনকে নির্মল, অবাধিত, মুক্তগতিমান করে।

মৃত্যু জরা, ক্লিষ্টতা ও রুদ্ধগতির কুক্ষি থেকে জীবনকে সবলে টেনে বের করে আনে। মৃত্যু তাই গতিযুক্ত হনন।

হন্ থেকেই আসে ঘন শব্দ, সংঘ শব্দটি। এ বিশ্ব প্রকৃতিকে, এ মহা-জীবনকে কালী হনন করেন না, তাঁর মহা প্রজ্ঞায় ঘন করে তোলেন, সংঘ গড়েন, সংগঠিত করেন। সংহার ও গঠনলীলা যুগপৎ তাঁর—গঠনের জন্যই সংহার। মার্ক্সীয় বিপ্লব তত্ত্ব এ পরম সত্যের ঈষৎ আভাস পেয়েছে মাত্র।

কালীর সংগঠন ও সংঘ-গঠন কেমন ? উপনিষদের "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" —নানা নেই, বহু নেই, দ্বৈত নেই ; এক অদ্বৈতই আছেন ; আর সবই যা দেখি শুনি সব অব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা—ব্রহ্মবাদীর এই সরল সংক্ষিপ্ত ও আরামদায়ক পথ কালীর সংগঠনের পথ নয়। ব্রহ্মবাদী মূলেই দুর্বল ক্লীব—তাই বার্যহীন অদ্বৈতের লক্ষ্য স্থাপন করেছেন। কালী ঐ জ্ঞানবাদী, খণ্ডদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান-দর্পিতের মুণ্ডটি কেটে ফেলেছেন। কিন্তু জ্ঞানবাদী তাঁর জ্ঞানের ঐকান্তিকতার জন্যই সম্মানার্হ, তাই তাঁর মুণ্ডটি কালী পায়ের পাশে তুচ্ছ বিবেচনায় ফেলে দেননি ; সম্মান দিয়ে কটিতটে মালা করে অলঙ্কারস্বরূপ পরেছেন। কালী পরম বিজ্ঞানী।

কেন কালী জ্ঞানী ও অজ্ঞানী দুজনকেই কাটেন—জ্ঞান ও অজ্ঞান দুইই নাশ করেন ? কারণ দুইই খণ্ডপূজারী, অংশকে পূর্ণ বলে দেখে ও প্রচার করে, কালীর সত্যের তা বিরোধী পথ। অদ্বৈতজ্ঞানী নিজেই আগ বাড়িয়ে খুন করতে গিয়েছিল। সংক্ষেপে ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছনোর লোভে সে কালীর জগৎকে, এ প্রত্যক্ষ বিশ্বকে, বাস্তবকে, প্রকৃতিকে খুন করেছে। মাকেই সে বলে দিল মায়া, মিথ্যা, ভ্রান্তি, মোহ, রাত্রি। সে দিনের পিরীতে গদগদভাষী হয়ে এ ভালোমন্দ আলো আঁধারে দুঃখ সুখে মেশা মায়ের সৃষ্টিকে অনিত্য, অশুচি, কেবল-দুঃখকর বলেছে—এমনকি এ নেই বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ব্রহ্মবাদীর হৃদয়ে যত কোমল বৃত্তি ও অনুভূতি মা সঞ্চার করেছেন তাকেও সে মোহ, কাম, পাপ বলে অভিযোগ এনে ঐ হৃদয়টিকেই উৎপাটিত করতে চেষ্টা করেছে। ব্রহ্মবাদী প্রকৃতির ওপর বিদ্বেষযুক্ত, নিজের ওপর সন্দেহযুক্ত। বিদ্বেষী, অসূয়া-পীড়িত ও সংশয়াত্মা ব্রহ্মবাদী যা কিছু মায়ের রচনা তাকেই নিকৃষ্ট, হেয়, পাপময় ও হন্তব্য বলে রায় দিয়েছে।

ব্রহ্মবাদী তার দেহসম্পর্কহীন আত্মা ও নামরূপহীন এক পরমাত্মাকে নিয়ে সংঘ গঠন করতে চেয়েছে। এই পরমাত্মা যখন বলেন 'মামেকং শরণং ব্রজ',

আমাতে শরণ নাও, তখন সংশয়াত্মা ব্রহ্মবাদী মুখটি ঘুরিয়ে নিয়েছে। তাঁর বিচারে পরমাত্মার তো নাম রূপ নেই, সে কেমন করে নামরূপ ধারণ করবে, কেমন করে মানুষ হবে, আর ডেকে বলবে, আমার শরণ নাও? ব্রহ্মবাদী বলল ওসব ভুল দেখা, ভুল শোনা, ভুল ভাবনা—এক নিরাকারই ধ্যেয় ও জ্ঞেয়। আমিও আত্মামাত্র, নিরাকার; পরব্রহ্মও মহা-নিরাকার। নিরাকারে নিরাকার মিশে যাওয়াই সাধনলক্ষ্য, পরমার্থলাভ। রূপ মিথ্যা, সৃষ্টি মিথ্যা, রস মিথ্যা, ভাব মিথ্যা। আর এ মিথ্যার জাল পেতেছে কুহকিনী মায়া। এরই নাম কেবল-ব্রহ্মবাদ, Absolute Idealism.

মায়াকে হঠানো সম্ভব, মাকে মারা সম্ভব নয়। মাকেই মায়া নাম দিয়ে খুন করতে চায় ব্রহ্মজ্ঞানী; পালটা সেই খুন হয়েছে। তার দ্বেষবিষই তাকে দুর্বল ও ক্লীব করেছে। প্রকৃতিকে হেয় করতে চেয়েছিল সে, প্রকৃতি তাকে হেয় করেছে। তাই বাস্তব জীবনের ওপর ব্রহ্মবাদীর কোনো দখল নেই, আসন নেই; এই জ্যান্ত জগৎটাকেই প্রেতলোকের মতো সে বিদেহ বানাতে চায়—যেখানে জীবনের কলরোল থাকবে না, প্রভাতের আলোমাধুর্য ও সন্ধ্যার চন্দ্রচুম্বন থাকবে না, এক শূন্য শ্মশানে শ্বেত শুভ্র বৈরাগ্যমূর্তি কেবলই শবের শিয়রে মোহমুদ্গর পাঠ করে চলবে। সৃষ্টির এ অপমান মা মানেন নি। তাই বৌদ্ধ মায়াবাদ টেঁকেনি। শঙ্করও তদ্গত ভাষায় মায়ের ভক্তিস্তব সুরু করে দিয়েছেন।

নামরূপময় প্রকৃতির সঙ্গ ঘৃণায় বর্জন করে অসঙ্গ হবার সাধনায় ব্রহ্মবাদী শুধু নিজে পতিত হয়নি, ভারতকেও বীর্যহীন, শ্রীহীন, লক্ষ্মীহীন, পেট-ভিখারী পরপদলাঞ্ছিত করেছিল। বিশ্বে আর যেখানে তাদের প্রভাব সেখানেও একই পরিণাম ঘটেছে। তারা নাশকতার বুদ্ধি এনেছে, সংগঠনের বুদ্ধি লুপ্ত করেছে।

কালী যে সংঘ গঠন করেন তার পদ্ধতি ভিন্ন, লক্ষ্য ভিন্ন। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এতো উপনিষদের ধ্রুব বাক্য। কিন্তু এ বাক্যের অর্থ কি একবারও তলিয়ে দেখতে নেই? 'নানা' শব্দের অর্থ পাণিনি দিয়েছেন "ন সহ"; অমর কোষ দিয়েছেন "নানা বর্জনে"। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে আপাত-বিরোধী যত কিছু দেখ তারা ন-সহ বা অসহ নয়, তারা কেউ কাউকে বর্জন করে না। তারা যুগপৎই থাকে, পরস্পরকে সয়ে থাকে, নিয়ে থাকে। আলো অন্ধকারকে হজম করেই থাকে, অন্ধকারের মধ্যে আলো বিদ্ধ হয়ে থাকে, চেতনা জড়কে

আলিঙ্গন করে থাকে, জড় চেতনার দ্বারা পালিত ও পোষিত হয়ে থাকে। চেতনা ও জড় দেখতেই আলাদা, প্রকৃতই বিরুদ্ধ ও একে অপরের নাশক নয় তারা। কেউ কারও কাছে অশুচি, অস্পৃশ্য ও অশোচ্য নয়।

ব্রহ্মবাদী যাকে মহামলিন বলে কলঙ্কভাগী করেছিলেন, মা সে সমস্ত নিয়েই মহামিলন ঘটান ; ঐ তাঁর সংগঠন ও সংঘ-গঠন। যারা সব বাদ দেয় ও বাতিল করে তারাই খুনী। মা সব নেন বলে কখনো খুনী নন, তিনি সর্বজীবের সর্ববস্তুর কল্যাণময়ী মা। তবে তাঁতে অজ্ঞান নেই মোহ নেই আসক্তি নেই বলেই তিনি আমাদের খোশামুদে মা নয়। তিনি সত্যকেই রাখেন, সত্যের ভানটুকুকেও বরদাস্ত করেন না। তাই মোহাবিষ্ট অল্পপ্রাণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষ মাকে সংহারকারিণী মনে করে। দোষ তার দৃষ্টির, মায়ের নয়।

মা বলেন এ প্রকৃতি আমারই অবয়ব, আমারই লীলাপট। এ যে নিত্যশুচি, সর্বমঙ্গলা, শিবা, সর্বার্থসাধিকা, গৌরী, নারায়ণী। এর ভয়ে ভীত হয়ে, হে ব্রহ্মসন্তানের দল, ক্লীব হোয়ো না! প্রকৃতিদ্বেষ তোমার সংগঠন-কৌশল কেড়ে নেবে, নিয়েছে। নিরঞ্জন স্থিতিই একান্ত সত্য নয়, চূড়ান্ত সত্যও নয়। নামরূপউপাধিরঞ্জিত গতিও তৎসঙ্গেই সমভাবে সত্য, গ্রহণীয়, সাধনীয়। এ সংসার কেবলই সরে যায় বটে, কিন্তু এ তো অসহ-এর ক্ষেত্র নয় ; এ সহ-এর স্থান। একটি মেরুকেই, সত্যোপলব্ধির একটি শিখরকেই—হোক তা শিখর—একান্ত ধ্রুব বলে মেনো না। মতুয়ার বুদ্ধি কোরো না। দও, দও, দও। দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো। দান করো, দান করো, দান করো। সহানুভূতিশীল, সমবেদন হয়ে দানের দ্বারাই পরস্পরকে গ্রহণ করো। ঐই অকলঙ্ক অদ্বৈত—ঐ দানে-গ্রহণেই "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—বহু বহু থেকেও এক, বিরোধী বিরোধী থেকেও ঐক্য বাড়ায়। ঐ বেদনই বেদের মূল কথা।

মার্ক্স মায়াবাদী ছিলেন না, বস্তুর মহিমা খ্যাপন করেছেন, এ বিশ্বসৃষ্টির বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। কিন্তু অ-সহ-এর দৃষ্টি তাঁর, দ্বেষ ও মোহে বাষ্পাচ্ছন্ন তাঁর মন। মানবমুক্তি আনবে একমাত্র প্রলিতারিয়েত? আর যারা মানবমুক্তি চায় তাদের একমাত্র কর্তব্য প্রলিতারিয়েত-মানসতা তথা প্রলিতারিয়েতীয় ধর্মকর্ম অর্জন? চেতনা যত মালিন্যযুক্ত, যত অহঙ্কারী, যত নিম্নস্তরবর্তী ততই তা বিপ্লবানুকূল? একপেশে ও আক্রোশপরায়ণ মনোভাবকে প্রশ্রয় দেবার ফলে মার্ক্সীয় বিপ্লব ধ্বসে গিয়েছে।

রামকৃষ্ণ কালীকে বরণ করেছিলেন কারণ কালী সর্বমোহশূন্যা, খণ্ডবোধ-

বর্জিতা, বিদ্বেষহীনা। তিনি গুণাতীতা কিন্তু গুণময়ী, ব্রহ্মকে আলিঙ্গন-আবেষ্টন করেই ব্রহ্মশক্তি, পরমাত্মা কিন্তু নামরূপময়ী, অনাদি ও অজ কিন্তু মরণপ্রচুর। তিনি পরম স্থিতি ও চরম চাঞ্চল্য, জ্ঞানীকে ধরে দেন জ্ঞানপাত্র, অজ্ঞানীর ঠোঁটে তুলে ধরেন মোহবিষপাত্র—বিজ্ঞানীকে নিয়ে যান দ্বৈত-অদ্বৈতেরও পরপারে। কালাতীতা তিনি কালময়ী, অসঙ্গ তিনি অগণন-সন্তানবতী, জ্ঞানসূর্য তিনি কালরাত্রিসদৃশা। রামকৃষ্ণ এই দ্বন্দ্ব-অদ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বাদ্বন্দ্বাতীতাকে প্রণতি জানিয়েছিলেন। তিনি একপেশে ভাব সুরু থেকেই বিদায় দিয়েছেন।

পুরুষ এব ইদং সর্বম্—সেই পরমপুরুষই এই সব হয়েছেন; সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই যা কিছু সবই ব্রহ্ম; এই অনুভবেরই জীবন্তরূপ মাতৃতত্ত্বে, কালীতত্ত্বে। নির্গুণ সগুণ—ইত্যাদি মানুষের মনঃকল্পিত ভেদ তাঁতে নেই। চিৎ ও জড়ের বিরোধও তাঁতে নেই। তাই তিনি পরম ইতি—নেতিবাদী দৃষ্টি নিয়ে সে অখণ্ডার দিকে তাকানো যায় না।

আর যদি নেতি নেতির পথ নাও তবে উপনিষদ তারও চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন, শুনে আঁৎকে উঠলে চলবে না। তাঁরা ব্রহ্মকে শুধু সৎ চিৎ ও আনন্দ বলে জানেননি; বলেছেন তিনি অসৎ। তিনি নিখিল নাস্তি—কেননা আছেন তা কী করে জানব। জানার একমাত্র উপায় আমার অস্তিত্ব। জীবের অস্তিত্বেই তাঁর অস্তিত্বের ছায়া পড়ে, তিনি সৎ বলে প্রতীত হন। একটি সত্য সূর্য ও দশটি ঘটে দশটি বিম্বিত সূর্য রয়েছে। রামকৃষ্ণ উপমা দিচ্ছেন। এই মোট এগারোটি সূর্যকে পেলাম। এখন একটি ঘট ভেঙে দিলে পাব দশটি সূর্য; আর একটি ঘট ভাঙলে পাব নয়টি সূর্য ইত্যাদি। নয়টি ঘট ভেঙে দিলে থাকবে একটি সত্য সূর্য ও একটি বিম্বিত সূর্য। দশম ঘটটি ভেঙে দিলে কী থাকবে? আকাশে মাত্র একটি সত্য সূর্য? রামকৃষ্ণ বললেন, তা বলা যায় না, বিম্বিত সত্য একটিও না থাকলে আকাশের সত্য সূর্যের খবর দেবে কে? তিনি যে আছেন কে তা জানে ও জানায়? একটিও ঘটের অস্তিত্ব না থাকলে সত্য সূর্যের অস্তিত্ব আছে কিনা জানার উপায় নেই। নেতিবাদী তাই নিজেকে খুন করতে গিয়ে ব্রহ্মকেও খুন করেন। জীব ও জগৎ নইলে ব্রহ্মও নাস্তি। তাই ব্রহ্ম বিশ্বোত্তীর্ণ বটে কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্ম বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও বিশ্বাত্মক—নিরুপাধি হয়েও উপাধিবিধুর। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ পরব্রহ্মেরই ত্রিপুটি। আনন্দের বাঁধে সেই একং সৎ উপচে পড়েন বিশ্বের বৈচিত্র্যে। স্বয়ম্ভূ হন পরিভূ। আবার

স্বয়ম্ভূ স্বধা ও পরিভূ ব্যাপ্তিকে তিনি গুটিয়ে এনে গুম্ফিত করেন জীবের মধ্যে। বিশ্বাতীত মহতোমহীয়ান জীবে হয়ে আসেন অণোরণীয়ান—জড়ের মধ্যে চৈতন্য নিজেকে স্ফুটমান করার এই লীলা। জীবে যেন প্রকৃতিতে নিহিত, শায়িত, আবৃত ব্রহ্ম ঘুম ভেঙে জেগে উঠছেন, যেন ঘটছে তাঁর কুণ্ডলমোচন। তাই ব্রহ্মধাত্রী কালী অতি স্নেহ-দরদে এই জীবকে বক্ষপীযুষ পান করিয়েই চলেছেন। তাঁর 'না' নেই; সদাই 'হাঁ'। তাই তিনি নাশ করেন না, সংগঠন করেন। রামকৃষ্ণের কালী এই অবন্ধনীয়া ও অখণ্ডা, আলোময়ী, আলো-কালোর উর্ধে স্বস্বভাবে ভাবময়ী।

এই কালী রামকৃষ্ণের জীবনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন না। ভিতরেই ছিলেন। কলকাতায় এসে, যৌবনশক্তির স্ফুরণকালে তিনি তা অবহিত হন। ঠনঠনের কালীমূর্তিকে গান শোনানো উপলক্ষ মাত্র; ভিতরে তাঁর স্বতঃ জাগরণ রামকৃষ্ণ অনুভব করেছিলেন। দেশজ পরিভাষায় একেই বলে কুণ্ডলিনীর জাগরণ; একটু আগে একেই বলেছি, ব্রহ্মশক্তির কুণ্ডলমোচন। অজ্ঞানীর কাছে, এমনকি জ্ঞানীর কাছেও তিনি গোপন থাকেন বলেই গোপিনী; বিজ্ঞানীর কাছে তিনি যোগিনী। তাঁর সর্বযোগ বলে তিনি যোগেশ্বরী। তাঁরই প্রসাদে যোগী হয় যোগেশ্বর। লোকগোপ্যা কিন্তু চৈতন্যবানের কাছে অকুণ্ঠিতা উন্মোচিত-আননা। কলকাতায় লক্ষ কোটি নরনারীর মধ্যেও সংগোপনে রামকৃষ্ণ তাঁর আনন দেখেছিলেন। যোগেশ্বর হয়েছিলেন। জেনেছিলেন শিবশক্তির সামরস্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত, যোগস্থ। তিনি নিজেই কালী।

তবে কেন দক্ষিণেশ্বরে নতুন করে সাধনার আসন পাতার দরকার হল? কারণ কালকবলিত আবিশ্ব মানুষ কালছলনা থেকে মুক্ত হয়ে যেন মাতৃপদ লাভ করে, যেন এই জগতের রুগ্ন জীর্ণ তিমিরহত বুকেই অনাবিল কালীক্ষেত্র ফুটে ওঠে; যেন জগতের কোটি কোটি হৃদয় হয়ে ওঠে মায়ের পদন্যাসের যোগ্য শতদল পদ্ম। রামকৃষ্ণ জগৎ ও জীবনের দিব্য রূপান্তরের লক্ষ্য সামনে রেখে সাধনা করেছিলেন।

কামারদের গ্রামে জন্ম নিয়ে তিনি সমাজের অন্ত্যজদের অঙ্গীকার করেই জগতে এসেছিলেন। আশৈশব তাদেরই সঙ্গে মেলামেশা; সম্পর্কের বিচিত্র জালে ও মাধুর্যে তাদের কাছে ধরা দিয়েই আছেন, আপনজন হয়ে। তাঁর যৌবনের সাধনা এই অন্ত্যজ ও অবরজনদের পূর্ণ মুক্তি কামনায়। রাম হয়ে

যিনি চণ্ডাল ও বানরদের মিতা, কৃষ্ণ হয়ে যিনি আভীর গোপ সমাজের হৃদয়বল্লভ, রামকৃষ্ণ হয়ে তিনিই আবিশ্ব জনসাধারণের মুক্তিদূত।

আত্মজ্ঞানবাদীরা আত্মারাম হওয়ার সাধনা করে। তাদের ব্রহ্মও আত্মারাম। সকল দ্বন্দ্বের সংস্পর্শলেশশূন্য সে ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্ব, অনির্দেশ্য, নিরঞ্জন সর্বব্যাপ্ত চৈতন্য মাত্র। দ্বন্দ্বময়, নির্দিষ্ট রূপধারী, রঙে রসে ভাবে রঞ্জিত এই প্রত্যক্ষ বিশ্ব ও বিশ্বের মানুষ সে ব্রহ্মের কাছে শোচ্য, পরিত্যজ্য, অবর। অবিকম্পিত, অটল, অনড়, নিষ্প্রাণ সে ব্রহ্ম। কিন্তু উপনিষদ ব্রহ্মপরিচয় দিতে গিয়ে যখনই বললেন তন্নৈজতি—তিনি কাঁপেন না, তখনই গলা কেঁপে গেল উপনিষদের ঋষির। সত্যভাষণের দায় মানতে তাঁকে বলতেই হল, তদেজতি, ব্রহ্ম কাঁপেন। ব্রহ্ম চলেন না বলতে বলতেই বলতে হল, হাঁ তিনি চলেন।

আত্মবাদী-ব্রহ্মবাদী ভাষ্যকার কোমর বেঁধে এগিয়ে এসেছেন ঋষির কম্প্র আবেগের উচ্চারণকে তর্কের ধোঁয়ায় ঢেকে দিতে। বললেন, হাঁ ব্রহ্ম কাঁপেন বটে, তবে যিনি কাঁপেন তিনি ছোট ব্রহ্ম, অবর ব্রহ্ম। এই কম্পিত, চলমান ব্রহ্ম রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ হয়ে ধরাতলে আসেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের এইসব সগুণলীলা ব্রহ্মের নির্গুণ অস্তিমাত্রের চেয়ে হেয়, ছোট। অথবা অবতারের নরলীলা অভিনয় মাত্র—লোকশিক্ষার্থে অভিনয়। অভিনয় অর্থ পুরা মিথ্যা নয়, পুরা সত্যও নয়, সত্যমিথ্যা মেশানো ব্যাপার। নাটমঞ্চে যা ঘটে তা সত্যের আভাস, সত্য নয়। আগেই এক দৃষ্টান্ত দিয়েছি এই মর্মে যে উনিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকে নীল-আন্দোলন হয়েছিল যশোর-নদীয়ার গ্রামে। বিশ শতকের এই শেষ পাদে কলকাতার নাট্যমঞ্চে 'নীলদর্পণ' নাট্যাভিনয় যখন দেখি তখন বুঝি মূল ঘটনাটি নাট্যমঞ্চে ঘটছে না; তা ঘটেছিল শতাধিক বছর আগে অন্যত্র। সেই মূল ঘটনার আভাস মাত্র পাচ্ছি বর্তমান নাট্যলীলায়। অবতারের জীবনলীলাও অনুরূপ বলে শাস্ত্রব্যাখ্যাতারা অবতারলীলার গুরুত্ব হাল্কা করে দিয়েছেন। অবর ভূমিতে ব্রহ্মের সকল লীলা 'যেন' যুক্ত; যেন সত্য কিন্তু সত্য নয়, যেন নিত্য কিন্তু নিত্য নয়। রামকৃষ্ণ রামলীলার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, মুনিরা তাঁকে ব্রহ্ম বলে মানেননি। রাম মুচকি হেসে-চলে গিয়েছিলেন।

ব্রহ্মস্বরূপেরও দুটি ভাগ করে ফেলেছেন জ্ঞানবাদীরা: পরব্রহ্ম ও অবর ব্রহ্ম। এই অবর ব্রহ্মই নররূপে অবতার। পরব্রহ্ম যদিও ঋষির অনুভবে রসো বৈ সঃ,

কিন্তু জ্ঞানবাদীর যুক্তিজালে তিনি শুধু তৎসৎ, সত্তা সার। রূপরসময়ী প্রকৃতি তাঁর কেউ নয়, তাঁকেই আবরণকারিণী মায়া মাত্র। ব্রহ্মবাদীর এ কঠোর রায়ে লজ্জিতা প্রকৃতিরাণী আত্মগোপন করতে চেয়েছে, তাই রসমাধুর্য বুকে নিয়ে সে বিশ্বগোপা। প্রকৃতির হৃদয়ের সে গুপ্ত ও গুহ্য ব্রহ্ম রস পানে আহ্লাদিত হতেই পরব্রহ্ম নররূপে আসেন—তাই মহাপ্রভুর ভাষায় অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই ব্রজেন্দ্রনন্দন, রসিকশেখর। আর সেই রস পানে রসোদ্বেল হয়ে পৃথিবীর পথে পথে নিত্য পথিক হয়েছেন পরব্রহ্ম, মানুষী তনু ধারণ করেছেন। রামকৃষ্ণ জানিয়ে গিয়েছেন যে পরব্রহ্মস্বরূপে ফিরে যাওয়াতেই তাঁর লীলা সমাপন হয়নি; বিশ্বের পথে পথিক বেশে নরতনু-আশ্রিত লীলা তারপরও আছে। তিনি যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন, পথ আর ফুরোয় না; পাহাড়ে-পর্বতেও নয়, অরণ্যেও নয়, তাঁর পথ এঁকেবেঁকে চলে গিয়ছে জনপদের ভিতর দিয়ে।

ব্রহ্মের এই চলা—এই চঞ্চলতাতেই তাঁর নিত্য স্থিতি—চঞ্চল-চপল প্রকৃতির বুকে তাঁর স্বাত্মানন্দের উচ্ছলন, তাঁর আপূর্যমান অচল প্রতিষ্ঠা—এই চলার সঙ্গীরাও ওই গোপ-গোপীরাই। অর্থাৎ গোপনচারীরা। চঞ্চলতাকে চুম্বন করে তারাও তাদের ব্রহ্মস্বরূপকে গোপন করে রেখেছে—অরসিক, বেদবাদীর কাছেই শুধু গোপন; বেদনশীলের কাছে গোপন নয়। তারাও অবর ব্রহ্মের খেলার সাথী হয়ে অবর, অন্ত্যজ, হেয়, সাধারণ সেজেছে। তাদেরই সঙ্গ ও সাহচর্যে অব্যয় হয়েছেন অমিতব্যয়ী—এই ধরার বুকে নিজেকে অকাতরে ব্যয় করছেন, অক্ষয় নিজেকে ক্ষয় করছেন। রামকৃষ্ণ মানুষের জন্য নিজের রক্ত মুখে তুলে গিয়েছেন—তাদের পাপতাপভাগ নিজে মাথায় নিয়ে শুধু এই অমোঘ আশীর্বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন: তোমাদের চৈতন্য হোক, তোমরা চৈতন্য হও। এই তাঁর সাধনার চরিত্রলক্ষণ।

রামকৃষ্ণ সাধনা করেছেন সব তুচ্ছ পতিত জাতিহীনদের নিয়ে একটি জাতি গড়তে: ঈশ্বরজাতি। চাঁদা মামা সকলের মামা, আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান-সন্ততি। সর্বমানবকে এই বোধে প্রতিষ্ঠিত করতে ঈশ্বর স্বয়ং প্রাকৃত জন্মের দায় মেনেছেন। অক্ষর নিজেকে ক্ষয়িত করেছেন। নির্বিকার তিনি জগতের বিকার গায়ে মেখে এমনকি মানুষের পদাঘাত সহ্য করেছেন। বেদবাদী বেদবিবাদে পণ্ডা বুদ্ধিকে পণ্ড করার আমোদে মেতে থাকায় লক্ষ্য করেনি যে পরব্রহ্ম লুটিয়ে পড়েছেন ধরণীর ধূলিতে, লুট দিচ্ছেন নিজেকেই, হরিজনদের মধ্যে হরিলুট দিচ্ছেন; দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধাসনে রামকৃষ্ণের তপস্যা

নিখিলজনের জন্য রামকৃষ্ণলুট ছাড়া আর কিছু নয়। এই রামকৃষ্ণলুটের পরিচয় তিনি অনাবৃত করে দিয়েছিলেন জীবনসায়াহ্নে কল্পতরুর উপলক্ষে: যদিও ভক্তরা জানে যে তিনি নিত্যই কল্পতরু।

বেদপণ্ডিতরা এসব কথা বোঝেন না। তাঁরা ধর্ম বোঝেন। মীমাংসাসূত্র 'অথো ধর্ম-জিজ্ঞাসা' বাক্য দিয়ে সুরু করে এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করলেন যে বেদের আদেশ মানাই ধর্ম। শবর ও কুমারিল ভট্ট ব্যাখ্যা করেছেন যে বৈদিক যজ্ঞের ফলস্বরূপ স্বর্গ ইত্যাদি কাম্যবস্তু লাভই ধর্ম। বৈদিক আচার পালন ও তজ্জাত সুফল লাভই ধর্ম:

য এব শ্রেয়স্কর: স এব ধর্ম-শব্দেন উচ্যতে; কথম অবগম্যতাম্;

যো হি যাগম্ অনুতিষ্ঠতি, তম্ ধার্মিক ইতি সমাচক্ষতে;

—মীমাংসা-সূত্রের শবর-ভাষ্য ১. ১. ২

মনু সংহিতায় মনু ধর্ম বলতে বুঝিয়েছেন পণ্ডিতরা নিরাসক্ত ও বিদ্বেষশূন্য হয়ে ও প্রসন্ন হৃদয়ে যেসব কাজ করেন যথা বেদাচার পালন, স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ পালন, লোকহিত করা, আত্মনঃ তুষ্টি ইত্যাদিই ধর্ম। মেধাতিথি বলেন যে একমাত্র বেদপণ্ডিতরাই ধর্ম কী তা জানেন, তাই বৌদ্ধ ও জৈনরা ধর্মবিৎ নন। তিনি ভাগবত-মানা বৈষ্ণবদেরও ধর্মের বহির্ভূত বলে রায় দিয়েছেন।

ভাগবত এর জবাবে বলেছিলেন, ধর্ম মানে স্বর্গফলকামনা নয়, বেদাচার-পালনও নয়, বেদবিধির পারে ঈশ্বরে নিষ্কাম অহেতুক একান্তী প্রেমই ধর্ম। শ্রীধর একটু স্বর খাটো করে, আপসের ভঙ্গীতে বললেন: কোমলম্ ঈশ্বরারাধনা-লক্ষণো ধর্ম নিরূপ্যতে—ঈশ্বরের ভক্তিকোমল আরাধনাই ধর্ম। রামকৃষ্ণের এ আপস নেই; গলায় খড়্গ হানতে গিয়েছিলেন 'মা দেখা দিবিনে?' বলে। বলেছিলেন, এ হল ডাকাতে ভক্তি, উৎপেতে ভক্তি। ব্রহ্ম ভজনার এই অভিনব রীতি রামকৃষ্ণের।

কারণ তিনি যে ভজন করেন, যে ভজনা শেখান আমাদের তা গায়ত্রী মন্ত্রের "ভর্গঃ দেবস্য ধীমহি"-র ভর্গমূল। ভজ ধাতু থেকে ভগ, ভর্গ, ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান শব্দ নিষ্পন্ন। শ্রীধর স্বামী ভগ শব্দের অর্থ দিয়েছেন 'ভজনীয়গুণ'। যিনি ভগের "স্বয়ং"-রূপ স্থাপন করেন তিনিই ভগবান। প্রকৃতিপুঞ্জের ভজনীয় গুণসম্পদ প্রচার করার সাহস মায়াবাদীর নেই, মায়াবাদীর ধ্যেয় ব্রহ্মেরও নেই—কিন্তু নরতনুধারী ভগবানের সে দুঃসাহসের অভাব কোনোদিন হয়নি।

তাই বারবার এই বিশ্বকুঞ্জের প্রকৃতিপুঞ্জের কাছে প্রেমভিখারীর বেশেই এসে তিনি অমলিন বদনে দাঁড়ান। রামকৃষ্ণের ভাষায়ঃ বাড়ির একঘেয়ে ডালভাত ভালো লাগে না। তাই স্বধাম ছেড়ে মর্ত্যধামে এসে পাতা পাড়েন বিশ্বাতীত তুরীয়ও। তাঁর মায়া-ভয় নেই, তিনিই যে মহামায়াবী ও মায়েশ।

ভজনে ভক্ত হন ভগবান, ভগবান হন ভক্ত। কখনো ভগবান চুম্বক, ভক্ত চুম্বিত; কখনো ভক্ত চুম্বক ভগবান চুম্বিত। কে যে ছোট আর কে যে বড় তা বোঝার অবকাশ থাকে না। প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন— বিশুদ্ধ বেদস্তুতির চেয়েও তা ভগবানের কাছে মধুর লাগে। "ভজতি একত্ব-মাস্থিতঃ।" পরব্রহ্ম ও জীব একত্বে অবস্থিত হয়ে উভয়ে উভয়ের ভজনা করেন। আমাকে যে যেমন ভজনা করে আমি তাকে তেমন ভাবে ভজনা করি—ভজাম্যহম্, গীতায় ভগবানের শ্রীমুখ-বাণী।

ঈশ্বর যখন জীবধর্ম স্বীকার করে জীবসেবায়, জীবের ভজনায় নেমে আসেন তখন তাঁকেই অবতার বলি। বেদ-উপনিষদের জ্ঞানবাণী শুনেও জীবের মনে এ চাপা অভিযোগ থেকেই গিয়েছে যে হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা ভিন্ন গাছের পাতাটিও নড়ে না, তুমিই ব্রহ্মাণ্ড-পরিচালক, অথচ কৃতকর্মের ভালো মন্দের ফলভোগ আমাকেই করতে হয়—এ কেমন ন্যায়বিচার? ঈশ্বর একথার জবাব দিতে পারেননি, নিত্য অভিযুক্ত অপরাধী তিনি। নারায়ণ তাই জীবদায়ে আপনি ধরা পড়ে, ধরা দিয়ে অপরাধমুক্ত হতে আসেন। জীব তাঁর ভজনা করার আগেই তিনি জীবের ভজনা করেন। যাবার বেলা শেষ ভজনাটিও তিনিই করে যান। গিরিশ ঘোষ তাই সবিস্ময়ে জেনেছিলেনঃ প্রথম নমস্কারটিও রামকৃষ্ণ করেছেন, শেষ নমস্কারটিও তিনিই করে গিয়েছেন। জীবের কাছে শিবের এই শেষ-অশেষ নতি।

তখন জগতের প্রলিতারিয়েতরা আর প্রলিতারিয়েত থাকে না, তারা বুর্জোয়াও হয়ে যায় না; তাদের অন্তরে ও বাহিরে, চেতনায় ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বিপ্লব মূর্ত হয়ে ওঠে। যুগ যুগান্ত ব্যাপী পরব্রহ্ম ধরার বুকে workers of the worldকে unite করতে, তাবৎ প্রলিতারিয়েতদের সংঘবদ্ধ করতে, সংহত করতে, তাদের সংগঠনের মালায় সমাজে নতুন শৃঙ্খলা-বিন্যাস করতে আসছেন—সে আসায় তাঁর ক্ষান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। বিখ্যাত বিদ্বজ্জনরা নয়, অভিজাতরাও নয়, প্রলিতারিয়েতরাই তাঁর আসার সংবাদ আগে পায়, তাঁকে চিনে নেয়, বরণ করে, তাঁর বন্ধু হয়, অনুগামী হয়, তাঁকে

মাথায়-বুকে রাখে। রাজবৃত্তে আঘাত হানতেই অত্যাচারিত প্রহ্লাদের পাশে নৃসিংহের আবির্ভাব; পাশব চেতনার রাজত্বে পাশব দেহ ধরতেও পরব্রহ্ম কুণ্ঠিত হননি। অযোধ্যার রাজবৃত্ত অতিক্রম করে রাম বেরিয়ে পড়েছেন শবর, চণ্ডাল, বানরদের খোঁজে। তারাই তাঁকে চিনেছে, মেনেছে, অনুসরণ করেছে, হৃদয়ের রাজা করেছে। মথুরার কারাগারে বন্দী জনক-জননীর কোলের ধন কৃষ্ণ; নিরীহ গ্রামের গোয়ালারা তাঁর আশ্রয়দাতা, তিনি মুটে মজুর রাখাল শ্রমজীবীদের বরেণ্য ভর্গ। তাদের সংঘই তাঁর বৃন্দাবন, যা ছেড়ে তিনি কোনোদিন এক পাও যান না। অভিজাত অহংবাদী রাজন্যবর্গের উৎসাদনে কুরুক্ষেত্রে ভেরীনিনাদে যাঁর যুদ্ধঘোষণা, প্রলিতারিয়েতের ব্রজমণ্ডলে তাঁরই মধুর বেণুবাদন। পরব্রহ্ম বেণুর কলভাষায় আপন গোপনতম বাণীটি প্রলিতারিয়েতদের প্রাণমনে সঞ্চার করে দিচ্ছেন, তাদের প্রেমে নিজে মুগ্ধ হচ্ছেন, তাঁর প্রেমে এই পতিতদের মুগ্ধ করছেন।

রামকৃষ্ণ প্রলিতারিয়েতদের মান দিতে, মুক্ত করতে, সংগঠিত করতে, সংঘদেহ গঠন করতে এসেছিলেন। রাজকুলজাত বুদ্ধেরও ছিল ঐ একই ব্রত; তাই তিনি রাজসিংহাসন ছেড়েছিলেন, নির্বাণও ছেড়েছিলেন—পথে জনপদে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, ধর্মের শরণ যে সংঘের শরণ লাভেই পূর্ণ হয় এ কথা তিনি শিখিয়েছিলেন। সে সংঘ দল নয়, পার্টি নয়, গোষ্ঠী নয়, তা বৃহত্তর ব্যাপকতম গণসংঘ। ছুতোর মিস্ত্রির ছেলে যীশু জেলে মালোদের নিয়ে নতুন সঙ্ঘারাম গড়েছিলেন, যা উত্তরকালে পতিত মানুষের, মানবসভ্যতারই শরণ্য হয়ে উঠেছিল। মহাপ্রভুর পদযাত্রা, পথযাত্রার ইঙ্গিতও তদভিমুখে—প্রকৃতি-পুঞ্জকে নিয়ে তাঁর ভক্তজাতি, এক কৃষ্ণপ্রাণ মানবসঙ্ঘ গঠন প্রচলিত সমাজে এমন বিপ্লব আনতে উদ্যত হয়েছিল যে যিনি তাঁকে আহ্বান করে জগতে এনেছিলেন সেই অদ্বৈত আচার্যই ভীতিব্যাকুল হয়ে তাঁকে লীলা সম্বরণের আবেদন জানান। নদীয়া থেকেই জগদানন্দ পণ্ডিত মারফত নীলাচলে মহাপ্রভুকে অদ্বৈত এই বার্তা পাঠান:

প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥

বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥

বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, উনিশ পরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ মহাপ্রভুর প্রচারে ও উপদেশে জনসমাজ বাউলবৎ হয়েছে; প্রচলিত রক্ষণশীল বিধিবিধান শিথিল হয়ে পড়েছে, আর হাটে চাউল বিক্রীর দরকার নেই, চৈতন্যের হাট এবার বন্ধ হোক, সাঙ্গ হোক চৈতন্যলীলা। বৃদ্ধ রক্ষণশীল অদ্বৈতের ভয় হচ্ছে যে লোকসমাজ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে চৈতন্যের বৈপ্লবিক জীবন ও বাণীর অনুপ্রেরণায়ঃ চতুর্বর্ণভিত্তিক, উচ্চ-নীচ ভেদমূল, অভিজাত-পতিতের দ্বন্দ্বদীর্ণ সমাজব্যবস্থা টলোমলো হয়ে উঠেছে। অদ্বৈত পুরানো ভিত্তিতেই লোকসংস্থিতি চাইছিলেন—তবে পতিতের কিছু উদ্ধারও চাইবার মতো প্রাণবত্তা তাঁর ছিল। কিন্তু সীমিত উদ্ধার, relief—এ জন্য তো পরব্রহ্ম অবরদের সমাজে নেমে আসেন নি; তিনি গোটা অবরসমাজকে ব্রহ্মভূত স্তরে তুলে নিতে চান—এইই মহাপ্রভুর প্রেমমণ্ডলিত মানবসংঘ রচনার মূল রহস্য। একটা বৈপ্লবিক পরিণামের পথে যেতে বৃদ্ধ অদ্বৈত ভয় পেলেন।

তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর সেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা॥

অদ্বৈতের আজ্ঞা শুনে মুচকি হাসলেন মহাপ্রভু, তবে বিবাদ করলেন না কেননা জগতে পতিত-সংঘের অভ্যুদয়ের যোগ্য লগ্ন আসেনি তখনো, তিনি জানতেন। স্বরূপ দামোদর সব জেনে বুঝেও তরজার অর্থ ও মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত তাঁর শ্রীমুখ থেকেই শুনতে চাইলেন। মহাপ্রভু সব ভেঙে বললেন না, কিন্তু স্বীয় লীলাবসানের ইঙ্গিত দিয়ে বললেনঃ

প্রভু কহে আচার্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কত কাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥

তরজার অর্থও তিনি জানতেন, অদ্বৈতের মনোকথাও তিনি বুঝতেন। অদ্বৈতবাদী ছিলেন অথবা অদ্বৈতের পাঠ দিতেন বলে কমলাক্ষ ভট্টাচার্য অদ্বৈতবাদের আচার্য নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর অদ্বৈতবাদ-প্রচারণায়

ব্যথিত রুষ্ট মহাপ্রভু একদিন অদ্বৈতের শান্তিপুরের বাড়িতেই তাঁকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করেন। ভক্তিরসে সে অদ্বৈতবাদকে যত দ্রব ও স্বাদু করেই নিন না কেন অদ্বৈতাচার্য, তবু পুরনো প্রভাব ও সংস্কার পুরো ত্যাগ করতে তিনি পারেননি: তাই ভজনের অন্তর্নিহিত সর্বনাশা—সকল নাশা—বৈপ্লবিক রূপ দেখে তিনি সহ্য করতে পারেননি, রথোপরি বিশ্বরূপ-দর্শনে ভয়ভীত অর্জুনের মতোই। অর্জুনও ব্যাকুলিত চিত্তে বলেছিলেন:

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ১১।৪৫

হে দেব, তোমার অদৃষ্টপূর্ব বিশ্বরূপ দেখে আমি যেমন নন্দিত হয়েছি তেমনি ভয়ে আমার মন হয়েছে ব্যাকুল। আমার ভয় দূর করো; আগের মধুর শান্ত রূপটি দেখাও। হে দেবেশ, জগতের আধার, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

অর্জুনের ভয়কাতরতা দেখে ভগবান কৃষ্ণ বিশ্বরূপ সম্বরণ করেছিলেন। অদ্বৈতের বিহ্বলতা প্রশমিত করতে মহাপ্রভু তাঁর গণবিপ্লবী মূর্তি সংহরণ করে লীলাবসান ঘটান।

অদ্বৈতের কিবা দোষ, স্বয়ং বিশ্বজননী রামকৃষ্ণের কুলভাসানো, জাতিনাশা, অজ্ঞানতিমিরান্তক মহাশৈব পদক্ষেপকে হরণ করে নিয়েছিলেন। অসাম্যে স্থিত জগতের ওলট-পালট ঘটাবার কাল প্রতীক্ষা শেষ হয়নি যে! স্পর্শে, দৃষ্টিতে বা সংকল্পমাত্রে সকলকে ব্রহ্মচৈতন্য দান করতে উদ্যত রামকৃষ্ণকে মা সরিয়ে নিলেন। পাছে সরল বোকা সবাইকে সব দিয়ে ফেলে তাই মা এ শরীরটাকে রাখবেন না—রামকৃষ্ণের অকপট উক্তি।

লোককল্যাণার্থে স্বয়ং ব্রহ্মশক্তিকে স্বরূপে প্রাকৃত ভূমিতে অবতরণ করাতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ রামকৃষ্ণ মায়ের সঙ্গে যোঝাযুঝির এক চূড়ান্ত মুহূর্তে কালীর খড়্গ টেনে নিজের গলায় আঘাত করতে গিয়েছিলেন। এ তাঁর দক্ষিণেশ্বরের সাধন পর্বের ঘটনা। মা স্থির থাকতে পারেন নি। প্রথমে নিরঞ্জন জ্যোতিঃপুঞ্জরূপে, তারপর সাকারা মাতৃমূর্তিতে তিনি অবতীর্ণা হয়েছিলেন। এই অকাল উদ্বোধনের পূর্ণ মূল্য রামকৃষ্ণকে শোণিতমূল্যে পরিশোধ করতে হয়েছিল—মানবমুক্তি ব্রতে ঐ তাঁর বীর্যশুল্ক দান আত্ম-বিসর্জনের পৃষ্ঠপটে। ঐ গলদেশই তাঁর আহত হল ক্যান্সার রোগের দংশনে। যৌবনে নিজ হাতে খড়্গাঘাতে যে গলা তিনি দিতেই গিয়েছিলেন সেই

উৎসর্গীকৃত কণ্ঠ, উৎসর্গীকৃত জীবন তাঁকে দিতেই হয়েছিল নিঃসর্তে। যে কণ্ঠে হরিনাম হল, সেই কণ্ঠে রক্তপুঁজ, রামকৃষ্ণবাবু? অন্তিম এ প্রশ্নে রামকৃষ্ণ নিজেই নিজেকে বিদ্ধ করে তাঁর জীবনসাধনার রহস্য উদ্ঘাটন করে দিয়ে গিয়েছেন। মানুষের ভজনায় নেমে স্বয়ং পরব্রহ্মও রক্তপুঁজ উদ্গীরণ করতে করতে হরিনামকেই পরম মহিমা দান করে যান। ব্রহ্মের মহত্তম পরিচয় এই মানব-পরিচয়। মানুষের জন্য তাঁর এই আত্মদান; আত্মলয়।

আত্মলয় অর্থে আত্মহত্যা; আত্মহনন। হন্ অর্থে হনন, কিন্তু গতিযুক্ত হননই ঘন হওয়া। মারা অর্থে হত্যা, আবার মারা অর্থে ঘন করা। যেমন, 'নুন মারা' অর্থে জলের ভিতর ছড়ানো নুনকে জমাট করা। "মূর্তৌ ঘনঃ"—পাণিনি। এর টীকায় সিদ্ধান্তকৌমুদী বলেন—"মূর্তিঃকাঠিন্যং তস্মিন্নভিধেয়ে হন্তেঃ অপস্যাৎ ঘনশ্চাদেশঃ।" হন্ ধাতুর উত্তর কাঠিন্য অর্থে অপ্ প্রত্যয় হয় ও তাতে ঘন আদেশ হয়। যেখানে জনন নেই, সেখানে হনন নেই। ব্রহ্ম জন্মেন না, হতও হন না। তিনি ঘন হন। অবতারলীলায় নরতনুতে তিনি ঘন হন। অবতারের আত্মদান লীলায় তিনি ঘনতম হন। মানুষ হয়ে এসে মানুষের জন্য আত্মদানে সে ঘনত্বের চরম চমৎকৃতি। আত্মারাম এই আত্মদানলীলাতেই বিশ্বরমণ হন। তিনি বিশ্বে রমন্তঃ—লোকসমূহের হৃদয়ে হৃদয়ে ব্রজতি, ব্রজন করেন, লোকহৃদয়কে ব্রজ করে তোলেন। সে হৃদয়-ব্রজে তাঁর নিত্য রাসরসোৎসব। ব্রহ্মের আত্মরতির হননে বিশ্বরতি ঘন হয়ে ওঠে।

বিশ্বের বুকে শিব ও জীবের, হরি ও হরিজনের অনবদ্য সংঘ গঠন করতেই এই লীলা মারার কৌশল—সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মচেতনাকে ছড়ানো অবস্থা থেকে জমাট ঘন করাই সে কৌশলের মর্মকথা। ব্রহ্মাণ্ডে যা ব্যাপ্তচৈতন্য, ভাণ্ডে তাই কূটস্থ চৈতন্য। জীবই ভাণ্ড। মানুষই চৈতন্যময় জীব। মানুষের ছড়ানো চৈতন্যকে ঘন করতেই অবতার আসেন, প্রয়োজনে জীবন দেন। ঐ ঘন চৈতন্যই সংঘ রচনার ভিত্তিমূল।

কেন সংঘ? সংঘ যে তাঁর চাই। স অবিভ্যৎ তস্মাৎ একাকী বিভেতি। তিনি ভীত হলেন, তাই একা থাকতে ভয় পেলেন। কেন ভয়? কালই তাঁকে ভয় পাওয়াল। কালাতীত, অসঙ্গ, শুদ্ধ সৎ ব্রহ্ম কালের স্পর্শে কেঁপে উঠলেন—তদেজতি। কম্পন একটি শক্তিস্পন্দ—স্পন্দন মাত্রেই কালপরম্পরাধৃত। ছোট ছোট কালসমষ্টিই কম্পন। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অচ্ছেদ্য—অবিনাভাবে

ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সততই শক্তিযুক্ত। শক্তিরই কম্পন-স্পন্দন হয়। শক্তিযুক্ত ব্রহ্মই কাল—কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ। কালের পটভূমিতেই ফুটে ওঠে রূপ, ফুটে ওঠে গতি। যেখানে রূপ যেখানে গতি সেখানেই জনন ও হনন। ব্যক্ত ও অব্যক্তে গতায়াত। ব্যক্তের ভূমিতে আসাই জন্ম, অব্যক্তের ভূমিতে ফিরে যাওয়াই লয়। তা জন্মও নয়, লয়ও নয়—আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র।

কালের বুকে ব্রহ্মের অবতরণই তাঁর কম্পন-লীলার শ্রেষ্ঠ রূপ। সে লীলার চরমোৎকর্ষ মানবলীলায়। আবির্ভাব-তিরোভাবমণ্ডিত সে লীলা। সে লীলায় ভগবান বিস্তীর্ণ, গভীর, মধুর ও ঘন। অসঙ্গ ব্রহ্ম বিস্তীর্ণ কিন্তু ঘন নন। নরলীলায় তিনি যুগপৎ দুইই—আবার গভীর ও মধুরও। নরতনুই ব্রহ্মের শেষ পরিণাম। একা তিনি ভয় পেয়েছিলেন, এখন আর সে ভয় নেই। এখন বহুর আলিঙ্গনে তিনি আলিঙ্গিত, আশ্বস্ত। এই বহুকে তাঁর চাই—বহু একার সম্পূরক। তাই মানুষই ব্রহ্মকে ভজনা করে না, ব্রহ্মও মানুষকে ভজনা করেন। প্রয়োজনে মানুষের জন্য আত্মদান করেন। হরি নিজেকে লুণ্ঠিত করেন, লুট দেন। রামকৃষ্ণ ব্রহ্মের সে লুটমূর্তি।

ঈশ অনীশ হলেন। হবার কারণ অনীশকে তিনি ঈশ করে তুলতে চান। অনীশ জগতকে ঈশ-বিশ্ব রূপে গড়তে চান। এই তাঁর সংঘ গঠনের মূল কথা। অনীশই প্রলিতারিয়েত, সর্বহারা। তার সব আছে বলেই সে সব খোয়াতে পেরেছে,—নতুবা হারাত কী? হারানোর মতো সম্পদে ভরপুর মানুষ। কারণ মূলে সেও ব্রহ্মকণা বইকি! আত্মপরিচয়-হারা, স্বরূপবোধ-হারা হয়ে সে সর্বহারা। তাকে তার লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরিয়ে দেবার ব্রত নিয়েই ব্রহ্ম মানুষ হন। "আসীনঃ দূরং ব্রজতি"—স্বসত্তায় স্থিত থেকেই তিনি দূরে ব্রজন করেন। শুধু ভাবে নয়, আলঙ্কারিক অর্থে নয়, প্রতীকী তাৎপর্যেও নয়, সত্যই ব্রজন করেন। লোকসমূহের মধ্যে চলে যান, চলতেই থাকেন। চলতে হলে পা চাই, ধরতে হলে হাত চাই, দৃষ্টিপ্রসাদ দিতে হলে চোখ চাই। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা—অর্জুনের জিজ্ঞাসা। স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা মানুষকে শোনাতে হলে কণ্ঠ চাই। বেণুবাদনের কলভাষাই স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা, ব্রজভাষা, গীতার ভাষা —ভগবানের গীত বা গানের ভাষা। বেণু বাজাতে মুখ চাই। এককথায় ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়াদি চাই। ইন্দ্রিয়াদি ধারণ করেই তিনি গোবিন্দ। তিনি ইন্দ্রিয়দের প্রভু বটে কিন্তু নিজে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর। ইন্দ্রিয়ধারী মানুষ ও জীবের সমভূমিতে তিনি নেমে দাঁড়িয়েছেন। ইন্দ্রিয়-পথে পরব্রহ্ম হন দেহধারী

মানুষের সখা। পৃথিবীতে তিনি আসেন মানুষকে শাসন করতে নয়, দণ্ড দিতে নয়, ভয় দেখাতে নয়, স্তুতি পেতেও নয়—সখামণ্ডলী গড়ে তুলতে। সব মানুষ তাঁর সখা- কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ, এই মাত্র। আশা তাঁর, সবাই অন্তরঙ্গ হবে। যারা এল না কাছে তাদেরও জন্য বেদনভরা বুকে বেদগান করে যান তিনি। সেই গানই তাঁর কথামৃত।

যারা এল না কাছে, তিনি নিজেই তাদের কাছে এগিয়ে যেতে চান। তাই নিভৃত কামারপুকুর থেকে ভারতের রাজধানীতে এসেছেন রামকৃষ্ণ, রাজধানীর হাতার মধ্যেই ত্রিশ বছর বাস করেছেন, অবশেষে তাতেও কুলোয়নি বলে কলকাতায় শ্যামপুকুরে, বলরাম বসুর বাড়িতে ও কাশীপুরে শেষ সময়টা কাটিয়ে গিয়েছেন। তাতেও মুষ্টিমেয় কিছু লোকই এসেছিল তাঁর কাছে, অবশিষ্ট অসংখ্যের জন্য তিনি সারদা দেবীকে বলে যান—ঐ দুঃখী লোকদের তুমি দেখো।

অসঙ্গ ব্রহ্ম মানুষের সঙ্গ-কাঙাল—বলেন, এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়। এই গীতিটি অস্ফুট কণ্ঠে রামকৃষ্ণ গাইতেন। এই দায় বহনই তাঁর সাধনার লক্ষ্য নির্ণয় করে দিয়েছিল। ঈশ্বরের দর্শনলাভ বা ঈশ্বর হওয়ার জন্য তাঁর সাধনা ছিল না—ও তো স্বতঃসিদ্ধ ও সহজাত ব্যাপার ছিল, ঈশ্বর ঈশ্বরলাভের জন্য কেন সাধনা করবেন? "ঈশ্‌ ঐশ্বর্যে; ঐশ্বর্যমীশ্বরীভাবঃ অধীনীকরণঞ্চ।" ঐশ্বর্যভাব ঈশ্বরের স্বভাবঃ জীবকুল স্বতঃই তাঁর অধীন। সাধনার দ্বারা তাঁকে এসব লাভ করতে হয় না। যা তাঁর স্বতঃই নেই তা পেতে ও হতেই তাঁকে সাধনা করতে হয়—তাঁর সাধনার লক্ষ্য বিপরীতমুখী। যিনি ঈশ্বর ছিলেন না তপস্যাক্রমে তাঁর ঈশ্বর হওয়া ঈশ্বরীভবন; যিনি জীব ছিলেন না তপস্যাক্রমে তাঁর জীব হওয়া জীবভবন। অভূত ব্রহ্ম ভূত মহেশ্বর হয়েছেন বলেই ভূতসাম্য লাভ করতে জীবভূত হবার দায় তাঁর। দক্ষিণেশ্বরের ব্রহ্মপাঠে পরব্রহ্ম সর্বাংশে অনবদ্য জীব হয়ে জীবের সখা হবার সাধনা করেছিলেন। অধীনীকরণঞ্চ—জীবকে অধীন করা ঈশ্বরস্বভাব। দক্ষিণেশ্বরে ঈশ্বর জীবের অধীন হতে বহুপথগামী বিচিত্র সাধনা করেছিলেন। বিশ্বে সেই সবচেয়ে দুরূহতম সাধনা।

জীবের অধীন হতে হলে জীবকে ঈশ্বরের আসনে বসাতে হয়, জীবকে ঈশ্বর করতে হয়, শিব জেনে জীবকে পূজা করতে হয়। তাই-ই করেছিলেন রামকৃষ্ণ। একান্ত ঈশ্বর হওয়া ও জীবকে অধীন করা—স্বৈরতন্ত্রীর মতো

আচরণ, ঈশ্বরের পক্ষে তাও মায়া। তাতে তিনি হাঁফিয়ে ওঠেন, ভয় পান, অভিযুক্ত হন জীবকুলের কাছে। তাতে ভজন নেই, ব্রজন নেই—ডিক্টেটর ঈশ্বর আপন দূরত্বে, নিঃসঙ্গতায়, ঐশ্বর্যের কারাগারে বন্দী ঈশ্বর। আর সবই অনীশ, তিনি একা ঈশ ; অনীশ-পরিবৃত ঈশ একা, অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, ব্যর্থ। অনীশকে ঈশ করে আপন সহচর, দরদী, সমরসরসিক করে গড়ে নেওয়াই তাঁর সামর্থ্যের, দৈবী প্রতিভার, সৃজন কুশলতার, কবিস্বভাবের পরিচায়ক। মহামায়াবী ব্রহ্ম মায়াদণ্ডস্পর্শে জীবসমূহের চৈতন্যকে ঘুম পাড়িয়ে একা জেগে থাকতে চান না ; তিনি বিশ্বজীবের চৈতন্যকে স্ফুরিত, জাগ্রত জীবন্ত করে বিশ্বাঙ্গনকে তাঁর ক্রীড়াঙ্গন, লীলাঙ্গন, বৃন্দাবন করে তুলতে চান। তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী ও স্বৈরাচারী নন ; সঙ্ঘবাদী, প্রেমিক, রসিক, কবি। পরব্রহ্মের রসিক-কবি রূপে আত্মপ্রকাশই রামকৃষ্ণ।

চৈতন্য স্বয়ম্ভর ও সর্বাত্মক। জড় ইন্দ্রিয়গোচর ও প্রত্যক্ষ কিন্তু তার আপাতরূপই তার অন্তিম পরিচয় নয় ; স্বরূপে জড় চৈতন্যেরই কায়রূপ—চৈতন্য তাতে আবৃত ও নিগুহিত মাত্র। এ ব্রহ্মাণ্ড চৈতন্যে জারিত, স্বরূপে চৈতন্যই। কার্ল মার্ক্স পদার্থ বলতে যা বুঝতেন পদার্থবিদরা আজ আর তা বোঝেন না। মার্ক্সের সময় পরমাণু অবিভাজ্য ছিল, পদার্থ যে শক্তিকূট মাত্র তাও জানা ছিল না। সব শক্তিকূটই যে মূলে চৈতন্যকূট আধুনিকতম বিজ্ঞান সে সিদ্ধান্তের উপকূলে পৌঁছেছে। চৈতন্যসমুদ্রে ভাসমান আমরা, দোলায়িত এ জগৎ, যত রূপ যত প্রাণ যত মন সব চৈতন্যসমুদ্রে এক একটি বুদ্বুদ মাত্র। চৈতন্যই পরব্রহ্ম, চৈতন্যই জীব, চৈতন্যই প্রকৃতি। বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ দৃষ্টিতে ও কর্মে এই সত্যই উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ যখন সংঘ রচনার মন্ত্র দেন তা বস্তুবাদীর আংশিক সত্যোচ্চারণ হয় না, তা হয়ে ওঠে চৈতন্যের প্রজ্জ্বলন-মন্ত্র। তাঁর সংঘ চৈতন্যলীলায় সর্ব মানবের আমন্ত্রণ। প্রকৃতিপুঞ্জকে তিনি পেতে চান, বাঁধতে চান দিব্যের আবেশে। মর্ত্যের অণুপরমাণুতে জ্বালিয়ে দিতে চান চৈতন্যের দীপশিখা। মানুষকে করতে চান মান-হুঁশ। এই মৃত্যুলাঞ্ছিত শবজীবনে মৃত্যুত্তীর্ণ শিবদৃষ্টির উন্মেষ ঘটানোই তাঁর সাধনলক্ষ্য। নিখিল মানবের অজ্ঞান-নির্মোক অপহরণ করে নিখিল দেবসঙ্ঘের অভ্যুদয় ও বিকাশই তাঁর গূঢ় ও দুরূহ তপশ্চর্যার সার কথা।

১১

বিশ্বপুরুষের সাধনা

স্বষ্টির মূল শক্তি প্রেমের প্রেরণা, না, প্রয়োজনের তাগিদ? বস্তুবাদী দ্বিতীয়টিকেই সত্য বলে জানেন. কিন্তু অখণ্ড দৃষ্টিতে প্রশ্নটির অমন একপেশে উত্তর মানার দরকার হয় না। এখনো বস্তুবাদী দৃষ্টি অতি সীমাবদ্ধ; প্রশ্নের মুখোমুখি হবার বদলে প্রশ্নকে এড়িয়ে থেকে স্বস্তি খোঁজেন বৈজ্ঞানিক। পনেরোশো বা বিশশো কোটি বছর আগে তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের স্বষ্টিমুহূর্ত ধার্য করেছেন, তার আগে কী ছিল তা তাঁদের জানা নেই, প্রশ্নও নেই। তখন, অর্থাৎ T=0 সময়ে, অর্থাৎ যার আগে দেশ-কাল কিছুই ছিল না বলে বৈজ্ঞানিকের অভিমত, আকস্মিক এক বিস্ফোরণে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হল। বৈজ্ঞানিক বলেন জগতে আকস্মিক কিছু ঘটে না, ঘটার কারণ থাকে। যেহেতু ব্রহ্মাণ্ড-স্বষ্টির কারণ বা কর্তা তাঁদের অজ্ঞাত তাই 'আকস্মিক' বলে তাঁরা পার পেয়ে যেতে চাইছেন। এতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বা অভাবই ধরা পড়ে, গর্ব করার কিছু নেই এতে।

বৈজ্ঞানিক বলেন, চারশো বা পাঁচশো কোটি বছর আগে সৌরমণ্ডল ও পৃথিবী রূপ নিয়েছিল। সাড়ে তিনশো কোটি বছর আগে প্রাণ জেগে উঠল তাতে। কারও মতে দু কোটি বছর আগে, কারও মতে বা মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে মানুষ এসেছে জগতে। এই যে সব ঘটনা ঘটল—দেশকালের পটভূমি ফুটে উঠল, তারপর অযুত-নিযুত নক্ষত্র ও সৌরমণ্ডল ফুটে উঠল, তারপর প্রাণ ও মন;—এসবের পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক বর্ণনা করেন। তাও তাঁদের সব বিষয়েই মতভেদ আছে। কিন্তু কোন প্রেরণায় বা তাগিদে এসব ঘটল তা তাঁদের জানা নেই। সৌরমণ্ডল স্বষ্টির প্রয়োজন কী, কার প্রয়োজন? কারও নয়, কারণ প্রয়োজন অনুভব করার মতো কেউ তো তখন ছিল না। বস্তুবাদীর সিদ্ধান্ত তো তাই। তাঁদের মতে প্রয়োজনবোধটাও দেখা দিল আকস্মিক, প্রাণীর আবির্ভাবের পর। যা আকস্মিক ও আপতিক তা বস্তুর স্বরূপধর্ম হতে পারে না। ইতিহাসের কোনো সময়ে তা আকস্মিকই আসে, আবার

আকস্মিকই চলে যায়। যা অবিচ্ছেদ্য, যা না থাকলে বস্তুর স্বভাবই পালটে যায় তাকেই বলা যায় তার সার, তার স্বরূপলক্ষণ। বস্তুর আবির্ভাব ও বিকাশে অন্তত সাড়ে বারোশো কোটি বছর ব্যাপী কালে প্রয়োজনতত্ত্বের চিহ্নমাত্র পাওয়া যায়নি। ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের বড় অংশটাতেই যা ছিল না, অথচ না থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটেছে, তাকেই চরম মর্যাদা দেওয়া বালচপলতা ভিন্ন কিছু নয়।

ব্রহ্মাণ্ডের দেশকালের পৃষ্ঠায় গ্যালাক্সি, ছায়াপথ, নক্ষত্র ও সৌরমণ্ডলের অক্ষরে অক্ষরে প্রেমের কাব্যই লেখা হয়েছে; এক বিশ্বভাবন প্রেমিক ও কবির লেখা সে কাব্য। সেই কবি আত্মমোহগ্রস্ত নন, অতৃপ্ত হলে নিজের লিপি অবলীলায় মুছে দেন তিনি, নতুন শব্দ ও পদ বসান, নতুন পংক্তি লেখেন।

একবার এই পৃথিবীটাকে তিনি একদিকে শুধুই জল, আর একদিকে শুধুই স্থল এভাবে ভাগ করেছিলেন। ভালো লাগল না তাঁর। ডাঙা ভেঙে জলে ফেললেন, এক সাগর ভেঙে হল নানা সাগর, এক ডাঙা ভেঙে হল নানা মহাদেশ। বীজাণু থেকে ডাইনোসার পর্যন্ত প্রাণী গড়লেন, কিন্তু ক্ষুদ্র বীজাণুকে মান দিলেন, দানব ডাইনোসারকে বিদায় দিলেন। মানুষের তাতে স্বস্তি পাবার কারণ নেই, সংশয়ের কারণ আছে। মানুষ যদি দু কোটি বছরও জগতে এসে থাকে—রাজত্ব চালাচ্ছে মাত্র ত্রিশ হাজার বছর। পক্ষান্তরে ডাইনোসার পনেরো কোটি বছর রাজত্ব চালিয়ে গিয়েছে। মানুষের রাজত্ব, এমনকি অস্তিত্ব অনন্তকাল স্থায়ী হবে, এ কথা কে বলেছে? কে বলতে পারে? অসভ্য দানব টেঁকেনি, অসভ্য মানবও টিঁকবে না। অভদ্রতা থেকে ভদ্রতায় উত্তরণই বাঁচার পথ। বিকশিত হবার পথ। তাই-ই সাধনা। প্রয়োজনবোধতাড়িত মানুষ বাঁচার জন্য লড়াই করে ও জীবনকে ধ্বংস করে। পৃথিবীর মাটির তলা থেকে জ্বালানী ও খনিজ পদার্থ তুলে এনে বেপরোয়া ভঙ্গীতে ক্ষয় করে, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল উজাড় করে, জল ও বাতাসকে বিষাক্ত করে, আকাশেও মারণাস্ত্রবাহী যান পাঠায়, মানুষকে শোষণ-পীড়ন ও হত্যা করে। এ সবেরই মূলে প্রয়োজনবোধ। প্রয়োজনতাড়না মানুষকে ক্ষেপা কুকুর করে তুলতে পারে। ক্ষেপা কুকুর নিজের অনিবার্য মৃত্যুই ডেকে আনে।

বাঁচার প্রয়োজনে মানুষ প্রেমের ধর্ম শিখবে এ আশা বাতুলতা। প্রয়োজনতাড়নার ঊর্ধে উঠে প্রেমবোধে জাগ্রত হলে তার জীবন সার্থক হয়।

কেননা প্রেমই ব্রহ্মাণ্ডের মূল শক্তি। প্রেমেই সে ব্রহ্মাণ্ডমূলের সঙ্গে মানুষের আত্মসনাক্তীকরণ ঘটে। প্রেমই সাধনা।

প্রেমের উচ্চারণই ভাষা, প্রেমের অস্ফুট বোধই সমাজ; ভাষা ও সমাজ প্রয়োজন মেটাতে আবিষ্কৃত একথা বলার সাহস নৃতাত্ত্বিকের হয়নি। রহস্যই গোড়ার উপলব্ধি: প্রাণ রহস্যময়, প্রকৃতি রহস্যময়, মৃত্যু রহস্যময়। রহস্যের ঘেরাটোপে জগৎ ও জীবন: মানুষের মনোচেতনায়ই এই রহস্যবোধ প্রথম উদিত। আদিম শিকারীরাও কবর দিত: জ্যাকব বুর্কহার্ডের মতে মানব-প্রকৃতির শাশ্বত ও অনশ্বর পরমার্থ-চেতনার সাক্ষ্য এই কবর (Reflections on History, পৃষ্ঠা ৪১)। কবরই নয়; শিকার, পশুপালন ও কৃষিও তাই—এসব আবিষ্কারের পিছনে অর্থনৈতিক প্রয়োজন ছিল: তার চেয়ে বেশি ছিল মানুষের ধর্মবোধ। "the agricultural-pastoral revolution might never have been achieved if it had not been a religious revolution, (আর্নল্ড টয়েনবি: A Study of History, সচিত্র একখণ্ড সংস্করণ, টেমস ও হাডসন প্রকাশিত, পৃ: ৪৮)

কেননা শিকারী শুধু দোহন করত পার্থিব পরিবেশ থেকে, শুধু ছিনিয়ে নিয়ে ভোগ করত, প্রয়োজন মেটাত। সে খুঁড়ে নিত কন্দমূল, ছিঁড়ে নিত গাছের ফল, হত্যা করত পশু, পাখি, মাছ। ঐ নিছক হননের দৃষ্টি ছেড়ে, শুধু পাবার-নেবার-দখলের বৃত্তি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে যখন মাটির প্রতি, ঋতুপর্যায়ের প্রতি, উদ্ভিদের প্রতি, পশুর প্রতি, এমনকি মানুষের প্রতি প্রেম-প্রসন্ন হল, ভালোবাসল, পরিচর্যাবান হল তখনই সে কৃষি ও পশুপালনে, ঘর বাঁধায়, নারীকে একনিষ্ঠ সযত্ন স্নেহদানে ও সন্তান-সন্ততির পরিপালনে মন দিতে পেরেছে। এসবই দাবী করে ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহযোগিতা ও ত্যাগ; শুধু ভোগ, কেড়ে নেওয়া, প্রয়োজন তথা স্বার্থসিদ্ধির দৃষ্টি অবলম্বনে এর কোনোটাতেই সাফল্য আসে না, এমনকি প্রবৃত্তিও না। হৃদয়ে, দৃষ্টিভঙ্গীতে, জীবনে প্রেমানুভূতির জাগরণই মানুষকে হিংস্র হননকারী যাযাবর শিকারী থেকে দায়িত্বশীল গৃহস্থ, স্নেহশীল পিতামাতা, শ্রদ্ধাশীল পুত্রকন্যা ও সামাজিক প্রীতিময় মানুষ করে তুলেছে। সংস্কৃতি রচনা ও সাংস্কৃতিক পরম্পরা রক্ষা এ সপ্রেম মানুষেরই সাধনার ফল। শিকারীও মানুষই ছিল; তাই মনুষ্যত্বলক্ষণবর্জিত জীব হিসাবে তাকে দেখা চলে না। গুহাচিত্রে, মূর্তিনির্মাণে, পাথরের হাতিয়ারেও প্রয়োজনাতিরিক্ত সৌকুমার্য ও নান্দনিক কারুকৃতি

আনার চেষ্টায়, ভাষা সৃষ্টিতে, পরিবার ও সমাজের অঙ্কুর বিকাশ করে তোলায় ও সর্বোপরি জীবন-মৃত্যুর রহস্যবোধের অনুভবে সে তার মানবস্বভাবের সাক্ষ্য রেখে গিয়েছে। টয়েনবি এত কথা বলেননি; কিন্তু মনে হয় ধর্মীয় বিপ্লব বলতে তিনি মানুষের বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর রূপান্তরের কথাই বলেছেন: শিকারীর রুক্ষ তির্যক দৃষ্টিতে প্রেমস্নিগ্ধতার আবেশের কথাই বলতে চেয়েছেন। কৃষিজীবী গৃহস্থ মানুষ প্রকৃতিকে দান করেছে, শুধু কঠোর হাতে ছিনিয়ে নেয়নি প্রকৃতি থেকে; জমিকে করেছে সে উর্বর, ফলিয়েছে ফুল ও ফল, রোধ করেছে ভূমিক্ষয়; পশু পাখির সঙ্গে সে যোগ করেছে তার নিজস্ব নতুন কলতান, এনেছে মধুরতর হাসি ও গান। সর্বোপরি, হাজার হাজার কোটি বছর যাবত প্রকৃতি যে তারই নিরুদ্ধ চৈতন্যের উন্মীলনের প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাসে দিন গণেছে, প্রেমিক মানুষ মুক্ত করেছে সে চৈতন্যকে। আকাশে সূর্যোদয়ের মতোই, প্রকৃতি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে মানুষের চেতনার ভাস্বরতায়ঃ ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি বছরের অস্তিত্বের তাৎপর্য ও লক্ষ্য মানুষের চেতনা-দ্বারেই হৃদয়ঙ্গম করেছে বিশ্বপ্রকৃতি। সত্তাধারণের সার্থকতার হদিশ আর কে তাকে দিতে পারত। পুত্র যেমন মাতৃঋণ শোধ করে, পৃথিবীমাতার ঋণ তেমনি শোধ করেছে মানুষ স্বানুভবের আনন্দে ও দীপ্তিতে। স্বানুভবের নিবিড়তাই প্রেমবোধ।

দেবভাবনাও আদিম মানুষের মধ্যে বিকশিত না হলে তার জীবন ও সমাজকে ধীরে ধীরে উন্নত করা সম্ভব হত না। শিকারের বদলে কৃষি এসেছিল শুধু প্রযুক্তিবিদ্যায় উদ্ভাবনের বলে নয়। ছাড়া ছাড়া ভাবে অনুকূল জমিতে কৃষি করা চলে; তাতে ব্যক্তি বা পরিবারের যদি বা চলে, সমাজের চলে না। একসঙ্গে ব্যাপক অঞ্চলে কৃষিকাজ করলেই সমাজের ভরণপোষণ হয়। সব জমি নদীর কাছে থাকে না, থাকলেও নদী সেঁচে সেচ চলে না, খাল কাটতে হয়। জলা জঙ্গলে পতিত জমি যোগ্য করে তুলে আবাদী করতে হয়। এ সব বড় মাপের কাজ, বহু মানুষের সহযোগ ছাড়া সম্ভব হয় না, মজবুত সামাজিক সংগঠন চাই। শ্রমসাধ্য, হাতে হাতে ফল মেলে না, অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘকাল—এমনতরো এ কাজ। নিজের জমিটুকুই নয়, সবার জমিই লাভবান হবে এমন উঁচু ভাবনা মাথায় রেখে সাধারণ অজ্ঞ ও পূর্বসংস্কারহীন মানুষ এমন কাজে হাত দেবে কেন? প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষ যে এমন নতুন কাজে হাত লাগিয়েছিল তা তাদের শুভবুদ্ধির প্রেরণায় বটে, রাজার নির্দেশেও বটে, কিন্তু মূল কথাটা তাদের কাছে ছিল এই যে জমি-হাসিল করা, সেচযোগ্য

করা, ফসলে ফসলে দিক ঢাকা দেবকর্ম, দেব-উপাসনা, দেবতার তৃপ্তি-সাধন—আর তাতেই নিজেদেরও চরম তৃপ্তি ও কল্যাণ। সুমের, মিশর ও সিন্ধু উপত্যকায় জমি হাসিল যারা করেছিল তারা মেনে নিয়েছিল যে জমি দেবসম্পত্তি। দেবতা-প্রত্যয় ও দেবসেবার অভিপ্রায় প্রাক-সভ্যতা থেকে সভ্যতার স্তরে মানুষকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংগঠনও উদ্‌বর্তিত হয়েছে দেবমন্দিরকে কেন্দ্র করে: দেব-উপাসক পুরোহিতের আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক নেতৃত্ব, যা দিয়েছে আদর্শ, ইডিওলজি, ধর্ম; দেবতার মর্ত্যপ্রতিনিধি রাজন, যাঁর নেতৃত্বকে ঘিরে দানা বেঁধে উঠেছে রাষ্ট্রমণ্ডল। পুরোহিতরা লোক ঠকাতে ধর্ম-উদ্ভাবন করেনি। পুরোহিত শ্রেণীর অভ্যুদয়ের বহু আগে Catal Huyuk-এর ঘরে ঘরে ঈশ্বরোপাসনার ক্ষুদ্রাকার মন্দির ও বেদীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে (আট হাজার খ্রীস্ট পূর্বাব্দ)। শহর গড়ে উঠলে গণ-মন্দিরও গড়ে উঠেছে এবং সেখানেই প্রথম সাধারণ-শস্যাগার ও প্রথম লিপি সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম গণ-মন্দির পাওয়া গিয়েছে সুমেরের কাছে এরিডুতে (৩৫০০ খ্রীঃ পূঃ) যেখানে শস্যাগার ছিল; আর প্রথম লিপি পাওয়া গিয়েছে উরুকের মন্দিরে।

দেবতায় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস—পৃথিবীর সর্বত্র। সে বিশ্বাস শিকারযুগেও ছিল—সত্তর হাজার খ্রীস্ট পূর্বাব্দের কবরেও পাওয়া গিয়েছে পরলোকে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত জিনিস। যথা অলঙ্কার। মিশরে জীবন যাপিত হত মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে। পিথাগোরাস আত্মার অমরত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করেছিলেন পুনর্জন্মবাদ। ক্রমেই এই সব বিশ্বাস উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে, উপলব্ধি হয়েছে গভীর থেকে গভীরতর, খণ্ড ধর্মবোধ উত্তীর্ণ হয়েছে অখণ্ড সমগ্রতায়, আঞ্চলিক ধর্ম রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বজনীন ধর্মে। বিশ্বজনীন রাষ্ট্র বিশ্বজনীন ধর্মের দীপাধার হয়ে উঠেছিল: যথা মৌর্য-সাম্রাজ্য বৌদ্ধ ধর্মের, গুপ্ত সাম্রাজ্য সনাতন ধর্মের, রোমান সাম্রাজ্য খ্রীস্টধর্মের, আরব-সাম্রাজ্য ইসলামের।

ইতিহাসের এই গতিচ্ছন্দ অনুসরণ করলে বুঝি যে ঈশ্বরপ্রত্যয় ও ঈশ্বরানুভব ছাড়া মানবসভ্যতা উষাকাল থেকে কখনো এগোয়নি: যেন ঈশ্বর তাঁর অনন্ত কৃপায় মানুষের হৃদয়ে তাঁর বোধ সঞ্চারিত করে, তাঁর স্পর্শ দান করে মানুষকে টেনে তুলেছেন চেতনার জড়িমা থেকে, পাশব স্তর থেকে নিয়ে এসেছেন সভ্যতা-সংস্কৃতির স্তরে; পশুমানবকে সাধক মানবে রূপান্তরিত করেছেন।

নৃসিংহের আবির্ভাবের কাহিনীতে এই গোটা সত্যটি ধরা আছে। সর্বাগ্রে মনে পড়ে জয়দেবের স্তবমন্ত্রটি—ঈশ্বর কিভাবে তমিস্রাগর্ভ থেকে মানুষের চেতনাকে টেনে তুলেছেন হিরণ্যদীপ্তির সীমায় তা যেন এক লহমায় দেখে নিয়েছিলেন কবিঃ প্রলয়কালে তিনি ধারণ করেছেন জ্ঞান, ধরিত্রীকে রক্ষা করেছেন, এবং

> তব কর-কমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং।
> দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্॥
> কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥

হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি! তোমার করকমলের অদ্ভুত নখশৃঙ্গে হিরণ্যকশিপুর দেহ-ভৃঙ্গ দলিত-চূর্ণিত হয়। নরসিংহরূপধারী তোমার জয় হোক।

ভাগবত বললেনঃ মাদুরশিল্পী যেভাবে মাদুরের গ্রন্থিহীন কাঠিগুলি কোলের ওপর নিয়ে চিরে ফেলে সেভাবে নরসিংহরূপে মহাগর্বী দানবরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিজের উরুর ওপর শুইয়ে নখ দিয়ে চিরে ফেললেন। কাহিনীর বিস্তারক্রমে ভাগবত বর্ণনা দিয়েছেন যে দানবরাজ হিরণ্যাক্ষকে ভগবান বরাহ-মূর্তি ধরে বধ করলে তার প্রতিশোধকামী ভাই হিরণ্যকশিপু ভগবানকে হত্যা করতে চেয়েছিল। প্রথম সে আঘাত হেনেছিল ভগবানের সন্তান মানুষের ওপরঃ ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল, গ্রাম ও ধানের ক্ষেত, গোপপল্লী, কৃষক-পল্লী, নগর ও ঋষির আশ্রম তছনছ করেছিল, দেবতাদেরও করল হতমান। তারই ঘরে জন্মেছিল প্রহ্লাদ, দাসের মতো বিনীত কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমে মজ্জিত ও মানুষের সেবাপরায়ণ। ক্রোধান্ধ হিরণ্যকশিপু নিজের ছেলেকে বধ করতে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে নেমেছিল খড়্গ হাতে। তখন স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন নৃসিংহ। হিরণ্যকশিপু ও তাঁর দলবল হত তো হলই, ভগবানের দিব্য ক্রোধে ব্রহ্মাণ্ড টলমল করে উঠেছিল। প্রহ্লাদের ভক্তিই তাঁর করুণাময় রূপ আবার ফিরিয়ে এনেছিল।

পাশব চেতনা থেকে মুক্ত মানুষের সহায় ও রক্ষক ঈশ্বর স্বয়ংঃ তিনিই রক্ষা করেন তার গোপপল্লী, কৃষিপল্লী, তপস্যার আশ্রম ও নগর, তিনি পালন ও পোষণ করেন তার ঊর্ধ্বমুখী চেতনার শিখা। পশু থেকে মানবে উত্তরণের সংগ্রামে বিপ্লবের বেশে এসেছিলেন ঈশ্বর—একটি ক্ষুদ্র দেশখণ্ডে নয়, সারা পৃথিবীতে। সেই অভিজ্ঞতা ও অনুভবই ব্যক্ত হয়েছে জগৎজোড়া ধর্মপ্রত্যয়ে। মানুষের সাধনা, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সেকুলার, অপরোক্ষ

অনুভব ও সমাজ সভ্যতা ও রাষ্ট্রগঠন—এই সকল স্তরের সাধনা ঈশ্বর-আশ্রিত ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব সবেরই সাক্ষ্য এই। প্রয়োজনতাড়না মানুষের ইতিহাসে যতটা গতিশক্তি জুগিয়েছে, তাকে বহুগুণে ছাপিয়ে গিয়েছে তার ঈশ্বরপ্রেমানুভব।

রাষ্ট্র একটি মূল জাগতিক সংগঠন। ঈশ্বরের চিন্ময় অনুভব স্থূল রাষ্ট্রানুভবের মূলে কতখানি বর্তমান তা বললে উপরোক্ত কথাটি সহজগ্রাহ্য হবে। প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম পীঠভূমি চীন যখন ইতিহাসের আলোয় এসে পৌছল নয় বা আট খ্রীস্ট পূর্বাব্দে তখন দেখি তা বহু ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত একটি দেশ। তাদের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ চলছে। সেই অস্থিরতা, অশান্তি ও ধ্বংসের ভিতরে বসে চীনা সন্ত, ঈশ্বরপ্রেমিক ও দার্শনিকরা সভ্য জীবনের বার্তা, প্রেরণা ও বিধিবিধান নির্দেশ করতে লাগলেন—কনফুসিয়াস এঁদেরই একজন। এই যুদ্ধ ও অরাজকতার কালেই সবগুলি চীনা দর্শন প্রচারিত হয়েছিল। ফলে চীনে রাজনৈতিক ঐক্য আসার বহু আগেই সাংস্কৃতিক জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পেরেছিল। একটি বিশিষ্ট চৈনিক মানসতা বিকশিত হয়েছিল। ২২১ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ নাগাদ তারই ফলে চীন রাষ্ট্রীয় ঐক্যও লাভ করে—শিন ও হান বংশ চীনা রাষ্ট্রীয় ঐক্য এনে দেয়।

আর এক পুরনো সভ্যতার দেশ মিশর। চীনের বহু আগে ৩১০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দেই দেবপ্রতিনিধি বা স্বয়ং দেবতাপ্রতিম ফ্যারাও রাজাদের নেতৃত্বে উত্তর ও দক্ষিণ মিশর মিলিত হয়ে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল।

গ্রীসে দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চা বহু দূর এগোলেও কোনো জ্বলন্ত ধর্মীয় বোধ সে দেশে ছিল না। তাই সক্রেটিস-প্লেটো-আরিস্ততলের মতো প্রজ্ঞাবান দার্শনিকরা থাকতেও গ্রীস ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত থেকে চিরকাল অন্তর্যুদ্ধই করেছে—অবশেষে রোমান সাম্রাজ্যভুক্তি ছাড়া তার আর উপায় ছিল না।

ভারতের ইতিহাসেরও গোড়ায় পাই বহু জনপদ ও রাজ্য। মহাভারতের যুদ্ধ ঘটিয়ে, রাজশক্তিসমূহকে প্রায় নির্মূল করে কৃষ্ণই অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র গঠনের পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য ইতিহাস কিংবা কবিকল্পনা জানি না তবে মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য কবিকল্পনা ছিল না। বৌদ্ধ ও সনাতন ধর্মের প্রেরণাই ছিল এই দুই বলশালী রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মূলে।

রোমান সাম্রাজ্য ক্ষাত্রশক্তির দ্বারা বিজিত হয়েছিল কিন্তু আপন ভারেই তা যখন ভেঙে পড়ার উপক্রম ঘটে তখন সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রীস্ট ধর্মের

শরণ নেন রাষ্ট্রমণ্ডল রক্ষার্থে। তিনি রাষ্ট্রকে ধর্মাশ্রিত করেই তাকে পুনর্জীবন দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আড্রিয়ানোপোলের যুদ্ধে গথরা রোমান সাম্রাজ্যকে পরাস্ত করেছিল, কিন্তু তারাও খ্রীষ্টান ধর্মাশ্রিত হওয়ায় সাম্রাজ্যের পতন হয়নি।

ইসলামিক সাম্রাজ্য গোড়া থেকেই ধর্মাশ্রিত সাম্রাজ্য।

বিশাল রাষ্ট্র স্থাপনে ক্ষাত্রশক্তি, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, সচল অর্থনীতি এসবই লাগে, কিন্তু তাতেই রাষ্ট্রবন্ধন স্থায়ী হয় না। ধর্মই তাকে ধারণ করে। তবু ধর্ম শেষ পর্যন্ত হার মেনে যায় কারণ বড় রাষ্ট্র রক্ষা করতে, তার ক্রমবর্ধমান আমলাতন্ত্র ও সৈন্যবাহিনী পোষণ করতে অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়ে, জনসাধারণের শোষণ বাড়ে। চীন, মিশর, পঞ্চম শতকের রোমান সাম্রাজ্য, নবম শতকের ক্যারোলিঙ্গিয়ান সাম্রাজ্য, এগারো শতকের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য এবং ভারতের মৌর্য, গুপ্ত, মুঘল ইত্যাদি সাম্রাজ্যগুলিও ভেঙে পড়েছিল একারণে যে সেকালের কৃষিমূল অর্থনীতি রাষ্ট্র পরিচালনার স্ফীত ব্যয়ভার বহন করতে পারেনি—একা কৃষক কত খরচ জোগাবে? ধর্মপতিরা যখন শোষণের পক্ষে রায় দিতে থাকেন তখন ধর্মও কলুষিত হয়। ঈশ্বরানুভূতি থেকে বহু দূরে অপনীত সে ধর্ম প্রাণহীন, সত্যহীন, স্বার্থপরের হাতিয়ার মাত্র। তা রাষ্ট্র, সমাজ, জীবন কিছুকেই আর ধারণ করতে পারে না।

এমন একটি ক্লৈব্যের সময়, যখন রাষ্ট্র ভেঙে পড়ে, সমাজ ভেঙে পড়ে, জীবনের মূল্যবোধগুলি বিপর্যস্ত হয় তখন বেদনার প্লাবন আসে। ভারতভূমির ইতিহাসের আলোয় দেখি যে তখন স্বয়ং ঈশ্বর নরদেহে অবতীর্ণ হন সে বেদনার প্লাবন থেকে প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করতে, সভ্যতার নতুন গতিপথ নির্দেশ করতে, নতুন সমাজবন্ধন দিতে, এমনকি নতুন রাষ্ট্রতন্ত্র নির্মাণ করতে। অবতারের কর্ম যে কী আর কী নয় তার সীমা-নির্দেশ কে করবে? কে বলবে যে তিনি এই সীমা পর্যন্ত বিচরণ করেন, এই সীমা তিনি অতিক্রম করেন না?

রামকৃষ্ণের সাধ্য কী ছিল, সাধনাই বা কী ছিল শাস্ত্রীরা তার সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন না। তাঁদের পক্ষে সে অনধিকারচর্চা। সমগ্র বিশ্বের মানব ইতিহাসের প্রবাহ, তার অন্তর্ভুক্ত তরঙ্গসমূহের সংবাদ আমি নিয়েছি এ কারণে যে রামকৃষ্ণের চিন্ময় সাধনা ও উপলব্ধিরও একটি মানবপ্রেক্ষিত আছে: যদি প্রেমের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, যদি বুঝি যে এ মহাবিশ্ব এক মহাপ্রেমিকের

প্রেমলীলা, তবে সে মানবপ্রেক্ষিত দিব্যপ্রেক্ষিত বই আর কিছু বলে তো মনে হয় না। প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো বিষয়েরই মর্ম বোঝা যায় না। রামকৃষ্ণের সাধনা একজন ব্যক্তির আত্মমুক্তি তথা ঈশ্বরলাভের সাধনা নয়, সেকথা আগেই বলেছি। সে এক বিশ্বপুরুষের আত্মসম্ভূতি—এই বিশ্বরূপে তাঁর হয়ে ওঠা, ফুটে ওঠা, বিশ্বভবন; অথবা বিশ্বময় ও বিশ্বনাথের বিশ্বমুক্তির সাধনা। তাই বিশ্বইতিহাসপ্রেক্ষিতেই সে সাধনা অনুধাবনীয় ও বিচার্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর লীলা-তাৎপর্য বর্ণনার পূর্বাহ্নে বস্তু-বিচারের এক পদ্ধতি শিখিয়েছেন আমাদের। একাদশী তত্ত্ব থেকে এই ন্যায়যুক্তি উদ্ধৃত করেছেন তিনি;

অনুবাদ্যমনুক্ত্বৈব
ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ
কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥

অর্থ—অনুবাদ বা উদ্দেশ্য না করে বিধেয় নির্দেশ করবে না। অনুবাদই বিধেয়ের আশ্রয়। আশ্রয় ছাড়া কোনো বস্তু প্রতিষ্ঠা পায় না।

কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় সরল ভাষায় প্রসঙ্গটি বুঝিয়ে বলেছেন:

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয়॥
বিধেয় কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত॥
যৈছে কহি—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ, ইঁহার বিধেয় পাণ্ডিত্য॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাত॥
তৈছে ইঁহা অবতার সব হইলা জ্ঞাত।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥

আদিলীলা: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ, জ্ঞাতের ওপরই অজ্ঞাতের প্রতিষ্ঠা করতে হয়। যা জ্ঞাত তাকে বলে অনুবাদ, যা অজ্ঞাত তাকে বলে বিধেয়। সকলেই জানে যে অমুক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। কিন্তু তিনি যে বিদ্বানও তা অনেকের জানা নেই। আগে উনি

ব্রাহ্মণ, তৎপর উনি বিদ্বান। ব্রাহ্মণত্ব অনুবাদ, বিদ্যাবত্তা বিধেয়। অনেকেই জানে চৈতন্য অবতার। কিন্তু কার অবতার? তা জানেনা লোকে।

তাই পরম্পরা ও প্রেক্ষিত জেনে তবে সেই জ্ঞানের ওপর রামকৃষ্ণের সাধ্য ও সাধনরহস্য জানতে হয়—কেননা তা বিধেয়, অজ্ঞাত। পরম্পরা ও প্রেক্ষিতের আলোয় বুঝতে এগোবার অনুত্তম বুদ্ধিবিভ্রম, বোধিবিভ্রমও ঘটিয়েছে।

রামকৃষ্ণ জগতের এই দ্বৈতক্ষেত্রকে, এই আলো-আঁধারে মেশা বিদ্যা-অবিদ্যার দেশকে অদ্বৈতের আলোয় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন। সে আলোয় দৃষ্টিই সৃষ্টি, দেখাই গড়া। তাই প্রকৃত তাৎপর্যে, তিনি মানব জগৎকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সমাধির পটভূমিতেই প্রকৃতিতে নিহিত ব্রহ্মরসপানে মানব সন্তানকে তিনি পুষ্ট, বীর্যবান ও বিজ্ঞানী হবার পথ-সন্ধান দিয়েছিলেন।

পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের প্রথমেই সমাধিপাদঃ। তাতে তিনি বলছেন, যোগঃ সমাধিঃ। সমাধিই যোগ। সর্ববৃত্তিনিরোধে ত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ। চিত্তের পাঁচটি ভূমি আছে: ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। স্বভাবত অস্থির ও ধীশক্তিহীন ইন্দ্রিয়মুগ্ধ, কখনো স্থির কখনো অস্থির এরকম তিনটি ভূমিতেও সমাধি হতে পারে কিন্তু তা সাধনজনিত নয়, আকস্মিক এবং তার ফলও সাধারণ, মুক্তিদায়ক নয়। কিন্তু চিত্ত একাগ্র ভূমিতে গেলে সম্প্রজ্ঞাত বা মুক্তিদায়ক সমাধি হতে পারে। কিন্তু এও স্থায়ী হয় না। চিত্ত নিরোধ-ভূমিতে গেলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পরম জ্ঞান সদাস্থায়ী হয়, সৎস্বরূপ প্রকাশিত হন। তখন ক্লেশ চলে যায়, কর্মবন্ধন খসে পড়ে। পতঞ্জলি দ্বিতীয় সূত্রে বললেন, যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে বিকল্পজ্ঞান থাকেনা। তৃতীয় সূত্রে পতঞ্জলি বললেন, স্বরূপে হ্বস্থানম। এ অবস্থায় দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও দুরকম—সবীজ ও নির্বীজ। ৫১ সূত্রে পতঞ্জলি বলেন, সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ। সর্বনিরোধ থেকে নির্বীজ সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সংস্কারসমূহও তখন নাশ হয়ে যায়—অর্থাৎ এ সমাধিরও সমাধি। তখনই পুরুষ যথার্থ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন। তখন তিনি শুদ্ধমুক্ত। শুদ্ধমুক্ত স্বরূপটি কী কৈবল্যপাদের শেষ বা ৩৪ সূত্রে সেকথা পতঞ্জলি বলেছেন:

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি॥

অর্থ—কৈবল্য পুরুষার্থশূন্য, গুণসকলের প্রলয়, অথবা স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ চিতিশক্তি।

পতঞ্জলি এই পর্যন্তই খোঁজ রাখতেন, এই পর্যন্তই বলেছেন। শুদ্ধমুক্ত স্বপ্রতিষ্ঠ পুরুষ আসলে স্বরূপ-প্রতিষ্ট চিতিশক্তি। সৎ ও চিতের কথা এতে যদি বা মিলল, আনন্দের কথা কই? সচ্চিদানন্দ যে এতে খণ্ডিত হয়ে গেলেন, অর্থাৎ সমাবিধান পুরুষ যে আনন্দানুভববঞ্চিত হলেন। ক্লেশমুক্ত হওয়া আর আনন্দস্বরূপ হওয়া এক কথা কি? কিংবা পতঞ্জলি স্বীকার করে নিচ্ছেন যে নির্বিকল্প সমাধিই রসো বৈ সঃ-এর অন্ত্যলীলা নয়। আরও লীলা ধারণ করেই তিনি পরিপূর্ণতম। পতঞ্জলি জ্ঞানের শেষ সীমা পর্যন্ত বলেছেন, বিজ্ঞানের সন্ধান পান নি।

চিত্তবৃত্তিনিরোধই সমাধি—এতে দ্বিমত নেই। কিন্তু নির্বীজ সমাধির পর, স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ চিতিশক্তিই আবার ব্যুত্থানে নেমে আসতে পারেন সে খবর পতঞ্জলি দেন নি। তাই বিভূতিপাদ-এর পর তিনি কৈবল্যপাদ লিখেছেন—ঐই তাঁর যোগে অন্তিম পাদ। কিন্তু সমাধিবিহীন সাধারণ মানুষের সাধারণ ব্যুত্থান অবস্থা ও নির্বীজ সমাবিধান পুরুষের পূর্ণতম কৈবল্য-সমাধির পর ব্যুত্থান অবস্থা কি এক? পতঞ্জলি সেকথা বলেননি, কেননা সে খবর তাঁর জানা ছিল না। তিনি তেমন মানুষ দেখেন নি। তিনি মহাযোগ জানতেন, মহাযোগীর তাবৎ অবস্থাও জানতেন কিন্তু তারও পারে যে যোগেশ্বর ভগবানের ঋদ্ধি ও সিদ্ধি কী রকম তা হয় জানতেন না অথবা জানাবার দরকার মনে করেননি; বিভূতিপাদ অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন:

> ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ
> নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥৯

অর্থ—ব্যুত্থান-সংস্কারের অভিভব হয় ও নিরোধ-সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হয়। তার ফলে প্রত্যেক নিরোধক্ষণে অন্বিত চিত্তের নিরোধপরিণাম ঘটে অর্থাৎ চিত্তসংস্কার শেষ হয় অর্থাৎ নিরোধে সংস্কার লয় পায়।

কিন্তু পূর্ণ নিরোধ-সমাধির পর আবার যাঁর ব্যুত্থান হয় তাঁর অবস্থা কিরকম হয়? তখন কি সাবেক ও সাধারণ ব্যুত্থান-সংস্কারে প্রত্যাবর্তন ঘটে? এ প্রশ্ন সেকালে ওঠেনি কেননা তখন সমাধির পর ব্যুত্থিত হতেন না যোগী; সমাধির পরের অবস্থাই দেহত্যাগ।

ব্যুত্থান-সমাধি ও সমাধি-ব্যুত্থান যুগপৎ হতে পারে কিনা অথবা একই

অবস্থার তা দুটি বিভাব হওয়া সম্ভব কিনা অথবা সমাধিযুক্ত ব্যুত্থানে নিয়ত অবস্থান করে স্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত চিৎ-পুরুষই সহজ সরল মানুষ রূপে বিচরণ করতে পারেন কিনা পতঞ্জলির তা জানা ছিল না। তাঁর জানা ছিল না বলেই যে তা নেই তা তো নয়। রামকৃষ্ণ তেমন সমাধিযুক্ত ব্যুত্থানের মানুষ। তাঁর সমাধি ও ব্যুত্থানের এমনকি ক্ষণপরম্পরার ভেদও নেই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিচারের যে রীতি নির্দেশ করেছেন তা মেনেই রামকৃষ্ণের সাধন-তাৎপর্য বুঝতে এগোলে দেখি যে নির্বিকল্প সমাধি লাভ ঈশ্বর সাধনার অন্তিম লক্ষ্য বা সাধ্য। তার চেয়ে উচ্চাবস্থা ভারতীয় অথবা বিশ্বের অধ্যাত্মশাস্ত্রে জানা নেই। নির্বিকল্প সমাধি সহজলভ্য নয়—জীবদেহে তা প্রায় অসম্ভব। পতঞ্জলি বলেছেন, কিন্তু দৃষ্টান্ত দিতে পারেননি, দৃষ্টান্ত জানা নেই। পৃথিবীতে ঈশ্বর সাধনার যত নজীর আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তাতে নির্বিকল্প সমাধি লাভ অবতার-পুরুষ ভিন্ন আর কারও হয়েছে এমন সংবাদ নেই। অবতারের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করেই পতঞ্জলি তাঁর নিয়ম জারি করেছেন। টীকা-ভাষ্যকাররা বাকবিস্তার করেছেন অনেক—তাঁরা কেউ নির্বিকল্প সমাধির হদিশ পাননি। যে হদিশ পায় তাঁর আর বই লেখার সময়, সামর্থ্য বা রুচি থাকে না। বাক তাঁর শুদ্ধ হয়ে আসে, বাকবিস্তার করা সম্ভব হয় না তাঁর পক্ষে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেখানেই অবতারের আবির্ভাব ঘটুক না কেন তাঁরাও কেউ বই লেখেন না। সমাগত মানুষের ঈশ্বর-জিজ্ঞাসার মৌখিক উত্তর মাত্র দিতে পারেন তাঁরা। গীতাও কৃষ্ণের স্বমুখোচ্চারিত বাণী, স্বরচিত পদ্য নয়।

টীকা-ভাষ্যকাররা, এমনকি মননশীল মুনিরাও অখণ্ড সত্যের প্রবক্তা নন। তাঁরা খণ্ড সত্য আঁচ করেন মাত্র ও তারই ভিত্তিতে যেসব দর্শন ও নীতি-নিয়ম রচনা করেন তার কোথাও পূর্ণ সত্যের প্রতিবিম্বন ঘটে না। আংশিক জ্ঞান ও বোধ নিয়ে তাঁরা শাস্ত্র রচেন, সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন ও অশেষ বিতণ্ডার সৃষ্টি করে যান।

সমাধি-ব্যুত্থান দুটি পৃথক বস্তু, একের নাশেই অপরের অস্তিত্ব সম্ভব—মুনি, দার্শনিক ও টীকা-ভাষ্যকারদের এই ধারণা সত্য নয়; তাঁরা অনভিজ্ঞ বলেই এমন দাবী করেছেন। সমাধির আলো যে সাধারণ মানুষের চেতনা-স্তরে একেবারেই পৌছয় না একথাও যেমন সত্য নয়, নির্বিকল্প সমাধিবান মানুষ ব্যুত্থানের সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় এসে দাঁড়ান না এও তেমনই সত্য কথা

নয়। কৃষ্ণ গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন সমাধিস্থ অবস্থায়—সমাধি-ব্যুত্থান যুগপৎ ধৃত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের গর্জমান রণাঙ্গনে। তিনি লোকভাষায়ই কথা বলছিলেন সত্য কিন্তু উচ্চতম অদ্বৈতোপলব্ধির দ্বারা আদ্যন্ত বিদ্ধ হওয়ায় সে ভাষা অতি প্রাঞ্জল থেকেও আর লোককথা থাকেনি। তা হয়ে উঠেছে ভগবানের ভাষা, ভগবানের গীত—শ্রীমৎ ভগবৎ গীত। গীতার শ্লোকগুলি কথা, না, গান?

আমরা কথা বলি; কথা শোনাই। কথা শোনাবার ব্যস্ততায় মাইক্রোফোন, লাউডস্পীকার, বেতার যন্ত্র, দূরভাষ যন্ত্র ইত্যাদিও ব্যবহার করি। করি, কারণ আমাদের কথা শুধু কথাই, কথার ফেনা মাত্র। তার উদ্দিষ্ট স্থূল শ্রোতার কাণ ও মন। ভগবান কথা বলেন আমাদের আত্মার কাছে—নিত্যই বলেন। মর্মভেদী তাঁর বাণী। তাই যন্ত্র ব্যবহারে তাঁর প্রয়োজন নেই। অখণ্ড নৈঃশব্দ্যে বাহিত হয়ে তাঁর বাণী সুমধুর সঙ্গীতের মতো আত্মার উপলব্ধি-দ্বারে বর্ষিত হয়। বাইরের জনকোলাহল সে বাণীর পথ রোধ করতে পারে না। কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য-সমাবেশ, রথাশ্বসমূহের হ্রেষারব, অস্ত্র ও সজ্জার ব্যঞ্জনা, তুরীভেরীর কলনাদ কৃষ্ণের বাণীকে আচ্ছন্ন, অস্পষ্ট বা অশ্রুতিযোগ্য করেনি। তিনি স্বতোৎসারিত ভাষায়, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন অর্থে, সহজ গীতময় ছন্দে তাঁর বাণী বলেছেন। অর্জুন গ্রহণ করেছেন সে বাণী। এমনকি দূরস্থিত সঞ্জয়ও প্রতিটি শব্দ যথাযথ শুনেছেন।

কৃষ্ণের কথা সহজ, কিন্তু তাঁর উপলব্ধির গভীরতার তল নেই। সে গভীরতার উৎস তাঁর নির্বিকল্প-সমাধির অবস্থা। বস্তুত কৃষ্ণ জানেন, একা তিনিই আছেন, সেই পরম অদ্বৈত পুরুষই বর্তমান। যুদ্ধ মৃত্যু ও জীবন তাঁরই এক একটি ভঙ্গী মাত্র, তৎবিচ্যুত কিছু নয়। রথ, ঘোড়া, অর্জুন, রথী-মহারথীগণ—তিনিই, তাঁতেই বর্তমান; জগৎলীলায় এসব সৃষ্টি বিকাশ ও ধ্বংসের উল্লাসে উল্লাসে তিনি চঞ্চল; আবার সব চাঞ্চল্যের পটে তিনি স্থির অকম্পিত সদা সনাতন। সমাধিতে সনাতন ও এক; ব্যুত্থানে বিচিত্র ও বহু—কিন্তু সমাধি-ব্যুত্থান একই অঙ্গে ধৃত; যুগপৎ ধৃত।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে শুনি অর্জুনের কলভাষণ। মহাবীর জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণে উপস্থিত; খণ্ড খণ্ড বা স্থানিক যুদ্ধে নয়, এক বিশাল ভারতরাষ্ট্রমণ্ডলমন্থন-কারী যুদ্ধে তাঁর স্বীয় বীরত্বের পরীক্ষাদানলগ্ন সমাগত। সেই ক্ষণে সামাজিক

নৈতিকতার বোধ তাঁকে দংশন করল, যেন সমগ্র সমাজ আজ অর্জুনের সামনে ভিক্ষাপাত্র হাতে উপস্থিত: হে গাণ্ডীবধারী, একদা খাণ্ডবদাহন করেছিলে তুমি, আজ সমাজদাহন কোরো না, বাঁচাও, শান্তি ও সামাজিক স্থিতি রক্ষা করো। আপন জয় ও গৌরব, স্বপক্ষের রাজ্যলাভ—এ সব প্রশ্ন মুহূর্তে তুচ্ছ হয়ে গেল সামাজিক—নৈতিক মানসতাসম্পন্ন অর্জুনের কাছে: বহুজনহিতায়, আসন্ন ধ্বংস থেকে ভারতজনকে রক্ষাকল্পে যুদ্ধ থেকে আত্ম-প্রত্যাহার করা কর্তব্য মনে করলেন অর্জুন। এমনকি আত্মরক্ষারও প্রয়োজন দেখলেন না তিনি, নিরস্ত্র তাঁকে শত্রুরা যদি হত্যা করে তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। গাণ্ডীব ফেলে দিয়ে রথে বসে পড়লেন অর্জুন—তাঁর চোখ জলভরা।

সেই প্রেক্ষাপটে এই প্রথম পেলাম বিশ্ব-ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চকর ঘোষণা—ইতিপূর্বে কোনো দেশের কোনো শাস্ত্রে বা ইতিহাসে তেমন ঘোষণা পাইনি। এতদিন শুনেছি ঋষির কথা, মুনির কথা, নেতার কথা, ভাবুক ও মনীষীর কথা। এই প্রথম স্তম্ভিত হয়ে শুনি: শ্রীভগবানুবাচ। ভগবান বললেন। ভগবান কথা বলেন মানবিক ভাষায়, জীবনসংকটলগ্নে, ব্যক্তির ও রাষ্ট্রের, কুলের ও সমাজের সংকটের তুঙ্গতম মুহূর্তে—বেদ-উপনিষদ সে কথা ঘোষণা করেনি। গীতা সে ঘোষণা করার সৌভাগ্যে নিখিল বিশ্ব-জনের অশেষ সমাদরের অধিকারী—ঈশ্বরপুত্র নয়, ঈশ্বরজানিত ব্রহ্মবিৎ পুরুষ নয়, স্বয়ং ঈশ্বর পরব্রহ্ম এই প্রথম মানুষের বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষভূমিতে দাঁড়িয়ে মনুষ্যমূর্তিতে কথা বলেছেন।

তাঁর প্রথম বাক্য শ্রুতিমধুর ললিত বাণী হয়নি—তা তীব্র তিরস্কারে পূর্ণ: অর্জুন, এ সংকটকালে তোমার মনে কোথা থেকে এসে জুটল অনার্যসেবিত, স্বর্গের অযোগ্য, যশহানিকর এই কশ্মল, মোহ? আরও রূঢ় হয়ে উঠল ভগবানের কণ্ঠ: ছাড়ো তোমার এই ক্লৈব্য, এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য, শত্রুদমন তুমি, তোমার যোগ্য নয় এ মনোভাব। উঠে দাঁড়াও।

এই ভগবৎ আদেশ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে হতে ক্রমশঃ উচ্চ থেকে উচ্চতম স্বরগ্রামে উঠেছে; নেমে গিয়েছে তত্ত্বের অতলান্ত গভীরে; সমগ্র জগৎ ও জীবনকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে অখণ্ড সত্যের অনাবিল আলোয়।

তীব্র ভর্ৎসনাযুক্ত আদেশ থেকে অন্তিমে সেই জলদগম্ভীর আহ্বান পর্যন্ত নিয়ে গেল গীতা আমাদের, যখন নিখিল মানবশাস্ত্রের সারাৎসার ও চূড়ান্ত

সত্যের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে আমাদের হৃৎপিণ্ড আলোড়িতমথিত অথচ পরম শান্ত রসাস্পদ হয়ে ওঠে:

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

তুমি মদ্গতচিত্ত, আমার ভক্ত, আমার সেবক হও। আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার প্রিয় তাই তোমাকে সত্য শপথ করে বলছি, তুমি আমাকেই পাবে। সব ধর্ম ছেড়ে তুমি একমাত্র আমার শরণ নাও; শোক কোরো না, সব পাপ থেকে মুক্ত করব আমি।

এ কথা যিনি বলেছেন তিনি ব্যুত্থান-অবস্থাতেই বলছেন, চোখ খুলে মন খুলে প্রাণ খুলে বলছেন। যুদ্ধদামামার মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছেন—হিমালয়ের নিভৃত গুহায় স্তিমিত প্রদীপের আলোয় ধ্যাননিমগ্ন যোগীর মৃদুভাষ এ নয়। কিন্তু চেতনার সাধারণ ভূমি থেকেও তো এ কথাগুলি উঠে আসেনি, উঠে আসতে পারে না। ভগবান যখন পূর্ণ আত্মস্থ, অবিচল, শান্ত ও সমাধিযুক্ত তখনকার বাণী এ। তাই লোকসমাজে এ বাণী গ্রাহ্য হয়েছে, নতুবা হত না।

শারদ পূর্ণিমায় এই ভগবানই আবার উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন একান্ত ভক্তদের সঙ্গে প্রেমাস্বাদন লীলায়।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

ভগবান হয়েও কৃষ্ণ ফুল্লমল্লিকাশোভিত শারদ রজনী সমাগত দেখে যোগমায়া-আশ্রয় করে লীলা করতে ইচ্ছা করলেন।

সে রাত্রে নির্জন বনে কৃষ্ণ সুমধুর গান সুরু করলেন। গানের আকর্ষণে গোপীরা যে যেমন অবস্থায় ছিল, কেউ উনুনে দুধ জ্বাল দিচ্ছিল, কেউ ভাত রাঁধছিল, কেউ স্বামীপুত্রদের অন্ন পরিবেশন করছিল, কেউ শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছিল, কেউ স্বামীসেবা করছিল, কেউ খাচ্ছিল, কেউ প্রসাধন করছিল—সব ফেলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যা হয়ে তারা বনের দিকে ছুটল। বাবা, ভাই, স্বামী বা বন্ধুরা বাধা দিলেও তারা তা শোনেনি—যে একান্তই যেতে পারল না সে ঘরে তদবস্থায়ই কৃষ্ণধ্যানে ডুবে গেল। তারা এসে পড়লে কৃষ্ণ তাদের বললেন, তোমরা ফিরে যাও ঘরে। এ রাতে হিংস্র জন্তুপূর্ণ বনে স্ত্রীলোকের

থাকতে নেই। তোমাদের বাবা মা, ভাই, স্বামী ও ছেলেরা তোমাদের খোঁজ করছেন, তাঁদের উৎকণ্ঠিত কোরো না। বনের সুন্দর দৃশ্য দেখলে তো, এখন ফিরে যাও। ঘরে ফিরে ঘর সামলাও। স্বামীপুত্রের সেবা করো, গরুবাছুর সামাল দাও।

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণাং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ! প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥

হে কল্যাণীগণ! স্বামী ও তাঁর আত্মীয়দের অকপট সেবা ও সন্তান-সন্ততির প্রতিপালনই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম।

তোমাদের স্বামীরা দুঃশীল, দুর্ভাগা, বৃদ্ধ, কর্মশক্তিহীন, রোগী বা নির্ধন হলেও যদি পাপী না হন তবে তাঁদের ত্যাগ করা তো উচিত নয় তোমাদের। কুলত্যাগ অনার্যসেবিত, স্বর্গের অযোগ্য, যশহানিকর কশ্মল। ভয়াবহ নিন্দনীয় সে কাজ। আর আমাকে ভক্তি? আমার কাছে থেকে ভক্তি তো হয় না—তা হয় দূরে থেকে আমার শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও ধারণায়। তাই ঘরে ফিরে যাও তোমরা।

অর্জুনকে আদেশ করেছিলেন কৃষ্ণ প্রায় অনুরূপ ভাষায়। অর্জুন মেনে নিয়েছিলেন সে আদেশ। গোপীরা মানলেন না। এ ভর্ৎসনা ও অপ্রিয় বাক্য শুনে তাঁরা ব্যর্থকাম ও বিষণ্ণ হয়ে দুর্নিবার চিন্তায় আচ্ছন্ন হলেন। শুকিয়ে গেল তাঁদের মুখ। চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। পায়ের নখে মাটিতে দাগ আঁকতে লাগলেন। জলে চোখ ঢেকে গিয়েছে তবু কোপকণ্ঠে বললেন তাঁরা:

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য
সর্ব্ব-বিষয়াংস্তব পাদমূলং।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ! মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষো
ভজতে মুমুক্ষূন্।

ঠাকুর! এরকম কঠোর বাক্য আপনি বলতে পারেন না। আমরা সব বিষয় ছেড়ে আপনার পাদমূলের দাসী হয়েছি। ওগো দুর্লভ! আদিপুরুষ দেব মুক্তিকামী সাধকদের যেভাবে গ্রহণ করেন, তুমি সেভাবেই আমাদের নাও, ত্যাগ করো না।

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যন্নিবিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্‌যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম্ কিংবা॥

আমাদের চিত্ত এতদিন সুখে গৃহধর্মে নিবিষ্ট ছিল, আমাদের হাতও গৃহকর্মে ছিল রত। তুমিই তো সে চিত্ত ও হাত চুরি করে নিয়েছ ঠাকুর! আমাদের পাও তোমার কাছ থেকে তিলমাত্র দূরে যাবে না। আমরা কেমন করে ব্রজে যাব, সেখানে গিয়েই বা কী করব?

> সিঞ্চাঙ্গ! নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং।
> নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ
> পদবীং সখে! তে॥

> প্রিয়তম! তোমার সহাস দৃষ্টি ও মধুর গান আমাদের হৃদয়ে জ্বালিয়েছে কামের আগুন। তোমার অধরসুধা দান করে সে আগুন নেভাও ঠাকুর! সখা! নইলে তোমার বিরহ-বহ্নিতে পুড়ব আমরা, কিন্তু সে দগ্ধ দেহে ধ্যানযোগে তোমারই চরণ-সান্নিধ্য পাব।

কামনাক্ষুব্ধ প্রাকৃত নরনারীর কামক্রীড়া ও কামভাষ এ নয়; রসো বৈ সঃ-এর রসোল্লাস এ। এ ঘটনা বাস্তব জগতের ভূমিতে অনুষ্ঠিত; নরশরীরধারী ভগবানের আত্মক্রীড়ালীলা এ; কিন্তু এই গান, এই মোহন, এই সর্বধর্মপরিত্যাগকারী ভগবৎপ্রেমবিহ্বলতা ও শরণাগতি, এই তিরস্কার ও তদুত্তরে কোপঝঙ্কার—এই সব হারানো, সব দেওয়ার লীলা এর সমগ্রটাই সমাধিতে বিধৃত। গীতায় পেয়েছিলাম বাণী, সমাধির ভাষা; এখানে পেলাম কর্ম, সমাধির বস্তুরূপে আত্মপ্রকাশ। সমাধি যে জীবনোচ্ছল হয়ে উঠতে পারে ভাগবত তার নিদর্শন দেখালেন। তাই কথিত আছে যে গীতার ফলিত রূপ ও বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শুকমুখবিগলিত এ ভাগবত। ভাগবত যে কামায়ন না হয়ে রামায়ণ হয়ে উঠেছে, নিষ্কাম ঈশ্বরধ্যানী ঈশ্বরপ্রেমিকের কণ্ঠহার হয়েছে তার কারণ প্রাকৃত ভূমিতে অনুষ্ঠিত কাজ সমাধিযুক্ত মনের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়েছে এখানে; সমাধি-ব্যুত্থান যে দুটি পরস্পরবিরোধী Either/or অবস্থা নয়, একই সঙ্গে বিদ্যমান একটি অবস্থারই দুটি বিভাব, ভাগবত তা দেখিয়েছেন। ঈশ্বরকামনা বা ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত কাম—সমগ্র মন প্রাণ ও দেহ দিয়ে একমাত্র তাঁকেই পাবার অপ্রতিরোধ্য আকুতি—ব্রজগোপীদের চিত্তনিরোধ ঘটিয়ে দিয়েছে, তাঁদের সংসার ও বিশ্ব লুপ্ত, একমাত্র অদ্বৈতপুরুষ কৃষ্ণই জ্বলন্ত-জীবন্ত তাঁদের কাছে, তাঁতেই সমাহিত তাঁরা। তাঁদের কোপভাষাও সমাধির ভাষা। প্রাকৃত কাম তাঁদের মনে প্রাণে বা

দেহে বিন্দুমাত্রও নেই, এমনকি জগৎরূপ বিকল্পও নেই তাঁদের চিত্তে, তাই তাঁদের সমাধি নির্বিকল্প সমাধি।

কবিরাজ গোস্বামীর অনুসরণে এই অনুবাদ স্থাপিত হল। এর ওপর দাঁড়িয়ে এবার বিধেয় নির্ণয় কর্তব্য।

রামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরের সাধনভূমিতে এসে বসেছিলেন তখন সেই অতি সংবেদনশীল যুবক ব্যথিত হয়েছিলেন বিশ্বব্যাপী মহা ক্লৈব্যের মুখ ব্যাদানে। সমসাময়িক পরিস্থিতি যদি সে ক্লৈব্যের উৎসমূল হত তবে রাজনৈতিক—সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেই তার স্বরূপ বোঝা যেত ঃ দাওয়াইও হত তদনুরূপ. তার মূল আরও বহু গভীরে প্রোথিত। স্বদেশের অভিজ্ঞতা থেকে বললেই তা বোঝা সহজ হবে।

প্রাচীন ভারতে যে ভাবাদর্শ স্থায়ী ও দৃঢ় মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার নাম আর্যধর্ম। বৌদ্ধরাও এই ধর্মকে বলতেন ইসিমত বা ঋষিমত। সে মতের মূল গ্রন্থ বেদ। বেদ ঋষিদের উপলব্ধিজাত। বৌদ্ধরাও বুদ্ধকে মহেসি বা মহর্ষি বলতেন। মুনি ও দার্শনিকরা বললেন, ঋষি দু-রকম—প্রবৃত্তিমার্গের ঋষি ও নিবৃত্তিমার্গের ঋষি। বেদের কর্মকাণ্ডের প্রবর্তকরা প্রবৃত্তিমার্গের ঋষি। মোক্ষপথের প্রবক্তারা নিবৃত্তিমার্গের ঋষি। সাংখ্য বেদান্ত বৌদ্ধ ও জৈনমত নিবৃত্তিমার্গ।

এই বিভাজনই ক্লৈব্যের উৎসমূল। প্রাকৃত চেতনায়ই এই বিভাজন সত্য —অখণ্ড বোধিতে এরূপ বিভাজন হয় না। এই বিভেদ-দৃষ্টির ফলেই কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ডই রয়ে গেল ও অধঃপতিত হল। মূলে যা ছিল ঋষিদৃষ্ট জীবনকাণ্ড মুনিমতে তা হয়ে গেল নিছক কর্মকাণ্ড। তারই প্রতিক্রিয়ায় নিবৃত্তিমার্গের আবির্ভাব ; বস্তুপরতন্ত্রতা থেকে মুক্ত স্বয়ম্ভর চৈতন্যের আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, তাও খণ্ডিত দৃষ্টির প্রসাদে। সত্য অখণ্ড হয়েই সম্পূর্ণ ও অনবদ্য—তাতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, ইতি-নেতি ভেদ নেই। ভেদবুদ্ধিই ভেদ দেখে। মুনি ও দার্শনিকরা ভেদ দেখেছেন। ঋষিরা ভেদ দেখেননি। বুদ্ধ তাই মধ্যপথের কথা বলেন—একদেশদর্শী একান্ত ভোগ ও একান্ত ত্যাগের কথা বলেন না। ঋষিরা নির্গুণ-সগুণ, সাকার-নিরাকার ভেদ করেননি। ঋষিদৃষ্টির প্রত্যাহারে ও মুনি-দার্শনিকের দৃষ্টিপ্রাবল্যে এই ভেদবাদগুলি উদ্ভূত হয়ে মানুষের সত্য-বোধকে খণ্ডিত ও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

ভেদবাদের যুগেই পতঞ্জলি যোগশাস্ত্র লেখেন যার দার্শনিক ভিত্তি জুগিয়েছে

সাংখ্য। সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক কপিল সম্পর্কে জনশ্রুতিই শোনা যায় মাত্র। নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না—কপিল একজন না বহু সে সম্পর্কেও প্রশ্ন আছে। কপিলের বাণী পাওয়া যায়নি। সে বাণীর ব্যাখ্যাকার পঞ্চশিখ রাজা জনদেব জনককে তত্ত্বোপদেশ করেছিলেন ও সাংখ্যসূত্র লিখেছিলেন। এ গ্রন্থও নেই—টিঁকে আছে কিছু উদ্ধৃতি তা থেকে। কালাম গোত্রের অরাড় মুনি বুদ্ধকে সাংখ্যমত শুনিয়েছিলেন, এ কথা জানিয়েছেন বুদ্ধচরিতে অশ্বঘোষ। বুদ্ধ তারপর রুদ্রক-রামপুত্রের কাছে যোগসাধনা শেখেন। সে যোগ পতঞ্জলি-কথিত যোগ। জৈন মহাবীরও সাংখ্য ও যোগে ব্যুৎপন্ন হন। বেদান্ত পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রকে পুরো মেনে নিয়েছেন।

ভেদমূলজাত দৃষ্টির সৃষ্টি সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ সমগ্র ভারতীয় দর্শন ও জীবনকে এত প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করেছে যে ভারতীয় চিত্তসংস্কার তদ্দ্বারা একান্তভাবে রঞ্জিত। এ জন্য এখানে সে প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেওয়া দরকার—নতুবা রামকৃষ্ণের সাধনা, স্বয়ং ভগবানের ব্যাপ্ত, গভীর, কঠোর ও বিচিত্র সাধনার স্বরূপ আমরা বুঝতে ভুল করব, যেমন ইতিপূর্বে তাঁর প্রসিদ্ধ জীবনীকার ও জীবনভাষ্যকাররা করেছেন।

প্রথমেই দেখি সাংখ্য প্রবর্তক কপিলই একমাত্র কপিল নয়, আরও কপিল ছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বের ২৬৭-৬৯ অধ্যায়ে গোকোপিল সংবাদে গো শরীরে প্রবিষ্ট ঋষি স্যুমরশ্মি কপিলের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই কপিল নিরীশ্বরবাদী নন, ব্রহ্মবাদী। তিনি বহু পুরুষবাদী নন, এক পুরুষবাদী ও ব্রহ্মাণ্ডমূল পুরুষের সঙ্গে জীবের একাত্মতা সম্ভব একথায় বিশ্বাসী। তবে তিনি ঋষি স্যুমরশ্মিকে সতর্ক করে বলেছেন, হাঁ আপনারাও জ্ঞানী ও নিরাময় বলে পরিচিত বটে, তবে কি জানেন,

ঐকাত্ম্যং নাম কশ্চিদ্ধি কদাচিদুপপদ্যতে ॥ ১২।২৬৮।৫১

ঐকাত্ম্য জ্ঞান আপনাদের মধ্যে কদাচিৎ কারও হয়। কার হয়? যে এই উপলব্ধিতে পৌঁছায় যে

সর্বং বিদুর্বেদবিদো বেদে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
বেদে হি নিষ্ঠা সর্বস্য যদ্‌যদস্তি চ নাস্তি চ ॥
এষৈব নিষ্ঠা সর্বত্র যত্তদস্তি চ নাস্তি চ।
এতদন্তং চ মধ্যং চ সচ্চাসচ্চ বিজানতঃ ॥ ১২।২৬৯।৪৩-৪৫

বেদবিৎ সবই জানেন, কেননা বেদেই সব প্রতিষ্ঠিত। যা আছে আর

যা নেই সে সবেরই নিশ্চিত নিষ্ঠা বেদে। এ দৃশ্যমান জগৎ আছেও বটে, নেইও বটে; এর আদি আছে মধ্য আছে অন্ত আছে; সৎ ও অসৎ আছে এতে—এ সবেরই নিষ্ঠা বেদে বর্তমান। বেদবিৎ তা জানেন।

এই ব্রহ্মজ্ঞানী কপিল বলছেন যে অজ্ঞানীর কাছে জগৎ সৎ; জ্ঞানের উদয়ে এর প্রাকৃত রূপটাই অসৎ লাগে, কিন্তু জ্ঞানী দেখেন প্রাকৃত রূপের আড়ালে এ জগৎ ব্রহ্মই—সমস্তই নিশ্চয়ই অনন্তস্বভাব ব্রহ্ম

এবং পক্বকষায়াণমানন্ত্যেন শ্রুতেন চ।
সর্বমানন্ত্যমাসীদ্বৈ এবং নঃ শাশ্বতী শ্রুতি ॥ ১২।২৬৯।২৮-২৯

এইভাবে যাঁদের চিত্তমালিন্য কেটে গেছে তাঁরা বেদবাণী ও অনন্তস্বভাব ব্রহ্মের উপলব্ধি করেছেন। তাঁদের উপলব্ধি এই যে এ সবই অনন্তস্বভাব ব্রহ্ম। এটাই আমাদের শাশ্বতী শ্রুতি।

ব্রহ্ম কী? ঋষি কপিল বলছেন:

ঋতং সত্যং বিদিতং বেদিতব্য সর্বস্যাত্মা স্থাবরং জঙ্গমং চ।
সর্বং সুখং যচ্ছিবমুত্তর চ ব্রহ্মাব্যক্তং প্রভবশ্চাব্যয়ং চ ॥
১২।২৬৯।৪৬

ব্রহ্ম ঋত ও সত্য, জ্ঞাত ও জ্ঞেয়, স্থাবর ও জঙ্গম। তিনি সকলের আত্মা। তিনি সকল সুখ ও শিব ও তা ছাড়িয়েও। তিনি অব্যক্ত, আবার জগৎ স্বরূপে প্রকাশিত (জগতের প্রভব)। তবু স্বীয় স্বরূপে নির্বিকারভাবে অবস্থিত বলেই তিনি অব্যয়। আরও, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিৎ অভিন্ন।

এই সর্বাত্মক ও সর্বসত্যময় ব্রহ্মবাদী, বেদবাদী কপিলই কি সাংখ্য মতের প্রবর্তক? মহাভারতের শান্তিপর্ব বলছেন, হাঁ, তবে কপিলের আগেও সাংখ্যমত ছিল। সাংখ্যধারার আচার্যক্রম এই—

সনৎকুমার, নারদ, কশ্যপ, জৈগীষব্য, অসিতদেবল, কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ, বার্ষগণ্য, গর্গ, পুলস্ত্য প্রমুখ।

কপিল ষষ্টিতন্ত্র নামে একটি বই লেখেন। বইটি লুপ্ত, কিছু উদ্ধৃতি রক্ষিত আছে। যথা একটি বচন:

ইদং ফেনো ন কশ্চিদ্বা বুদ্বুদো বা ন কশ্চন।
মায়েয়ং বত দুষ্পারা বিপশ্চিদিতি পশ্যতি ॥

অন্ধো মণিমবিন্দত্তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ।

তমগ্রীবঃ প্রত্যমুখ্যত্তমজিহ্বোহভ্যপূজয়ৎ ॥

(ভর্তৃহরি রচিত 'বাক্যপদীয়'-এর বৃত্তিতে উদ্ধৃত

ও পাতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে অনূদিত)

এ জগৎ ফেনপুঞ্জ, আর কিছু নয়। এ বুদ্বুদমালা, আর কিছু নয়। এ এক দুষ্পার মায়া! বিদ্বানগণ একে এরকমই দেখেন। অন্ধ মণিকে ছিদ্র করেছে; আঙুলবিহীন সেই মণির মালা গেঁথেছে; গ্রীবাহীন ঐ মালা গলায় পরেছে; এবং জিহ্বাবিহীন তার কত না প্রশস্তি গেয়েছে।

কপিল প্রাকৃত জগৎকে এভাবে মায়া ও মিথ্যা বললেও দেখা যাচ্ছে তাঁর কাব্যবোধ যথেষ্টই ছিল। অন্ধ মণির ছিদ্র করতে পারে না, আঙুলহীন মালা গাঁথতে পারে না, গলাহীন মালা পরতে পারে না গলায়, জিহ্বাহীন পারেনা প্রশস্তি আওড়াতে—অতএব এসবই অসত্য, অলীক, জগৎও তদ্রূপ অসম্ভব রচনা, অসত্য ও অলীক।

কিন্তু ষষ্টিতন্ত্রের আর একটি শ্লোক পাওয়া গিয়েছে যাতে কপিলের বক্তব্যের অন্য গভীরতা পাই। শ্লোকটি এই :

গুণানাং সুমহদ্রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।

যত্তু দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্ ॥

সর্বং পুরুষ এবেদং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।

আরামং তস্য পশ্যন্তি ন তং কশ্চন পশ্যতি ॥

আচার্য বিদ্যানন্দ রচিত 'অষ্টসাহস্রী'তে উদ্ধৃত।

গুণসমূহের সুমহান রূপ দৃষ্টিপথে পড়ে না। দৃষ্টিপথে পড়ে শুধু তার মায়িক, তুচ্ছ রূপ। এ সবই তো পুরুষ। আর নানা তো কিছুমাত্র নেই। সেই অদ্বিতীয় পুরুষের আরাম বা আতত অবস্থাই আমরা দেখি। তাঁকে তো আমরা কেউ দেখি না।

এই সাংখ্যপ্রবর্তক কপিল ব্রহ্মবাদী; ঈশ্বরবাদী। স্যুমরশ্মি-কপিল সংবাদের কপিল ও ইনি একই ব্যক্তি। ফেনপুঞ্জ ও বুদ্বুদমালা তো জগতের প্রাকৃত রূপকেই বলা চলে; ভিতরে তো সে ব্রহ্মই! এক ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় নেই।

এই উদ্ধৃত বচন দুটি যে আদি কপিলের তা স্পষ্টভাবে বলেছেন টীকাকার কৃষ্ণদেব (ইদং ফেনঃ ইতি। ষষ্টিগ্রন্থশ্চায়ং যাবদভ্যপূজয়ৎ ইতি) ও টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র (মায়েব তু ন মায়া, সুতচ্ছকং বিনাশী)।

ষষ্টিতন্ত্র লুপ্ত ; সেই সুযোগে মুনি, দার্শনিক ও টীকাকাররা এক নকল কপিল খাড়া করে নিজেদের খণ্ড দৃষ্টিজাত মতই সাংখ্য বলে চালিয়েছেন। গল্প রটনা হয়েছে যে কপিল আসুরিকে সাংখ্য শেখান, আসুরি আবার পঞ্চশিখকে শেখান। আসুরি কিন্তু কপিলের সাক্ষাৎ শিষ্য নন। বলা হয়েছে : "আদি বিদ্বান ভগবান পরমর্ষি কপিল করুণাবশত নির্মাণচিত্ত গ্রহণ করে জিজ্ঞাসু আসুরিকে তন্ত্র বলেছিলেন।" তার অর্থ পরলোকগত কপিল আর কোনো দেহ নিয়ে এসে আসুরিকে উপদেশ শিখিয়েছেন। এই উক্তিটি পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের ব্যাসভাষ্যে কোনো প্রাচীন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি রূপে আছে ; বাচস্পতি মিশ্র জানিয়েছেন যে উক্তিটি আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখের রচনা। টীকাকার মাঠরের বৃত্তির উপোদঘাতে ঘটনাটি বেশ ফলিয়ে বলা হয়েছে।

ঐ উক্তিতে যে তন্ত্র শব্দটি আছে তা ষষ্টিতন্ত্রকেই বোঝাচ্ছে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য ভাস্কর বলেন :

কপিলমহর্ষিপ্রণীত ষষ্টিতন্ত্রাখ্য স্মৃতেঃ।

(ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য ২।১।১)

কপিল ষষ্টিতন্ত্র লেখেন। কেন ষাটতন্ত্র ? কারণ ষাটটি ভাবে ও বিভাবে আত্মা নিজেকে উপলব্ধি করতে, পেতে, আস্বাদন করতে ও প্রকাশ করতে চান। মহাভারত বলেন যে আত্মার (বুদ্ধির) ষাটটি গুণ আছে তাই ষাট তন্ত্র। কথাটি হারিয়েই গিয়েছিল, সত্যটি পড়েছিল চাপা। মহাভারত যে শিবের এক নাম ষষ্টিভাগ রেখেছেন (১৩।১৭।৭২) তাও ভুলে গিয়েছে লোকে। প্রচার করা হল যে কপিলের বইয়ের ষাটটি খণ্ড বা অধিকরণ ছিল বা তাতে ষাটটি পদার্থের আলোচনা ছিল তাই তার নাম ষষ্টিতন্ত্র। (ষষ্টিপদার্থে যস্মিন্ শাস্ত্রে তন্ত্র্যন্তে তৎ ষষ্টিতন্ত্রম্—মাঠরবৃত্তি, ৭১ কারিকার অবতরণিকা)। কপিলের মূল লক্ষ্য ও বক্তব্য—তাঁর পরম জ্ঞানতত্ত্বকে উদ্ধার করেছেন রামকৃষ্ণ—বেদোদ্ধার অবতারের অন্যতম কাজ বটে ! তিনিই তন্ত্রের চৌষট্টি কলার সাধনা করেছিলেন—যার মধ্যে কপিলের ষাট কলা ছিল। কপিলের ষাট তন্ত্রকে অঙ্গীকার করেও তাকে ছাপিয়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণের চৌষট্টি তন্ত্র। তাঁর সাধনার আলোয় ভগবান কপিলের লুপ্ত ষষ্টিতন্ত্র পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছি আমরা।

ছদ্মশিষ্য আসুরি অথবা খণ্ডদৃষ্টিসম্ভূত বিদ্বেষ দ্বারা আক্রান্ত আসুরি এক নকল কপিল খাড়া করেছিলেন। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ আরও একটু

এগিয়ে কপিলের বইকে ছিন্নভিন্ন টুকরো টুকরো করে ফেললেন ও তাকে লুপ্তির পথে পাঠালেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ পঞ্চশিখের শিষ্য। তিনি জানিয়েছেন, "আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন বহুলীকৃতং তন্ত্রম্" (সাংখ্যকারিকা, ৭০ কারিকা) অর্থাৎ পঞ্চশিখ আসুরি থেকে প্রাপ্ত তন্ত্রকে বহু করেছিলেন। সাংখ্যকারিকার 'জয়মঙ্গলা' টীকায় কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: "পঞ্চশিখ মুনিনা বহুধা কৃতং তন্ত্রম্। ষষ্টিতন্ত্রাখ্যং ষষ্টিখণ্ডং কৃতমিতি। তত্রৈব হি ষষ্টিরর্থা ব্যাখ্যাতা)।

অর্থাৎ পঞ্চশিখ মূল সাংখ্যতন্ত্রকে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করেন। তিনিও তাঁর বইয়ের নাম দেন ষষ্টিতন্ত্র। এ বইও পাওয়া যায় না। তবে পঞ্চশিখের বই থেকে আখ্যায়িকা ও পরমতখণ্ডন অংশ বাদ দিয়ে (আখ্যায়িকা-বিরহিতা: পরবাদবর্জিতাঃ—৭২ কারিকা) সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করেন ঈশ্বরকৃষ্ণ। তারই নাম সাংখ্যকারিকা, যা সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনতম বই রূপে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকার পাঁচটি টীকা পাওয়া যায়—মাঠর রচিত (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন যে ৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইনি কণিষ্কের মন্ত্রী ছিলেন), গৌড়পাদের ভাষ্য, লেখকপরিচয়হীন 'যুক্তিদীপিকা', বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ও শঙ্করাচার্য (বেদান্ত প্রচারক শঙ্করাচার্য নন) প্রণীত জয়মঙ্গলা। মূল কপিলের উপদেশকে বিপর্যস্ত ও বিকৃত করে অথবা ভিন্নগতি দান করে এই সব টীকা-ভাষ্য সমন্বিত সাংখ্যদর্শন প্রচারিত হয়েছিল ও তাই-ই ভারতের জাতীয় মনকে ক্লৈব্যগ্রস্ত করেছে। স্বয়ং বুদ্ধ-মহাবীরও তার শিকার।

কপিলের শিক্ষাকে কতটা পরবর্তী সাংখ্যে বিকৃত করা হয়েছে তার আলোচনা রামকৃষ্ণের সাধনতত্ত্ব বোঝার পক্ষে একান্ত প্রাসঙ্গিক। কপিল বলেছিলেন, জ্ঞান উদিত হলে প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলেই দেখি। ঈশ্বরকৃষ্ণ ঠিক বিপরীত নির্দেশ করেছেন। তাঁর উপদেশ:

যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য।

জ্ঞান উদিত হলে প্রকৃতি আর পুরুষের নয়নপথে পড়ে না। অর্থাৎ প্রকৃতি ভয়ে সংকোচে লুকিয়ে পড়ে অথবা নাশ হয়। মাঠর এক কাব্যময় উপমা দিয়ে কথাটি বুঝিয়েছেন। আপন ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক সতী কুলরমণী। হঠাৎ পরপুরুষকে আসতে দেখে লজ্জায় মুখ নিচু করে সে পালায় ঘরে। ঐ পুরুষ আমাকে দেখে ফেলেছে এ কথা ভেবে সে আর তার সামনে

বেরোয় না। তেমনি পুরুষ জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখে ফেললে প্রকৃতি পুরুষের নয়নপথ থেকে লুকোয়।

শুধু লুকোয় না; নিহত হয়। সাংখ্য একবার বলেছিলেন যে পুরুষ প্রকৃতির দ্রষ্টা বা সাক্ষীস্বরূপ থাকে। ১৯ ও ৪৭ কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলছেন, না, সাক্ষিত্বও গুণবিপর্যয়জনিত বা অবিদ্যাজনিত। সাক্ষিত্ব থাকলে প্রকৃতিকে না-দেখতে পাওয়া তো বলা যায় না। মোক্ষে প্রকৃতির আত্যন্তিক বিনাশ হয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিত্যা। ৬৮ কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখেছেন পুরুষ কৈবল্য লাভ করলে প্রধানবিনিবৃত্তৌ—প্রকৃতির বিশেষ নিবৃত্তি বা বিনাশ হয়। তবু তো প্রকৃতি থাকে? থাকে, তার কারণ রূপে আসুরি-পঞ্চশিখদের বিকৃত সাংখ্য প্রচার করেছে যে পুরুষ এক নয়, বহু। একজন পুরুষের কৈবল্য হলেও অপর অসংখ্য পুরুষের তো কৈবল্য হচ্ছে না—অতএব তাদের অজ্ঞান-দৃষ্টিতে প্রকৃতি থেকেই যাচ্ছে। বেদের এক পুরুষকে, কপিল-উপাসিত এক পুরুষকেও অস্বীকার করে বহু পুরুষবাদের গোঁজামিল চালিয়ে দিয়েছে অর্বাচীন সাংখ্য—যাকে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভুলবশতঃ classical Sankhya আখ্যা দিয়েছেন। (A History of Indian Philosophy, Vol IV, p, 36)।

আসলে এ অর্বাচীন সাংখ্য, বিপযস্ত সাংখ্য। এরই ভিত্তিতে পতঞ্জলি তাঁর 'যোগসূত্র' বা 'যোগদর্শন' প্রণয়ন করেন। পতঞ্জলি ও তাঁর ভাষ্যকার ব্যাস (মহাভারতের কবি ব্যাস নন, পরবর্তী টীকাকার মাত্র) বলেন যে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, অপরিণামী, কূটস্থ ও নিত্য। কিন্তু সংসারদশায় উপাধিবশত পুরুষ স্বরূপে নেই বলে মনে হয়। চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ ঘটে বলেই সংসার গজায়, এইই বিকল্প। অবিদ্যাই বিকল্পের মূল। অবিদ্যা কী? পতঞ্জলি বলেন:

> অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা। ২।৫ অনিত্য জিনিসকে নিত্য মনে করা, অশুচি জিনিসকে শুচি মনে করা, দুঃখকে সুখ মনে করা, অনাত্মকে আত্ম মনে করাই অবিদ্যা।

ব্যাস ভাষ্য করলেন, অবিদ্যা মানে বিদ্যার অভাব নয়, ভ্রান্তিকর বিদ্যা। অবিদ্যা জ্ঞাননাশী। অমিত্র মানে মিত্রের অভাব নয়, শত্রু। অগোষ্পদ মানে গোষ্পদের অভাব নয়, গোষ্পদের বিপরীত বিপুল দেশ বোঝায়। অবিদ্যা মানে তেমনি বিদ্যার বিপরীত। বিদ্যা উদিত হলে অবিদ্যার নাশ হয়।

তখন পুরুষ ও বুদ্ধির সংযোগ কেটে যায়। তখন আত্যন্তিক দুঃখ উপশম হয়। তাই-ই কৈবল্য।

এ হল নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, negative মানসতা। কৈবল্য লাভ ও ব্রহ্মোপলব্ধি সমান কথা নয়। উপনিষদ যে বলেছিলেন :

সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয়।

বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম।—বৃহদারণ্যক।

পতঞ্জলির কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষের দুঃখ উপশম হয় বটে কিন্তু আনন্দের সদর্থক অনুভূতি তার হয় না, উল্লাস তো নয়ই।

অর্বাচীন সাংখ্যের পুরুষ আনন্দস্বরূপ নন। 'সাংখ্যপ্রবচনসূত্র' বলেন যে একই ব্যক্তি যুগপৎ চিৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ হতে পারে না; কেননা চিৎস্বরূপতা ও আনন্দস্বরূপতা বিপরীত ধর্মী :

নৈকস্য আনন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ ৫।৬৬

আসল কথা দুঃখনিবৃত্তি আনন্দ-টানন্দ সব বাজে কথা। পতঞ্জলিও এটাই মেনে নিয়েছেন। তিনিও বহু পুরুষবাদী। এক পুরুষ কৈবল্য পেলে তার কাছে প্রকৃতি বিনাশ পায়, কিন্তু অপর পুরুষরা অবিদ্যাগ্রস্ত থাকে বলে প্রকৃতি থেকে যায় (পাতঞ্জল যোগ, ২।২২)।

তৎ পরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণম্। ১।১৬(পাতঞ্জল-যোগ) পুরুষের আত্মজ্ঞান হলে প্রকৃতি স্বীয় কার্যে বিতৃষ্ণা বোধ করে। তাকেই বলে পরবৈরাগ্য।

পরবৈরাগ্য হলে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়ে আসে। চিত্ত সবরকম আলম্বনশূন্য হয়ে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করে। তখন আর কিছুর জ্ঞান থাকে না—তাই অসম্প্রজ্ঞাত তখন গুণসমূহ একেবারেই বিনষ্ট হয়ে কৈবল্য লাভ হয়। তখন পুরুষ কিছুই গ্রহণ করে না বলে চিৎস্বরূপ হয়; তাই তাকে বলে কৈবল্য। জগতের জ্ঞান থাকে না, পুরুষ জগৎকে গ্রহণ করে না—তাই জগৎ থাকেই না।

ঋষিরা জীবের মুক্তি লাভকে বলেছিলেন ব্রহ্মভবন। স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তির অর্থ এই : এই সেই মহান আত্মা; অজ, অজর, অমর, অমৃত এবং অভয় ব্রহ্মই। ব্রহ্ম নিশ্চয় অভয়। যে তা জানে সে অবশ্যই অভয় ব্রহ্ম হয়।

কিংবা অঙ্গিরা ঋষি যখন বললেন :

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। (মুণ্ডক) যে সেই পরম ব্রহ্মকে জানে সে নিশ্চয় ব্রহ্ম হয়।

পতঞ্জলির দীন কল্পনা ও দীন উপলব্ধি ও হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন মন এই মানুষের ব্রহ্ম হবার কথায় সংকুচিত হয়েছে। তাই কৈবল্যে মানুষের নিবৃত্তি বা বিনাশের কথাই তিনি বলেছেন :

"বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ।" পতঞ্জলি ভুলেও ব্রহ্মের নামোল্লেখ করেননি। তিনি ঈশ্বরের কথা বলেছেন, কিন্তু সে ঈশ্বর ব্রহ্ম নন, শুধু কতগুলি অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারেন এমন ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি মাত্র।

সাংখ্য ও যোগের এই পতন ও ভাবত্বের জাতীয় মানসে তার ক্লৈব্যসঞ্চারী প্রভাব সম্পর্কে অবহিত থেকে মহাভারত ও ভাগবত প্রকৃত সাংখ্য ও প্রকৃত যোগতত্ত্ব পুনরুদ্ধার করেছিলেন। মহাভারতের সাংখ্যবাদ আগেই আলোচনা করেছি। শান্তিপর্বে দেখি মহর্ষি বশিষ্ঠ মিথিলারাজ দৈববাতি জনককে যোগতত্ত্ব উপদেশ দিয়ে বলছেন, যোগ হল মন দ্বারা বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে ফিরিয়ে এনে হৃদয়ে তৎ বা ব্রহ্মের ধ্যান করা। (১২।৩০৬।৭-১১) যোগ মানে যুক্ত হওয়া (ঐ ১৪-১৫)। যুক্ত হলে কী হয়?

তদা তমনুপশ্যেত যস্মিন্ দৃষ্টেঽনুকথ্যতে।
হৃদয়স্থোঽন্তরাত্মেতি জ্ঞেয়ো জ্ঞস্তাত মদ্বিধৈঃ॥ ১২।৩০৬।১৯

মদ্বিধ (জ্ঞানী) ব্যক্তিরা যাঁকে দেখে বলেন যে তিনি হৃদয়স্থ অন্তরাত্মা, জ্ঞেয় ও জ্ঞ—তাত! যোগযুক্ত হলে তাঁকেই দেখে।

বশিষ্ঠ বললেন, যোগাবস্থায় কান শোনে না, নাক শোঁকে না, জিহ্বা রস নেয় না, চোখ দেখে না, ত্বক স্পর্শ গ্রহণ করে না, মন সংকল্প করে না। যোগী কাঠের মতো জড, অভিমান নেই, বাহ্যবোধ নেই। এই নিশ্চল সমাধি দ্বারা জীব ব্রহ্ম হয়। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই ত্রিপুটি ভেদবোধ থাকে না। বশিষ্ঠ রাজা করালজনককে বারবার বললেন যে তিনি সনাতন বিশুদ্ধ পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম যথার্থত ব্যাখ্যা করেছেন। সে পরব্রহ্ম পরম পবিত্র, অশোক, আদি-মধ্য-অন্তরহিত অর্থাৎ বিচ্ছেদহীন, নিরাময়, বীতভয় ও শিব। ঐ ব্রহ্মই সর্বজ্ঞানের তত্ত্বার্থ। তাঁকে জেনে জীব জন্মমরণ থেকে মুক্ত হয়, অভয় হয়। বশিষ্ঠ

বললেন, ব্রহ্মাকে সেবাদ্বারা প্রসন্ন করে তেজস্বী সনাতন হিরণ্যগর্ভ এই যোগতত্ত্ব পেয়েছিলেন, আমি সেই হিরণ্যগর্ভের কাছ থেকেই তা পেয়েছি।

মহাভারতে পাই যে ব্যাসদেব পুত্র শুককে যোগতত্ত্ব বলেছিলেন। তিনি বলেন, বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ এবং আত্মা সর্বপ্রকারে এক —এইই পরম জ্ঞান :

একত্বং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়ানাং চ সর্বশঃ।
আত্মনো ব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদনুত্তমম্ ॥ ১২।২৩৯।৪০

পতঞ্জলির সম্পূর্ণ বিপরীত এ কথা। এতে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বিষয়ের ওপর বিমুখতা নেই, অনাস্থা নেই, অবহেলা নেই। আত্মা ও এরা সম। চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের কথাও যেন এই সিদ্ধান্তে ব্যাহত হয়। রামকৃষ্ণ যখন বলেন যে শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি ও শুদ্ধ আত্মা এক—তখন পতঞ্জলির মুনিদৃষ্টি শিশুবোধপ্রসূত বলে স্পষ্ট বুঝি ; ব্যাসই রামকৃষ্ণের উপলব্ধিতে সমথিত।

যোগীর যোগে "তদা ব্রহ্ম প্রকাশতে"—তখন ব্রহ্ম প্রকাশ পান। কেমন সে ব্রহ্ম ? ব্যাস পুত্রকে বলছেন :

ব্রহ্ম তেজোময়ং শুক্রং যস্য সর্বমিদং রসঃ।
এতস্য ভূতং ভব্যস্য দৃষ্টাং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ১২।২৪০।৯-১০

ব্রহ্ম তেজোময় শুক্র। এই সব, এই জগৎ সেই শুক্রপরিণত ; ব্রহ্মই তার রস। এই ভূতসমূহ, এই স্থাবর ও জঙ্গম, ঐ ভব্যের (বহুভবনোন্মুখ ব্রহ্মের) দৃষ্টিজাত। মহাভারতেই পাই যে ব্যাসের যোগতত্ত্ব অনুশীলন করে শুকের ব্রহ্মভবন হয়েছিল।

শান্তিপর্বে দেখি এই একই প্রাচীন যোগতত্ত্ব—যা পতঞ্জলির যোগ অপেক্ষা প্রাচীনতর, সদর্থক, বলিষ্ঠ ও উদার—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলারাজ দৈবরাতি জনককে এবং ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন।

মহাভারতের বহু পরে ভাগবত ভগবান কপিলের অবিকৃত সাংখ্যদর্শনকে উদ্ধার করেছিলেন। ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই কপিলের সত্য সাংখ্যের হদিশ ছিল :

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্।
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১।১।১

যাঁর থেকে বিশ্বের সৃষ্টি, যাঁতে বিশ্বের স্থিতি ও লয়; সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই সৎরূপে যিনি বর্তমান বলেই বস্তুর সত্তা স্বীকৃত, আর অবস্তুতে যিনি নেই বলেই তাদের সত্তা অস্বীকৃত; যিনি সকল জ্ঞানে পরিপূর্ণ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান; জ্ঞানীরাও যে বেদ-সম্পর্কে বিভ্রান্ত সেই বেদজ্ঞান যিনি আদি কবি ব্রহ্মার মানসপটে উদ্ভাসিত করেছিলেন; অগ্নি জল মাটিতে যেরূপ বিনিময় জ্ঞান হয় অর্থাৎ অগ্নিকে জল মনে হতে পারে, জলকে মাটি মনে হতে পারে, কাচকে জল মনে হতে পারে ইত্যাদি,—সেরূপ সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের সৃষ্ট বস্তু যাঁর মধ্যে সত্যবৎ প্রতিভাত হয়; আবার যিনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুহক বা মায়াজাল নিরস্ত বা ছিন্নভিন্ন করেন সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি।

শ্রীধর টীকায় বলেছেন পরং মানে পরমেশ্বর। তাঁর স্বরূপ হল সত্যং। সত্য অর্থ বাস্তব, reality; তিনি পরম reality বলে মিথ্যা সৃষ্টিও real মনে হয়। সমগ্র বিশ্ব reality-তে বিধৃত বলে, দৃশ্যমান বিশ্বও real. সৎস্বরূপেই সব স্থিত বলে সবই সৎ। তাঁকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান যে নামেই ডাকি তিনি স্বরূপে শুদ্ধ নিরাকার চৈতন্য—অরূপস্য চিদাত্মনঃ ১।৩।৩০ গুণত্রয়যুক্ত মায়াশক্তিতে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, কিন্তু সৃষ্টির আড়ালে তিনি সদ্রূপে অবস্থিত বলে তাঁরাই আত্মমায়ায় সৃষ্ট জগৎও সৎ। শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ মায়াধীশ ঈশ্বর সর্বপ্রকার দ্বৈতবর্জিত, ভাগবত একথা বারবার বলেছেন। তাঁর তিনটি শক্তি: অন্তরঙ্গ স্বরূপ-শক্তি, যাতে তিনি নিত্য স্থিত; অন্তরঙ্গ চিৎ-শক্তি যা দ্বারা তিনি জীব সৃষ্টি ও ধারণ করেন এবং বহিরঙ্গ মায়াশক্তি, যা দ্বারা তিনি বস্তুজগৎ সৃষ্টি ও ধারণ করেন। শক্তিমান ও শক্তি অভিন্ন। একই reality দুটি বিভাবে প্রকাশিত: শক্তি ও শক্তিমান। যখন তাঁকে শক্তিমান রূপে দেখি এখন তিনি ঈশ্বর, যখন তাঁকে শক্তিরূপে দেখি তখন তিনি মা।

পরব্রহ্মই পরম পুরুষার্থ, পরম সুখরূপ, নিত্য। তিনি আমাদের সকলকে পরিপূরিত করে আছেন।

আদাবন্তে জনানাং সদ্বিহরন্ত পরাবরম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বচো বাচ্যং তমো জ্যোতিস্ত্বয়ং স্বয়ম্॥

ভাগবত ৭।১৫।৫৭

লোক সকলের আদিতে ও অন্তে, অন্তরে ও বাইরে, উচ্চ ও নীচ, জ্ঞান

ও জ্ঞেয়, বাক ও বাচ্য, আলো ও অন্ধকার ইত্যাদি যা কিছু আছে সবই তিনি স্বয়ং।

ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দে কপিলের কথা পাই। তাঁর পিতা মাতা ও জন্মবৃত্তান্ত সবই তাতে আছে। ব্রহ্মা কপিলের পিতা ঋষি কর্দমকে বলেছেন :

বেদাহমাদ্যং পুরুষমবতীর্ণং স্বমায়য়া।
ভূতানাং শেবধিং দেহং বিভ্রাণং কপিলং মুনে ॥ ৩।২৪।১৬

মুনি! তোমার এই পুত্রটি, ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, দেখামাত্রই আমি জানতে পারলাম যে আদিপুরুষ ভগবান স্বীয় মায়াদ্বারা প্রাণীদের সর্বাভীষ্টপ্রদ এই দেহ ধারণ করে কপিলরূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন।

কপিলের মা দেবহূতিকে ব্রহ্মা বলেছেন যে অবিদ্যাসংশয়গ্রন্থি ছিন্ন করে পৃথিবীতে বিচরণ করবেন এই কপিল, ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর, স্বয়ং কৈটভনাশন ভগবান, সাংখ্যাচার্যগণ কর্তৃক পূজিত, জ্ঞানবিজ্ঞান যোগী!

কপিল বাবাকে বলেছেন যে আত্মজ্ঞানের পথ কালপ্রভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তা পুনর্বার প্রবর্তন করতে আত্মমায়াদ্বারা এই দেহ ধারণ করেছি। তুমি পিতা, কিন্তু আমাতে কর্ম সমর্পণ করে দুর্জয় মৃত্যু জয় করে, অমৃতের জন্য—অমৃতত্বায় মাং ভজ—আমাকে ভজনা কর।

এরপর বাবা বনে চলে গেলে মাকে কপিল বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। বাবা-মার কাছে বলা তত্ত্বে যথার্থ কাপিলীয় সাংখ্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে। মাকে তিনি বলেন :

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥ ৩।২৬।৩

মা! সর্বেন্দ্রিয়ের অগম্য ধামবাসী আত্মাই পুরুষ; সেই পুরুষই অনাদি, প্রকৃতিসঙ্গরহিত ও নির্গুণ; তিনি স্বয়ং প্রকাশ পান, এ বিশ্ব তাঁর সঙ্গে সমন্বিত হয়ে প্রকাশ পায়।

পুরুষ লীলয়া, লীলাভরে প্রকৃতিকে গ্রহণ করেন; তাঁর বন্ধন নেই, হয় না। পুরুষ এক—এ সিদ্ধান্ত আদি কপিলের; পুরুষ বহু—এ সিদ্ধান্ত নকল কপিলের। প্রকৃতি হেয় ও অবজ্ঞেয় নয়—তা ব্রহ্মেরই ধন, এ সিদ্ধান্ত মূল সাংখ্যকারের। প্রকৃতি পচা, অশুচি, মিথ্যা, হত্যাযোগ্য – এ সিদ্ধান্ত নকল সাংখ্যকারের। ব্রহ্মের ইচ্ছায় ব্রহ্মময়ী জগৎ ও জীবন সৃষ্টি করেন ও ব্রহ্ম তাদের ধারণ করেন, এ

সিদ্ধান্ত মূল সাংখ্যের। জগৎ ও জীবন সৃষ্টিই হয় না, তা অলীক দর্শন মাত্র—এ মত নকল সাংখ্যের। মুক্তি আনন্দময় ব্রহ্মভবন, অমৃত হওয়া—এ উপদেশ পিতা দেবহূতিকে কপিল দিয়েছিলেন। মুক্তি মানে দুঃখ থেকে ত্রাণ মাত্র—এ ভীরু বাণী ছদ্ম কপিলের। ভগবান কপিল বেদবাদী, ব্রহ্মবাদী, সেশ্বর; নকল কপিল বেদবিরোধী, ব্রহ্ম-অনভিজ্ঞ, নিরীশ্বর। এই নকল কপিলটি কে তারও হদিশ পাওয়া যায় মহাভারতের শান্তিপর্ব থেকে। তিনি আসুরি-শিষ্য পঞ্চশিখ স্বয়ং। কপিলা নাম্নী এক নারীর স্তন্য পানে পুষ্ট হয়েছিলেন তিনি শিশুকালে, তাই তাঁর নাম হয় কাপিলেয়। পরে বড় হয়ে তিনি পরমর্ষি কপিল বলে নিজেকে প্রচারিত করেন (১২'২১৮।৯)। এই পঞ্চশিখ গুরু আসুরির নাম নিয়ে যে নকল ষষ্টিতন্ত্র চালান আসল ষষ্টিতন্ত্র তাতে ঢাকা পড়ে নি। অহির্বুধ্ন-সংহিতা আসল ষষ্টিতন্ত্রের মোট ষাটটি অধ্যায়ের বিষয়সূচী দিয়েছেন। তাতে দেখা যায় যে বইটির দুটি খণ্ডে ব্রহ্ম, পুরুষ, শক্তি, নিয়তি, কাল, গুণ, অক্ষর, প্রাণ, কর্তা, ঈশ্বর, জ্ঞান, কর্ম, তন্মাত্র, ভূতাদি, জীবনের কর্তব্য, অভিজ্ঞতা, চরিত্র, ক্লেশ, প্রমাণ, ভ্রান্তি, ধর্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, গুণ, লিঙ্গ বা লক্ষণ, অনুভূতি, বৈদিক কর্ম, সিদ্ধি, কামনাশ, আচারপ্রথা ও মোক্ষ বিষয়ে আলোচনা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিচার করে জানিয়েছেন যে অহির্বুধ্ন সংহিতার সংবাদ সত্য এবং ঈশ্বরকৃষ্ণ মূল কপিল-বিরচিত ষষ্টিতন্ত্র দেখেননি। তিনি নকল ষষ্টিতন্ত্রের পাল্লায় পড়েন। অহির্বুধ্ন-সংহিতা মূল কপিলের সাংখ্যতত্ত্ব এরূপ বলে জানিয়েছেন যে ব্রহ্ম হরি বিষ্ণু বা ঈশ্বর একই; তাঁর শক্তিও তাঁর সঙ্গে এক; সে শক্তি স্বরূপে ব্রহ্মের চিন্তা—স্বচ্ছন্দ-চিন্ময় ভাব। সে ভাব স্পন্দমান—জ্ঞানমূলাক্রিয়াত্মা। সে ভাব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে—দ্বিধাভাবম্ ঋচ্ছতি। এক ভাগ ভগবানের সংকল্প, ভাবের ভাবক; আর এক ভাগ ভাব্য বা প্রকৃতি। প্রকৃতি তাই ভগবানের শুদ্ধ সংকল্পজাতা, চিন্ময়ী—ভাগবতী। ব্রহ্মের শক্তি স্তৈমিত্য-রূপ, শূন্যতা-রূপিণী—কিন্তু অনির্বচনীয় স্বতস্ফূর্ততার বশে হয়ে ওঠে গতিময়। এ হল ভগবৎসংকল্প—তাই গতিস্পন্দময়। সব সৃষ্টি এ থেকেই উদ্ভূত। সৃষ্টি কোনো বিশেষ কালে হয়নি, ব্রহ্মশক্তির শাশ্বত স্পন্দমানতাই সৃষ্টিমূল। অতএব সৃষ্টি শাশ্বত, সত্য, নিত্য। সৃষ্টি ভগবানের নিত্য আত্মপ্রকাশ। ভগবানের এত বল যে এই নিত্য অবিরাম সৃষ্টিমুখরতায় তিনি ক্লান্ত হন না। তাঁর বীর্য এমন যে তাঁরই শক্তি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এক ভাগ ব্রহ্মাণ্ড-উপাদান হচ্ছে ও আর এক ভাগ সেই উপাদান-সাহায্যে সৃজন করে

চলেছে—তবু তিনি নির্বিকারই থাকেন। বিশুদ্ধ চৈতন্য তিনি, আবার শক্তিও তিনি।

গীতায় কৃষ্ণ যে সাংখ্যের কথা বলেছেন তা সাংখ্যকারিকার সংখ্য নয়, কপিলের সাংখ্য। পতঞ্জলির নেতিবাচক যোগ কৃষ্ণের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিযোগ নয়। গীতা ও ভাগবতে যে যোগের কথা আছে, ভগবান কপিলের ষষ্ঠিতন্ত্রে যে যোগতন্ত্রের কথা ছিল, রামকৃষ্ণ যে যোগ দেখালেন তা সম্পূর্ণ ইতিবাচক, সদর্থক যোগ। এ যোগ ভগবানের সঙ্গে সর্বদা সর্বতোভাবে যোগ—অব্যয় অচ্যুত যোগ।

আমরা অনুবাদ অর্থাৎ প্রাচীন পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব ও যোগ তত্ত্বের কথা বলেছি। এখন বিধেয় অর্থাৎ রামকৃষ্ণের যোগতত্ত্ব তথা সাধনতত্ত্বের কথা বলব। আমরা দেখেছি যে নকল সাংখ্যের প্ররোচনায় পতঞ্জলি জগৎকে অনিত্য, অশুচি, অসুখ ও অনাত্ম বলেছিলেন এবং জগৎকে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মাময় মনে করাকেই অবিদ্যা বলেছিলেন। এই দর্শনই তাঁর যোগের ভিত্তি। রামকৃষ্ণ বললেন, ঈশ্বরদর্শনের আগে এই অনিত্য, অশুচি, অসুখ ও অনাত্মবোধ থাকে; ঈশ্বরদর্শনের পর নয়। যার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে সে দেখে সবই নিত্য শুচি ও ব্রহ্মময়। শুধু দেখে না, তার আচরণও তদ্রূপ হয়ে যায়। তাই তাকে কখনো কখনো জ্ঞানহীন বালক, শুচিঅশুচিবোধহীন পিশাচ, নিত্য-অনিত্য-বোধশূন্য পাগল ও স্তব্ধবাক জড় মনে হতে পারে। রামকৃষ্ণের স্বভাষায় বর্ণনাটি এই:

> যে ঈশ্বরকে সর্বদা দর্শন করছে, তাঁর সঙ্গে কথা কচ্চে (বিজ্ঞানী), তার স্বভাব আলাদা; কখনও জড়বৎ, কখনও পিশাচবৎ, কখনও বালকবৎ, কখনও উন্মাদবৎ।
>
> কখনও সমাধিস্থ হয়ে বাহ্যশূন্য হয়—জড়বৎ হয়ে যায়। ব্রহ্মময় দেখে তাই পিশাচবৎ; শুচি অশুচি বোধ থাকে না। হয়তো বাহ্যে করতে করতে কুল খাচ্ছে, বালকের মতো। স্বপ্নদোষের পর অশুচি বোধ করে না—শুক্রে শরীর হয়েছে এই ভেবে।
>
> বিষ্ঠা মূত্র জ্ঞান নাই; সব ব্রহ্মময়। ভাত ও ডাল অনেকদিন রাখলে বিষ্ঠার মতন হয়ে যায়।
>
> আবার উন্মাদবৎ; তার রকম সকম দেখে লোকে মনে করে পাগল।
>
> আবার কখনও বালকবৎ; কোন পাশ নাই, লজ্জা ঘৃণা সঙ্কোচ প্রভৃতি।
>
> (১৮৮৪ খ্রীঃ ৯ই মার্চ রবিবার দক্ষিণেশ্বরে উক্ত)

এমন বিজ্ঞানী পুরুষকে পতঞ্জলি দেখেননি, দেখলে অবিদ্যা কথাটির উচ্চারণ অত সহজে করতে পারতেন না। কোথায় আছে অবিদ্যা? বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইই আছে এ কথা বলার পরক্ষণেই, নরেন্দ্রের প্রতিবাদ শিরোধার্য করে রামকৃষ্ণ বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞানে দেখা যায় যে সবই বিদ্যা। অবিদ্যা ত্রিভুবনে নেই। (১৮৮৫ খ্রীঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারি স্টার থিয়েটারে কথা)। ঐদিন একটু আগেই তিনি বলেছিলেন: ভক্ত জাগ্রত স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থা উড়িয়ে দেয় না। ভক্ত সব অবস্থাই লয়; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণও লয়; ভক্ত দেখে তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব (সাংখ্যে উক্ত) হয়ে রয়েছেন, জীব-জগৎ হয়ে রয়েছেন। ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই। 'স্বপ্নবৎ' বলে না, তবে বলে তিনিই এই সব হয়েছেন; মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ। তবে পাকা ভক্তি হলে এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে; তখন দেখে যে সবই হলদে। ভক্তও তাঁকে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে 'তিনিই আমি' 'আমিই তিনি'।

ঈশ্বরভক্ত প্রকৃতিকে সহজ প্রসন্নতায় গ্রহণ করে, এমনকি গুণত্রয়কেও। কেননা সে জানে গুণাতীত নিষ্কল পুরুষই এই সব হয়ে রয়েছেন এবং সে নিজে ও সেই পুরুষ অভিন্ন। ভগবানই ভক্ত, ভক্তই ভগবান। এখানে কোনো বিষয়ে ভয় থাকে না, উপেক্ষা থাকে না, কারও প্রতি কোনো দ্বেষ ও অবহেলা থাকে না—ফলে আসে না সংকোচন ও প্রত্যাহার। সাধক তখন অনন্ত আত্মপ্রসারণে মেতে ওঠে, জগৎকে হজম করে জগতে ছড়িয়ে পড়ে; সে আর দুর্বল ভীরু ছুঁৎমার্গী নয়, উদার বলিষ্ঠ সর্বগ্রহিষ্ণু। আত্মকেন্দ্রিকতার গুটি ছেড়ে সাধক নিজেই তখন হয়ে ওঠে বিশ্বপুরুষ, বিশ্বম্ভর। আত্মমুক্তির সাধনা তখন রূপান্তরিত হয়ে যায় মানবমুক্তির তপস্যায়।

আগেই বলেছি, রামকৃষ্ণ যখন সাধনায় রত হয়েছিলেন তখন বিশ্বব্যাপী ক্লৈব্যের মুখব্যাদান তিনি দেখেছিলেন। সে ক্লৈব্যের আদি মূল সমকালীন পরিস্থিতিতে ছিল না, ছিল বহু গভীরে প্রোথিত: ভেদদৃষ্টি, খণ্ডদৃষ্টিই সে মূল। অখণ্ড পূর্ণ দৃষ্টির সৃষ্টি ছিল বেদ; ক্রমেই সে দৃষ্টিতে সংকোচন দেখা দেয়; উপনিষদেই সে সংকোচনের ঈষৎ আভাস ফুটে উঠেছিল, যদিও অখণ্ড দৃষ্টি তখনো বর্তমান। এই খণ্ড দৃষ্টির প্লাবন থেকে অখণ্ড দৃষ্টিকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন কৃষ্ণ: তাঁকে অবতার রূপে গ্রহণ করেই কর্তব্য শেষ করেছে

লোকে, অনুসরণ করেনি তাঁর শিক্ষা। তাই সত্যের লাঞ্ছনা করার অপরাধে কালহত হয়েছে কলির জীবকুল।

এ হল আমাদের স্বদেশের অভিজ্ঞতা: বিশ্বের অপর প্রান্তের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। তাই জ্ঞান-বিদ্যা শৌর্য-বীর্যে উন্নত হয়েও প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা খণ্ড ও সংকুচিত বুদ্ধির প্রভাবে কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি, প্রতিবেশীকে করেছে শত্রু, আপন ঘরের সর্বোত্তম জ্ঞানীকে দিয়েছে মৃত্যুদণ্ড। হেলেনিক সভ্যতার চূড়ান্ত বুদ্ধিবিভ্রমের সাক্ষ্য রয়েছে যখন ব্রহ্মবরিষ্ঠ যীশুকে তারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল—সে কোন সভ্যতার সাধনা যা সত্যকে দেখতে দেয়না, স্বার্থ-পরতাকেই একান্ত বড় করে তোলে? এইই ক্লৈব্য যা সত্যের তেজ সহ্য করতে পরাঙ্মুখ, যা মিথ্যা মোহ ও মূঢ়তার আশ্রয়ে মুখ লুকিয়েই সর্বার্থসিদ্ধির স্বপ্ন দেখে।

কুরুরাজ সভায় কুরুরাজবধূ দ্রৌপদী যেদিন লাঞ্ছিতা-অপমানিতা হয়েছিলেন সেদিন ভীষ্মের ব্রহ্মচর্যবীর্য, দ্রোণের শস্ত্রবিদ্যা, রাজার রাজধর্ম, বেদপণ্ডিতের বেদবিদ্যা, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মগায়ত্রী উচ্চারণ ক্লীব হয়েছিল; এক অসহায়া রমণীর প্রতি অন্যায়ের আস্ফালনে সকলেই ছিল রুদ্ধবাক, রুদ্ধকর্ম—একটিও প্রতিবাদ-ধ্বনি ওঠেনি। সে নির্বাক সভায় শুধু দুঃশাসনদের কণ্ঠই বাজছিল আর শোনা যাচ্ছিল দ্রৌপদীর ক্রন্দনধ্বনি। বীর পঞ্চস্বামী তখন নিষ্প্রাণ পুতুলে পরিণত। সেই সার্বিক ক্লৈব্যের পটভূমিতেই ভগবানের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল—তা নইলে লাঞ্ছিতা মানবীর মান রক্ষা হত না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কৃষ্ণার্জুন সংলাপের অন্তরালে ঐ রমণীর ক্রন্দনধ্বনি আছে;—সে ক্রন্দন থেকেই মহাভারতের যুদ্ধ সমুদ্ভূত, আর যুদ্ধক্ষেত্রেই শোনা গেল ভগবানের গীত। অর্জুন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদিকে দেখছে, তাদের যুদ্ধসজ্জা দেখছে, শুনছে যুদ্ধক্ষেত্রের নানা কলরব। দ্রৌপদীর ক্রন্দন সে বিস্মৃত হয়েছে, তা তার কাণে আর এসে পৌঁছয় না। যারা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার হেতু ও সমর্থক তাদের প্রতিই মায়া-উদ্বেল হয়েছে অর্জুনের হৃদয়; তার স্মৃতি আজ মায়াচ্ছন্ন, লুপ্ত। খণ্ড স্মৃতি, খণ্ড বিচার, খণ্ড দৃষ্টি নিয়ে সে গাণ্ডীব পরিহারের সিদ্ধান্তে উপনীত। কিন্তু কৃষ্ণের বিস্মৃতি নেই, দৃষ্টিতে আচ্ছাদন নেই—সেদিনও রাজসভায় ক্লৈব্যাচ্ছন্ন হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল যখন সকলে, তিনি একাই জানতেন তাঁর কর্তব্য কী ও দ্বিধাহীন ছিলেন তা পালনে। আজ কুরুক্ষেত্রেও অখণ্ড স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি স্পষ্ট জানেন কর্তব্য কী এবং তা পালনে তিনি অকম্পিত।

সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত গ্রন্থে বহু সংলাপ ধরা আছে—ভক্তবৃন্দ ও ভগবানের আলাপ। শ্রীম সে সংলাপের লিপিকার, প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তবু মনে হয়, ওই ভগবদ্বাণীর অন্তরালে যে কান্না বিদ্যমান তা শ্রীমর কাছেও অশ্রুত ছিল, আমাদের কাছেও অশ্রুত রয়েছে। গীতার মহতী বাণীর আড়ালে দ্রৌপদীর কান্না কি গীতার পাঠক কোনোদিন শুনেছে, না শুনতে চেয়েছে?

রামকৃষ্ণ নিখিল মানবতার মর্ম থেকে উত্থিত কান্না শুনেছিলেন—তিনি একাই শুনেছিলেন, আর কেউ নয়। অপর কোনো কোনো দরদী মানুষ আংশিক আভাস মাত্র পেয়ে থাকবেন—তাতেই তাঁরা কেউ বিপ্লবের পথে, কেউ শিল্প সাহিত্যে সেই আভাসটুকু ব্যক্ত করার পথে ছুটেছেন। স্থির সমাহিত চিত্তে মানবতার যুগ যুগব্যাপী মর্মযন্ত্রণার বেদনভাষা রামকৃষ্ণ শুনেছিলেন বলেই পরব্রহ্ম তিনি জীবদায় অঙ্গীকার করে, জীবপ্রেমে আকণ্ঠ ভরপুর হয়ে জীবদেহ নিয়ে মর্ত্যের ধূলিতে নেমে এসেছিলেন। নেমে এসেছিলেন জীবের শিবত্ব সম্পাদন করতে, মানুষকেই ব্রহ্মবরিষ্ঠ করতে। জগতের রাজারা, প্রভুরা শোষণমূল সমাজ রাষ্ট্র জ্ঞানবিদ্যা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে মানুষের অঙ্গের শেষ বসনটুকুও হরণ করেছে, অশন তো কেড়ে নিয়েছেই। বীর্যবান ও জ্ঞানী, ধর্মবেত্তা ও নীতিরক্ষক সকলেই সব দেখে ও জেনেও চুপ, ক্লৈব্যগ্রস্ত। একা রামকৃষ্ণ স্থির, এমন বসনে সাজাবেন ঐ অপমানিত অসহায় মানবতাকে যা কখনো ফুরোয় না, যার আদি অন্ত নেই, যা আমাদের অঙ্গে অঙ্গে নিত্য ঝলমল করে উঠবে। তিনি আমাদের লজ্জা-নিবারণ হরি; আর সকলে যখন কর্তব্যভ্রষ্ট, কৃপণ, তিনিই তখন একা জাগ্রতকর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন, বদান্য; সমস্ত পরাভব থেকে মানবতাকে তিনিই পারেন উদ্ধার করতে, কেননা তিনিই পারেন আমাদের সকলকে ব্রহ্মবরিষ্ঠ করতে—দুএকজন শিষ্য-ভক্তকে মাত্র নয়।

পরমেশ্বর সর্বভূত-অন্তরাত্মা—তিনি সব জানেন। কিন্তু দেহধারী সরলবুদ্ধি রামকৃষ্ণ মানুষের দুঃখের কথা কিভাবে জানলেন? রক্তলিপিতেই তিনি দুঃখের পাঠোদ্ধার করেছিলেন। হাড়ির একটি ভাত টিপলেই হাড়ির সব ভাতের অবস্থা জানা যায়। রামকৃষ্ণ দিব্য প্রতিভায় এক লহমায় বুঝে নিয়েছিলেন যে যে অন্যায়মূলে তাঁর বাবা-মা বাস্তুচ্যুত হন, আইন-আদালত তথা রাজশক্তি যে অন্যায়কে সমর্থনের শীলমোহর দিয়েছিল, সব জেনেও যে অন্যায়ের প্রতিকার করতে কেউ এগিয়ে আসেনি—সে অন্যায় শুধু একা তাঁর আপন।

পরিবারকে আক্রমণ করেনি, সমগ্র মানবজাতিকে আক্রমণ করে বসে আছে সভ্যতার উষাকাল থেকে। এভাবে পাণ্ডবরাও তো ভূমিচ্যুত হয়েছিলেন—সেই তো আবহমান কাল চলে আসছে ভূমিগ্রাসের লড়াই। গ্রীক সমাজে কোথা হতে এসেছিল হেলটরা, রোমান সাম্রাজ্যে প্লেবিয়ানরা? কেন স্পার্টা তার প্রতিবেশী মেসেনির কৃষককুলকে সামরিক শক্তিতে পরাস্ত করে চিরতরে পদানত ও দখল করে রাখে? এবং পৃথিবীর সর্বত্রই সভ্যতা কেন নরশোষণধর্মী আদি কাল থেকে? আপন পারিবারিক মণ্ডলের অভিজ্ঞতা থেকেই রামকৃষ্ণ মানবসভ্যতার রক্তনখরপুষ্ট রূপটি এক আঁচড়ে চিনে নিয়েছিলেন।

এও বাহ্য; ক্ষমতাশালীরা সাধারণ মানুষকে দমন-পীড়ন-শোষণ করেছে—এটা অবাঞ্ছনীয় কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। যা অস্বাভাবিক তা হল সকল বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, নীতি এই শোষণ ও দমন, এই ভেদবাদিতা চিরদিন সমর্থন করে এসেছে, মেনে নিয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মসাধনাও এই ভেদবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত; ঈশ্বরভাবুকও শোষণ বিরোধী নয়; পণ্ডিতরা তো নয়ই। এইই ক্লৈব্য—সর্বব্যাপক ক্লৈব্য। শাস্ত্র, নীতি, তন্ত্র, সাধনা, পাণ্ডিত্য, কলানিপুণতা সবই ক্লীব। সকলেই সর্বভাবে যখন ক্লৈব্য-আক্রান্ত তখন বিবেকের মুখরক্ষার সহজ উপায় জগৎ ব্যাপারটিকেই মায়া, অলীক, অবিদ্যাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেওয়া।

রামকৃষ্ণ ঐভাবে উড়িয়ে দেওয়াটাই ব্রহ্মবিদ্যা, এমন কথা বলেননি। তাঁর দৃষ্টিতে পুরুষ যেমন সত্য, প্রকৃতিও তেমনই মহিমান্বিতা—তিনিই তাঁর আরাধ্যা কালী, মা। তিনি বলেছেন, মাত্র দুটি জিনিসই আছে, ব্রহ্ম আর ব্রহ্মময়ী। ব্রহ্ম যেমন সত্য, ব্রহ্মময়ীও তেমনই সত্য। ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি করেন ব্রহ্ম-উপাদানকে নিয়েই। অন্য উপাদান তিনি পাবেন কোথায়? তাই যা দেখি আর যা দেখিনা সবই ব্রহ্মবস্তু।

তবে কেন মানুষের অপমান, লাঞ্ছনা, কান্না? এ প্রশ্ন রামকৃষ্ণের কাছে জরুরী, অন্যদের কাছে নয়। এই প্রশ্নের উত্তর দানই তাঁর সাধনার মর্মকথা। মানুষ চিত্তবৃত্তিনিরোধ করে জগৎভ্রান্তি কাটিয়ে কৈবল্য বা নির্বাণে উত্তীর্ণ হয়ে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে এ বিধান মুনির বিধান হতে পারে, ভগবানের বিধান নয়। এ জগৎ ব্রহ্মধাম। সমাধি ও ব্যুত্থান এখানে যুগপৎ সিদ্ধ হলেই তা সার্থক। নেতিবাচক নির্বাণ বা কৈবল্যের নিরস্তিত্বে চলে যাওয়ার জন্য জগৎ ও জীবন সৃষ্টি ভগবান করেননি। আত্মহত্যাকে তিনি উৎসাহ

দেননা। রামকৃষ্ণ জীবনের বাণী শুনেছেন ও শুনিয়েছেন ; মৃত্যুর, লয়ের, নিরস্তিত্বের ঘোষণাকারী তিনি নন।

লয় যখন লীলাকে শুচিস্নাত মার্জিত বাধাবিকৃতিমুক্ত করতে আসে তখন তা সার্থক, কিন্তু লয় যখন মদগর্বিত ঔদ্ধত্যে স্বপ্রধান হয়ে ওঠে তখন সে লীলাকে হরণ ও নাশ করতে চায়, অস্বীকার করে লীলার ঔচিত্য—সে উদ্ধতমূর্তি লয়ের স্থান সৃষ্টিতে নেই। তখন লয়ের অতীত পুরুষ আপনি নেমে আসেন এ লয়গ্রাসিত পার্থিব জীবনকে বিপন্মুক্ত করতে। পতঞ্জলির যোগে লয়ের কথা শুনেছি। রামকৃষ্ণের যোগে নিত্য লীলা প্রতিষ্ঠিত।

যোগ শব্দটির ধাতুগত অর্থ তিনটি—যুজির্ যোগে, যুজ্ সমাধৌ ও যুজ্ সাম্যমানে। অর্থাৎ যুক্ত করা, মনোবৃত্তির লয় ও মনঃসংযম। গীতা যোগ শব্দটি গ্রহণ করেছেন প্রথম অর্থে, পতঞ্জলি নিয়েছেন দ্বিতীয় অর্থে। যুজির যোগে বা যুক্ত করা অর্থে যুজ,—এর সঙ্গে মনঃসংযমের বিরোধ নেই। গীতা বলছেন কামনা, ফলকামনা ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে, নইলে যোগ হবে না। বস্তুতঃ সর্বত্যাগী হলেই যোগারূঢ় অবস্থায় যাওয়া চলে; নিম্নপ্রবৃত্তি মার্গ যোগের পথ নয়, বিয়োগের পথ। কারণ আত্মা থেকে, পরমাত্মা থেকে সে পথ আমাদের বিযুক্ত করে। তাই নিবৃত্তি চাই। কিন্তু নিবৃত্তি চাই আত্মলয়ের জন্য নয়, প্রবৃত্তিজাত অহঙ্কারের বদলে নিবৃত্তিজাত অহঙ্কার পুষ্ট করার জন্য নয়—আত্মা, পরমাত্মা ও পরমপুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। যোগারূঢ় ব্যক্তি শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান সব কিছুর মধ্যে সমাহিত থাকেন (গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়, সাত শ্লোক)। তার তাৎপর্য এই যে যোগী জগতেই বাস করেন, সব দ্বন্দ্বমধ্যেই থাকেন, কিন্তু থাকেন অবিচল হয়ে ; তাঁর সমাধি তাঁর পার্থিব আবেষ্টনীতে ক্ষুন্ন হয় না।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৬।৮

যিনি আত্মজ্ঞান ও আত্মানুভূতি দ্বারাই তৃপ্ত থাকেন, যিনি নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি পাথর মাটি ও সোনা সমান দেখেন, তেমন যোগীকেই বলি ঈশ্বরে যুক্ত।

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥ ৬।৯

সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ, অপ্রিয়, বন্ধু, সাধু, পাপী—এদের সবার প্রতি যিনি সমভাবাপন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ৬।১০

যোগী নিজের দেহমন সংযত করে, কামনা ও ভোগ ত্যাগ করে একাকী নির্জনে থেকে আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করবেন।

এইই গীতার যোগ। এখানে নির্জনে একাকী থাকার কথা আছে, সংযম ও ত্যাগের কথা আছে, কিন্তু লয়ের কথা নেই, প্রকৃতি ও প্রজাপুঞ্জ বর্জনের কথা নেই;—সাধু ও পাপী, বন্ধু ও শত্রুকে সাম্যভাবে নিয়ে, টাকা ও মাটিকে সম মূল্য দিয়ে ঈশ্বরযুক্ত হবার কথাই শুনি কৃষ্ণমুখে। রামকৃষ্ণমুখেও যোগ এরূপ তাৎপর্যসহই উক্ত হয়েছে।

কৃষ্ণ বলেছিলেন যে যোগী প্রশান্তচিত্ত, ভয়শূন্য, ব্রহ্মচর্যে স্থিত হয়ে মনঃ-সংযমপূর্বক মৎপরঃ অর্থাৎ কৃষ্ণপরায়ণ হয়ে মচ্চিত্তো যুক্ত—আমাতেই অর্থাৎ কৃষ্ণেই চিত্ত যুক্ত হবেন। নির্বাণে যে শান্তি লাভ হয় এই যোগেও সেই শান্তি মিলবে কেননা শান্তির ভিত্তিও আমি।

পতঞ্জলি মনের লয়কেই যোগ বলেছেন বলে দেহবাসনার উন্মূল করতে ধীরে ধীরে খাদ্যপানীয় নিদ্রা সম্পূর্ণ বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন—দেহের সব স্পন্দন যেন থেমে যায় এই তাঁর লক্ষ্য। কৃষ্ণ সংযত আহার ও সংযত নিদ্রার উপদেশ দিয়েছেন, অনশন ও অনিদ্রা নিষেধ করেছেন। পতঞ্জলি প্রাণায়ামের দ্বারা বছরের পর বছর শ্বাসরোধ করে থাকতে বলেছেন, মন থাকবে শূন্য—অবশেষে দেহ ও মন দুয়েরই ধ্বংস কাম্য। কৃষ্ণ বলেছেন দেহ থাকবে সুস্থ সবল, দেহ ক্ষীণ হবে না, কাজকর্মও থাকবে, মন থাকবে স্ববশ, সরস, ফুল্ল। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত মন তো আনন্দে-উল্লাসে ভাসবে। প্রাণায়াম, অর্থাৎ শ্বাস-সংযম যারা করে কৃষ্ণ তাদের বলেছেন যজ্ঞবিৎ—তাদের যোগী বলেননি। পতঞ্জলি বলেছেন কৈবল্যে আত্যন্তিক দুঃখের নাশ হয়। কৃষ্ণ বলেছেন, যোগী লাভ করে আত্যন্তিক সুখ।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ৬।২১

যোগী লাভ করেন আত্যন্তিক সুখ; অতীন্দ্রিয় সে সুখ শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। এ সুখ যিনি পান তিনি আত্মস্বরূপ থেকে আর কখনো বিচ্যুত হন না।

সে সুখ সামান্য সুখ নয়; তা দিব্য উল্লাস। সে যোগী হয়ে যান ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মই। সর্বভূতে তিনি ব্রহ্ম দেখেন. সর্বভূতকে দেখেন ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। অবিচল ঈশ্বরসম্পর্কান্বিত হবার ফলে যোগী সবার মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সব কিছুকে দেখেন—এইই সদর্থক অদ্বৈত; মায়া তাঁর সৎ দৃষ্টিতে মা, ব্রহ্মময়ী। তাই জগতের সঙ্গে সে যোগী সম্পর্ক রাখেন, জগৎ সত্য তাঁর কাছে। অপরের দুঃখ তাঁর দুঃখ, অপরের সুখ তাঁর সুখ। ব্যক্তি তখন বিশ্বপুরুষ হয়ে যান। পতঞ্জলির যোগের ফলশ্রুতি ব্যক্তির আত্যন্তিক বিনাশ; কৃষ্ণের যোগের ফলশ্রুতি ব্যক্তির অনন্ত আত্মপ্রসারণ, জীবের ব্রহ্মভবন। পতঞ্জলির যোগভিত্তি: সব অশিব তাই সবার নিঃশেষ অবলোপ করো। কৃষ্ণযোগের ভিত্তি: সব শিব জেনে পরম শিব হও।

পতঞ্জলি প্রাণায়ামের ওপর অতিশয় গুরুত্ব দিয়েছেন; কৃষ্ণ কর্মযোগ, বুদ্ধিযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—ইত্যাদি কোথাও প্রাণায়ামের প্রয়োজনের কথা বলেননি। বরং কর্মের কৌশলকেই যোগ বলেছেন। কর্মের কৌশল হল ফলাকাঙ্খারহিত হয়ে, ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ করে, কর্তৃত্ববোধহীনভাবে কর্ম করা। ঈশ্বরযুক্ত যোগীর নিজের কোনো স্বার্থ থাকে না। সব তখন ঈশ্বরময়, কর্মও ঈশ্বরময়। এ যোগের যোগেশ্বর ঈশ্বর স্বয়ং—যাঁর লয় নেই; কেননা সকল কালেই তিনি সৎ; তাঁর চিত্তবৃত্তিনিরোধের কথা ওঠেনা কেননা তিনি চিৎস্বরূপ; দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের প্রয়োজনও তাঁর নেই, কেননা তিনি আনন্দস্বরূপ

গীতোক্ত যোগেরই সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, অভিনব প্রকাশ রামকৃষ্ণের যোগে। এমনকি সরল করে বলেছেন, তোরা আমার কথা ভাবলেই তোদের সব হয়ে যাবে। বলেছেন, শুধু তিনটি জিনিস মনে রাখবি তোরা; আমি কে, তোরা কে, আমার সঙ্গে তোদের সম্পর্ক কী। ঐ মনে রাখা, ঐ মনে করা—ঐই স্মরণ-মনন। আর ঐ সম্পর্কটুকুই যোগ। ঐ স্মরণ-মনন-সম্পর্ক স্থাপনে, সম্পর্কভাবনায় চিত্তবৃত্তিনিরোধের কথা নেই, মনের লয়ের কথা ওঠে না। সমাধিতে মনের নাশ, না, মনের নাশে সমাধি? প্রশ্নটি জটিল বটে, কিন্তু ঈশ্বরে মন রাখাই যোগ, ঈশ্বরে মন স্থির হলেই সমাধি—এভাবে দেখলে প্রশ্নটি জটিল থাকে না।

রামকৃষ্ণের তপস্যা বিনাশের তপস্যা নয়, সৃষ্টির তপস্যা। সৃষ্টির মূলেই

বিনাশ-অবস্থা, এরকম উপলব্ধি বেদের কোনো কোনো ঋষির অবশ্য ছিল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলেন :

অসতঃ সদ্ যে ততক্ষুঃ ঋষয়ঃ সপ্ত অত্রিশ্চ যৎ (১।১১।৪)

অর্থ—অত্রি প্রমুখ সাত জন ঋষি অসৎ থেকে সৎ হতে দেখেছেন।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত। (৮।৭)

এ দৃশ্যমান জগৎ অসৎ ছিল। তা থেকে সৎ জাত হল।

ছান্দোগ্য উপনিষদ ঐ মতেরই উল্লেখ করেছেন :

তদ্ধৈক আহুরসদেবদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্,
তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত। (৬।২।১)

অর্থ—কেউ কেউ বলেন যে জগৎ জাত হবার আগে এক অদ্বিতীয় অসৎই ছিল। সেই অসৎ থেকেই সৎ উৎপন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতি ঋষি বলেন যে আদিতে অসৎ ছিল, তা থেকেই এসেছে সৎ :

অসতঃ সদজায়ত

অসৎ অর্থে না-থাকা। ঐই বিনাশ। কিন্তু একান্ত বিনাশকে ঋষি মানতে পারেননি। ঋষিদৃষ্টি ঐ বিনাশেই সৎ বা অস্তিত্বের স্পন্দন দেখেছে। যথা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে :

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ। ন দ্যৌরাসীৎ। ন পৃথিবী। নান্তরিক্ষম্। তদসদেব সন্মনোঽকুরু স্যামিতি। তদতপ্যত। তস্মাত্তপনাদ্ধূমোঽজায়ত। তদ্ভূয়োঽতপ্যত। তস্মাত্তপনাদগ্নিরজায়ত। (২।২।৯।১)

অর্থ—আগে এসব কিছুই ছিল না। আকাশ ছিল না। পৃথিবী ছিল না। অন্তরিক্ষ ছিল না। অসৎই ছিল। সে অসৎ মনে করল, আমি বহু হব। তাই সে তপস্যা করল। সে তপস্যা থেকে অগ্নি উৎপন্ন হল।

যে অসৎ বহু হতে চায় ও তপস্যা করে সে কি একান্তই অসৎ? না সে পরম সতেরই একটি বেশ মাত্র?

অথর্ববেদ রহস্যটি ভেঙে দিয়েছেন। বলেছেন :

অসতি সৎ প্রতিষ্ঠিতং সতি ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্।
ভূতং হ ভব্য আহিতং ভব্যং ভূতে প্রতিষ্ঠিতম্॥
তবেদ বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি। (১৭।১।২।৯)

অর্থ—অসতে সৎ প্রতিষ্ঠিত ; সতে ভূত প্রতিষ্ঠিত ; ভূত ভব্যে রয়েছে ও ভব্য ভূতে রয়েছে। হে বিষ্ণু! এ সব তোমারই অনন্ত বীর্যসম্ভব।

ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি সৃতত্ত্ব বিশদভাবেই আলোচনা করেছেন (১০।১২৯)। তিনি বলেন যে সৃষ্টিতত্ত্ব অতি গূঢ় রহস্য, তা ভেদ করা কঠিন এবং ভেদ করলেও সে রহস্য প্রকাশের যথাযথ ভাষা নেই।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত অজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ
কো বেদ যত আবভূব ॥

অর্থ—এ বিচিত্র সৃষ্টি কী দিয়ে তৈরী হল? কে তৈরী করল? কে তা ঠিক ঠিক জানে? কে তা ঠিকভাবে বলতে পারে? দেবতাগণও তো সৃষ্ট। তাই তাঁরাই বা কিভাবে জানবেন?

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।

অর্থ—যা থেকে এই সৃষ্টি হয়েছে, তা-ই কি একে ধারণ করে আছে? নাকি করেনি? (অর্থাৎ আদপেই সৃষ্টি হয়েছে কি হয়নি?) এই সৃষ্টির অধ্যক্ষ পরমব্যোমে আছেন, তিনি এসব জানেন। কিংবা তিনিও জানেন না।

মানুষ জানেনা, দেবতারা জানেন না, সৃষ্টির অধ্যক্ষ হিরণ্যগর্ভও জানেন না; এ দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টিরহস্য তবু একান্ত অজানাও নয়। পর পর কয়েকটি ঋকে পরমেষ্ঠী ঋষি সে রহস্যের যবনিকা ঈষৎ উত্তোলন করে দেখিয়ে আমাদের বলছেন:

দেশকাল নেই, আলো-আঁধার নেই, মৃত্যু-অমৃত নেই, সৎ-অসৎ নেই, লোকসমূহ নেই, বস্তু নেই, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্রা নেই। সৃষ্টির সে প্রাক-মুহূর্তে আছে গহন গম্ভীর অপ্রকেত সলিল (অপ্রকেত > অপ্রজ্ঞাত, বিশেষভাবে অজ্ঞাত)—তমঃ-আচ্ছাদিত তা। আভু বা বিভু বা ব্রহ্ম আছেন তুচ্ছের দ্বারা আবৃত (তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং)। বায়ু নেই, কিন্তু সে ব্রহ্ম স্বমহিমাবলে বায়ু বিনাই শ্বাসোচ্ছাস করছেন। সে স্বপ্রকাশ চৈতন্য এ সৃষ্টির অন্তরালে আছেন বিতত। তাঁতে দেখা দিল কাম, কেননা কামের উৎস মনোবীজ বা রেতঃ তাঁতেই ছিল। কবি মনীষীরা হৃদয়ে উপলব্ধি করে নিরূপণ করেছেন যে ঐ মনোবীজ ও কামই অসতের মধ্যে সতের প্রথম উদয়-হেতু:

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি

মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্

হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।

এই যে নেই নেই, আবার আছে,—এমন বলার ধরণ কেন নিলেন ঋষি? কারণ বিনাশ তিনি মানেননি, সৃষ্টির আগে যদি প্রলয়াবস্থাও থাকে তবু তা বিনাশ নয়। আসলে দেশকালহীন, সৃষ্টিক্রিয়াহীন একটা অবস্থা তিনি বোঝাতে চাইছেন; আমাদের দ্বৈতবোধের ভাষায় বোঝাতে চাইছেন তাই বলতে হচ্ছে যে আলো নেই, তাই আঁধার নেই, মৃত্যু নেই তাই অমৃতও নেই, অর্থাৎ ভেদবোধ নেই। ভেদ নেই অর্থাৎ অভেদ আছে, অদ্বৈত আছে; সে অদ্বৈত জীবন্ত কেননা বায়ু ছাড়াই তিনি শ্বাস নিচ্ছেন। বায়ু ছাড়া বস্তু উপাদান ছাড়া তিনি শ্বাস নেন বা জীবিত থাকেন কিভাবে? স্বধয়া, অর্থাৎ স্বমহিমায়। এই অদ্বৈতের মধ্যেও জেগে ওঠে কাম বা সৃষ্টিবাসনা, যার আদিরূপ মনোবীজ। অপরাপর শ্রুতির মতেও সে অদ্বৈতপুরুষ অকাময়ত—বহু হতে কামনা করলেন এবং তপোহতপ্যত—তপস্যা করলেন। এই সৃষ্টি তাঁর তপস্যা।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বেদে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষির বর্ণনাই শ্রেষ্ঠ ও গভীরতম—আর কোনো বৈদিক ঋষি তাকে অতিক্রম করতে পারেননি। তবু তিনি নিজেই তাঁর বর্ণনায় তৃপ্ত নন, কেননা তাঁর সম্বল মানবিক ভাষা, যা দ্বৈতক্ষেত্রের ভাষা, তা দিয়ে অদ্বৈতের বর্ণনা অসম্ভব। মন ও বাক্য সৃষ্টির পর জাত হয়েছে, তা দিয়ে সৃষ্টির পূর্বাবস্থাকে প্রকাশ করা যায় না। অথচ মানুষ আমরা অসহায়, মন ও বাক্যই তো আমাদের প্রকাশ-মাধ্যম! ভাষা ত্রুটিযুক্ত, বিশেষত বাকমনাতীতের বর্ণনায় তা পদে পদে প্রতিহত ও পরাস্ত। দেশ-কালাতীত, অনির্বাচ্য অদ্বৈতকে দেশকালে উদ্ভূত ও ব্যবহৃত ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করতে গেলে বর্ণনা কখনো সম্পূর্ণ ও যথাযথ হবে না, ত্রুটিযুক্ত হবেই। সহৃদয় ও বিচারশীল ব্যক্তির কর্তব্য এটুকু বুঝেই ঋষিবাক্য অনুধাবন করা।

পরমাদ্বৈত স্ব-ইচ্ছায় ও তপঃপ্রভাবে যখন বহু হতে লাগলেন সর্ব বর্ণনাই সেই অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছায়, তার পারে যায় না। তাই গূঢ় অপ্রকেত সলিল, তমঃ-আচ্ছন্ন ও তুচ্ছের দ্বারা আভু বা বিভু আবৃত বলা হয়েছে। পরম বস্তু বর্ণনাতীত, কেননা ইন্দ্রিয়াতীত, তাই অসৎ—তাঁর থাকা-না-থাকা ইন্দ্রিয় মন ও বাক্যের পক্ষে সমান কথা। তবু তিনি আছেনই, স্বমহিমায় বিরাজিত

স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্যস্বরূপের মন ছিল একথা বলায় দোষ হয় না —শতপথ ব্রাহ্মণ (১০।৫।৩।১-২)-মাধ্য) বলেন, অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না কিন্তু মন ছিল একথা বলায় প্রত্যবায় নেই—তন্মন এবাস। ঐ অদ্বৈতই রেতোধা— জগৎবীজ ধারণ করেন, তাই তাঁর কাম জেগে ওঠে। তাই স্বধা, অধোদিকে জগদভিমুখী; আবার বিপরীতে প্রযতি—স্বরূপাভিমুখী। জীবচৈতন্যও ঐ ক্রমেই কখনো প্রবৃত্তিমার্গে বিষয়মুখী, কখনো নিবৃত্তিমার্গে আত্মস্বরূপমুখী। তিনি স্বপ্রকাশ জগতের অন্তরালে বিতত থাকেন এ কথার তাৎপর্য হল বিষয়-মুখী মানুষ বিষয়কেই দেখে, তাঁকে দেখে না—তাই জগৎবস্তু থাকে সামনে, আর তার আড়ালে থাকেন পরম অদ্বৈতবস্তু।

এই আড়ালে থাকার অবস্থাই অসৎ (আমাদের চোখের সামনে তাঁর না-থাকা)। এই অবস্থাকেই বিনাশ বলে ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে বিনাশ হয় না তাঁর :

ভূতং ভবিষ্যৎ প্রস্তৌমি মহদ্‌ব্রহ্মৈকমক্ষরম্‌

—শতপথব্রাহ্মণ (মাধ্য)—১০।৪।১৯

অর্থ—স্তুতি করি সেই একের, অক্ষরের, ভূত ও ভবিষ্যৎ ব্রহ্মের। ব্রহ্ম ভূত ও ভবিষ্যৎ—এ কথাটির তাৎপর্য এই যে তিনি নিত্য, সনাতন। তিনি অক্ষর, অর্থাৎ তাঁর ক্ষয় হয় না, ক্ষরণ হয় না, তিনি সদাই একরূপ। তিনিই এক— দ্বিতীয় নেই।

প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষি প্রশ্নটি এতদূর তুলেছেন যে সৃষ্টি সত্যই হয়েছে, না হয়নি তাও সুনিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি কি? কেননা আমরা, দেবতারা, এমনকি সৃষ্টির অধ্যক্ষ হিরণ্যগর্ভও সৃষ্টিজাত, সৃষ্টির পর জন্মেছেন; আমরা সবাই সৃষ্টির ফসল, হাবুডুবু খাচ্ছি সৃষ্টিসমুদ্রে—তাই আমাদের কারও দৃষ্টি ও জ্ঞান নিরপেক্ষ নয়, সৃষ্টিদ্বারা আমাদের দৃষ্টি, এমনকি সত্তাও আচ্ছন্ন, রঞ্জিত, আমরা সৃষ্টির অংশীদার; তাই আমাদের ভাষণ তো শেষ কথা হতে পারে না।

অগস্ত্য ঋষি তাই বলেছিলেন, কে প্রথম জাত, কে পরে জাত, কেনই বা এ সৃষ্টি কে তা জানে? শুধু দেখছি চাকার মতো ঘুরছে এ সৃষ্টি :

কতরা পূর্বা কতরা পরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ।

বিশ্বং স্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম বি বর্ততে অহনী চক্রিয়েব।

ঋগ্বেদ ১।১৮৫।১

অহর্নিশ চাকার মতো ঘুরছে, তার অর্থ এর যেন আরম্ভ নেই, শেষ নেই—এ সৃষ্টি নিত্য চলমান। নারী ঋষি বাক বলেছিলেন, বাতাস যেমন স্বতঃই বয়, বয়ে যাওয়াই তার স্বভাব, তেমনি সৃজনশীলতা ব্রহ্মের স্বভাব : ঐ তাঁর মহিমা।

অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব।

ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৮

অর্থ—আমি বাতাসের মতো বয়ে যেতে যেতে সৃষ্টি করি সব ভুবন ; আমি ভূলোকের পারে, দ্যুলোকেরও পারে—আমারই মহিমায় এসব সম্ভূত হয়েছে।

আচার্য গৌড়পাদ বলেছিলেন আপ্তকাম ব্রহ্মের কামনা থাকবে কেন? সৃজন তাঁর স্বভাব, সৃজনই তাঁর মহিমা :

দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়ং আপ্তকামস্য কা স্পৃহা। (মাণ্ডুক্যকারিকা ১)

দীর্ঘতমা ঋষি জানতে চেয়েছেন কোথা হতে আসে দেবমন, যে মনে সৃষ্টিবাসনা জাগে?

কবীয়মানঃ ক ইহ প্রবোচৎ দেবং মনঃ কুতো অধি প্রজাতম্।

ঋক ১।১৬৪।১৮

অর্থ—কোথা হতে উৎপন্ন হল এ দেব মন, কোন ঋষি-কবি তা বলতে পেরেছেন? অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃজনেচ্ছার হেতু জানা যায় না—মনবুদ্ধির অতীত তা, তাই কোনো ঋষি সে হেতু নির্দেশ করতে পারেননি।

শুধু জানা যাচ্ছে যে ব্রহ্মের দেবমন ছিল—আর তিনি আপ্তকাম হওয়া সত্ত্বেও, কোনো অভাববোধ তাঁর না থাকা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টির ইচ্ছা ছিল, মনোবীজ ছিল, তা থেকেই জেগে উঠেছিল কাম। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ আভাস দিয়েছেন যে অসৎ থেকে সতে আসার প্রথম পদক্ষেপ মন—অসৎ মন সৃষ্টি করে নিলেন :

অসতোঽধি মনোঽসৃজত। মনঃ প্রজাপতিমসৃজত। প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তদ্বা ইদং মনস্যেব পরমং প্রতিষ্ঠিতম্। যদিদং কিঞ্চ। তদেতচ্ছ্বোবস্যসং নাম ব্রহ্ম।

অর্থ—অসৎ মন সৃষ্টি করল। মন প্রজাপতিকে সৃষ্টি করল। প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলেন। দৃশ্যমান এ জগৎ মনেই প্রতিষ্ঠিত। ঐ মনই শ্বোবস্যস ব্রহ্ম।

সায়ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে শ্ব শ্ব, দিনে দিনে বা উত্তরোত্তর বসীয়, যা বেড়ে চলে তাই-ই শ্বোবস্তুস। ব্রহ্মের দেবমন ক্রমেই বেড়ে চলে, প্রসারিত হয়। ঐ মনই প্রতি ক্ষণে একের পর এক ভুবন সৃষ্টি করে চলেছে। এই বৃংহণ বা বড় হওয়া তাঁর স্বভাব বলেই তাঁকে বলি ব্রহ্ম।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিশ্বসৃষ্টির আগে একটা বিনাশ বা মৃত্যুর অবস্থার কথা বলা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে আগে কিছুই ছিল না, ছিল শুধু মৃত্যু। অশনায়া মৃত্যু সব কিছুকে আবৃত করে রেখেছিল। অশনায়া অর্থাৎ ক্ষুধা। এই ক্ষুধাই ভাবল : 'আমি আত্মবান হই'—অর্থাৎ দেহযুক্ত হই। সে অর্চনা করে বিচরণ করল, তখন সেই মৃত্যু থেকে উৎপন্ন হল জল। এই জলই কি অপ্রকেত সলিল, কারণ সলিল ?

মৃত্যু থেকে দেশ সৃষ্টি হল। তারপর মৃত্যু তখন দ্বিতীয় দেহ কামনা করল। সেই দ্বিতীয় দেহ হল কাল। ক্রমে প্রাণ, বাক ইত্যাদিও সৃষ্টি হল। সৃষ্টির মূলে মৃত্যু—কিন্তু সে মৃত্যু বিনাশ নয়, অশনায়া অর্থাৎ ক্ষুধা। কোথা থেকে এল এই ক্ষুধা? সে প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই ঋষি জানালেন যে প্রাণের মৃত্যু নেই, সৃষ্টিরও বিনাশ নেই এমনকি ব্যক্তিরও মৃত্যু নেই—

> স বা এষা দেবতা দুর্নাম দূরং হ্যস্যা মৃত্যুর্দূরং হ অস্মানমৃত্যুর্ভবতি য এবং বেদ। ১।৩।৯

অর্থ—এই সেই দেবতা যাঁর নাম দূর—কারণ মৃত্যু থেকে তিনি দূরে। যিনি তা জানেন, মৃত্যু তাঁর কাছ থেকে দূর হয়।

সে দেবতা প্রাণকে, বাককে, এমনকি আমাদেরও মৃত্যুর অতীত করে দিয়েছেন। মৃত্যুর মৃত্যু হয়েছে। রয়েছে শুধু জীবন। ঋষি আমাদের প্রার্থনা-মন্ত্র শোনালেন : অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। ১।৩।২৮ অসৎ থেকে আমাকে সতে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও।

মৃত্যু থেকে যার আরম্ভ অমৃতে ও অমরত্বে তার পরিণাম। মৃত্যুর খোলস থেকে অমরত্ব যদি প্রকাশিত হয় তাহলে বুঝতে হবে যাকে মৃত্যু বলা হয়েছিল তা মৃত্যু নয়। সৎস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ নিত্য অদ্বৈতই ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। কেবল তাঁর ওপর পড়েছিল তমসার, মৃত্যুর, অসতের আবরণ বা বোধ। তাঁর একান্ত একাকীত্বই এই বোধের হেতু।

> সোঽবিভেৎ ১।৪।২

তিনি ভয় পেয়েছিলেন।

স বৈ নৈব রেমে···স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। ২।৪।৩

তিনি আনন্দ পেলেন না।···তিনি দ্বিতীয়কে ইচ্ছা করলেন। একান্ত একাকী থাকায় ভয় ও নিরানন্দ—এইই মৃত্যু। অশনায়া মৃত্যু তা—অর্থাৎ ক্ষুধারূপী মৃত্যু। সেই ক্ষুধাই কাম, মনোবীজ যার আদিরূপ। সৃষ্টির বীজই মনোবীজ, আর সৃষ্টির ইচ্ছাই কাম। কিন্তু সে ক্ষুধা বা কাম বশত যা সৃষ্টি হল তা সৎ, অবিনাশী, নিত্য।

ব্রহ্মপুরুষের স্বভাবই সৃজন—লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম—লোকসৃষ্টি তাঁর লীলা আর লীলাতেই আনন্দ। লীলা না থাকলে আনন্দের স্ফুরণ হয় না, তাই সচ্চিদানন্দও নিরানন্দ বোধ করেন। ঐ অবস্থাই তাঁর পক্ষে মৃত্যুতুল্য।

স্বয়ং ব্রহ্ম যখন ব্রহ্মসাধনা করেন, রামকৃষ্ণ যখন ঈশ্বরলাভের সাধনা করেন তখন তা সাধারণ মানুষের ঈশ্বরলাভের সাধনার সমপদবাচ্য তো হয় না। তখন সাধনার লক্ষ্য ও তাৎপর্য বদলে যায়। সেই লক্ষ্য ও তাৎপর্যটুকু বোঝার উদ্দেশ্যেই বেদের ঋষিদের উপলব্ধির আলোর সন্ধান করেছি।

রামকৃষ্ণের তপস্যা নতুন সৃষ্টির তপস্যা। নতুন নতুন পদার্থজগৎ সৃষ্টি নয়, নতুন নতুন প্রাণী সৃষ্টি নয়—এই মানব-বিশ্বের মধ্যে আর এক অভিনব ব্রহ্ম-বিশ্ব সৃষ্টি করতেই তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। মানবচৈতন্যকে অবলম্বন করেই আর এক নবীন চৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য, দিব্যচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য তিনি প্রকাশ, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর সাধনার মূল কথা।

সৃষ্টির ইতিহাস চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ ও অজেয় আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। বস্তু ও আত্মা, জীবন ও বুদ্ধি দেখতে পৃথক পৃথক—কিন্তু এক চৈতন্যেরই তারা ভিন্ন প্রকাশ-ভঙ্গী মাত্র, চৈতন্যেই ধৃত সব। মানুষে দেহ আর চৈতন্যের মধ্যে বইছে প্রাণের প্রবাহ, চর্যাপদের কবিদের ভাষায়, পউআ খাল, পদ্মা নদী; আমরা বলি প্রাণগঙ্গা। সে প্রবাহের ভাটা-অবস্থায় প্রখর হয়ে ওঠে দেহবোধ, যেন জেগে ওঠে বস্তু-আসক্তির চড়া—প্রাকৃত কামের পীড়া তখনই প্রবল। আবার প্রাণগঙ্গার উজান-অবস্থায় স্ফুট হতে থাকে ব্রহ্ম-আকূতি তথা ঈশ্বর-জিজ্ঞাসা; মন হয় নিবৃত্তিমুখী তথা চৈতন্য-অভিমুখী। তখন কামের রূপ ও স্বভাব পালটে যায়। তখন সে প্রেম। কোথায় তার শেষ? শেষ নেই। চৈতন্যের বিকাশের ইতি নেই।

এ বিশ্ব চৈতন্যের অভিযানেরই স্বাক্ষর। বস্তু চৈতন্যেরই একটি ব্যঞ্জনা,

একটি মূর্তি, প্রথম পদক্ষেপ। কেননা স্বয়ম্প্রকাশ স্বয়ম্ভর চৈতন্য পৃথিবী রচনা করে পৃথিবীর স্থূল ক্ষেত্রে জয়ী হতে চায়—তার আত্মপ্রকাশের ঔজ্জ্বল্য ও মহিমা তাতে বাড়ে। সর্ব বিরোধিতার জয়ে তার বিজয়ী রূপ প্রতিষ্ঠা পায়। চৈতন্য বস্তুকে সৃষ্টি করে নিয়েছে তার বিরোধী, প্রতিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বী করে; আবার তার আধার হিসাবেও। রূপ যেমন ভাবের বিরোধী, আবার তেমনি ভাবের আধারও। দেশকালও চৈতন্যের আধার, নিজেকে ব্যক্ত-পরিণামিত করার উদ্দেশ্যেই চৈতন্য সৃষ্টি করে নিয়েছে দেশকাল।

দেশকালে পদার্থের আধারে ফুটে উঠেছে প্রাণ। ফুটে উঠেছে বটে, কিন্তু নিরন্তর লড়াই করে পেয়েছে সে প্রতিষ্ঠার ভূমি। উপনিষদের ইঙ্গিত, প্রাণ অন্নাদ হয়ে অনবরত অন্ন পদার্থকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে। প্রাণ সৃষ্টি করে নেয় নতুন নতুন প্রজাতি,—উদ্ভিদ, জীবাণু, মাছ, পাখি ও পশু। প্রাণ যতক্ষণ পাশব-চেতনায় সীমাবদ্ধ ততক্ষণ তা প্রাকৃত ক্ষুধা, কাম, সুখ ও যন্ত্রণার অধীন। তখন তার আত্মচেতনা নেই—আছে শুধু বাঁচার ও ভোগের তাগিদ। তবু পৃথিবীর প্রাণ জীব দেহকে আশ্রয় করে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্ম-প্রসার করেছে: পদার্থের বুকে প্রাণের জয় ঘোষণা বৃক্ষ বীজাণু মাছ পাখি পশুই এনে দিয়েছে।

তারও পর মানুষ। কিভাবে মানুষ জগতে এসেছে, কবে এসেছে তার সঠিক হিসাব জানা নেই। নৃবিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন মাত্র। তবে একথা ঠিক যে পশুদেহকে অবলম্বন করে মনোচেতনা স্ফূর্ত হয়েছিল। পশু-দেহের পরিণামেই মানবদেহ—পাশব ক্ষুধা ও কাম, হিংসা ও আগ্রাসন মানুষের আছে, কিন্তু নতুন যা আছে তা তার মস্তিষ্কের সমৃদ্ধি, নাড়ীতন্ত্র ও স্নায়ুজালের জটিলতা ও অপূর্ব সংবেদনশীলতা। মনোচেতনা বাসা বাঁধার জন্যই দেহযন্ত্রের এসব পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছিল; এমনকি পশুদেহের অবয়ব-আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটিয়ে গড়ে উঠেছে মানবদেহ। নতুন চেতনা নবীন দেহ দাবী করে।

প্রাণের আধার দেহ নানা জাতীয়: উদ্ভিদের, এককোষী প্রাণীর, জটিল-কোষী প্রাণীর, মাছ, সাপ, পাখি, পশুর। পশুই বা কত প্রকারের। মানবদেহ কিন্তু একই প্রকার। পদার্থ থেকে মানুষ পর্যন্ত বিবর্তন যেন নৈরাজ্য (chaos) থেকে সংহতির (organisation) দিকে যাত্রা—চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ যত বাড়ে তত স্ফুট হয় ঋতছন্দ। সৃষ্টি একটা অসংযত শৃঙ্খলাহীন

বল্গাহারা ব্যাপার নয়—সংযমে, সংগঠনে, শৃঙ্খলা-বিন্যাসে তার ক্রম-অভিব্যক্তি।

কিন্তু মনোচেতনাও দেখি বিশৃঙ্খলায়, নৈরাজ্যে ছাওয়া : মনের সচেতন অংশ যদি বা কিছুটা সুশৃঙ্খল ও যুক্তি-অনুসারী, অবচেতন অংশ অযৌক্তিক, তমসাচ্ছন্ন, অসংযত। মনোচেতনায়ও চৈতন্যের প্রকাশ সীমিত, তার কোনো জ্ঞানই সুনিশ্চিত নয়; বুদ্ধি যতটা উজ্জ্বল তার চেয়ে বেশি অনুজ্জ্বল, দিশেহারা; মনের কল্পনা সামর্থ্য ও সৃজনক্ষমতাও অপরিসীম নয়। মানুষ যেন অর্ধ-সমাপ্ত; তার দেহ ভঙ্গুর, প্রাণ বাসনা-অবসাদ পীড়িত ও মরণশীল এবং মন আলো-আঁধারে গড়া। চৈতন্যের পূর্ণ মুক্তি হয়নি মানুষে, কাটেনি সংকোচের বাধা। তাই পরম সত্য মানুষের বাকমনাতীত।

চৈতন্যের অভিযান থেমে যায়নি মানুষে এসে, তা উচ্চতর পরিণাম অপেক্ষমান। সে পরিণামের আভাস-ইঙ্গিত বেদে ও পৃথিবীর ধর্মশাস্ত্রগুলিতে আছে; মরমীয়া যোগী সন্ত ও অবতারদের জীবন ও বাণীতেও ফুটে উঠেছে। রামকৃষ্ণের সাধনা জগতের বুকে নবতর চৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ, প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ঘটানোর সাধনা। বিদেহ ব্রহ্মচৈতন্যকে সদেহ করা, মানুষকে ব্রহ্ম করে তোলার উদ্দেশ্যেই রামকৃষ্ণরূপ স্বয়ং পরব্রহ্মের এই মর্ত্যভূমিতে অবতরণ।

শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, আদিকালেই মানুষের বোধিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল মানুষের পরম লক্ষ্য : ব্রহ্ম হওয়া, সত্য-অমৃত-আনন্দী হওয়া। মুক্ত জ্যোতিষ্মান অমর ঈশ্বর হওয়াই মানুষের আদি ও চূড়ান্ত প্রজ্ঞাবাণী। প্রকৃতিও ধীর কিন্তু সুনিশ্চিত ছন্দে কাজ করে চলেছে একই লক্ষ্যের পরিপূরণে; সে লক্ষ্য হল manifestation of God in Matter (The Life Divine, ১ম অধ্যায়)। প্রকৃতি স্বরূপে পরমা প্রকৃতি, ব্রহ্মময়ী। তাই জীবনের ভিতরে ও বাইরে ব্রহ্মকে প্রকাশ করতেই চান তিনি।

মানুষের প্রথম কাজ ছিল জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তা তো সমাধা হয়েছে বহু হাজার বছর আগেই। এখন ধরিত্রীর বুকে সেই অধীশ্বর। এখন নিজেকে অতিক্রম যেতে হবে তাকে, নতুন উত্তরণ চাই তার। চৈতন্যের পূর্ণ আবরণোন্মোচন করার দায় নিতে হবে তাকেই, অর্ধ-সমাপ্ত তার সত্তাকে করে তুলতে হবে পূর্ণায়ত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে সে, এবার সেটুকু বজায় রেখেই তাকে হয়ে উঠতে হবে বিশ্বপুরুষ। এতদিন মানুষ অবিদ্যা-আচ্ছন্ন

ছিল, এবার সে হবে মুক্ত বিদ্বান; প্রাকৃত মানুষ হবে দিব্য মানুষ, মৃত্যু-গ্রাসিতরাই হবে অমৃতের সন্তান। সচ্চিদানন্দই বর্তমান আমাদের মধ্যে—ছিলেন চিরকাল কুটস্থ চৈতন্য রূপে,—এখন তিনি প্রকাশমান হতে চান আমাদের জীবনে; তাঁরই সংকল্পে ও প্রেরণায় এই মানবদেহে অবস্থিত থেকেই আমাদের অতিক্রম করে যেতে হবে প্রাকৃত মানব স্বভাব, হতে হবে স্বরূপে আমরা যা তা-ই। ব্রহ্মকে জানা ও পাওয়া, ব্রহ্মে বাস করা ও সমগ্র সত্তায়, চেতনায়, শক্তিতে, আনন্দে তাঁকে প্রকাশ করা—বেদের প্রাচীন ঋষিরা বিদ্যা ও জ্ঞান বলতে এইই বুঝতেন—that was the Immortality which they set before man as his divine culmination. (তদেব, ২য় খণ্ড, ২য় অংশ, ১৭ অধ্যায়)।

মানুষ, বিশ্ব ও ভগবান পৃথক পৃথক বলে প্রতীত হয় মনের দ্বারে; কিন্তু জ্ঞানোজ্জ্বল বুদ্ধিতে পৃথকত্ব মুখোস বলে ধরা পড়ে; আসলে এই ত্রিপুটি নিয়ে সত্য এক ও অবিভাজ্য।

ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই এই একত্বের অনুভব ও প্রকাশ ঘটাতে পারলেই মানুষ হয় বিশ্বজনীন। হয় ব্রহ্ম—যিনি সবচেয়ে বড় ও আমাদের বড় করেন বলেই ব্রহ্ম নামে অভিহিত। প্রকৃতি ও মানুষ ব্রহ্মে আছে একথা যেমন সত্য, ব্রহ্মও প্রকৃতি ও মানুষে আছেন একথাও তেমনই সত্য। সে-থাকাটা আছে ঢাকা হয়ে, কিন্তু চিরকালের জন্য নয়। ঢাকা খুলে দেওয়াই মানুষের ভবিতব্য। জীবে শিব প্রকাশিত হলে, শিবত্ব জীবের আন্তর ও বহিরঙ্গ জীবনে উদ্ভাসিত হলে জীবের জীবনধারা সার্থক; লক্ষ কোটি বছরের জীবনসরণি বেয়ে অহর্নিশ চলা তার সাফল্যের কিনারায় তখন আসে। অনন্ত কোটি বছর ধরে সে চলে এসেছে কারণ সে নিত্যজীব। কোনো মৃত্যুই তার অবসান ঘটাতে পারেনি। মৃত্যু আসে শুধু জীবের যাত্রাপথে চলার জড়িমা নাশ করে দিতে। মৃত্যু তাই জীবনের সখা, শত্রু নয়।

যে প্রতিশ্রুতি বুকে নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে এসেছিল, বংশ বিস্তার ও মনোচেতনার উৎকর্ষে জগতে মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও সে প্রতিশ্রুতি তো এখনো পূর্ণ হয়নি। প্রতিশ্রুতিটি হল সত্যের ত্রিপুটিকে—বিশ্ব, মানুষ ও ভগবান—অঙ্গীকার করেই ত্রিপুটির স্বরূপসত্যকে উজ্জ্বল করে তোলা; বৈচিত্র্যকে রক্ষা করেই তাদের এক ব্রহ্মস্বভাবকে স্ফুট করা।

পৃথিবীতে ভাগবত জীবনের ঐ হবে ভিত্তি। মানুষের দেহ, প্রাণ ও মন

বরবাদ হয়ে যাবে না, থাকবে সবই, কিন্তু ব্রহ্মদ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে উঠবে এ সব। ব্রহ্মদেহ, ব্রহ্মপ্রাণ, ব্রহ্মমন নিয়ে উঠে দাঁড়াবে যে মানুষ সে তো আমাদের এই চেনা মানুষটি নয়ঃ চেনা মানুষটিই হয়ে উঠবে এক অভাবিত ও অচেনা মানুষ। মানুষ বলে মনে হলেও সে হয়ে উঠবে চিন্ময় মানুষ—কিন্তু বিদেহ নয়, দেহধারী। মানুষ যেমন পশুর মতোই দেহধারী, ক্ষুধা কাম ব্যাধি মৃত্যুর অধীন, তবু সে পশু নয়, মনোচেতনাময় ও সহৃদয় এক নতুন প্রজাতি; ব্রাহ্মী চেতনা সম্পন্ন ও ব্রাহ্মী হৃদয়বান নব বিকশিত ও বিবর্তিত সত্তাও মানুষেরই মতো হাবভাব ধারণ করেও ঠিক তো মানুষ থাকবে না—সেও হবে এক নতুন প্রজাতি। দিব্য মানুষ হবে সে।

এই মহতী পরিণামের দিকেই প্রথমাবধি সৃষ্টির অন্তরালে বসে পরমাপ্রকৃতি কাজ করে চলেছেন। পুরুষকে প্রসন্ন করতেই তাঁর যত কাজ; সেই পুরুষ পরব্রহ্ম তাঁকে বস্তুতে প্রকাশ করে ধরাই প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়—সেই হবে পুরুষ-প্রকৃতির সপ্রেম আলিঙ্গন, যুগনদ্ধ রূপ। প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম গঠনে পরমাণুরও ভিতরে ইলেকট্রনে প্রোটনে ব্রহ্ম আছেনঃ ব্রহ্ম-ব্রহ্মময়ী লীলা সেখানেও। কিন্তু দুর্ভেদ্য নিশ্চেতনায় আবৃত সে লীলা। প্রকৃতির বুকে উজ্জ্বল চেতনালোকে ব্রহ্মলীলা মূর্ত করতে চান ব্রহ্মময়ী—তাই ধাপে ধাপে এখানেই, এই মর্ত্যধূলায় স্তর পরম্পরায় চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। লক্ষ্য তাঁর অনির্বচনীয় ব্রহ্মকে এখানেই স্থূলে রূপময় করা। রূপে-অরূপে ভেদ ঘোচানো।

সব মানুষই দেব-মানুষ হয়ে উঠবে এমন নয়। অধিকাংশ মানুষ থাকবে যেমনটি আছে তেমনটি, কেননা তারা তাই থাকতে চায়। কিন্তু যারা তৃপ্ত নয় স্বল্পে, যারা অন্তরে শুনেছে বৃহতের আহ্বান, হতে চায় বৃহৎ—তাদের বর্তমান অহং-সত্তাকে স্ফীত করে তোলাকেই বৃহৎ হওয়া বলছিনা—প্রজ্ঞায় ও হৃদয়বত্তায়, চরিত্রদীপ্তিতে ও প্রেমে যারা মহৎ হবার অভিলাষী রামকৃষ্ণের সাধনাশক্তি, সাধনফল ও সাধনার দৃষ্টান্ত তাদের প্রেরণা দেবে, শক্তি জোগাবে, সম্ভব করে তুলবে দিব্য মানবতায় উত্তরণে। সব মানুষ সে তপস্যাকে গ্রহণ করুক বা না করুক কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও লক্ষ্য রূপে এই ব্রহ্মভবনকেই স্বীকার করে নিতে হবে তাদেরঃ আর সব আদর্শ তাদের কাছে লঘুতর, কম মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়ে যাওয়া চাই, কেননা জগতে ব্রহ্মচৈতন্যের অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য তা-ই দাবী করে।

রামকৃষ্ণ ঈশ্বরলাভের—পরাচৈতন্য লাভের সাধনা যতটা করেছেন—বস্তুত সে সাধনার প্রয়োজন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ছিলনা—তার চেয়ে সত্তার গভীরে গিয়ে সত্তার প্রতিটি অংশকে দেবায়ত করে তুলেছেন, প্রতিটি তন্তু ও তন্ত্রীকে বেঁধেছেন ব্রহ্মচৈতন্যের মীড়ে ও গমকে ; অবচেতনেরও তলে দেহের ও প্রাণের কোষে কোষে ব্রহ্মজ্যোতিকে প্রসারিত করেছেন ; তাঁর সত্তায় অনালোকিত অংশ অবশিষ্ট ছিল না, সব অংশই নিঃশেষে হয়ে উঠেছে জ্যোতির্ময়। ঊর্ধচেতনায় তিনি বাস করতেন বাল্য থেকেই, সেই ছিল তাঁর স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সাধনায় স্বদেহের প্রতিটি মৃত্তিকা-বিন্দুকে তিনি করে তুলেছেন ব্রহ্মচেতনাঘন—অদিব্যের অবশেষ নেই তাঁতে। পরব্রহ্ম মাটির জগতে এসেছিলেন মৃত্তিকাকেই শোধিত সংস্কৃত রূপান্তরিত করতে—তার দিব্যস্বরূপ তাকে ফিরিয়ে দিতে। তাই তাঁর সাধনা অত ব্যাপ্ত ও জটিল, অত বিচিত্র পথগামী ও বিচিত্র সিদ্ধির ঐশ্বর্যে ফলন্ত। এও তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে নয় ; মর্ত্য মানবকে পথ দেখাতে ও তার হয়ে তারই বিজয় তাকে এনে দিতে। সে বিজয়ের ফল এখনো জগতের বুকে স্ফুট হয়নি অবশ্য—তবে স্ফুট হবে তা নিশ্চিত।

রামকৃষ্ণ যা আমাদের প্রথম করণীয় জানিয়েছেন তা হল আত্মার উপলব্ধি ; দেহ প্রাণ ও মনের অন্তরালে, তাদের থেকে স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভর যে আত্মা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান তার উপলব্ধি। ঝুনো নারকেলের শাঁস যেমন তার খোলা থেকে আলাদা হয়ে যায় আত্মাও তেমনি ব্যক্তির মধ্যে অন্ন-প্রাণ-মনোময় পুরুষ থেকে আলাদা বলে স্পষ্ট বোধ হবে—এই হল দিব্য জীবনপথে যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। আমরা এতকাল জীবনধারণ করেছি দেহের অস্তিত্ব বজায় রাখতে, খাদ্য পানীয় জোগাতে, স্বস্তি ও আরামের ব্যবস্থা করতে। আরও চেয়েছি প্রাণের বাসনা মেটাতে, কাম হিংসা চরিতার্থ করতে, যশ প্রতিষ্ঠা আনতে—প্রাণ যাতে তৃপ্ত হয় তাই করতে। আরও এগিয়ে আমরা চেয়েছি মনের অভিলাষ পূরণ করতে ; জানতে, শুনতে, বিদ্বান হতে, বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি বা সম্ভোগ করতে ইত্যাদি। আমরা যে যেমন মানুষ তেমনই একটা পথ ধরে এগিয়েছি ; বেছে নিয়েছি কর্ম ও আত্মপ্রকাশের এক বা একাধিক ক্ষেত্র। কিন্তু এ সবই প্রাকৃত মানবজীবনের পরিসীমার মধ্যে বাস করা ও চলা। একে ছাপিয়ে ভাগবত জীবনে প্রবেশ করতে হলে আত্মাই হবে বন্ধু, উপদেষ্টা ও চালক।

আত্মার পরিচালনায় জীবন গড়ে তুলতে হবে, আত্মার আদেশই পালন করতে হবে।

ঈশ্বরকে কে জানে? মানুষ ঈশ্বরকে জানে তার বুদ্ধি দিয়ে নয়, প্রাণবাসনা দিয়ে নয়, দৈহিক ক্ষমতা দিয়েও নয়—মানুষের মধ্যে যে আত্মা তিনিই ঈশ্বরকে অনুভব করেন, জানেন। আত্মা আছেন আমাদের মধ্যে গুহাহিত হয়ে, আবরণে ঢাকা। তিনিই পুরুষ, দেহ-প্রাণ-মন প্রকৃতি মাত্র। এতদিন আমাদের সব কাজ এই প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয়ে এসেছে। যুগ যুগান্ত জন্ম জন্মান্তর ব্যাপী পুরুষ শুধু থেকেছেন সাক্ষী হয়ে। রামকৃষ্ণ তাঁর সাধনায় মানুষের আত্মাকে সামনে এনে দিয়েছেন; সেই পুরুষই এখন প্রকৃতির চালক হয়ে উঠবে। রামকৃষ্ণের সাধনা পুরুষকে প্রকাশিত করা ও প্রাধান্য দেবার সাধনা। প্রকৃতি পুরুষের সেবায় বরাবরই নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু অবিদ্যার রাজত্বের দুর্যোগে প্রকৃতি পুরুষ তথা আত্মাকে আবৃত-আচ্ছন্ন করে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তাই পুরুষের বন্ধনমোচন ও প্রকাশ্য প্রভুত্বলাভে প্রকৃতির পরাজয় ঘটে না, বরং তিনি হয়ে ওঠেন পুরুষের অনুগামিনী সেবিকা। মানবজীবনকে ভাগবত জীবনে উত্তরণ ঘটাবার এই হল মূল রহস্য।

প্রকৃতিও তাই চান, অমন অবস্থা হলেই তিনি সুখী হন। কত জন্ম তিনি আমাদের চালনা করে এসেছেন কিন্তু আমাদের তিনি অবিদ্যার সন্তান করেই রেখেছেন; জ্ঞানের আলোয় উত্তীর্ণ করে দিতে পারেননি। ফলে আমরাও বদ্ধ, প্রকৃতিও। প্রকৃতি কখনো পুরুষের শত্রু নন, বিরুদ্ধবাদী নন। তিনি পুরুষকে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে চলেন। কিন্তু পুরুষ যতক্ষণ পুরোভাগে না আসেন, আত্মাময় না করে তোলেন মানুষকে, জীবনপথের না হন সারথি, ততদিন প্রকৃতি অবিদ্যা-অজ্ঞানের পাশ থেকে মুক্তি দিতে পারেন না মানুষকে, মুক্তি পাননা নিজেও এবং পুরুষের সেবাও তাঁর যেন জ্ঞানোজ্জ্বল ও সার্থক হয়ে ওঠে না। স্বরূপে প্রকৃতি ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মের আপন শক্তি। ব্রহ্মকে সেবা করতে তাঁর আবির্ভাব। যতক্ষণ তিনি সাধারণ প্রাকৃত প্রকৃতি ততক্ষণ তাঁর নিজেরও ব্রহ্মময়িত্ব কুণ্ঠিত, লুক্কায়িত—ঐ তাঁর বন্ধন দশা। ব্রহ্মস্পর্শে, ব্রহ্মইচ্ছায়, ব্রহ্মের আশীর্বাদে তিনিও ফিরে পান তাঁর আপন স্বরূপ। তখন মানুষেরও ঘটে বন্ধনমুক্তি, সেও প্রতিষ্ঠিত হয় তার স্বরূপে।

মুক্ত মানুষের, দিব্য মানুষের জীবন হবে অখণ্ড; তাতে বাহির ও ভিতরের বিরোধ-সংঘাত নেই, আছে পরিপূরণ, ঐক্য। আমরা অন্তরে ঈশ্বরোপলব্ধি

করলেও আমাদের বাইরের জীবন চলে গতানুগতিক ভাবে, অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে, অন্ধকারের দাপট মেনে। এ বিরোধ দূর হবে। রামকৃষ্ণের জীবনে এ বিরোধ ছিল না। তাঁর অন্তর ও বাহির সমধর্মী ছিল, পরস্পরের পরিপূরক ছিল,—বহির্জীবন অন্তর্জীবনেরই প্রতিবিম্বন ছিল অথবা তদনুসারী ছিল। আত্মময় পুরুষ তিনি—তাঁর দেহ ও আত্মা এক সুরে ও ছন্দে বাঁধা। তাঁর তপস্যার এও এক ফলশ্রুতি, যা শুধু তাঁরই জন্য উপচিত হয়নি, আমাদের সকলের জন্য হয়েছে সঞ্চিত।

মুক্ত মানুষের জীবনে ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীতে থাকবে না কোনো বিরোধ; একই সঙ্গে ধৃত ও সমন্বিত হবে এ তিন তাঁর জীবনে। সে ব্যক্তিই থাকবে, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হবে তার জীবন। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব বিশ্বজনীনও হবে--বিশ্বের সঙ্গে ছেদযুক্ত অহংশাসিত ব্যক্তিত্ব তা নয়; বিশ্ব ও ব্যক্তিত্বে কোনো বিরোধ নেই মুক্ত মানুষের জীবনে। তেমনই বিরোধ নেই বিশ্বাতীত ব্রহ্মের সঙ্গে। কারণ ব্যক্তিজীবন সুগঠিত ও সমৃদ্ধই হবে বটে, কিন্তু ব্রহ্মকেই তা প্রকাশ করবে—ব্রহ্মবিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা হয় অহং-এর, মুক্তচিত্তের নয়। মানুষ তার আপন ব্যক্তিস্বরূপে হবে বিশ্ববাসী ও পার্থিব, কিন্তু সেই সঙ্গে হবে মহাবৈশ্বিক ও বিশ্বাতীতও। সে হবে অখণ্ড ব্যক্তি ও সর্বজনীন—একাধারে।

তখন জীবন থেকে ও জগৎ থেকে পলায়নের আর দরকার হবে না, ইচ্ছাও না। ব্রহ্মবাদীরা যে পলায়নের পথ নিয়েছেন তার কারণ তাঁরা দেখেছেন যে আন্তর সত্যের সঙ্গে বাইরের সত্যের একটা অসহনীয় বিরোধ আছে—জগৎ বড় স্থূল ও বাঁকা, আত্মময় জীবনযাপন যেন অসম্ভব এখানে। অজ্ঞান ও অবিদ্যার এ রাজত্বে ব্রহ্মবিৎ মানুষ তৃপ্তি পাননা, পদে পদে তাঁর স্বস্তি হয় বিঘ্নিত। তাই তিনি থাকতে চাননা এখানে, মনে করেন যে থাকতে হলে মিথ্যা ও মায়াকে মেনে, তার সঙ্গে আপস করেই থাকা সম্ভব। তাতে বড় বিতৃষ্ণা জাগে। কিন্তু পূর্ণ ও অখণ্ড মানুষ দেখেন যে জগৎ ও জীবন ব্রহ্মেরই লীলাক্ষেত্র, ঘৃণার পাত্র নয়। এ মর্ত্য আধারে জীবন পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, উচ্ছলিত হতে পারে আনন্দানুভূতি। বিজ্ঞানী দেখেন যে কত স্ববিরোধিতায় আকীর্ণ মনে হয়েছিল যে জগৎ ও জীবন, পূর্ণের পদপরশে তা ধন্য হয়ে ওঠে। সুসমন্বিত হয় সব বিরোধ; বিরোধী উপাদানসমূহ আসলে বৈচিত্র্যের জন্যই দরকার—আর সব বৈচিত্র্যকে ধারণ করে সুষমার শ্রী ফুটে ওঠে বিজ্ঞানঘন পার্থিব জীবনে। রামকৃষ্ণের

তপস্যা তারই সন্ধান দিয়ে গিয়েছে—তাঁর জীবন তেমন দিব্য সুষমামণ্ডিত জীবনের অক্ষয় দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছে। তাই জগতের প্রতি তাঁর মনোভাব আগ্রাসীর মনোভাব হয়নি, তিনি চাননি এ জগৎকে দখল করতে : পক্ষান্তরে জগৎও পারেনি তাঁকে দখল ও গ্রাস করতে। তাঁতে ও জগতে বিরোধ নেই—যা এখন পর্যন্ত আমাদের ক্ষেত্রে রয়েছে। এ বিরোধ দূর করার জন্যই সকল মানুষের হয়ে তাঁর তপস্যা।

একটি প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে যে যদি রামকৃষ্ণের জীবনে দেহ ও আত্মার বিরোধ দূর হয়ে থাকে, যদি আত্মাময় দেহ হয়ে থাকে তাঁর,—আমরা আগেই বলেছি, ভগবানের বিগ্রহই তাঁর আত্মারূপ—তাহলে ব্যাধির আক্রমণে সে দেহ ক্লিষ্ট ও ভঙ্গুর হয়েছিল কেন? আত্মার তো ব্যাধি হয় না। এ প্রশ্নের উত্তরও আমরা আগেই দিয়েছি যে মানুষের কল্যাণকামনায় তিনি আত্মবলি দিয়েছিলেন—তাঁর ক্যান্সার তাঁর crucifixion. কাশীপুর বাগানে তাঁর রোগযন্ত্রণাকাতর দেহের সেবায় যাঁরা রত ছিলেন সেই তাঁর অনন্যগতি ভক্ত ও সেবকদের মনেই এই সত্য প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁরা দেখেছিলেন, দেহ দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, গলা থেকে পুঁজ রক্ত নির্গত হল, কিন্তু সে দিব্য পুরুষের দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু অম্লান. আগের মতোই ভগবৎ কথায় ও ভাবে বিভোর তিনি, কথা বলতে বলতেই সমাধিস্থ। শেষ দিনের ক্ষণটুকু পযন্ত কোনো বিকার দেখা যায়নি তাঁর চেতনায়; সুস্থ সবল দেহেও যিনি ছিলেন ব্রহ্মস্বরূপ, ক্যান্সারদষ্ট দেহেও তিনি তাই-ই থেকেছেন।

সর্ব মানুষের চৈতন্য হোক,—তাঁর এই সংকল্পের জন্যই মানুষের অচেতনার অন্ধকারের ভার মাথায় তুলে নিতে হয়েছিল তাঁকে, মানুষের পরম দরদী বলেই মানুষের ব্যথা-গরল ধারণ করেছিলেন তিনি নিজ কণ্ঠে। নিঃস্বার্থ নিষ্কাম আত্মদানেই প্রেমের পরীক্ষা। প্রেম তো কোনো কিছু দাবী করে না; যাকে ভালোবাসি, সততই শুধু তার মঙ্গল চাই। আর তা শুধু মুখের চাওয়া নয়, তা এমন বলবতী চাওয়া যে সেজন্য নিঃশেষে আত্মদান করি। রামকৃষ্ণ মানুষের জন্য আত্মদান করেছিলেন; বলেছিলেন, মানুষের পাপ নিয়েই তাঁর এই ব্যাধি।

মানুষ ভগবানকে পূজা করে, স্তব করে, ভোগরাগ দেয়, সিংহাসনে ঠাকুরকে বসিয়ে কতভাবে সাজায়। আর পরব্রহ্ম মানুষের সেবায়, মানুষের মহৎ উজ্জ্বল মঙ্গল সাধনে তাঁর আপন অবিনাশিত্বকেও বলি দিয়ে ব্যাধি ও মৃত্যুর কষ্ট

অঙ্গীকার করেন। কার পূজা বড়, কার পূজা সার্থক? মানুষ ভগবানের উপাসনা করে, সে উপাসনায় স্বীয় মঙ্গলের আশা সূক্ষ্মভাবে হলেও বর্তমান থাকে। ভগবান যখন জীবন বলি দিয়ে মানুষের উপাসনা করে যান তখন তাঁর তো কোনো আত্মসুখ বা আত্মকল্যাণবাঞ্ছা থাকেনা। তিনি নিজেকেই দান করেন নিষ্কাম প্রেমে। তখন ভগবানের উপাস্য মানুষ।

এই প্রাকৃত অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষকেই ঈশ্বরেরও ঈশ্বর করে গিয়েছেন রামকৃষ্ণ: এই সকল জীবন্ত কোটি কোটি ঈশ্বরের মহিমাকে তিনি প্রকাশ করে গিয়েছেন তাঁর তিল তিল আত্মবলিদানে। তাঁর জীবনতপস্যার শেষ অঞ্জলি তিনি এভাবেই দিয়ে গিয়েছেন।

পরব্রহ্মের আত্মবলিদানের উদ্ভাসনে মানুষ স্বমহিমাকেই দেখবে, চিনবে, জানবে। বুঝবে যে তার নিজের এতদিনের দেখাটি তো সার্থক নয়, সত্য নয়—নিজেকেই সে ঠিকমতো দেখেনি কোনোদিন, জানেনি সে কে। ক্ষুৎকাতর কামপীড়িত সামান্য মানুষ সে নয়, স্বরূপে সেও ব্রহ্মকণা, ব্রহ্মশিখা, স্বয়ং ব্রহ্ম। তাঁর আপন শিব-পরিচয়ের লিপি একদিন সে রামকৃষ্ণের অন্তিম আরাধনার আলোয় পাঠ করে নেবে: জীবে জীবে বিতত সেই শিবকেই যে তিনি রক্তমূল্যে আরাধিত করে গেলেন।

কৃতজ্ঞতাবোধে নয়, দায়বোধে নয়, অহংয়ের পরিতৃপ্তিজনিত উল্লাসবোধেও নয়—মানুষের অন্তরস্থিত শিব পরমদেবের এ প্রেমের আহ্বানে একদিন সাড়া দেবে; ঐ আত্মহারা আত্মবিহ্বল পাগল প্রেমের আহ্বান যে দুর্নিবার। কৃষ্ণের বাঁশি উতলা করেছিল গোপীদের: রামকৃষ্ণের প্রেমের রক্তলিপি তাড়িত করবে সর্বমানবকে। আর সব ঠেকানো যায়, ফিরিয়ে দেওয়া যায় সব আহ্বানকেই; কিন্তু যে প্রেম চায়না কিছুই, শুধু দান করে নিজেকে তাকে ঠেকাবার অস্ত্রবর্ম নির্মিত হয়নি এ জগতে।

রামকৃষ্ণের সাধনা সেই সর্বাতিশায়ী প্রেমের সাধনা। তার গতি যেমন বৈকুণ্ঠলোক-ব্রহ্মলোকের দিকে, তেমনই আমাদের এই ধূলিধূসর মর্ত্য পানে। তিনি সৎ-অসতের পরপারে আদিপুরুষ গোবিন্দ, আবার এ মর্ত্যধামে তিনি আমাদেরই একজন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি আমাদের হয়ে আমাদের জন্য সাধনা করেছিলেন: তারপর দিনে দিনে বছরে বছরে ক্রমাগত আমাদেরই কাছে আপনাকে মুঠো মুঠো করে বিলিয়ে দিয়েছেন। এই সবটাই প্রেমের খেলা; তাঁর তপস্যাও তাই, তাঁর বিলাস-বিহারও তাই। ভগবান এই প্রেমের খেলাই

খেলেন অনবরত, এই-ই তাঁর লীলা। তাই যত নামেই তাঁকে ডাকি, যত বিশেষণে করি তাঁকে বিশেষিত, সব ছাপিয়ে একটি পরিচয়ই বড় হয়ে ওঠে তাঁর—অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ তিনি। তাঁর তপস্যাও তাঁর প্রেমের উচ্ছলন বই তো নয়!

১২

মা

ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর পূজারীর পদ হারিয়েছিলেন নন্দোৎসবের দিন তাঁর হাত থেকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ পড়ে ভাঙবার ফলে। সে বিগ্রহই গদাধর জোড়া দিয়ে আবার নিখুঁত করে দিলেন। এখন রাধাকান্তের পূজার ভারও নিতে হল তাঁকেই। এর আগে ভবতারিণীর পূজায় দাদার সাহায্যকারী ছিলেন তিনি। তখন তিনি ছিলেন মায়ের বেশকারী—হৃদয় ছিল তাঁর সহায়ক। এখন হৃদয় ভবতারিণী মন্দিরেই রইল রামকুমারের অধীনে, গদাধর এলেন রাধাকান্তের মন্দিরে।

গদাধরের পূজাপদ্ধতি অভিনব ছিল না, কিন্তু তা যথার্থ পূজা হয়ে উঠল। ভাবে তিনি এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে মন্দিরে কেউ এলে, কাছে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ কথা বললেও তিনি দেখতে বা শুনতে পেতেন না—তাঁর মনে কোনো ছায়াই পড়ত না। পূজার অঙ্গ আছে, যথা অঙ্গন্যাস করন্যাস ইত্যাদি। ওসব করার সময় তিনি স্পষ্ট দেখতেন যে তাঁর দেহে ঐ মন্ত্রবর্ণগুলি উজ্জ্বলভাবে বর্তমান। দেখতেন যে ভুজগাকারা কুণ্ডলিনী সুষুম্নার পথ বেয়ে উর্ধে সহস্রার পানে উঠে যাচ্ছে। এক চক্র থেকে আর এক চক্রে ঐ শক্তি উঠে গেলে পড়ে থাকা চক্রগুলির স্থান পর্যন্ত দেহ অবশ হয়ে যাচ্ছে, যেন শক্তিহীন শব হয়ে যাচ্ছে, অসাড় ও নিস্পন্দ।

পূজাপদ্ধতিতে নির্দেশ আছে যে রং এই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করে পূজারী নিজের চারদিকে জল-ছিটা দিয়ে ভাববেন যে পূজার স্থান বেষ্টন করে আছে আগুনের পাঁচিল—রং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য—কোনো বাধাবিঘ্ন ঐ পাঁচিল ভেদ করে আসতে পারছে না। লক্ষ জিহ্বা বের করে লক লক করছে সে আগুন—কে তা ডিঙোবে! তখন গদাধরের তেজঃপুঞ্জ কলেবর ও ভাবলীন অবস্থা; মন্দিরের ব্রাহ্মণরা দেখে বলতেন—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব নরতনু ধারণ করে পূজা করতে বসেছেন।

রামকুমার খুশি হয়েছিলেন; তবে পুরো নয়। গদাধর চাকরি করছে,

পূজারীর পদে চাকরিতে মন বসেছে, এ ভালো কথা; কিন্তু সংসারে তার মন কই? চির উদাসীন সে, এখন তার ঔদাসীন্য বাড়ছে। সকালে-সন্ধ্যায় মন্দির থেকে দূরে গঙ্গাতীরে একাকী হয়তো পদচারণা করে ফিরছে, কিংবা পঞ্চবটীর তলে বসে আছে চুপচাপ স্থির। সেসময় পঞ্চবটী ছিল জঙ্গলে ঘেরা। সে জঙ্গলে গদাধর গিয়ে বসে থাকে বহুক্ষণ।

রামকুমার বুঝছিলেন তাঁর সময় আর বেশি নেই; এখন ঐ উদাসীন ভাইকে যতটা সম্ভব প্রস্তুত করে দেওয়া দরকার। পূজাবিধি শেখালেন যত্ন করে, শাক্ত দীক্ষাও হয়ে গেল, এখন গদাধরকে আর একটু দায়িত্ব দিলেন রামকুমার। তিনি নিজে রাধাকান্তের পূজার ভার নিয়ে গদাধরকে দিলেন ভবতারিণী-পূজার ভার। শরীর দুর্বল হওয়ায় রামকুমার হয়তো ভবতারিণী-পূজার ভারী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে ঈষৎ কম শ্রমের রাধাকান্ত-পূজার দায়িত্ব নিয়ে থাকবেন। মথুরবাবু এতে অরাজি হননি। কিছুদিন পর রামকুমার মথুরবাবুকে বললেন যে অনেক দিন তিনি দেশে যাননি, এখন দেশে যেতে চান একবার; তাঁর অবর্তমান কালে হৃদয়ই রাধাকান্ত পূজার ভার নেবে। মথুর তাতেও আপত্তি করেননি।

রামকুমার অবশ্য স্বগ্রামে ফিরতে পারেননি। তিনি শ্যামনগর-মূলাজোড়ে গিয়েছিলেন কোনো কাজে। সেখানেই মারা গেলেন। ১৮৫৬ সাল, বাংলা ১২৬৩ সালে মাত্র বায়ান্ন বছর বয়সে রামকুমার চলে গেলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তাঁর অবস্থান এক বছর মাত্র হয়েছিল।

দাদার এমন বিদায়ে রামকৃষ্ণ ব্যথিত হয়েছিলেন বই কি! বাল্যে বাবা মারা গেছেন, তখন থেকে দাদাই তাঁর অভিভাবক-প্রতিপালক—বয়সে ছিলেন একত্রিশ বছর বড়। শূন্যতা ও ক্ষতবোধ ছাড়াও বাড়িতে মায়ের জন্য ভাবনা হবার কথা; বিদেশে জ্যেষ্ঠপুত্রের অকাল মৃত্যুতে বৃদ্ধা মা শোকাহত হবেন। দাদার পুত্র অক্ষয় ছিল মাতৃহারা, হল পিতৃহারা; উপরন্তু সংসারের প্রধান স্তম্ভই ভেঙে গেল। তবু রামকৃষ্ণ, তখন বয়স একুশ, এসব ভাবনায় ব্যস্ত-উদ্বিগ্ন হননি। এমনকি মাকে সান্ত্বনা দিতে কামারপুকুরও ছুটে যাননি।

তিনি তখন আর এক মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে ব্যস্ত, নিবিড় করে পেতে। কালোর অধিক কালো সেই মা পাষাণী, কিন্তু কী যে তাঁর আকর্ষণ যে জগৎ ভুলিয়ে দেয়। মনে হয়, দাদার মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা প্রেক্ষাগৃহে চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মতোই রামকৃষ্ণের মানসচেতনায় ফুটে উঠতেই ভেসে

গেছে—মন চলে গেছে অন্তর দৃশ্যের পানে। এই নতুন মা সে অন্য দৃশ্যাবলীর সবটুকু জুড়ে। পুঁথির কবি তা লক্ষ্য করেই লিখেছেন:

অগ্রজের লোকান্তরে শ্রীপ্রভু এখন।
শ্যামার সেবায় দিল ষোলো আনা মন॥

এ সময় তিনি মা ভবতারিণীকে প্রতিদিন নতুন নতুন বেশে সাজাতেন; ফুলে, ফুলমালায়, বসনে ও অঙ্গরাগে মা হয়ে উঠতেন নিত্য নবীনা; ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা, চামর দুলিয়ে আরতি এসব তো ছিলই, আর ছিল রামকৃষ্ণের মধুর গীতি। যেমন মন কাড়া বেশ, তেমনই মন ঢালা পূজা, তেমনই মন মাতানো গান। রাণী রাসমণি চমকে গেলেন। এ কোন শিল্পী, এ কোন সাধক? এ কে? বিমুগ্ধা রাসমণি প্রায়ই আসেন, থেকে যান দক্ষিণেশ্বরে, আনন্দমগ্না হয়ে শোনেন রামকৃষ্ণের গান, দেখেন তাঁর পূজারতি। গান গাইতে গাইতে আত্মবিস্মৃত রামকৃষ্ণের বুক ভেসে যায় চোখের জলে। রাসমণি তাঁকে অনুরোধ করে এই গানটি বারবার শুনতেন:

কোন হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিভ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
বল মা তোরে শুধাই তারা
তারা কি তোর এমনি ধারা
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল এমনি করে॥

রাসমণির অনুরোধে গান শোনানো, তা ছাড়া আর কারও সঙ্গে কোনো অনাবশ্যক বাক্যালাপ করতেন না রামকৃষ্ণ। রাতে মন্দিরের ফটক বন্ধ হয়ে গেলে একা তিনি চলে যেতেন পঞ্চবটীর জঙ্গলে। তখন সেখানে ছিল জঙ্গল, এখন বাঁধানো পথ ও সমতল মাঠ। তখন জায়গাটি ছিল নিচু জমি, খানাখন্দে ভরা। কবরডাঙ্গা, তায় জঙ্গল—দিনের বেলাও লোক যেত না ভয়ে। জঙ্গলে তো ঢুকতই না। রাতে আরও ছিল ভূতের ভয়। বনে ছিল একটি আমলকী গাছ—নিচু জমিতে। তার তলে কেউ বসে থাকলে জঙ্গলের বাইরে থেকে দেখা যেত না। রাতে ঐ আমলকী গাছের তলে বসে ধ্যান করতেন রামকৃষ্ণ।

হৃদয় দেখল মন্দিরে সারাদিন পরিশ্রম করে ছোট মামা, খাওয়া-দাওয়ার হুঁস নেই, তারপর ঘুমোয় না রাতে। এমন করলে শরীর থাকবে কেন? মামা জঙ্গলে গিয়ে কী করে সে বিষয়ে ধারণা ছিল না হৃদয়ের। সে এক রাত্রে

মামার অজ্ঞাতে মামাকে অনুসরণ করল—কিন্তু ভয়ে জঙ্গলে ঢুকতে পারল না। মামাকেই ভয় দেখাতে ঢিল ছুঁড়তে লাগল বনে। মামার সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। হৃদয় ফিরে গেল ঘরে।

পরদিন মামাকে সে জিজ্ঞাসা করল : রাতে জঙ্গলে তুমি কর কী মামা? রামকৃষ্ণ বললেন : আমলকী তলায় ধ্যান করি। শাস্ত্রে আছে আমলকী গাছের তলে যে যা কামনা করে ধ্যান করে সে তা পায়।

এর পর কয়েকদিন হৃদয় মামার ধ্যান ভাঙার চেষ্টা করল ঢিল ছুঁড়ে। রামকৃষ্ণ বুঝলেন যে ঢিলের পিছনে রয়েছে হৃদয়। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। মামার নৈঃশব্দ্য ভাঙাতে না পেরে হৃদয় এক রাতে সাহস করে জঙ্গলে ঢুকল। দেখল যে মামা পরণের কাপড় আর পৈতে ফেলে স্বচ্ছন্দ বসে ধ্যান করছে। হৃদয় ভাবল : মামা পাগল হয়েছে। ধ্যান করা ভালো, কিন্তু ল্যাংটা হয় তো পাগল। আর ব্রাহ্মণ পূজারী হয়ে পৈতে ত্যাগ!

হৃদয় তখনই রামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল : মামা, এ কী হচ্ছে? পৈতে কাপড় ফেলে ল্যাংটো হয়ে বসেছ কেন? বেশ কয়েকবার ডাকাডাকিতে রামকৃষ্ণের হুঁশ ফিরল। শুনলেন প্রশ্ন। বললেন : তুই কী জানিস! এমন পাশমুক্ত হয়েই ধ্যান করতে হয়। ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান—এই অষ্ট পাশে মানুষ জন্ম থেকেই বদ্ধ থাকে। আমি ব্রাহ্মণ, সবার চেয়ে বড়—এই অভিমানের চিহ্ন পৈতে, এও একটা পাশ।

'আমি পুরুষ'—এই অভিমানের চিহ্ন বস্ত্র, এও একটা পাশ। সব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে মাকে ডাকতে হয়। তাই ওসব খুলে রেখেছি। ধ্যান শেষ হলে ফেরার সময় পরে নেব।

হৃদয়ের কাছে একথা অশ্রুতপূর্ব। কিন্তু কথার মধ্যে যে সত্যের জোর আছে তাও অস্বীকার করতে পারেনি সে। তাই আর কোনো যুক্তি, অনুরোধ, ভৎর্সনা বেরোল না তার মুখ থেকে। ফিরে গেল সে ঘরে।

ভাবের ঘরে চুরি নেই, মন মুখ এক, এমনই সাধন ছিল রামকৃষ্ণের। অষ্টপাশ শুধু মনে ত্যাগ নয়—বাইরেও ত্যাগ। আবার সাধন হবে মনে, বনে, কোণে—তাঁর এই উক্তি তাঁর নিজ আচরণজাত। হৃদয় মামার হিতকামনায় আকুল হয়ে অনুসরণ না করলে পঞ্চবটীর জঙ্গলে রামকৃষ্ণের প্রথম সাধনার কোনো সাক্ষীই থাকত না।

হৃদয়ই বা কতটুকু সাক্ষী? ভাবগ্রাহী ভিন্ন সাধকের ভাব কে পারে

জানতে। স্বয়ং রামকৃষ্ণ জানিয়েছেন বলেই সাধন কালের কোনো কোনো গুহ্য কথাও আমরা জানতে পারি। বলেছেন: সন্ধ্যাপূজা করবার সময় যখন ভাবতুম, ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হয়ে গেল—শাস্ত্রে এমন ভাবতে বলেছে—তখন কে জানত শরীরে সত্যসত্যই পাপপুরুষ আছে, আর তাকে বিনষ্ট করা যায়। সাধনার সুরু থেকে গাত্রদাহ দেখা দিল। ভাবলুম, এ আবার কী রোগ হল? ক্রমে তা বেড়ে অসহ্য হয়ে উঠল। নানা কবিরাজী তেল মাখলুম. কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একদিন পঞ্চবটীতে বসে আছি, সহসা দেখছি কী—মিশ কালো রঙ, লালচোখ, ভীষণ একটা পুরুষ যেন মদ খেয়ে টলতে টলতে, (নিজ শরীর দেখিয়ে) এর ভিতর থেকে বেরিয়ে সামনে বেড়াতে লাগল। পরক্ষণে দেখি কী—আর একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ, গৈরিক-পরা, ত্রিশূল-হাতে, ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সেই ভীষণ পুরুষটাকে তেড়ে আক্রমণ করে মেরে ফেললে! সেদিন থেকে গা-জ্বালা কমে গেল। তার আগে ছ'মাস গা-জ্বালায় দারুণ কষ্ট পেয়েছিলুম।

কষ্ট শুধু গা-জ্বালাজনিত নয়, কষ্ট যেন ছেয়ে এল সব দিক থেকে। তাঁর তন্ময় পূজা-ধ্যান সবার ভালো লাগেনি। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্মচারীরা দেখত, গ্রামবাসীরা জানত, তীর্থযাত্রীরা লক্ষ্য করত এক উন্মাদ পুরোহিত এসেছে রাসমণির কালীমন্দিরে। অতি ভোরে নিজের হাতে ফুল তুলে সে মালা গাঁথে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় তার মাকে সাজাতেই; তারপর পূজায় বসে! শাস্ত্রবিধি মতে আগে নিজের মাথায় একটি ফুল দিতে হয় পুরোহিতকে। কিন্তু এ পুরোহিত নিজের মাথায় ফুল দিতেই ধ্যানস্থ হয়ে যায়, সে ধ্যান ভাঙেনা দুঘণ্টায়ও। তারপর পূজা। মাকে ভোগ দিয়ে মা খাচ্ছেন ভেবেই সে বহুক্ষণ কাটিয়ে দেয়! আর তার সন্ধ্যার মাতৃ-আরতি—সে তো শেষ হতেই চায় না। দেখোগে, নিজের খাওয়া-দাওয়া নেই, শখ-আহ্লাদ নেই, কারও সঙ্গে কথাটি নেই, নতুন পুরোহিত সারাক্ষণ পড়ে আছে মায়ের পায়ে।

বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র তাদের কথা। রামকৃষ্ণকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে আনন্দ পেয়েছে তারা, বলেছে ঢং। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। বলেছে, হাঁ ভক্তি ভালো, নিষ্ঠাও ভালো, কিন্তু বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

এ গঞ্জনা রামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেনি, আত্মমগ্ন তিনি এসব কথার একটিও শোনেননি হয়তো। তাই এসব কথা তাঁর ব্যথার কারণ হয়নি। বরং তাঁর

ভক্তিময়, নিষ্ঠাবান পূজা-আরাধনা দেখে কেউ কেউ হয়েছিল শ্রদ্ধান্বিত। স্বয়ং মথুরবাবুও তাই। রাসমণিকে তিনি বলেন: অদ্ভুত পূজক পাওয়া গেছে, দেবী বোধ হয় শাগ্রই জাগ্রতা হবেন।

সেই ঠনঠনিয়ায় প্রতিদিন মাকে গান শোনাতেন। এখানে দক্ষিণেশ্বরে এসেও সেই রীতি। রামকৃষ্ণ মনে করতেন, গান পূজার অঙ্গ—গান শুনিয়ে মাকে প্রসন্ন করা যায়, আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হয় গানে। গান গাইতে গিয়ে রামপ্রসাদের কথা মনে পড়ে যায়। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন: মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবি না? আমি ধন জন ভোগসুখ কিছুই চাই না মা, শুধু আমায় দেখা দে।

বলতে বলতে আরও চোখের জলে ভাসত বুক। সেই অবস্থায় শোনাতেন আরও গান—গানের পর গান। সেই হৃদয়-নিংড়ানো ভক্তিমাখা সুরলহরী অপ্রাকৃত লোকের চিন্ময়ী দেবীকে যেমন, প্রাকৃত লোকের প্রাকৃত জনদেরও কম তৃপ্তি দেয়নি। পাগলা পুরুত গানে সিদ্ধ, বলত লোকে।

পাগলই বটে। একমাত্র ঈশ্বর চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ছিল না তাঁর। আহার নেই, নিদ্রা নেই: নিরবচ্ছিন্ন একমুখী চিন্তার ফলে শরীরের রক্তপ্রবাহ বুকে ও মস্তিষ্কে অনবরত ধেয়ে যাচ্ছে। বুক লাল, চোখ জলভারপূর্ণ, ঈশ্বর-দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতায় "কী করব, কেমনে পাব"—সদা এই ভাব। একমাত্র পূজা ও ধ্যানের সময় তিনি স্থির, অন্য সময়ে অশান্তি ও চাঞ্চল্যে দেহ বেপথুমান।

রামকৃষ্ণের উক্তি: তাঁকে দর্শন করতে হলে সাধনের দরকার। আমাকে কঠোর সাধন করতে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছ তলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে। চক্ষের জলে গা ভেসে যেত।

দেহের দিকে একেবারেই মন ছিল না। মাথার চুল লম্বা হয়ে ধূলোমাটি লেগে লেগে আপনি জটা পাকিয়ে গিয়েছিল। ধ্যানে বসলে শরীরটা কাঠের মতো হয়ে যেত। পাখি এসে মাথার উপর বসে থাকত আর ঠোঁট চুলের মধ্যে ডুবিয়ে খাবার খোঁজ করত। আবার সময়ে সময়ে তাঁর বিরহে অস্থির হয়ে মাটিতে এমন করে মুখ ঘষতুম যে কেটে গিয়ে জায়গায় জায়গায় রক্ত বের হত। ঐভাবে কখনো ধ্যান-ভজনে, কখনো প্রার্থনায় সারাদিন যে কোথা দিয়ে কেটে যেত, হুঁশই থাকত না। পরে সন্ধ্যা হলে যখন চারদিকে শাঁখের আওয়াজ

হতে থাকত, তখন মনে পড়ত—দিন শেষ হল, আর একটা দিন বৃথা কেটে গেল, মার দেখা পেলুম না। তখন দারুণ অনুতাপে মন এমন ব্যাকুল করে তুলত যে আর স্থির থাকতে পারতুম না। মাটিতে আছড়ে পড়ে "মা এখনও দেখা দিলি না" বলে চীৎকার করে কাঁদতুম আর যন্ত্রণায় ছটফট করতুম। লোকে বলত, পেটে শূলব্যথা ধরেছে, তাই অত কাঁদছে। সকলেরই যে বেশি তপস্যা করতে হয় তা নয়। আমার কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতুম। কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল 'মা মা' বলে ডাকতুম, কাঁদতুম।

রামকৃষ্ণের এই অবস্থা হবার আগেই সম্ভবত দক্ষিণেশ্বরে আর এক পাগল এসেছিল। মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরই তার আগমন। তার ছেঁড়া জুতো, এক হাতে কঞ্চি, আর এক হাতে একটি ভাঁড়ে আমচারা। গঙ্গায় ডুব দিয়ে এল সে। সন্ধ্যা-আহ্নিক করল না, কোঁচড়ে কী ছিল তাই খেল। তারপর ভবতারিণী-মন্দিরে গিয়ে স্তব করতে লাগল—ক্ষ্রোং ক্ষ্রোং খট্টাঙ্গ ধারিণীং ইত্যাদি। মন্দির কেঁপে গিয়েছিল।

সেসময় মন্দিরের অতিথিশালা থেকে যে চাইত তাকে আহার্য দেওয়া হত। কিন্তু এই আগন্তুক পাগলকে কেউ খেতে দেয়নি—কারণ চেহারায়-চরিত্রে সে যে বদ্ধ উন্মাদ। লোকটি এই ব্যবহার পেয়ে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি—তার ভ্রূক্ষেপ ছিলনা কোনোদিকে। যেখানে কুকুররা উচ্ছিষ্ট খাচ্ছিল সেখানে গিয়ে সে পাত কুড়িয়ে সেই উচ্ছিষ্ট খেতে লাগল কুকুরদের সঙ্গে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলোকে কাণ ধরে সরিয়ে দিয়ে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে খেল। কিন্তু কুকুররা কিছু বলেনি।

কুকুররাই হয়তো বুঝেছিল যে এ লোককে হিংসা করা চলে না—জীবের মধ্যে এ যেন জীবধারামুক্ত একজন। তখন হলধারী এসেছে মন্দিরে, তার থেকেই মনে হয় যে এ ১৮৫৭ সালের কোনো সময়ের ঘটনা। হলধারী ক্ষুদিরামের কনিষ্ঠ ভাই রামকানাইয়ের পুত্র, রামকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই।

হলধারীর শাস্ত্রজ্ঞান ছিল। তার সন্দেহ হল যে লোকটির মধ্যে কিছু অসামান্যতা আছে। হলধারী তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী? তখন সে বলেছিল, আমি পূর্ণজ্ঞানী! চুপ!

হলধারী রামকৃষ্ণকে একথা তখনই জানিয়েছিল। "আমি হলধারীর কাছে

যখন এসব কথা শুনলুম, আমার বুক গুরগুর করতে লাগল, আর হৃদেকে জড়িয়ে ধরলুম। মাকে বললুম, মা, তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে!"

রামকৃষ্ণ ও হৃদয় হলধারীর সঙ্গে দেখতে গেলেন সে পাগলকে। এঁদের সঙ্গে সে জ্ঞান-আলোচনা করল। কিন্তু অন্য লোক এসে পড়লে সুরু হল তার পাগলামি। যখন সে মন্দির ছেড়ে চলে যায় তখন হলধারী গেল পিছন পিছন। মন্দিরের সীমার শেষ যে প্রধান ফটক তা পার হয়ে লোকটি হলধারীকে বলল: তোকে আর কী বলব। এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোনো ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জানবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে। এই কথা বলে হনহন করে চলে গেল লোকটি, আর কখনো আসেনি।

জানা যায়নি এমন অদ্ভুত মানুষটির পরিচয়। তবে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে একদা যোগ ছিল তার। বৈশিষ্ট্য তার এই যে আর কোনো ব্রাহ্মের যা হয়নি এই পাগলের তা হয়েছিল—অদ্বৈত জ্ঞান। পূর্ণ জ্ঞান!

সাল তারিখ স্থির করা যায় না, তবে হলধারীর উপস্থিতি ও ঠাকুরের মুখের ঐ "মাকে বললুম, মা, তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে?"—এই উক্তি থেকে মায়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় হৃদ্য সম্পর্কাভাস যা ফুটে উঠেছে তা থেকে মনে হয় যে এটি রামকৃষ্ণের মাতৃদর্শনের পরের ঘটনা। তবু এখানে উল্লেখ করলাম এ কারণে যে ঘটনাটির সঠিক সময় নির্ধারণ করা যায় না; এবং এও বোঝাতে যে রামকৃষ্ণ তাঁর প্রথম ঈশ্বরোন্মত্ততার কালে এই একজন দোসর চাক্ষুষ করেছিলেন। নিজের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না; তাই বুঝতে পারেননি যে "আমারও কি এই অবস্থা হবে" নয়, হয়ে বসে আছে, বরং অবস্থা তাঁর আরও ঘোর—পাগলা বামুন নাম তাঁর রটেই গিয়েছে।

রামকৃষ্ণের ঘোর উন্মত্ততার মধ্যেই মায়ের আবির্ভাব। তখন তিনি স্বাভাবিক বুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। তখন তিনি মানুষের মতো ভাবেন না, চলেন না, তাঁর আচার-আচরণ মানবিক নেই—এবং নেই যে তা তাঁর জানা নেই। বয়স একুশ পূর্ণ হয়ে বাইশ চলছে, দেহে ভরা যৌবন। মনও সতেজ, শক্তিশালী। কিন্তু সে দেহে, সে মনে অন্য কাজ নেই—একমাত্র-মাতৃ আবাহন ছাড়া। সকল সত্তা তাঁর কেন্দ্রিত একটি বিন্দুতে—মা। জগজ্জননী, ব্রহ্মময়ী, ভবতারিণী, কালী।

> মার দেখা পেলুম না বলে তখন প্রাণে অসহ্য যাতনা। ভেজা গামছা লোকে যেমন করে নিঙড়ায়, মনে হল আমার মনটাকে ধরে কে যেন

তেমনি করছে। মার দেখা বুঝি আর কোনো কালে পাব না, ভেবে যাতনায় ছটফট করতে লাগলুম। অস্থির হয়ে ভাবলুম, তবে আর এ জীবনে কাজ কী। মার ঘরে যে খাঁড়া ছিল, হঠাৎ তার উপর চোখ পড়ল। এই দণ্ডেই জীবন শেষ করব ভেবে পাগলের মত ছুটে ধরতে যাচ্ছি, হঠাৎ মার অদ্ভুত দর্শন পেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলুম। তারপর বাইরে যে কী হয়েছে, কোথা দিয়ে যে সেদিন ও তার পরদিন গিয়েছে, কিছুই জানতে পারি নাই।

এই উক্তি স্বয়ং রামকৃষ্ণের, বলেছিলেন শরৎ প্রমুখদের। তাঁর মুখে প্রত্যক্ষভাবে শুনেই শরৎ অর্থাৎ সারদানন্দ লীলাপ্রসঙ্গে লিখে গিয়েছেন। ঠাকুরের অপর যে উক্তিগুলি উদ্ধৃত করেছি তার উৎস কথামৃত।

সেই প্রথম মাতৃদর্শনের সময় কী অবস্থা হয়েছিল? তাও তাঁর শ্রীমুখের কথা থেকেই জানতে পাই:

অন্তরে কি এক জমাট-বাঁধা আনন্দের জোয়ার বইছিল, আর মার সাক্ষাৎ প্রকাশ অনুভব করলুম। ঘর দরজা মন্দির সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই। আর দেখছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতির সমুদ্র। যেদিকে যতদূর দেখি, চার দিক থেকে তার আলোর ঢেউ যেন শব্দ করে ছুটে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে ঢেউগুলো আমার উপর এসে পড়ল আর এককালে আমায় কোথায় তলিয়ে দিল। হাঁপিয়ে হাবুডুবু খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলুম।

সে জ্যোতিঃ সমুদ্রের মধ্যেও ফুটে উঠেছিল মায়ের মূর্তি। অদ্বৈতের প্লাবনের মধ্যেই দ্বৈতাভাস। অদ্বৈত যেন দ্বৈতকে ধারণ করেছে। সমাধি থেকে প্রথম ব্যুত্থানেই সংজ্ঞা ফিরতেই, মা মা শব্দে রোদন করেছিলেন রামকৃষ্ণ। সমাধিভূমিতেই তিনি মাকে পেয়েছিলেন, ব্যুত্থানেও মা।

কবে এ ঘটনা ঘটেছিল তা জানা নেই। তবে ১৮৫৬ সালের শেষ বা ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে। রামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে আগমনের দেড় বছরের মধ্যেই।

লোকলোচনের অন্তরালে, বিশ্বের এক নির্জন কোণে মানবজাতির পক্ষেই বিপুল তাৎপর্যময় একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেদিন: এই পৃথ্বী-পরে ব্রহ্মশক্তির অবতরণ, ব্রহ্মময়ীর পদপাত—স্বয়ং পরব্রহ্মেরই আবাহনে, তপস্যায়।

সারা বিশ্ব টলোমলো হয়েছিল অনতিবিলম্বে, যেন একটা ওলোট-পালটের দিন এল ঘনিয়ে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসানে প্রথম বিশ্ব সমরের বীজগুলি বোনা হয়ে গেল এ সময়ে—রুশ বিপ্লবের সূত্রপাতও। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ফুঁসে উঠল। শক্তির লীলাচাঞ্চল্যের পরিমাপ করবে কে? ইতিহাসের মহত্তম বিপ্লবের সূচনাও সম্ভবত সেদিনই দক্ষিণেশ্বরের নিভৃতিতে ব্রহ্ম-ব্রহ্মময়ীর মিলনলীলায় সাধিত হয়েছে: মানবের দেবপরিণাম, মর্ত্যভূমিতে ঈশ্বরচৈতন্যের প্রতিষ্ঠা!

১৩

মথুর

দর্শনে দর্শনের লোভ বাড়ে। একবার ঈশ্বর দর্শন লাভে তৃপ্তি হয় না, বারবার দেখতে ইচ্ছা করে। ক্ষণমাত্র অদর্শনে বিরহ-ব্যথায় বুক ভেঙে যায়। আর সব আলুনি লাগে, জগৎটাই মিথ্যে হয়ে যায় : সব কিছু মনে হয় যেন ছায়ামাত্র, বাস্তব নয়, আকর্ষণীয় নয়। তাঁকে আবার কখন দেখব এই হয়ে দাঁড়ায় সর্বক্ষণের চিন্তা। ভাগবতে নারদ তাঁর ঈশ্বর দর্শনের কথা এরূপ বলেছেন :

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জিতচেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥১।৬।১৬

ভক্তিবশ চিত্তে ভগবান হরির চরণারবিন্দ ধ্যান করাতে উৎকণ্ঠাহেতু আমার দুচোখ জলে ভরে এল। ধীরে ধীরে হৃদয়ে হরি এসে আবির্ভূত হলেন।

প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ
আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে ॥১।৬।১৭

ব্যাস! তাঁর দর্শন পেলে প্রেমভরে আমার দেহ পুলকে ভরে গেল। আনন্দের প্লাবনে আমি মূর্ছিত হলাম। আনন্দের তীব্রতায় লোপ হল আমার আত্মস্মৃতি, ভগবৎস্মৃতিও। নিজেকেও দেখলাম না, তাঁকেও না।

দর্শনের পরই অদর্শন। ব্যাকুল হলেন নারদ আবার তাঁকে দেখতে। পেলেন না। শোকে আতুর হলেন তিনি। অসহ বিচ্ছেদ-ব্যাথায় কাতর নারদকে মধুর কণ্ঠে ভগবান বললেন : নারদ! এ জন্মে তুমি আর আমার দেখা পাবে না। একবার যে তোমাকে দেখা দিয়েছি সে কেবল আমাতে তোমার অনুরাগ বাড়াতে।

ভগবান অন্তরাল থেকে নারদকে বলেছিলেন, একবার তো দেখা দিয়েছি, এবার আমাতে মতি দৃঢ় কর। তোমার দেহান্তে তুমি আমার পার্ষদ হবে।

নারদ তাতেই খুশি হয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ কিন্তু একবারমাত্র মাতৃদর্শনে খুশি হতে পারেননি। তিনি

চাইলেন অনুক্ষণ দর্শন। সেজন্য তাঁর প্রাণে আকুল কান্না উঠল। থামে না সে কান্না। কান্নার তোড়ে মাটিতে লুটিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে "মা, আমায় কৃপা কর, দেখা দে" বলে এমন কাঁদতেন যে চারপাশে দাঁড়িয়ে যেত লোক। লোকে দেখে কী বলবে সে ভাবনা বিন্দুমাত্র আসত না তাঁর মাথায়। ঐ লোকগুলিকে মনে হত যেন ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্তি। তাই তাদের দেখে একটুও লজ্জা-সংকোচ আসত না মনে। বিরহ ব্যাকুলতার তীব্র যাতনায় বাইরের চেতনা লোপ পেত তাঁর কখনো কখনো। কিন্তু অন্তঃসংজ্ঞা থাকত অটুট। তখন দেখতেন বরাভয়দাত্রী চিন্ময়ী মা! মূর্তি নয়, জীবন্ত! মা হাসছেন, কথা বলছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন।

অদর্শন থাকল না। সততই ঈশ্বরদর্শন। তিনি বোধে, তিনি আত্মার উপলব্ধিতে, তিনি চোখের সামনে। সদাই। এমন ঈশ্বরদর্শনের নজীর নেই। শাস্ত্র-পুরাণ ঘাটলেও পাওয়া যাবে না। মহাপ্রভুও পলকে কৃষ্ণকে দেখতেন, পলকে হারাতেন। অদর্শনজনিত বিরহবেদনায় 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলে রোদন করতেন। আছাড়ি-পিছাড়ি খেতেন, মুখ ঘষতেন মাটিতে। রামকৃষ্ণের হৃদাকাশে, মনোলোকে ও বাইরে ঈশ্বর কিবা নিরুপাধি রূপে, কিবা উপাধিযোগে সতত বিদ্যমান—তাঁর উদয়-অস্ত নেই।

ফলে রামকৃষ্ণ এখন আনন্দে ভাসমান। এত আনন্দ যে তা রাখার জায়গা নেই। অসহ্য পুলকে বেভুল তিনি। ফুল তোলা, মায়ের বেশ করা, শাস্ত্রনিয়ম মেনে কালীর পূজা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। হৃদয়ের ভয়! চাকরি থাকবে কিভাবে! মন্দিরে মামার চাকরি না থাকলে তার নিজেরই বা কী দশা হবে! স্বার্থচিন্তার চেয়েও আর একটা বড় চিন্তা হৃদয়ের ছিল। সে যে ছোট মামাকে ভালোবেসে ফেলেছে। ছোট মামার মঙ্গলামঙ্গলে সে এখন নিরতিশয় উদ্বিগ্ন।

ছোট মামা পূজা করতে পারে না বলে হৃদয় ঠেক দিয়ে চালিয়ে দেয়। রাধাকান্ত ও ভবতারিণীর সেবাপূজা নির্বাহ একলার সামর্থ্যে সম্ভব নয়, সময়ই মেলেনা, তাই হৃদয় আর একজন ব্রাহ্মণের সাহায্য নিচ্ছিল। মামা বায়ুরোগের প্রকোপে উন্মনা হয়েছে সিদ্ধান্ত করে হৃদয় গোপনে গোপনে চিকিৎসার আয়োজন করল। মামার বাতুল অবস্থার কথা কর্তৃপক্ষের কাছে জানানোও তো চলে না—তাই গোপনতা!

হৃদয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল একজন গুণী চিকিৎসকের। কলকাতার দক্ষিণে

খিদিরপুরের দিকে ভূ-কৈলাসের রাজবাড়ি, সেই রাজপরিবারেই চিকিৎসক। হৃদয় তাঁকে গিয়ে মামার কথা বলল, তাঁকে দিয়ে চিকিৎসাও সুরু করাল। কিন্তু রোগ ভালো হল না। রোগই নয়, তা ভালো হবে কি!

ক্রমে রামকৃষ্ণের অবস্থা একটু শান্ত হল। দেহমন ঈষৎ স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হল। ভাবোন্মাদনার পর আত্মস্থ হবার লক্ষণ দেখা দিল। তখন তিনি পূজা করতে পারতেন। সে পূজা ও ধ্যানের সময় অস্থিরতার ভাব কেটে গিয়ে দৃঢ় স্থিরতা আসতে লাগল।

ভবতারিণী—মন্দিরের সামনে নাটমন্দির। তার ছাদের আলসেয় ধ্যানী ভৈরবের মূর্তি আছে। রামকৃষ্ণ ধ্যানের আগে ঐ মূর্তির দিকে তাকিয়ে নিজ মনকে বলতেন: ওরকমটি চাই। মন, অমন নিস্পন্দ হয়ে মার পাদপদ্ম চিন্তা কর। মন মেনে নিত সে শাসন—বিনা দ্রোহে। ধ্যান করতে বসা মাত্র রামকৃষ্ণ শুনতে পেতেন পায়ের দিক থেকে ক্রমে উপরে খটখট শব্দ উঠছে, আর এক এক অঙ্গগ্রন্থি আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে—যেন কেউ ভিতরে বসে ঐসব জায়গায় তালা আটকে দিচ্ছে। আর নড়া চড়ার সামর্থ্য নেই। আসনের বদল করা পর্যন্ত সম্ভব নয়। ধ্যান ছেড়ে উঠে যাওয়া তো অসম্ভব। ধ্যান সম্পূর্ণ হলে আবার খটখট শব্দ! এবার উপর থেকে নিচের দিকে। তখন তালাবদ্ধ গ্রন্থিগুলি খুলে যেত একে একে। তখন রামকৃষ্ণকে উঠতে দেওয়া হত—এখন ধ্যান ছাড়া-না-ছাড়া তাঁর হাতে নেই।

ধ্যান করতে বসে তিনি প্রথম প্রথম দেখতেন বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো জ্যোতির্বিন্দু: কখনো বা কুয়াসার মতো পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিঃতে চারদিক পরিব্যাপ্ত! আবার কখনো কখনো গলা রূপোর মতো উজ্জ্বল জ্যোতিঃ-তরঙ্গ সব কিছু ঢেকে ফেলে। চোখ বুজেও ওসব দেখা, চোখ মেলেও। এ সব কী বস্তু? এ সব দর্শনের তাৎপর্য কী? এ সব দেখা কি ভালো, না, মন্দ? রামকৃষ্ণ জানেন না। তাই মার কাছে তিনি ব্যাকুল চিত্তে প্রার্থনা করতেন: মা, আমার কী হচ্ছে কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না; যা করলে তোকে পাওয়া যায়, তুই তা আমাকে শিখিয়ে দে। তুই না শেখালে আমাকে আর কে শেখাবে মা! তুমি বিনা আমার গতি নেই, সহায় নেই।

প্রাণের গভীর থেকে উঠত এ ব্যাকুল প্রার্থনা। চোখের জলে মাখা এ প্রার্থনা। কিন্তু প্রার্থনার আড়ালে যে সত্যটি উদ্গত হচ্ছিল তা এই যে

রামকৃষ্ণ একান্ত মাতৃ-শরণাগত হয়ে পড়ছিলেন। চলে যাচ্ছিল তাঁর আপন কর্তৃত্ববোধ। সাধন? তাও রামকৃষ্ণ করেন না। করেন মা। মাই সাধক, মাই সাধ্য। মাই সাধন। রামকৃষ্ণ মায়ের শরণাগত বালক মাত্র—আমার মা আছেন এইটুকু মাত্র জানি। যা করতে হবে তা তিনিই করাবেন, করবেন। যা বলতে হবে তাও বলাবেন তিনি। মায়ের ইচ্ছাই ইচ্ছা, আমার নিজের কোনো ইচ্ছা নেই। তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।

মানুষ যদি এমন আত্মবুদ্ধিহীন আত্মকর্তৃত্বহীন হয়, যদি হিসাবী বুদ্ধি একেবারে ত্যাগ করে তাহলে লোকে কী বলে! এ বোকার ভবিষ্যৎ ফর্সা! তাছাড়া, ঢং নয় তো? কিংবা বদ্ধ পাগলই হবে! কথা উঠল, ফেনায়িত হতে থাকল কথার বুদ্বুদ আশেপাশে। উচ্চকণ্ঠ হল নিন্দুকরা। রামকৃষ্ণ নির্বিকার! কারণ তাঁর কানে কোনো কথা ঢোকেই না। মানুষ, জীব, জন্তু সব ছায়ার মতো তাঁর কাছে, অবাস্তব, অলীক। রামকৃষ্ণের বিশ্ব একময়ী—একমাত্র মাই বিরাজিতা সেখানে। তিনি বই, দ্বিতীয় নেই। জগৎ স্বপ্নবৎ হয়ে গেল রামকৃষ্ণের চোখে।

প্রথম প্রথম পূজা ও ধ্যানের সময় রামকৃষ্ণ দেখছিলেন: মার পাদপদ্ম, সজীব হাত বা সৌম্য থেকেও সৌম্য হাস্যোজ্জ্বল স্নিগ্ধ মুখচন্দ্র। তারপর আর পূজাধ্যানের অপেক্ষা থাকল না। অন্য সময় দেখতে পেতেন নয়নাভিরামা চিন্ময়ী জ্যোতির্ময়ী মা হাসছেন, কথা বলছেন। কখনো তিনি বলছেন, এটা কর। কখনো বলছেন, ওকাজ করিস না। আর ফিরছেন সঙ্গে সঙ্গে।

প্রথম প্রথম রামকৃষ্ণ দেখতেন, পূজাশেষে ভোগ নিবেদন করলে মার নয়ন থেকে বেরিয়ে আসত এক জ্যোতিঃরশ্মি, নিবেদিত সব ভোগদ্রব্য স্পর্শ করে যেন সারটুকু গ্রহণ করত—তারপর সে রশ্মি ফিরে যেত মার নয়নেই। তারপর আর ওই আলোটুকু নয়! এখন ভোগ নিবেদন করতে করতেই, এমনকি নিবেদন করার আগেই অঙ্গজ্যোতিতে মন্দিরঘর আলো করে মা স্বয়ং এসে খেতে বসে যান। হৃদয়ের সাক্ষ্য: একদিন পূজার সময় ভবতারিণীর মন্দিরে ঢুকে সে দেখে, মামা জবা বেলপাতা হাতে নিয়েছেন মায়ের পায়ে দেবেন বলে, স্মরণ করছেন মাকে—হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন: আরে রোস, রোস, আগে মন্ত্রটা বলি, তারপর খাস! কিন্তু পূজা বা মন্ত্রপাঠ সাঙ্গ করার সময় মিলল না: তার আগেই নৈবেদ্য ধরে দিতে হল মাকে।

প্রথম প্রথম পূজা-ধ্যানের সময় রামকৃষ্ণ দেখতেন ভবতারিণীর প্রতিমায়

মহাদেবীর আবির্ভাব। তারপর দেখতে লাগলেন, প্রতিমা কোথায়? প্রতিমা নেই, আছেন জীবন্ত সচল দেবী ; চৈতন্যঘন রূপময়ী। তাঁরই চৈতন্যে বিশ্ব চেতন!

সত্যই কি পাষাণী জ্যান্ত হয়েছে? পরীক্ষা করে দেখলেন রামকৃষ্ণ। মায়ের নাকে হাত দিয়ে দেখলেন, মা নিঃশ্বাস ফেলছেন। তারপর তন্ন তন্ন করে দেখলেন, মন্দিরদেউলে রাতে দীপালোকে মার দিব্য দেহের ছায়া পড়ে কিনা। প্রতিমা হলে পড়ত, জীবন্ত দেবীদেহের ছায়া হয় না। তাই ছায়া নেই। নিজের ঘরে বসে রামকৃষ্ণ শুনেছেন, নিঃস্তব্ধ রাতে চঞ্চলা বালিকার মতো আনন্দভরে আনন্দময়ী পাঁয়জোর পরে ঝলমল শব্দ করতে করতে কুঠির ছাতে উঠে যাচ্ছেন। সে শব্দ শুনে দ্রুত পায়ে রামকৃষ্ণ বেরিয়ে এসেছেন নিজ ঘর থেকে। দেখছেন, সত্যই মা কুঠির ছাতে আলুলায়িত কুন্তলা বেশে দাঁড়িয়ে একবার কলকাতার দিকে তাকাচ্ছেন, একবার গঙ্গা দেখছেন!

শুধু তো মন্দিরের ছাতে মা দাঁড়িয়ে নেই, মা এসে দাঁড়িয়েছেন রামকৃষ্ণের মধ্যে। পূর্ণভাবে। তাই সে চেনা মানুষটি ক্রমে ক্রমে অচেনা হয়ে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে সবচেয়ে বেশি চিনত হৃদয়। সে আর ছোট মামাকে দেখে কোনো থই পায় না। ভবতারিণী-মন্দিরে রামকৃষ্ণ যখন পূজা করেন তখন গোটা ঘরটি যেন গমগম করে দিব্যশক্তির আবির্ভাবে। সে আবির্ভাব পূজা সমাপ্ত হয়ে যাবার পর অন্য সময়ও বর্তমান থাকত। আর পূজার সময় বা অন্য সময়ও রামকৃষ্ণকে দেখলে বাস্তববাদী হৃদয়ও থমকে যেত। কোথা থেকে আসে বিস্ময় ও ভক্তি! তাঁর সঙ্গে কথা বলাও যেন সম্ভব নয়—ভয়ে সংকোচে ত্রস্ত হয় হৃদয়। মামাকে এখন কত দূরের মানুষ মনে হয়! নাগাল পাওয়া যায় না তাঁর।

হৃদয় বোঝে মামা কালীপূজা করছেন শাস্ত্রবিধির ধার না রেখেই। যেন তিনি স্বেচ্ছাতন্ত্রী। যেমন খুশি তাই করেন। আগে-পিছে নেই, কাণ্ডজ্ঞান নেই, রীতিনীতি নেই। আত্মভাবে আত্মহারা। মাতৃপ্রেমে পাগলপারা। কিন্তু রাসমণি ও মথুরবাবু জানতে পেলে তাঁরা কী করবেন! একটা কাণ্ড তো বাঁধবেই। তখন? অথচ কোনো উপায়ও নেই আর, কারণ মামাকে কোনো কথা বলাই সাহস হয় না হৃদয়ের।

মামার পাগলামির নমুনা: জবা বেলপাতা সাজিয়ে মামা আগে নিজের

পূজা করেন! নিজের মাথায় বুকে সারা দেহে এমনকি পায়ে ঐগুলি দেন। তারপর সেই আপন পদস্পর্শযুক্ত জবা-বেলপাতাদিই ভবতারিণীকে অর্পণ করেন। রামকৃষ্ণ যেন তখন পূর্ণ মাতাল! চোখ ও বুক লাল হয়ে উঠেছে। আসন ছেড়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে চলে যান মায়ের সিংহাসন-বেদীতে। সেই বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে মায়ের চিবুক ধরে আদর, গান, পরিহাস করেন, আলাপ করেন। মায়ের হাত ধরে হয়তো নাচতেই শুরু করলেন!

অন্ন ভোগ নিবেদন করছেন মাকে, হঠাৎ উঠে পড়লেন। থালা থেকে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন নিয়ে দ্রুত পায়ে বেদীতে উঠে মার মুখে দিয়ে বলতে লাগলেন : খা, মা খা! বেশ করে খা! তারপরই ভাবের বদল ঘটল। বললেন : আমাকে আগে খেতে বলছিস? আমি খাব? আচ্ছা, খাচ্ছি।

এই বলে ঐ অন্নের কিছুটা নিজে খেলেন। তারপর বললেন : আমি তো খেলাম মা। এবার তুই খা। বলে বাকি অন্ন মার মুখে তুলে দিলেন।

হৃদয় স্বচক্ষে এসব দেখে ভয়চকিত! একদিন সে দেখে যে ভোগ নিবেদনের সময় একটা বিড়াল কালীঘরে ঢুকেছে। ডাকছে : ম্যাও, ম্যাও। রামকৃষ্ণ দেখলেন বিড়াল রূপে স্বয়ং মা উপস্থিত। বললেন : খাবি মা, খাবি মা। বলে অন্নভোগ বিড়ালকেই খাওয়ালেন।

আবার একদিন রাতে হৃদয় এসে দেখে যে রামকৃষ্ণ মায়ের আরতি, ভোগ ইত্যাদি শেষ করে মায়ের শয়ন দিয়েছেন। তারপরই বলছেন : মা, মা, আমাকে কাছে শুতে বলচিস! আচ্ছা, শুচ্ছি। বলে মায়ের রূপোর খাটে নিজেই শুলেন।

হৃদয় এক একদিন পূজার সময় এসে দেখত ধ্যানে নিমগ্ন রামকৃষ্ণ। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। কে পূজা করে!

খুব ভোরে উঠে রামকৃষ্ণ বাগানে ফুল তুলছেন। ঐ ফুলে মায়ের মালা গাঁথবেন তিনি। কিন্তু ফুল তোলার সময় একাকী রামকৃষ্ণ হেসে সারা। কথা বলছেন কার সঙ্গে! হাসি ঠাট্টা আদর আবদার রঙ্গ তামাসা কিছু বাদ নেই। কিন্তু কার সঙ্গে এত আলাপন ও মস্করা? হৃদয় সে অন্যজনকে দেখতে পায় না। কিন্তু ফুলের বাগানে মামা যেন একাকী নেই।

হৃদয় দেখত রাতে মামার ঘুম নেই। মামার সঙ্গেই এক ঘরে শুত হৃদয়। যখনই রাতে সে জাগত দেখত মামা ভাবের ঘোরে কথা বলছেন, গান করছেন। অথবা ঘরেই নেই তিনি—পঞ্চবটীর বনে গিয়ে ধ্যানে ডুবে আছেন।

হৃদয়ের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হল। মামার কাণ্ডকারখানা লোকনজরে পড়ল। পূজার সময় ভবতারিণী-মন্দিরে অপর কেউ কেউও আসত। তারাও রামকৃষ্ণের রীতি বহির্ভূত পূজা দেখে থ! কিন্তু তাঁকে তো কিছু বলা যায় না। তিনি দেবাবিষ্ট, পরিবেশের প্রতি দৃকপাতহীন, সংকোচজড়িমাহীন আচরণ তাঁর, তন্ময়। দপ্তরখানায় বসে এস্টেটের কর্মচারীরা পরামর্শ করে। তাদের সিদ্ধান্ত হল: হয় ভট্টাচায পাগল হয়েছে, নতুবা উপদেবতার ভর হয়েছে তাঁর ওপর। শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার সজ্ঞানে কেউ করে না তো। যাহোক, মায়ের পূজায় বিঘ্ন ঘটছে। উচ্ছিষ্ট হচ্ছে তাঁর ভোগ। সব নষ্ট করে দিচ্ছে পূজারী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বাবুরা জানুন এ ব্যাপার, প্রতিকার করুন তাঁরা।

খবর পাঠানো হল মথুরবাবুকে। মথুর জানালেন, তিনি শীঘ্রই একদিন মন্দিরে আসবেন। এসে যা প্রয়োজনীয় তা করবেন। কিন্তু তিনি না আসা পর্যন্ত যেমন চলছে তেমনই চলবে। ভট্টাচায তাঁর ইচ্ছা মতো পূজা করবেন, বাধা যেন না দেয় কেউ।

মথুরের অভিপ্রায় বুঝতে ভুল করল কর্মচারীরা। তারা ভাবল, বাবু শীঘ্র আসবেন, স্বচক্ষে সব দেখবেন, তারপর ছোট ভট্টাচার্যকে বরখাস্ত করবেন। হবে না? ভট্টাচায যে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে নিত্যই অপরাধ করছে দেবতার কাছে। সে অপরাধ দেবতা আর কতদিনই বা সইবেন, বলো।

মথুর আচমকা একদিন এসে উপস্থিত পূজার সময়েই। সোজা চলে গেলেন ভবতারিণী মন্দিরে। বহুক্ষণ ধরে দেখলেন রামকৃষ্ণের মাতৃপূজা। হুঁশ নেই রামকৃষ্ণের কে এল, কে গেল সে দিকে। মথুরের উপস্থিতি তিনি লক্ষ্যই করেননি। তন্ময় তিনি। সেই মায়ের সঙ্গে আদর আবদার, অনুরোধ মিনতি, কষ্টি নষ্টি, কথা গান, কখনো তাঁর চোখ বেয়ে বুক বেয়ে নামে অশ্রুধারা, কখনো উদ্দাম উল্লাস, কখনো তাঁর বাহ্যচেতনা লুপ্ত, স্থির সমাধি। অবাক মথুর। হাঁ, এই তো সর্বার্থসাধক মাতৃপূজা। এই তো সামনে দুর্লভতম পূজারী, নিষ্কলুষ সাধক, হয়তো সিদ্ধ। মন কেন আনন্দে ছেয়ে যায়। মন্দির এত ভরাট জমজম মনে হয়। দেবতার আবির্ভাব যেন প্রত্যক্ষ, যেন স্পর্শ করা যায় এত জীবন্ত ও বাস্তব। মথুর দূরে দাঁড়িয়েই বারবার প্রণিপাত করেন জগন্মাতাকে আর সিদ্ধ রামকৃষ্ণকে। তোমরা দুজনই আমার প্রণম্য। অসীম তোমাদের কৃপা, তাই তোমরা এলে। এতদিনে সার্থক দেবী প্রতিষ্ঠা,

এতদিনে সত্যই মায়ের আবির্ভাব ঘটল এ শ্রীমন্দিরে। এতদিনে সার্থক ও সর্বাবয়বসম্পন্ন হল মায়ের পূজা। ধন্য তুমি পূজক!

ভাবাবেগরুদ্ধ মথুর একটি কথা বললেন না কারও সঙ্গে। ফিরে গেলেন কলকাতায়। পরদিন মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর কাছে তাঁর আদেশপত্র এল: সাবধান! ছোট ভটচাজের পূজায় কেউ যেন কোনো বাধা না দেয়। তিনি যেমন ইচ্ছা পূজা করতে থাকুন।

কর্মচারীরা সম্ভবত সুখী হলেন না। কিন্তু তারপর যা ঘটল তা তাদের কল্পনারও বাইরে।

মথুর ফিরে গিয়ে রাসমণিকে বৃত্তান্ত সবই শুনিয়েছিলেন। ছোট ভটচাজ সম্পর্কে রাসমণির ধারণা উচ্চ ছিল। সেদিক থেকে তাঁর মনে কোনো খটকা লাগেনি। ছোট ভটচাজের সাধনায় মায়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব ঘটেছে শুনে আনন্দ হল তাঁর। ভাবলেন, নিজেই যাবেন একদিন।

গেলেন। রামকৃষ্ণ তখন মন্দিরেই। রাণী তাঁকে গান শোনাবার অনুরোধ করলেন। গান চলল। রাণী ভবতারিণীকে দেখছেন, গান শুনছেন, আহ্নিক পূজা করছেন। হঠাৎ গান থামিয়ে রামকৃষ্ণ রাণীকে চাপড় মারলেন। বললেন: কী, এখানেও ঐ চিন্তা। কেবল ঐ এক ভাবনা!

রামকৃষ্ণের তখন উগ্রভাব, স্বর রুক্ষ।

আজ রাসমণি অজ্ঞাতভাবে আসেননি, আচমকাও না। খবর দিয়ে এসেছেন। কর্মচারীরা সবাই উপস্থিত, শশব্যস্ত। রাণী গঙ্গায় স্নান করেছেন। তারপর যখন কালীমন্দিরে এসেছেন তখন বেশ বেলা; পূজা শেষ। এখন শুদ্ধ বেশে শুদ্ধ চিত্তে তিনি ভবতারিণীর সামনেই বসে নিষ্ঠাভরে আহ্নিক-পূজা করতে করতে ছোট ভটচাজের কণ্ঠে রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রমুখ রচিত শাক্তগীতি শুনছিলেন। তার মধ্যে এই বজ্রপাত—অঘটন। বাইশ বছরের যুবা, মাত্র পাঁচ টাকা মাইনের কর্মচারী, রাণীর গায়ে হাত তুলে মেরেছেন, যাঁকে স্বয়ং ইংরেজ সরকার ঘাটাতে সাহস করেনা, সারা বাংলার লোক যাঁর নাম জানে, শ্রদ্ধা-সমীহা করে। আর যিনি তোমার মনিব!

মনিবের গায়ে হাত! কর্মচারীরা হৈ চৈ করে উঠল। এ অনাচার তারা সয় কী করে। দারোয়ান ছুটল ছোট ভটচাজের ঘাড় ধরতে। উল্কাবেগে খবর ছড়িয়ে পড়ায় যেখানে যত কর্মচারী ও লোকজন ছিল ছুটে এল ভবতারিণী মন্দিরে। বড় বাড় বেড়েছে তোমার ভটচাজ, তোমার

পাগলামি আজ ঘুচল বলে। হাঁ, বরাতজোরে কর্তাদের সুনজরে পড়েছিলে, তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শিখেছ! তায় মনিবকে অপমান! আর সে মনিব যে তোমার মায়ের বয়সী, প্রৌঢ়া নারী।

কিন্তু গোলমাল যা উঠল সবই ঐ মন্দির ঘরের বাইরে। ভিতরে নিস্তব্ধতা। অপরাধী ভটচাজ উন্মনা, উদাসীন, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। তাঁর মুখে ও আচরণে অপরাধবোধের ছায়া মাত্র নেই। বরং কী আশ্চর্য! অপরাধবোধের চিহ্ন ফুটে উঠেছে রাণীর মুখে। তিনি গম্ভীর, অপ্রতিভ। অনুতপ্তা। আর বিস্মিতাও। কী করে ছোট ভটচাজ জানলেন আমার মনের কথা! আমি যে মামলার বিষয় ভাবছিলুম, সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলা। এই মন্দিরে মায়ের কাছে বসে, আহ্নিক-পূজা করতে করতে মামলার ভাবনা! শ্যামাসঙ্গীতসুধা ফেলে বিষয়চিন্তা! অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি মা, তোমার কাছে। ক্ষমা করো মা। আর উনি যেন আজ বাবার মতো শাসন করলেন আমাকে। মেয়ে অন্যায় করলে বাবার কাজই তো তাকে শাসন করা। ছোট ভটচাজ আজ আমার ভুল ধরিয়ে দিলেন, ভুল শুধরিয়ে দিলেন। এমনটিই তো চাই।

কিন্তু রাণী বিস্ময় বোধ করছিলেন একটি কথা ভেবে। উনি জানলেন কেমন করে আমার মনের কথা। তন্ময় হয়ে যে গান গায় সে অপরের মনের কথা জানে কিভাবে? জানে কখন! তবে কি উনি সব জানেন, দেখতে পান মনেরও গোপন গতিবিধি!

এদিকে ভীড় বেড়েছে মন্দির দ্বারে। রাণীর মহিলা পরিচারিকারাও শশব্যস্ত, উদ্বিগ্ন। রাণী বুঝলেন, অনর্থ হবে। ওরা কেউ তো ভিতরের কথা জানে না, দুষবে ছোট ভটচাজকে। অপমান করবে। হয়তো মারধোর।

বিনম্রা অশ্রুরুদ্ধা রাসমণি মুখ তুললেন। এখন তিনি রাণী, গম্ভীর আদেশ-দাত্রী। হুকুম করলেনঃ ছোট ভটচাজ ঠিক কাজ করেছেন! তাঁর দোষ হয়নি। তোমরা তাঁকে একটি কথাও বলবে না। সাবধান।

কর্মচারীরা হতভম্ব। এত বড় ঘটনার এই ফল! এর পরও বহাল তবিয়তে থাকবে ছোট ভটচাজ। হায় ধনীর মন, ধনীর বিচার! তুচ্ছ কর্মচারীর হাতে কিল খেয়ে সে কিল হজম করা! কত তুকই না দেখব দিনে দিনে।

জল্পনা যাই হোক, রামকৃষ্ণ আপন স্বেচ্ছাচারে প্রতিষ্ঠিতই থাকলেন অবাধায়। রাসমণির মুখে সব ঘটনা শুনে মথুরবাবু শাশুড়ীর মতই মেনে

নিলেন। ছোট ভটচাজ সাধারণ মানুষ নয়। জগন্মাতার কৃপাপ্রাপ্ত। দেবস্বরূপধারী। মথুরবাবু নিজেও মন্দিরের কর্মচারীদের কাছে আদেশ পাঠালেন। ছোট ভটচাজ যেমন করছেন তেমনই করবেন। বাধা দিও না। হুঁশিয়ার।

কিন্তু সেদিন কেটে গেলে সব ঘটনা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ নিজে ব্যাকুল হয়েছিলেন। এ আমার কী অবস্থা হচ্ছে। রমণীর গায়ে হাত! স্বপ্নেও যা ভাবি না। মা, আমার এ অবস্থা কি ঠিক? আমি কি ঠিক পথে চলেছি? না ভুল হচ্ছে? আমি তো বুঝতে পারি না মা, আমাকে তুই শেখা। আমার যা কর্তব্য তা তুই আমাকে জানিয়ে দে, করিয়ে নে। সব সময় হাত ধর থাকে আমার।

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান। ভক্তের প্রার্থনা তিনি অপূর্ণ রাখেন না। বরং বাঞ্ছার চেয়েও একটু বেশিই জুগিয়ে দেন। তায় ভক্ত যদি হন স্বয়ং তিনিই। রামকৃষ্ণের প্রার্থনায় মা তাঁর হাত তো ধরেছিলেনই, বরং আর একটু বেশি, হৃদয়েরও হাত ধরলেন। হৃদয় যে রামকৃষ্ণকে ভালোবাসে, সেবা করে—সে সেবাপুণ্যবল তো কম নয়

বস্তুত রামকৃষ্ণের পূজাবসানকাল উপস্থিত হচ্ছিল! সব লৌকিকী প্রচেষ্টার পারে চলে যাচ্ছিলেন তিনি। সদাই এত বেহুঁশ থাকতেন যে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞানই লোপ পেয়ে যেত। পূজার ফুল-চন্দনে সাজাতেন নিজ দেহ। কালাকাল বিচার ছিল না। কখন পূজা, কখন ভোগ নিবেদন সে কালপারম্পর্য ভুল হয়ে যেত—আগেই হয়তো ভোগ দিয়ে বসে আছেন। সব সময় নিজ দেহের ভিতরে ও বাইরে দেখছেন মা। যদি তন্ময়তা হ্রাসের কারণে সে দর্শনে ক্ষণমাত্র বাধা পড়ত তবে ব্যাকুল হয়ে প্রাণ যায় অবস্থা হত। আছাড় খেয়ে ভূমিতে পড়ে মুখ ঘষতেন। কেঁদে অস্থির করে তুলতেন পাড়া। জলে না আগুনে পড়লেন থাকত না সে খেয়াল। লোকে বলত, শূলব্যথা উঠেছে বুঝি। আহা, ভারী কষ্ট তো! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মা দেখা দিতেন। তখন দিব্য হাসিতে ভরে যেত রামকৃষ্ণের মুখ। জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হত বদনমণ্ডল।

একদিন পূজার সময়ই মথুর হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে ভবতারিণী-মন্দিরে উপস্থিত। রামকৃষ্ণ আপন মনে পূজা করছিলেন, হঠাৎ উঠে পড়লেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থা। হৃদয়কে দেখতে পেয়ে তাঁর হাত ধরে টেনে এনে বসিয়ে

দিলেন নিজের পূজাসনে। মথুরবাবুকে বললেন: আজ থেকে হৃদয় পূজা করবে। মা বলছেন আমার পূজা তিনি যেভাবে নেন সেভাবেই হৃদয়েরও পূজা নেবেন।

মথুরও বুঝছিলেন যে ছোট ভটচাজের পক্ষে পূজাদির কাজ চালানো আর সম্ভব নয়। তিনি তখন এদিকের সব খবর পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতেন। খোঁজ নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তন্ন তন্ন করে। সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ঈশ্বরপ্রেম ও সরলতার জীবন্ত প্রতিমা রামকৃষ্ণ। অতীতেও যাঁরা ঈশ্বরপ্রেমিক সাধক ছিলেন তাঁদেরও আচরণ অনেক সময় পাগলেরই মতো দেখাত। তবে তাঁরা লৌকিক পাগল নন, দিব্যোন্মাদ।

একদিন দ্বাদশ শিবমন্দিরের একটিতে ঢুকে রামকৃষ্ণ মহিম্নঃস্তোত্র আবৃত্তি করছিলেন। আত্মহারা সে আবৃত্তিকালে যখন এই পংক্তিগুলি উচ্চারিত হল:

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী॥
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদাপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

মহাদেব! সাগর যদি হয় তোমার দোয়াত, হিমালয়ের মতো উঁচু স্তূপপুঞ্জ যদি হয় কালি, কল্পতরুর ডাল হয় যদি তোমার কলম, পৃথিবীপৃষ্ঠ হয় যদি কাগজ, আর স্বয়ং সরস্বতী হন লেখিকা, তবু অনন্ত কালব্যাপী তোমার গুণ বর্ণনা করে শেষ করতে পারবেন না তিনিও।

শ্লোক আবৃত্তি করতে করতেই শিবমহিমার জ্বলন্ত অনুভব হল রামকৃষ্ণের হৃদয়ে। বিহ্বল ব্যাকুল হলেন তিনি। উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন: মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব! গদগদ স্বরে এই কথা বারবার বলেন, আর চোখ বেয়ে নামে অশ্রুর বন্যা, ভেসে যায় বুক, দেহ। এমনকি পরণের কাপড় ও ভূমি হল সিক্ত। তাঁর পাগলের মতো কান্না ও প্রলাপ, চীৎকার শুনে ছুটে এল লোকজন। তারা বলতে লাগল: ছোট ভটচাজের পাগলামি আজ বড্ড বাড়ল রে। শেষে শিবের ঘাড়ে চড়ে বসবে না তো। বরং ওকে হাত ধরে টেনে আনি, সেই ভালো হবে।

হাসি মস্করাও করতে লাগল কেউ কেউ। রামকৃষ্ণ বেহুঁশ। কারও কোনো কথাই কাণে যাচ্ছে না তাঁর। শিবই সত্য; লোকজন ছায়াবৎ।

মথুর এসেছিলেন সেদিন। গোলমাল শুনে ঘটনাস্থলে এগিয়ে গেলেন।

রামকৃষ্ণের অমন ভাবাবস্থা দেখে তিনি মুগ্ধ। শিবমহিমা উপলব্ধি হয়ে যায় ওঁকে দেখলে। যারা বলছিল শিবের কাছ থেকে ওঁকে টেনে আনবে তাদের কথায় বিরক্ত হয়ে মথুর বললেন : যার মাথার ওপর আর একটা মাথা আছে, সেই যেন এখন ভটচাজকে ছোঁয়।

ফলে কর্মচারীরা নীরব ও নিশ্চেষ্ট হতে বাধ্য হল। কতক্ষণ পর বাহ্যচেতনা ফিরে এল রামকৃষ্ণের। চারদিকে এত লোক, মাঝখানে মথুর। তা দেখে বালকের মতোই ভয় পেলেন রামকৃষ্ণ। বলতে লাগলেন : আমি বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলেছি কি? মথুর তাঁকে প্রণাম করলেন। বললেন : না, বাবা, তুমি স্তব পাঠ করছিলে। এরা সব অবোধ, পাছে তোমাকে বিরক্ত করে, তাই আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি।

মথুর রামকৃষ্ণের ভাবগ্রাহী হয়ে উঠলেন। মথুর-চরিত্রের গুণসম্পদও সেজন্য দায়ী। এই মানুষটিতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছিল। তাঁকে যেমন তেমন খুশি বুঝিয়ে দেবার উপায় ছিল না। রামকৃষ্ণের এই প্রথম প্রধান সেবক ও জগন্মাতা কর্তৃক চিহ্নিত রসদদার মথুর-চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নেওয়া সঙ্গত।

গরীবের ঘরেই মথুরের জন্ম। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় সোনাবেড়ে গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। রাণী রাসমণি এই গরীবের ছেলেটিকে নিজের জামাই করেছিলেন তাঁর রূপগুণ দেখে। রাসমণির চার মেয়ে। ছেলে ছিল না। বড় মেয়ে পদ্মমণি। বরানগর সিঁথির রামচন্দ্র আটা (দাস)-র সঙ্গে ১৮১৮ সালে পদ্মমণির বিয়ে হয়। মেজো মেয়ে কুমারী। তার বিয়ে হয় প্যারীমোহন চৌধুরীর সঙ্গে। সেজো মেয়ে করুণাময়ী। এর সঙ্গে মথুরের বিয়ে হয়, তাই সেজোবাবু নামে তাঁকে ডাকা হত। ১৮৩১ সালে একটি মাত্র ছেলে রেখে করুণাময়ী মারা যায়। রাসমণি পরের বছর ছোট মেয়ে জগদম্বার সঙ্গে মথুরের বিয়ে দেন। মথুরকে রাসমণি এত পছন্দ করতেন যে তাঁকে সম্পর্কে বেঁধে রাখলেন।

গরীবের ছেলে, বিয়ের পর ধনী, ঘরজামাই মথুর কিন্তু কখনো চরিত্রের ভারসাম্য হারাননি। তিনি হিন্দু কলেজে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী ছিলেন। ইংরেজি বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, তার্কিক ছিলেন। তিনি ইয়ং বেঙ্গল যুগের মানুষ। হঠকারী ও ক্রোধপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু আবার ছিলেন বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল ও ধীরপ্রতিজ্ঞ। নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু ধর্মোপদেশ মাত্রই

মেনে নিতেন না। তাঁর যুক্তি ও বিচারবোধ প্রবল ছিল! কোনো কিছুই চোখ-কান বুজে তিনি মেনে নিতেন না। তা গুরুবাক্যও নয়। জমিদারসুলভ কূট বুদ্ধি ছিল। বিষয়কর্ম ভালো বুঝতেন, তাতে মনও ছিল। সম্পত্তি রক্ষা করতে ও বাড়াতে অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও পিছপা হতেন না। রাণীর ব্যবসায়, সম্পত্তি ও জমিদারি রক্ষণে মথুরবাবুই ছিলেন ডান হাত—বড় মেজো দুই জামাই এক্ষেত্রে রাণীর কাছে পাত্তা পেতেন না। রাসমণির বৈষয়িক সাফল্য ও ব্যক্তিত্বের দাপট মথুরের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল ছিল। মথুরের বুদ্ধি তাঁর কাজে লাগত। আবার এই মথুরের চরিত্রে সরলতা ও উদারতা গুণ দুটিও ছিল। মোটের ওপর মথুর ছিলেন এক সবলোন্নত, অত্যন্ত কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন রাশভারি চরিত্রের মানুষ—বিত্তৈষণার সঙ্গে উদার ভাবেরও চর্চা করতেন, ক্ষুদ্রমনা আদপেই ছিলেন না।

ইয়ং বেঙ্গল যুগের মানুষ, অতএব যুক্তিবাদে মথুরের আস্থা ছিল। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তিনি পাঠ নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণকেও তিনি যুক্তিবাদ শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন: ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। ঈশ্বর একবার যে নিয়ম করে দিয়েছেন তা রদ করবার ক্ষমতা তাঁরও নেই। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন: সে কি কথা, যার আইন, ইচ্ছে করলেই সে তা রদ করতে পারে। বা এক আইন পাল্টে আর একটা আইন করতে পারে।

মথুর॥ লালফুলের গাছে লালফুলই হয়, সাদা ফুল কখনো হয় না। কেননা তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন। কই, লালফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন করুন দেখি।

রামকৃষ্ণ॥ তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন, এও পারেন।

এই তর্ক হবার পরদিন ঝাউতলার দিকে শৌচে গিয়ে রামকৃষ্ণ দেখতে পান যে একটা লাল জবাফুলের গাছে একই ডালে দুটি ফেঁকড়িতে দুটি ফুল, একটি লাল, একটি ধপধপে সাদা। লালের চিহ্নমাত্র তাতে নেই। দেখেই ডালটি শুদ্ধ ভেঙে এনে মথুরের সামনে ফেলে দিয়ে রামকৃষ্ণ বললেন: এই দেখ। তখন মথুর স্বীকার করল: হাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে।

ঘটনাটি অবশ্য আমরা যে সময়ের কথা বলছি তার কিছু পরের কথা। কিন্তু এই ঘটনায় বোঝা যায় যে মথুর বিনা বিচারে রামকৃষ্ণকে মেনে নেননি।

মন্দিরে পূজা বা আর কোনো রকম কর্মেই রামকৃষ্ণের দায়িত্ব রইল না; মথুরবাবু তাঁকে সব কর্ম থেকে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু তাঁর সুযোগ সুবিধা

এক তিল কাটলেন না। বেতনের খাতায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নাম অক্ষত রইল, বাসের ঘর, অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা পূর্ববৎ রইল।

১৮৫৮ সালে রামকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই, ছোট কাকা রামকানাইয়ের বড় ছেলে রামতারক চট্টোপাধ্যায় ওরফে হলধারী চাকরির খোঁজে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। মথুর তাঁকে ভবতারিণীর পূজার ভার দিয়েছিলেন।

হলধারী ছিলেন শাস্ত্রবিৎ সাধক। ভাগবত, অধ্যাত্ম রামায়ণ ইত্যাদি বই তিনি নিত্য পাঠ করতেন। মত ও বিশ্বাসে তিনি ছিলেন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। কিন্তু শাক্তদ্বেষ তাঁর ছিল না। তাই ভবতারিণীর পূজার ভার নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি।

পশুবলিতে হলধারীর আপত্তি ছিল। ভবতারিণীর পূজায় বিশেষ বিশেষ তিথিতে ছাগ, এমনকি মহিষ বলি হত—এখনও হয়। বলি যেদিন হত সেদিন হলধারী মনঃক্ষুণ্ণ থাকতেন, আনন্দভরে পূজা করতে পারতেন না। হলধারী একমাস মাত্র ভবতারিণীর পূজা চালাবার পর একদিন ঐ বলির কারণে ক্ষুণ্ণমনে সন্ধ্যায় সন্ধ্যাবিধি পালন করতে বসেছেন এমন সময় দেখেন যে ভয়ঙ্করী মূর্তিতে ভবতারিণী বলছেন: আমার পূজা তুই করিসনে। করলে সেবাপরাধে তোর ছেলে মারা যাবে।

হলধারী ভাবলেন যে এ দর্শন ও আদেশ তাঁরই আপন কল্পনা। যত উদ্ভট ভাবনা! কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি তাঁর ছেলের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হতবাক হয়েছিলেন। তাহলে মাথার খেয়াল নয়—দেবাদেশ সত্য! রামকৃষ্ণকে সব ঘটনা বললেন হলধারী। মথুরকে বলে পূজকের রদবদল করা হল। হলধারী এলেন রাধাকান্ত-মন্দিরে। হৃদয় ফিরে গেলেন ভবতারিণী-মন্দিরে। এই কাহিনীটির উৎস হৃদয়ের ভাই রাজারাম মুখার্জি বলে জানিয়েছেন সারদানন্দ।

এই সব ব্যাপার চলা কালে রামকৃষ্ণের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছিলেন মথুর। রামকৃষ্ণের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব সম্পর্কে মথুরের সন্দেহ ছিল না। হলধারীও সে কথা তাঁকে বলেন। হলধারী মন্দিরের প্রসাদ খেতেন না। মন্দির থেকে সিধা নিয়ে স্বপাক করে খেতেন। মথুর তাঁকে বলেন, এ কষ্ট করার দরকার কী, তোমার ভাই রামকৃষ্ণ ও ভাগনে হৃদয় তো মন্দিরের প্রসাদ খায়! এ কথার জবাবে হলধারী বলেছিলেন: আমার ভাই রামকৃষ্ণের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা, তার কিছুতেই দোষ হবে না। আমার তো তেমন অবস্থা আসেনি, নিয়ম না মানলে আমার যে হবে নিষ্ঠাভঙ্গ দোষ।

মথুর খুশি হয়েছিলেন এ কথায়। হলধারী পঞ্চবটীতলে স্বপাকে খেতেন বরাবর।

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উচ্চ অবস্থা, কিন্তু তাঁর যে দিব্যোন্মাদের অবস্থা সেকথা মথুর বোঝেননি। কেউই বোঝেনি তখন পর্যন্ত। মথুর মনে করেছিলেন যে আধ্যাত্মিক উচ্চ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ ঈষৎ উন্মাদ রোগেও আক্রান্ত হয়েছেন ; তাঁর মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে। শাশুড়ী-মাকে চড় মারা মাথা খারাপের লক্ষণ বলেই তাঁর মনে হয়েছিল।

যাকে ভালোবাসি সে পাগল হলে আমরা তার চিকিৎসা করি। তাকে ত্যাগ করি না। মথুরবাবুও তাই করেছিলেন। সেকালে কলকাতার বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে রামকৃষ্ণের চিকিৎসার ভার দিয়েছিলেন মথুর। গঙ্গাপ্রসাদ রোগ সারানো দূরে থাকুক রোগ-নির্ণয় করতেও পারেননি। আরও যে চিকিৎসকরা এসেছিলেন তাঁরাও পারেননি। "পরিশেষে পূর্ববঙ্গনিবাসী একজন বিজ্ঞ কবিরাজ বলেন—সাধারণ লোকের ন্যায় এই মহাপুরুষের বায়ুরোগ নহে ; ইহা দিব্যোন্মাদ অবস্থা, কচিৎ কোনো ভাগ্যবানের সম্ভব হয়, সুতরাং আমরা ইহার প্রতিকার করিতে অপারগ।" (বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত)

কবিরাজের এই রায় মথুরকে হয়তো আশ্বস্ত করেছিল। হয়তো এই রায়ের আর কোনো প্রয়োজন বা গুরুত্ব তাঁর কাছে ছিলও না। কারণ তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাই ক্রমে তাঁর দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে তুলছিল। মথুরের বিশ্বাস ও ভক্তি রামকৃষ্ণের ওপর বেড়েই চলছিল। ক্রমে আসছিল শিষ্য ও শরণাগতের ভাব।

দুজনের বয়সের ব্যবধান ছিল বিস্তর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবয়স্ক সহপাঠী মথুর। তাই রামকৃষ্ণের চেয়ে অন্তত উনিশ-বিশ বছরের বড় ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনে রামকৃষ্ণের যখন অভ্যুদয় ঘটেছিল তখন তাঁর বয়স আটত্রিশ-উনচল্লিশ। প্রবীণ সংসারী মথুরের সে বয়সে রোমান্টিক হয়ে ওঠার কথা নয়। সে বয়সে মন বুদ্ধি একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও পরিণতি লাভ করে। এবং রামকৃষ্ণও তাঁকে অভিভূত করেননি। মথুরের অভিজ্ঞ দৃষ্টির সামনে শুধু ধীরে ধীরে ঘটেছিল তাঁর আত্ম-উন্মোচন।

সে আত্ম-উন্মোচনের আভায় সন্নিহিত অপর লোকের মনও আলোকিত হয়ে উঠত। বরানগর থেকে দুটি লোক আসত সে সময় রামকৃষ্ণের কাছে।

তারা ছোট জাত, কৈবর্ত বা তামলি। কিন্তু ভগভক্তি ছিল তাদের, আগমনের হেতুও তাই। রামকৃষ্ণের কাছে এলে তাদের ভক্তি ও ভাব বেড়ে যেত। একদিন পঞ্চবটীতে এদুজনের সঙ্গে বসেছিলেন রামকৃষ্ণ। তাদের ভিতর একজনের একটি অবস্থা হল ; বুক হয়ে উঠল লাল, চোখও লাল, চোখের জলের ধারা বইল, বাক্য রুদ্ধ। দুবোতল মদ খাইয়ে দিলে লোক যেমন মাতাল হয় তেমনি মাতালের মতো লাগতে লাগল তাকে। রামকৃষ্ণ লোকটির সে অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে মাকে বললেন : মা, একে কী করলি ? লোকে বলবে, আমি কী করে দিয়েছি। ওর বাপটাপ সবাই বাড়িতে আছে। এখনই ওকে বাড়ি যেতে হবে। লোকটির বুকে রামকৃষ্ণ হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর ঐরকম বলছেন। কিছুক্ষণ পর অবস্থা শান্ত হল লোকটির। প্রকৃতিস্থ হয়ে বাড়ি গেল সে।

এরকম একটি ভক্ত মানুষ লুকিয়ে ছিল মথুরের মধ্যেও। জমিদার তাঁর বাইরের রূপ, ভিতরে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবান বিশ্বাসবান। সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের দৃষ্টিতেই তিনি দেখেছিলেন একদিন এক অলৌকিক দিব্য নাটক।

দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরের উত্তর দিকে মথুরবাবুদের কুঠি বাড়ি ছিল। এখনও আছে। তার একতলার বারান্দায়—আসলে ঐটি ছিল বৈঠকখানা—মথুর বসে নানা কথা ভাবছিলেন। হয়তো জমিদারির কথাই। হয়তো কোনো কর্মপন্থা স্থির করছিলেন। সময় দিনের বেলা, সম্ভবত সকাল।

বিষয় ভাবনারত মথুরের বিপরীতে মন্দিরের উত্তর বারান্দায়—বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ কক্ষ সন্নিহিত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত উত্তর বারান্দায়—রামকৃষ্ণ বাহ্যবিষয়বিস্মৃত হয়ে যেন আবিষ্টভাবে পদচারণা করছিলেন। তিনি একবার পূবে যাচ্ছেন, আর একবার পশ্চিমে আসছেন। কোনো দিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঐ অবস্থায় মথুর তাঁকে লক্ষ্য করলেন। লক্ষ্য করতে করতে তাঁর চোখ বড় হয়ে গেল। এ কী দেখছি ? স্বপ্ন, না, দৃষ্টিবিভ্রম, না, সত্য ? মথুর চোখ রগড়ে নিলেন। সকালের সতেজ আলোয় চোখের ভুল হতে পারে না। রামকৃষ্ণ মন্দির-বারান্দায় পদচারণা করতে করতে যখন পূব মুখে আসছেন তখন আলুলায়িতকুন্তলা মা। যখন আবার ঘুরে পশ্চিমমুখো হয়ে চলে যাচ্ছেন তখন জটিলজটাভারসমন্বিত ব্যাঘ্রাম্বরধারী মহাদেব। এক দেহে শিব-কালী। মনুষ্যতনুতে যুগপৎ ব্রহ্ম-ব্রহ্মময়ী। ইষ্ট দর্শন হয়ে গেল মথুরের।

মথুর ভুলে গেলেন তিনি একজন প্রৌঢ় জমিদার। চারদিকে কর্মচারীরা ও লোকজন রয়েছে। স্থানকালপাত্রজ্ঞানরহিত হলেন মথুর। অশোভন ও অসঙ্গত কাজ করে বসলেন। ভক্তিগদগদ উচ্ছ্বাসে ভাবাবেগে মথুর ছুটে গিয়ে রামকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। সে দুটি রাঙা পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন তিনি। তাঁর কান্না শুনে লোকজন ছুটে আসতে পারে সে খেয়ালও রইল না।

বরং রামকৃষ্ণ মথুরকে সুস্থির করার চেষ্টা করলেন। বললেন : এ তুমি কী করচ? তুমি বাবু, রাণীর জামাই, লোকে তোমায় এসব করতে দেখলে কী বলবে? স্থির হও, ওঠো।

সহজে স্থির হননি মথুর। ক্রমে একটু স্থির হলে সব কথা খুলে বললেন তিনি। বললেন তাঁর অদ্ভুত দর্শনের কথা। বলেন আর কাঁদেন। রামকৃষ্ণ বললেন : কই, আমি তো কিছু জানি না বাবু। ভাবলেন : মথুরের এ অবস্থা যদি কেউ দেখে ফেলে আর রাণীকে গিয়ে বলে দেয় তাহলে কী হবে! রাণী হয়তো ভাববেন, ছোট ভটচাজ মথুরকে গুণ করেছে। অনেক করে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন মথুরকে।

চিরদিনের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন মথুর। আর তাঁর জীবনে ভরসার অভাব হবে না কোনোদিন। তাঁর কোষ্ঠীফল ছিল যে তাঁর ইষ্টের এমন প্রসন্ন কৃপাদৃষ্টি থাকবে তাঁর ওপর যে ইষ্ট মানুষ হয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরবেন। রক্ষা করবেন তাঁকে।

মথুরের বুক ফুলে উঠল গৌরব-গরিমায়। আমার ইষ্ট ৺মা কালী আমাকে কৃপা করতেই রামকৃষ্ণ তনুতে অবতীর্ণা। ঐ শ্রীমন্দিরে মৃন্ময় মূর্তিতে যিনি স্থির, রামকৃষ্ণ বেশে তিনিই চঞ্চল জঙ্গম। অচল তিনি চলছেন, অটল তিনি টলছেন, নঃ এজতি কৃপাভরে এজতি হয়েছেন। আর আমি মথুর? আমি তাঁর দাস, ভক্ত, শরণাগত।

রামকৃষ্ণও দাস। ঈশ্বরের দাস। শাস্ত্রে-পুরাণে দাস্যভাবের শ্রেষ্ঠ সাধক বলে হনুমানের নাম কীর্তিত। ঈশ্বরের দাস হতে হলে হনুমানের মতো হও। অথবা দাস্যভাবের জিম্মাদার হনুমানের কৃপাপ্রার্থী হও। রামকৃষ্ণ কলকাতায় এসে শ্যামা মায়ের শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর কৃপা পেলেন, সাক্ষাৎ পেলেন। কিন্তু কুলদেবতা রঘুবীর? তিনি কি নব পরিচয়ের আড়ালে চাপা পড়ে গেলেন? শ্যামা কি রুদ্ধ করে দিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামের দুয়ার?

তা হয় না। রামকৃষ্ণ এবার পিতৃপিতামহ-উপাসিত রঘুবীরের দর্শনের জন্য অধীর হলেন। রঘুবীর তাঁরও আবাল্য উপাসিত। রাম-সাধনায় দাস্যভাবই শ্রেষ্ঠ অবলম্বনীয়।

প্রণবঁউ পবনকুমার খল বন পাবক গ্যান ঘন।
জাসু হৃদয় আগার, বসহিঁ রাম সর চাপ ধর॥

(রামচরিতমানস বালকাণ্ড)

পবনকুমার হনুমানকে প্রণাম করি যিনি দুষ্টরূপী বনের বেলা আগুনসম, যিনি জ্ঞানে পূর্ণ, যাঁর হৃদয়মন্দিরে ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্র বাস করেন।

ঋষ্যমূক পর্বতে হনুমান যখন প্রথম রামচন্দ্রকে দেখতে পান তখন :

প্রভু পহিচানি পরেউ গহি চরনা।
সো সুখ উমা জাই নহিঁ বরনা॥
পুলকিত তন মুখ আব ন বচনা।
দেখত রুচির বেষ কৈ রচনা॥ (ঐ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

প্রভুকে চিনতে পেরে হনুমান তাঁর চরণে পড়লেন। (শিব উমাকে বললেন) পার্বতী! সে সুখ বর্ণনা করা যায় না। দেহ-পুলক-রোমাঞ্চিত। মুখে কথা নেই। রামের সুন্দর বেশরচনা হনুমান দেখতে লাগলেন।

তারপর হনুমান বললেন :

তব মায়া বস ফিরউ ভুলানা।
তাতে মৈঁ নহিঁ প্রভু পহিচানা॥

আমি তোমারই মায়ার বশে ভুলে ফিরছি। তাই প্রভুকে চিনতে পারিনি।

একু মে মঁদ মোহবস, কুটিল হৃদয় অগ্যান।
পুনি প্রভু মোহি বিসারেউ, দীনবন্ধু ভগবান॥

একে তো আমি মন্দ ও মোহবশ, কুটিল-হৃদয় ও অজ্ঞান, তারপর দীনবন্ধু ভগবান! তুমিও আমাকে ভুলিয়ে রেখেছ।

জদপি নাথ বহু অবগুণ মোরেঁ।
সেবক প্রভুহি পরৈ জনি তোরে॥
নাথ জীব তব মায়াঁ মোহা।
সো নিস্তরই তুম্হারেহিঁ ছোহা॥

নাথ! যদিও আমার মধ্যে বহু দোষ, তবু প্রভু! সেবককে ভুলবেন না।

নাথ! জীব তোমার মায়ায় মোহিত। তোমার কৃপাতেই সে মায়া থেকে নিস্তার পায়।

তা পর মৈঁ রঘুবীর দোহাঈ।
জানউঁ নহিঁ কছু ভজন উপাঈ॥
সেবক সুত পতি মাতু ভরোসেঁ।
রহই অসোচ বনই প্রভু পোসেঁ॥

তার ওপর রঘুবীর, দিব্যি করে বলছি, আমি ভজনের কোনো উপায় জানি না। সেবক প্রভুর ভরসায়, ছেলে মায়ের ভরসায় নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। প্রভুই সেবককে পালন করেন।

অস কহি পরেউ চরন অকুলাঈ।
নিজ তনু প্রগটি প্রীতি উর ছাঈ॥
তব রঘুপতি উঠাই উর লাবা।
নিজ লোচন জল সীঁচি জুড়াবা॥

এই বলে হনুমান নিজ দেহ প্রকাশ করে (কেননা এতক্ষণ তিনি ছদ্মবেশে ছিলেন) আকুল হয়ে রাম-চরণে পড়লেন। আনন্দে তাঁর হৃদয় ভরে গেল। তখন রঘুপতি তাঁকে উঠিয়ে বুকে নিলেন। নিজের চোখের জলে সিক্ত হয়ে নিজে জুড়োলেন।

সুনু কপি জিয় মানসি জনি উনা।
তৈঁ মম প্রিয় লছিমন তে দূনা॥
সমদরসী মোহি কহ সব কোউ।
সেবক প্রিয় অনন্য গতি সোউ॥

রাম বললেন, বানর! শোনো। তুমি মনে কিছু ভেবো না। তুমি আমার কাছে লক্ষ্মণের চেয়েও দ্বিগুণ প্রিয়। আমাকে সবাই সমদর্শী বলে। সেবক আমার প্রিয়, কেননা সে অনন্যগতি।

সো অনন্য জাকেঁ অসি, মতি ন টরই হনুমন্ত।
মৈঁ সেবক সচরাচর, রূপ স্বামি ভগবন্ত॥

হনুমান! অনন্য সেই যার বুদ্ধি থেকে এই বোধ কখনো টলেনা যে আমি সেবক, আমার স্বামী চরাচরব্যাপ্ত ভগবান।

রাম-হনুমানের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ তুলসীদাস এভাবেই দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধ বর্ণনা, কেননা তিনি নিজেই রঘুবীরের দাস্য বরণ করে সাধনা

করেছেন। বিনয়পত্রিকায় তিনি নিজেকে রামকো গোলাম বা রামের গোলাম বলেছেন। এই গোলামির পথেই তিনি পেয়েছিলেন রাম সীতা লক্ষ্মণের দিব্য দর্শন।

স্বামী সারদানন্দ রামকৃষ্ণের রাম-সাধনার পরিচয় দিতে গিয়ে ইঙ্গিতে তুলসীদাসের সূত্রটি যেন আমাদের ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উক্তি: "হনুমানের ন্যায় অনন্যভক্তিতেই শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ সম্ভবপর বুঝিয়া দাস্যভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্য তিনি এখন আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছুদিনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।" 'তিনি' অর্থাৎ রামকৃষ্ণ।

হনুমানের ভাব পুরো আরোপ করলেন রামকৃষ্ণ নিজের ওপর। তিনি হনুমান হয়ে গেলেন। রামকৃষ্ণ ভুলে গেলেন যে তিনি রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ওরফে গদাধর চট্টোপাধ্যায়, সাকিন কামারপুকুর, অধুনা দক্ষিণেশ্বর। হনুমান-চিন্তা এমন নীরেট সত্য হয়ে উঠল তাঁর জীবনে যে তিনি আহার করেন হনুমানের মতো, বিহার করেন সেইরূপ, ভাষা পর্যন্ত হয়ে গেল হনুমৎবৎ। পরণের ধুতিখানা পাকিয়ে করলেন লেজ আর তাই কোমরে বাঁধলেন। লাফিয়ে হাঁটতেন। খাদ্য ছিল শুধুই ফলমূল। তাও কোনো ফলের খোসা ফেলতেন না। খোসাসহই খেতেন। অনেকটা সময় কাটাতেন গাছে চড়ে। মুখে ছিল গম্ভীর হুঙ্কার: রঘুবীর, রঘুবীর। চোখ দুটি হয়ে গেল গোল ও চঞ্চল—হুপ হুপ করে হয়তো বা গাছের ডাল থেকে ডালে চলে যেতেন। ভাব এত গাঢ় হয়ে গিয়েছিল যে তার প্রাবল্যে দেহের অস্থি সংস্থানেও পরিবর্তন আসে। মেরুদণ্ডের শেষ ভাগ প্রায় এক ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছিল—লেজের সূচনা হয়েছিল। হনুমানভাব ছেড়ে আবার রামকৃষ্ণভাবে ফিরে আসার পর এই বর্ধিত অস্থি-অংশটুকু আবার হ্রাস পেয়ে ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছিল। মহাবীরের ভাবারোপ এত সফল হয়েছিল যে উপরোক্ত কার্যকলাপ তাঁকে ভেবেচিন্তে বা ইচ্ছা করে করতে হয়নি, আপনা-আপনি সব হয়ে যেত।

যেমন ভাব তেমন লাভ। রামহৃদয়বল্লভা সীতা দর্শন দিলেন রামকৃষ্ণকে। পঞ্চবটীতলে বসেছিলেন তিনি একদিন। এমনিই বসেছিলেন, কোনো ধ্যান বা চিন্তা করছিলেন না। এমন সময় সহসা কাছেই দেখলেন জ্যোতির্মণ্ডিতা মহিমান্বিতা এক নারী। দিব্য আবির্ভাব। আলো হয়ে গেল চারদিক সে আবির্ভাবে। পঞ্চবটীর সে গাছপালা, গঙ্গা ইত্যাদি সব যেন দ্যুতিময় হয়ে উঠল। রামকৃষ্ণ তখন সমাধি-অবস্থায় নেই, বাহ্যচেতনাতেই বর্তমান—তাই

এই সব পার্থিব দৃশ্যও তাঁর চোখ এড়ায়নি। আর ওই যে নারী তিনিও মানবী বটে, দেবীরূপ নিয়ে আসেননি। তাঁর কপালে আর একটি চোখ, তৃতীয় নয়ন, ছিল না। কিন্তু প্রেমে করুণায় দুঃখ-সহিষ্ণুতায় মাখা সে অমল আনন হার মানিয়েছে দেবীমুখকেও। ওজঃমণ্ডিত, গম্ভীর তাঁর আনন। দৃষ্টির প্রসন্নতায়ই তিনি যেন বিশ্বকে মুগ্ধ করে দিয়েছেন। শান্ত মন্থর পায়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে এগিয়ে এলেন তিনি রামকৃষ্ণের পানে। স্তম্ভিত রামকৃষ্ণ ভাবছেন : কে ইনি? এমন সময় উ-উপ্ শব্দ করে একটি হনুমান কোথা থেকে এসে লুটিয়ে পড়ল ঐ রমণীর চরণতলে। রামকৃষ্ণের মন বলে উঠল : সীতা, জনমদুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা!

'মা, মা' বলে অমনি রামকৃষ্ণ অধীর হয়ে হনুমানের মতোই ঐ মানবীর চরণতলে লুটিয়ে পড়তে যাবেন, এমন সময় বিদ্যুৎগতিতে ঐ নারী রামকৃষ্ণ-শরীরে প্রবেশ করলেন। আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন রামকৃষ্ণ। হারালেন বাহ্যজ্ঞান।

সীতা দেবী দর্শন দিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়। সেজন্য রামকৃষ্ণ কোনো চিন্তা বা ধ্যান করেননি, অন্ততঃ সে মুহূর্তে নয়। খোলা চোখে দর্শন হয়েছিল। তবে একেবারে অহেতুকও এ দর্শন ছিল না। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল জানিয়েছেন যে রামকৃষ্ণ একথা আগেই ভেবেছিলেন যে মায়ারূপিণী সীতা পরব্রহ্ম রামকে আবরণ করে রেখেছেন, তাই তাঁর প্রসন্নতা বিনা প্রাণারাম রাম-দর্শন অসম্ভব। সীতা তাঁর প্রসন্নতা ব্যক্ত করে যাবার পর একদিন শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেছিলেন রামকৃষ্ণ। কিন্তু পরে স্বমুখে তিনি একথা বলেছিলেন যে দর্শনাদির মধ্যে তাঁর প্রথম দর্শন জনমদুঃখিনী সীতার। তাই ফলস্বরূপ, আজন্ম তাঁকেও দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। পরে আরও বলেন : সীতার হাসি ছিল অতি মধুর; দর্শনের ফলে সে মধুর হাসিটিও তিনি পেয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ সূর্যদীপ্তিমণ্ডিত মহাবীর হনুমানও একদিন রামকৃষ্ণকে দেখা দিয়েছিলেন।

আজন্ম দুঃখভোগের হেতু হওয়া ছাড়াও রামকৃষ্ণজীবনে সীতার আবির্ভাবের তাৎপর্য হয়তো আরও ছিল। বাস্তবেই তাঁর জীবনে সীতার আবির্ভাব যে আসন্ন এই ক্ষণ-দর্শন তাও জানিয়ে গেল। সেই যে শিওড়ে একটি বালিকা আঙুল দিয়ে রামকৃষ্ণকে বর চিহ্নিত করে রেখেছে এখন বরণপাত্র নিয়ে তার আসার সময় হল। সে আসছে। সে না এলে তোমার এত সাধনা, তোমার এ মর্ত্যধামে আগমন-ব্রত যে সম্পূর্ণতা পাবে না। সেই বালিকা সারদা

উত্তরকালে আনমনে চকিতে এই স্বীকারোক্তিটি করেছিলেন যে যুগান্তরে তিনিই ছিলেন রামভদ্রা সীতা।

রামকৃষ্ণ এই সময় নিজস্ব একটি সাধনপীঠের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তার কারণ পঞ্চবটীতে একটি আমলকী গাছের নিচে বসে তিনি ধ্যান করতেন ; কাছের হাঁসপুকুর ঝালাতে গিয়ে তার মাটি এখানে ফেলা হয় ও পঞ্চবটীর সংলগ্ন নিচু জমি তাতে ভরাট হলেও ঐ আমলকী গাছটি মারা যায়। তখন একটি নতুন পঞ্চবটী স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন রামকৃষ্ণ। পুরনো পঞ্চবটীর পাশেই তিনি একটি অশ্বত্থের চারা রোপণ করেন ও হৃদয়কে দিয়ে বট, অশোক, বেল ও আমলকী চারা রোপণ করান। ছাগল গরুতে চারাগাছগুলি মুড়িয়ে খাবার চেষ্টা করত। খেয়েছিলও দুএকবার। তখন রামকৃষ্ণ চারাগাছ-গুলিকে রক্ষা করতে বেড়া দিয়ে ঘিরতে চান। তাঁর ইচ্ছাও মনে উঠেছে, আর তার কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল গঙ্গায় বান এসেছে আর সেই বানে বেড়ার জন্য দরকারী কিছু জিনিস যথা গরাণের খুঁটি, বাঁকারি, নারকেলদড়ি, এমনকি একখানি কাটারি ভাসতে ভাসতে এসে পঞ্চবটীর ধারেই গঙ্গাকিনারে এসে লেগেছে।

ভর্তাভারি নামে এক মালী ছিল মন্দির-বাগানের জন্য। ঐ জিনিসগুলি দেখতে পেয়ে ভর্তাভারিকে দিয়ে তোলালেন রামকৃষ্ণ। বেড়া দেওয়া হল। বেড়ার পাশে পাশে লাগানো হল তুলসী ও অপরাজিতা! রামকৃষ্ণ নিজেই এসব গাছের যত্ন করতেন, জলসেচ করতেন ও করাতেন। দেখতে দেখতে সব চারাই বড় হয়ে উঠল। তুলসী ও অপরাজিতার ঝাড় এত বাড়ল যে নতুন পঞ্চবটীতে বসে রামকৃষ্ণ যখন ধ্যান করতেন তখন বাইরে থেকে তাঁকে দেখাই যেতনা—এমন নিবিড় হয়ে উঠেছিল বন।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ভবতারিণীর জাগ্রত আবির্ভাবে যেমন জমজম করে উঠেছিল তেমনই তার খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল দূর দূরান্তে। ভারতের সকল প্রান্তের সাধুরা সেকালে গঙ্গার তীর বরাবর বাংলায় আসতেন গঙ্গাসাগরে যাবার উদ্দেশ্যে। আবার সাগরসঙ্গমে পুণ্য স্নানাদির পর তাঁরা পুরী অভিমুখে যেতেন জগন্নাথ দর্শনমানসে। এই যাওয়া ও ফেরার পথেই পড়ত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। সেসময় রেলপথ হয়নি, তাই এই হাঁটা পথই ছিল প্রশস্ত। সাধুরা একটানা পথ চলতে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে থাকেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছিল তাঁদের বিশ্রামের চিহ্নিত জায়গা।

এখানে তাঁদের সব সুবিধাই বর্তমান ছিল। গঙ্গাতীর, বাঁধানো ঘাট, প্রাতঃকৃত্য করার উপযুক্ত বন জঙ্গল, মন্দির থেকে প্রদত্ত প্রসাদ ও সিধা। তাই এখানে তাঁরা আসন করতেন। দুতিন দিন, অনেকে তার চেয়েও কিছু বেশি দিন থেকে যেতেন।

সাধুরা কেমন স্থানে আসন পাতেন সে সম্পর্কে সাধুদের মুখেই একটি গল্প শুনেছিলেন রামকৃষ্ণ। তাঁরা প্রথম দেখেন দিশা-জঙ্গল আছে কিনা, তারপর দেখেন অন্নপানির সুবিধা আছে কিনা। দিশা-জঙ্গল হল পায়খানা যাবার নির্জন স্থান। অন্নপানি হল ভিক্ষা। অন্নপানির অসুবিধা থাকলেও সাধুরা থেকে যেতে পারেন, কিন্তু দিশা-জঙ্গলের অসুবিধা থাকলে তাঁরা থাকেন না। জলকষ্ট থাকলেও থাকেন না। শৌচাদি করতে গিয়ে লোকনজরে পড়ার সম্ভাবনা কোনো ভালো সাধু মেনে নেন না। যত্রতত্র তাঁরা কাজ সারেন না। এ বিষয়ে তাঁরা গোপনতা রাখবেনই। গল্পটি এই নিয়ে।

ভালো ত্যাগী সাধু দেখবে বলে একজন লোক সাধু খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাকে একজন বলে দিয়েছিল যে যে সাধু লোকালয় ছাড়িয়ে দূর নির্জনে গিয়ে শৌচাদি করে সেই ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু। একদিন লোকটি এমন এক সাধুকে দেখতে পেল। তারপর সে তাকে লক্ষ্য করে ফিরছে সত্যই সাধুটি কেমন তা বিচার করার উদ্দেশ্যে।

ঐ দেশের রাজার মেয়ে সেসময় সাধুদের আড্ডায় এসেছিল। তার উদ্দেশ্য একজন যোগী পুরুষকে বিয়ে করা। কেননা শাস্ত্র বলেছে যে যোগীর পুত্র সৎ ও সাধু হয়। রাজার মেয়ের পছন্দ হল আমাদের পূর্বোক্ত সাধুটিকে। সে বাবাকে গিয়ে সব জানাল। রাজা দুলালীর কথা ঠেলতে না পেরে ঐ সাধুকে অনুরোধ করলেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে। সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বও তিনি দেবেন। সাধু চুপচাপ শুনল, তারপর কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গেল সে দেশ থেকে।

তখন প্রথম যে লোকটি ত্যাগী সাধু খুঁজছিল সে বুঝল যে ইনিই যথার্থ ত্যাগী সাধু, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। ঐ সাধুর কাছে গিয়ে শরণ নিল সে। শিষ্য হল তাঁর। এখন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছে উপদেশ পেয়ে ও গুরুর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়ে গেল তার জীবন।

যাত্রী সাধুরা বিশ্রামের স্থান হিসাবে সব দিক থেকে বিচার করে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির তথা রাসমণির বাগানকে উপযুক্ত স্থান মনে করতেন।

এক সাধুর মুখ থেকে আর এক সাধু, এক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আর এক সম্প্রদায়—এইভাবে সারা ভারতের সাধুসম্প্রদায় এই মন্দির ও বাগানের কথা জেনেছিলেন। ভারতের সব সাধুই জানতেন যে সাগরতীর্থ ও জগন্নাথধাম দেখতে যাবার পথে ডেরা করার একটি উত্তম স্থান এটি।

জহুরীই রত্ন চেনে। হীরের মূল্য তারই অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। গল্পে আছে, বাজারের বেগুনঅলা এক খণ্ড হীরের দাম দিতে চেয়েছিল নয় সের বেগুনে। বস্ত্রবিক্রেতা আরও কিছু বেশি দাম দিতে রাজি হয়েছিল। ব্যাপারীরা কেউই হীরে চেনেনি, তার যথার্থ দামও দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু যে মুহূর্তে একজন জহুরী হীরক খণ্ডটিকে দেখে তখনই সে তৎকালীন লক্ষাধিক টাকা মূল্যে ঐটিকে নিয়ে নেয়।

ভারতের সব সম্প্রদায়ের সাধু যখন দলে দলে আসতে থাকেন দক্ষিণেশ্বরে তখন তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ দুচার জন জহুরীও ছিল বই কি! সাধু মাত্রই পেট-ভাতের সাধু নয়। ঈশ্বরপ্রাপ্ত, ব্রহ্মজ্ঞ সাধুর সংখ্যা বেশি হয় না—কোটিকে গোটিকই মেলে তেমন জন। কিন্তু সাধন ভজনরত ঈশ্বর-অন্বেষু সাধুর সংখ্যা তো নেহাত কম নয়। সব ছেড়ে যারা পথে বেরিয়েছে শুধু তাঁরই খোঁজে, সাধুসম্প্রদায়ে তেমন লোক থাকে। তেমন সাধুরাও আসতেন দক্ষিণেশ্বরে।

এঁদের চোখে রামকৃষ্ণ ধরা পড়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখদের দ্বারা আবিষ্কৃত হবার সে অনেক আগের কথা। তখন রামকৃষ্ণের নাম প্রচারিত হয়নি বিদ্বৎমহলে। কলকাতার লোকরা তাঁকে জানত না। দক্ষিণেশ্বর গ্রামের লোকরাও তাঁকে চিনত না। রাসমণির কালীবাড়ির পুরোহিত একজন আছে এই মাত্র জানা ছিল। কাছে পিঠের লোকরা তাঁকে বলত পাগলা পুরুত।

কিন্তু সেই সময়ই, সিপাহী বিদ্রোহের ঝঞ্ঝা থেমে গিয়ে দেশে শান্তি ফিরে এলে পর, অতি নিভৃতে ভারতবর্ষের তাবৎ সাধু সম্প্রদায় রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তেইশ চব্বিশ বছরের যুবা, শাস্ত্রবাণী আওড়ায় না, কিন্তু ঈশ্বরদর্শী, প্রত্যগাত্মা, ব্রহ্মনির্বাণপ্রাপ্ত। অভিজ্ঞ যোগী ও ভক্ত সাধুদের দৃষ্টিতে আসল ও ঝুটা মাল ধরা পড়ে যায়। তাঁরা মধুলোভী অলি হয়ে রামকৃষ্ণ-পারিজাত পুষ্পে মধুপানে মত্ত হয়েছিলেন।

রাসমণির বাগানে তাঁদের ডেরা পড়ত কিন্তু এই আদত সাধুরা ভিড় করতেন রামকৃষ্ণের ঘরে। দিন রাত তাঁরা ও ঘরেই পড়ে থাকতেন। আর

দিবারাত চলত সৎপ্রসঙ্গ। আলাপ চলত ব্রহ্ম ও মায়ার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে। বিচার চলত যিনি অস্তি ভাতি ও প্রিয় তাঁর স্বরূপকথা নিয়ে। অস্তি অর্থাৎ যিনি আছেন, সৎ। ভাতি অর্থাৎ যিনি প্রকাশ পান, চিৎ! প্রিয় অর্থাৎ আনন্দপ্রদ, আনন্দস্বরূপ। সচ্চিদানন্দ অস্তি-ভাতি-প্রিয় নামেও প্রসিদ্ধ। ভাতি যে চিৎ তার কারণ প্রকাশ হওয়া জ্ঞানের স্বভাব। আমরা একটি জিনিসকে জানি, অর্থাৎ ঐ জিনিসটি আমাদের কাছে প্রকাশিত। যখনই একটি জিনিসের অস্তিত্ব বোধ হয় আমাদের কাছে, তখনই তা প্রকাশিত হয় আমাদের চেতনা-দ্বারে, আর আকর্ষণও করে আমাদের। এই অস্তিত্বের বোধ, প্রকাশ ও আকর্ষণ-আনন্দ যুগপৎ ঘটে; পৃথক পৃথক ভাবে, পরম্পরাক্রমে কালব্যবধানসহ ঘটে না। সৎ চিৎ ও আনন্দ একত্রে বর্তমান—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক ভাবে বর্তমান হন না। যা অস্তি তাই ভাতি তাই প্রিয়। সামনে দেখছ না রামকৃষ্ণকে? ওঁর অস্তিত্ব, ওঁর জ্ঞানস্বরূপতা তথা চৈতন্য-ময়তা, ওঁর আনন্দস্বভাব কি একই সঙ্গে উদিত হচ্ছে না তোমাদের মনে? ধরাতলে ওই তো অস্তি-ভাতি-প্রিয়ম্। উত্তর গীতায় কি বলেনি যে যে ব্যক্তি তোমার মন টানেন তাঁরই ভিতর পরমাত্মা নিজেকে জানান দিচ্ছেন, উঁকি দিচ্ছেন। যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পাদম্। তাঁর ভুবনভোলানো রূপ, তাঁর রসময় বিগ্রহ মানুষে দেখ। আর সে মানুষ যখন স্বয়ং তিনিই।

তোমরা ঈশ্বর-অভিসারী সন্ন্যাসীর দল। আকুল-ব্যাকুল হয়ে খুঁজছ তাঁকে। ধন জন গেহ পরিজন সব ছেড়ে এসেছ তোমরা। ছেড়ে এসেছ অতীতের বন্দর, হিসাব করোনি ভবিষ্যতের সঞ্চয় ও নিরাপত্তার কী হবে, ভাবোনি সুখবর্জিত এ বর্তমানে ক্লেশবরণে কী বা ফল। যোগে হোক, তন্ত্রে হোক, মন্ত্র আর ভাব-প্রেম-ব্যাকুলতায় হোক, অনন্যমনা, অনন্যকর্মা হয়ে তোমরা খুঁজে পেতে চাইছ পরম অভিষ্টকে। তোমাদের পথমাঝে বিশ্রামের ছায়া বিস্তার করে, তোমাদের অন্নপানি দিশা-জঙ্গলের ব্যবস্থা বিছিয়ে কে বসে আছে দেখ। কে সে তরুণ, কে সে নবারুণ। বেদেষু বেদ্য, বেদেরও যিনি বেদ্য—দেখ আদুল গায়ে এ গঙ্গাতীর উজ্জ্বল করে সেই পরম মানুষটি বসে আছেন।

পরম মানুষ; হোক পরম কিন্তু নির্ভেজাল মানুষই বটে—যেমন আমরা। আমাদেরই মতো রোগশোক ও দেহদুঃখাধীন। যাঁর সামনে বসে, যাঁকে নিয়ে অভিজ্ঞ প্রবীণ সাধুরা দিনরাত ধুম তর্কবিচার করেন তিনি এখন পেটের

অসুখে ভুগছেন, আমাশয়ে। বাহ্যে যাচ্ছেন মিনিটে মিনিটে। শৌচ করে আসতেই আবার। হাতের জল শুকায় না। এমনকি ঘর থেকে বেরোবার সামর্থ্য নেই, ফুরসৎ নেই। হৃদয় ঘরের কোণেই সরা পেতে রেখেছে, ওখানেই···। সেই যে ত্যাগী সাধুটির গল্প হয়েছিল—নির্জন স্থান ছাড়া যে প্রাকৃতিক কর্ম করেনা, তার দৃষ্টান্ত অচল হয়ে পড়ল। এখন সজনেই কাজ সারছেন যিনি ত্যাগীর ত্যাগী।

কিন্তু সাধুরা বিচলিত হলেন না, ঘৃণাবোধ করলেননা, তাঁদের জ্ঞানবিচারে ছেদও পড়ল না। ঐ অবস্থায়ও রামকৃষ্ণের উৎসাহে ভাটা নেই। তিনি সব ব্রহ্মবিচার শুনছেন, যোগ দিচ্ছেন ব্রহ্মোদ্যে। সাধুরা আলোচনাক্রমে হয়তো এমন কথায় এসে পড়েন যার কোনো মীমাংসা তাঁরা করে উঠতে পারেন না। ঐ আমাশয়ক্ষয়িত মানুষটিই কিন্তু মীমাংসাপুরুষ হয়ে দেখা দেন তদ্দণ্ডেই। তাঁর গেঁয়ো বাংলায় বলা কথা সহজে বুঝে নেন ভিনপ্রদেশী ভিন্ন ভাষী সাধুরা। নিষ্পত্তি হয়ে যায় তর্কের। বিবাদ মিটে আসে প্রশান্তি।

কত রকম সাধু আসেন এখানে দিনে দিনে! সন্ন্যাসী পরমহংস এলেন কতজন! একবার এলেন এক সাধু। মুখখানিতে সুন্দর জ্যোতি মাখানো। কেবল বসে থাকেন তিনি আর ফিক ফিক করে হাসেন। মুখে কথা নেই। ঘরেই বসে থাকেন। শুধু সকালে ও সন্ধ্যায় একবার করে ঘরের বাইরে আসেন আর গাছপালা, আকাশ, গঙ্গা সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, আর আনন্দে বিভোর হয়ে দু হাত তুলে নাচেন। কখনো বা হেসে গড়াগড়ি দেন, আর বলেন, 'বাঃ বাঃ ক্যায়া মায়া, ক্যায়সা প্রপঞ্চ বনায়া! অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কেমন মায়া ছড়িয়ে দিয়েছ। মায়ায় ঢেকেছ আপন মুখ। অথচ তুমি সুন্দর বলেই এ বিশ্বপ্রকৃতি হয়েছে সুন্দর! যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, সর্বং তং পরাদাদ্যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ। যে জগৎ ও আত্মাকে পৃথক বলে জানে জগৎ তাকে প্রতারিত করে। তাই, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনদং সর্বং বিদিতম্। ওরে মৈত্রেয়ী, একমাত্র আত্মাকেই দেখ, শোন, আত্মার কথা বল ও আত্মাকেই চিন্তা ও ধ্যান কর। আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা এই দৃশ্যমান সকলই বিদিত হয়। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ)।

দক্ষিণেশ্বরে আগত যে সাধুটির কথা বলেছি তিনি হয়তো ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যপন্থী। যোগী। তবে তিনি ছিলেন সিদ্ধ যোগী। তাঁর আনন্দ লাভ হয়েছিল—রামকৃষ্ণের উক্তি। আনন্দেই সৎ ও চিৎ বর্তমান। সৎ, চিৎ, আনন্দ যুগপৎ থাকে।

আর একবার এসেছিলেন এক জ্ঞানোন্মাদ সাধু। পিশাচবৎ। নগ্ন, গা-মাথায় ধূলিছাওয়া, লম্বা নখ চুল, মড়ার কাঁথা গায়ে। সাধু ভবতারিণীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ভবতারিণীকে দেখতে দেখতে এমন স্তব উচ্চারণ করলেন যে স্বরমহিমায় ও অর্থদ্যোতনায় মন্দির কাঁপতে লাগল। আর স্থখস্মিতা মা হাসতে লাগলেন।

তারপর কাঙালীদের পংক্তিভোজনে সাধু বসতে গেলেন। আপত্তি তুলল কাঙালীরাই। ঐ পিশাচটিকে কে কাছে বসতে দেবে? কাঙালীরা তাঁকে তাড়িয়ে দিল। পিশাচের ভ্রূক্ষেপ নেই। কাঙালীদের খাওয়া হয়ে গেলে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি যেখানে তারা ফেলল কুকুররা সেখানে পাতা চাটতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সঙ্গে পিশাচ সাধুও। বসেছেন একপাশে। কুকুরের ঘাড়ে হাত রেখে কুকুরের সঙ্গেই এক পাতা থেকে অন্ন খুঁটে খেতে লাগলেন তিনি। মানুষের বিরক্তি আছে, কুকুরের বিরক্তি নেই, ভয় নেই, ঘৃণা নেই—পিশাচের সঙ্গেই একপাতে খেতে লাগল তারা।

রামকৃষ্ণ বুঝলেন, এ সাধু পাগলও নয়, পিশাচও নয়—এ জ্ঞানময়, জ্ঞানোন্মাদ। বাহ্য বিষয়ে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই, অথবা সর্বত্রই তিনি ব্রহ্মকেই দেখেন। জগৎ ও আত্মাকে তিনি পৃথক দেখেন না। জগৎবস্তুতে আত্মা দেখেছেন বলেই বস্তু তাঁকে প্রতারিত করে না। উচ্ছিষ্ট অন্নও ব্রহ্ম। আর ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন না।

রামকৃষ্ণ চমকে উঠলেন। তবে কি জ্ঞানীর এই পরিণাম? এই পৈশাচিক রূপ? আমাকেও হতে হবে এরকমটি? এমনই কাঙালীদেরও ঘৃণ্য? সে যা হোক হবে তখন, এখন ওঁকে আর একটু জানা যাক। হৃদয়কে বললেন, এ যে জ্ঞানোন্মাদ সাধু রে!

ঐ কথা শুনে হৃদয় সাধুকে দেখতে এগিয়ে গেল। সাধু তখন মন্দির-সীমানা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। হৃদয় বহুদূর সাধুর পিছন পিছন গেল আর বলতে লাগল: মহারাজ, ভগবানকে কেমন করে পাব, কিছু উপদেশ দিন।

সাধু তার কথায় পাত্তা না দিয়ে এগোতে লাগলেন। তারপর হৃদয় যখন

কিছুতেই সঙ্গ ছাড়েনা, তখন পথের পাশের নর্দমার জল দেখিয়ে সাধু বললেন : এই নর্দমার জল আর ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে, সমান পবিত্র জ্ঞান হবে, তখন ঈশ্বর পাবি।

হৃদয় এটুকু উপদেশে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও কথা জানতে চাইল। সে বলল, মহারাজ, আমাকে আপনার চেলা করে সঙ্গে নিন। সাধুর মুখে কথা নেই। হৃদয় পিছু ছাড়ল না। বহুদূর এগিয়ে সাধু যখন দেখলেন যে হৃদয় প্রত্যাবৃত্ত হবেনা, তখন চোখ লাল করে পথের থেকে ইট কুড়িয়ে মারতে গেলেন হৃদয়কে। হৃদয় কিছুটা সরে আসতেই সাধু ইট ফেলে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন—হৃদয় আর তাঁকে দেখতে পায়নি।

রামকৃষ্ণ বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানী পরমহংস সাধু ইনি।

এ হল পরমহংস শ্রেণীর সাধু। অর্থাৎ জ্ঞানযোগসিদ্ধ। এই শ্রেণীর সাধু আরও এসেছিলেন। এঁদের যাওয়া-আসায় ভাঁটা পড়তেই আর এক শ্রেণীর সাধু আসতে লাগলেন। রামায়েৎ সম্প্রদায়ের ত্যাগী ভক্ত সাধু তাঁরা। ভক্তি ও বিশ্বাসে ভরপুর ছিলেন তাঁরা। ইষ্টের সেবায় নিষ্ঠা তাঁদের অতুলনীয়। তাঁদেরই একজনের কাছ থেকে রামকৃষ্ণ পেলেন রামলালাকে।

উত্তর প্রদেশে লোকে আদর করে বালক-বালিকাকে ডাকে লাল বা লালী বলে, যেমন বাংলায় দুলাল বা দুলালী। বালক রামচন্দ্র তাই রামলালা। রামায়েৎ সম্প্রদায়ের এক সাধু, নাম জটাধারী, শ্রীরামচন্দ্রের বালক ভাবের উপাসক ছিলেন। তার সঙ্গে থাকত অষ্টধাতুনির্মিত একটি বালক রামমূর্তি। কতকাল ইষ্টজ্ঞানে এই মূর্তির তিনি সেবা করে এসেছেন। যেখানে যেতেন, সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। যা ভিক্ষা পেতেন রেঁধেবেড়ে রামলালাকে ভোগ দিতেন। তাঁর ভক্তিতে, সাধনায়, স্নেহে, সোহাগে রামলালা হয়ে উঠেছিলেন জীবন্ত। যেন বাস্তব বালকটি। জটাধারী দেখতেন রামলালা সত্য খাচ্ছে, খেতে চাইছে, বেড়াতে যেতে চাইছে, আবদার করছে! খুনসুটিটি পর্যন্ত। জটাধারী প্রত্যক্ষ করতেন সে লীলা, আর আনন্দে বিভোর ও মত্ত হয়ে থাকতেন।

এই সাধু চলার পথে রাসমণির মন্দিরে এসে পড়েছিলেন। এসে পেয়ে গেলেন এক মনের মানুষ। তাঁরই মতো দৃষ্টিতে রামলালাকে প্রত্যক্ষ জীবন্ত দেখতে পান, ভক্তি করেন, স্নেহ ও আদর করেন এ তেমন একজন মানুষ। অতএব উভয়ের সখ্য হল। জটাধারী বেশ কিছুকাল থেকে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

রামকৃষ্ণ জটাধারীর কাছে বসে থাকেন চব্বিশ ঘণ্টা আর দেখেন ধাতু-বিগ্রহ থেকে বেরিয়ে আসা কৌশল্যানন্দন বালক রামচন্দ্রকে। দেখেন আর আকর্ষণ করেন। স্বেচ্ছায় নয়, আপনিই। রামলালাও ততক্ষণ সেখানে থাকে আর খেলাধূলা করে। আর যেই জটাধারীর কাছে বিদায় নিয়ে তিনি নিজের ঘরে চলে আসেন রামলালাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। রামকৃষ্ণ বলেন: বাঃ, তুমি বাবাজীর কাছে যাও. সে তোমাকে না দেখে থাকবে কী করে! কথা শোনে না রামলালা।

রামকৃষ্ণ ভাবতে চান: রামলালা জটাধারীর কাছেই রয়েছে, তাঁর কাছে আসেনি। কেন আসবে? জটাধারী কত ভালোবাসেন তাঁর ইষ্টকে, কত ভক্তিময় সেবা করেন, কতকাল যাবত পুজো করছেন, কী গাঢ় নিষ্ঠা তাঁর। তাঁর আরাধ্য ঠাকুর তাঁকে ফেলে কেন আসবেন রামকৃষ্ণের কাছে! ও যা দেখছি এ আমারই মনের খেয়াল!

কিন্তু কোথায় খেয়াল? রামলালা যে নাচতে নাচতে আসছে। একবার রামকৃষ্ণের সামনে গিয়ে নাচে, একবার পিছনে। কী আহ্লাদ! তারপর সে আবদার করে কোলে ওঠার জন্য। আবার রামকৃষ্ণ হয়তো তাকে কোলে করেই আছেন, সে চায় কোল থেকে নেমে ছুটোছুটি করতে। সে রোদে দৌড়োদৌড়ি করবে, কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাঁপাই জুড়বে। রামকৃষ্ণ বারণ করেন: ওরে, অমন করিসনি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে; ওরে, অত জল ঘাঁটিসনি, ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে, জ্বর হবে। কে শোনে বারণ! প্রাণচঞ্চল বালক আপন খুশিতে চলে, বড়র কথা শোনার তার ফুরসৎ নেই। বড়র মন ভোলানোর কত কৌশল সে জানে! পদ্মপলাশের মতো সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে রামকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসে সে। আর তার দুরন্তপনা আরও বেড়ে যায়। লাল ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে মুখ ভঙ্গী করে ভ্যাঙচায়। রামকৃষ্ণও এ দুর্বিনীত বালকের ওপর রেগে তেড়ে ওঠেন: তবে রে পাজি, রোস—আজ তোকে মেরে হাড় গুড়ো করে দেব।

শুধু কথায় তাড়না নয়, কাজেও। যুবক রামকৃষ্ণ একরত্তি বালক রামকে হিড়হিড় করে টেনে তোলেন জল থেকে। বা রোদ থেকে টেনে নিয়ে যান ঘরের ছায়ায়। অভিমানে বালকের মুখ হয়ে ওঠে ভার, কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়,—রামকৃষ্ণ তখন তাকে ভোলাতে বসেন এ জিনিস ও জিনিস দিয়ে। বলেন, খেলা কর না ঘরে বসে। আয়, আমিও তোর সঙ্গে খেলি!

বালকের দুষ্টামি থামেনা। বিরক্ত হয়ে রামকৃষ্ণ তার গায়ে চড় চাপড় মারেন। মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে সজল নয়নে রামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে থাকে বালক। তখন আবার রামকৃষ্ণের মনে কষ্ট! কোলে করে নিয়ে কত আদর করে তাকে ভোলান।

একদিন রামকৃষ্ণ স্নানে যাচ্ছেন, রামলালা বায়না ধরল যে সেও যাবে। গেল। তার গঙ্গাস্নান সেদিন আর শেষই হয় না—কিছুতেই ওঠে না জল থেকে। রামকৃষ্ণ যত বলেন, শোনে না সে! শেষে রাগ করে রামকৃষ্ণ তাকে জলে চুবিয়ে ধরে বলেন, তবে নে, কত জল ঘাঁটতে চাস ঘাঁট! তখন রামকৃষ্ণ দেখেন, জলের ভিতর হাঁপিয়ে শিউরে উঠেছে ছেলে। তার কষ্ট দেখে রামকৃষ্ণের কষ্ট শতগুণ। এ আমি কী করলুম—বলে জল থেকে রামলালাকে তুলে কোলে করে নিয়ে এলেন ঘরে।

একদিন বড় বায়না করছিল রামলালা, ভোলানো যায় না। ভোলাবার উদ্দেশ্যে খই খেতে দিলেন তাকে রামকৃষ্ণ। তার মধ্যে ছিল চারটি ধানসুদ্ধ খই। খই খেতে খেতে ধানের তুষ লেগে রামলালার নরম জিভ চিরে গেছে! তা দেখে রামকৃষ্ণের মনে পরম কষ্ট। ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি আর বালকের মুখখানি ধরে বলতে লাগলেন: যে মুখে ব্যথা লাগবে বলে মা কৌশল্যা ক্ষীর, সর, ননীও কত সন্তর্পণে তুলে দিতেন, আজ হতভাগা আমি সে কোমল মুখে এ কদর্য খাবার দিলাম। ধিক, এতে আমার সংকোচ পর্যন্ত হল না!

বহুকাল পর রামকৃষ্ণ যখন এ ঘটনাটি বিবৃত করছিলেন, বিবৃতিমুখে সেই পূর্বশোক উথলে উঠেছিল। আবার ফিরে এল পূর্বঅধীরতা। কথা বলতে বলতেই এমন ব্যাকুলভাবে কাঁদলেন তিনি যে তাঁর শ্রোতাদেরও চোখ ভিজে উঠেছিল সমবেদনায়।

বেশিদিনের কথা তো নয়। Age of Reason-এর মধ্যাহ্নবেলায় সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতার উদীয়মান বস্তুবাদী সংস্কৃতির আবহের মধ্যেই এই অপরূপ দেবলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দেবতার সঙ্গে দেবতার লীলা। এই মর্ত্যের ধূলিমাটিতে ঈশ্বরীয় লীলার এ অপূর্ব বিস্তার হয়তো অহর্নিশই ঘটে চলেছে—আমাদের দেখার চোখ ফোটেনি, তাই দেখি না। অথচ সে লীলা কত মানবিক। আমাদেরই গৃহ অঙ্গনে বড় ও ছোটরা মিলে যেভাবে প্রেমরস আস্বাদন করে এও তেমনি! ভগবান ও মানুষের এ মিলসূত্র তো উপেক্ষণীয় নয়।

এ কাহিনীটির একটি বিয়োগান্ত পরিণতি আছে। তা ঐ রামায়েৎ ভক্ত জটাধারীর দিক থেকে। তাঁর এতকালের আরাধ্য ও স্নেহশ্রদ্ধার পাত্র রামলালা যেন আঘাত দিয়ে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিল। জটাধারী এক একদিন নিত্য উপাসনা-অন্তে রেঁধে বেড়ে ধাতুবিগ্রহের সামনে ভোগ নিবেদন করে অপেক্ষা করেন। রামলালা আগেকার মতো আর খেতে আসে না। উদ্বেগ ও বেদনায় জটাধারী ছুটে আসেন রামকৃষ্ণের ঘরে। দেখেন, রামলালা সেখানে বসে খেলা করছে। তখন অভিমানে ফুঁসে ওঠার পালা জটাধারীরই। তিনি বলে উঠলেন : আমি এত করে রেঁধেবেড়ে তোকে খাওয়াব বলে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসে আছিস! ভুলে গেলি আমাকে! তোর ধারাই অমন, যেমনটি ইচ্ছা তেমনটি করবি, মায়া দয়া নেই একটুও! বাবা মাকে ছেড়ে বনে গেলি, বাপটা কেঁদে কেঁদে মরে গেল, তবুও ফিরলি না—তাকে দেখা দিলি না! কোনো কালে তুই কাউকে সুখী করিসনি, সকলকেই কাঁদিয়েছিস। কৃষ্ণ অবতারে পিতা নন্দ, মা যশোদা, ব্রজরাখাল, ব্রজগোপী সকলেই তোর আচরণে কেঁদে আকুল, সাধের গোকুল ডুবেছিল অন্ধকারে।

জটাধারী দুঃখে ক্ষোভে এত সব কথা বলে রামলালাকে টেনে নিয়ে যেতেন, খাওয়াতেন ভোগ-নৈবেদ্য। এমন এক দিন নয়, প্রায়ই হতে লাগল। সাধুর এক স্থানে বেশি দিন থাকতে নেই, সাধু হবেন রম্যমান। কিন্তু রামলালা রামকৃষ্ণকে ছেড়ে যেতে চায় না, আর তাকে ফেলে জটাধারীরও যাবার উপায় নেই। এইভাবে কত দিন কেটে গেল।

রামলালা তো শুধু বালক নয়, সে যে জটাধারীর ইষ্ট ও গুরু। ভক্তাধীন তিনি, তাই ভক্ত যেমনটি তাঁকে পেতে চায় তেমনভাবে ধরা দেন তাঁর কাছে। কিন্তু তাঁর ভক্ত রূপমোহে আবদ্ধ থাকে এও তিনি চান না। ভক্তের মোহ-মুক্তিও ঘটানোর দায়িত্ব তাঁর। তিনি যে ধাতুবিগ্রহ নন, পুতুল নন;—সজীব প্রাণময় প্রত্যক্ষ পুরুষ ও ভক্তের সঙ্গে গাঢ় সম্পর্কযুক্ত তা তো তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন জটাধারীকে। এখন জটাধারীরই পরম কল্যাণকল্পে তাঁকে রূপ থেকে অরূপে, ইস্টের ব্যক্তিরূপ থেকে নৈর্ব্যক্তিক রূপে, সীমাবদ্ধতা থেকে পরম ব্যাপ্তিতে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ জটাধারীর জীবনের এখন পরম শুভ লগ্ন উপস্থিত : সকল হৃদয়গ্রন্থি নিঃশেষে ছিন্ন হবার পালা! রামকৃষ্ণকে সামনে রেখে রামচন্দ্র তাঁর একান্তী ভক্তের সর্বমোহপাশ সর্ববন্ধন ঘুচিয়ে পরম ব্যোমের

ব্যাপ্তিতে নিয়ে গেলেন। অথবা রামকৃষ্ণের কৃপা-কটাক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠল এটা—জটাধারীর রামকৃষ্ণ-সংস্পর্শের সেই হয়তো মহৎ তাৎপর্য।

একদিন জটাধারী এসে সজলনয়নে রামকৃষ্ণকে বললেন : রামলালা কৃপা করে প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে যেমনভাবে দেখতে চাইতাম তেমনি করে দর্শন দিয়েছে ও বলেছে, এখান থেকে যাবে না ; তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে চায় না! আমার এখন আর মনে দুঃখকষ্ট নেই। তোমার কাছে ও সুখে থাকে, আনন্দে খেলাধুলো করে, তাই দেখেই আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই আমি। এখন আমার এমনটা হয়েছে যে ওর যাতে সুখ, তাতেই আমার সুখ! সেজন্য আমি এখন ওকে তোমার কাছে রেখে অন্যত্র যেতে পারব। তোমার কাছে সুখে আছে ভেবে ধ্যান করেই আমার আনন্দ হবে!

এই কথা বলে রামলালার ধাতুবিগ্রহটিকে জটাধারী তুলে দিলেন রামকৃষ্ণের হাতে। শূন্য হাতে বিদায় নিয়ে গেলেন তিনি। আর কোনোদিন ফিরে আসেননি। আসক্তির শেষটুকুও ত্যক্ত হয়ে গেল তাঁর চিত্ত থেকে।

প্রেমের পরাকাষ্ঠা-ভূমিতে আরোহণ করে গেলেন জটাধারী। এতদিন প্রেম ছিল, স্বসুখ বাসনাও ছিল। রামলালাকে পেয়ে দেখে ছুঁয়ে আমার আনন্দ! আজ আমার আর পৃথক কোনো আনন্দের প্রয়োজন নেই—ওর সুখেই আমার সুখ। আমার সব দাবী প্রত্যাহৃত : ইস্টের আনন্দস্ফূর্তিতেই আমার সম্পূর্ণ সার্থকতা। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। সাধু আজ কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।

রামকৃষ্ণসান্নিধ্য রামভক্তের প্রেমপূর্ণ হৃৎপদ্মটিকে যেন আরও উন্মীলিত হতে সাহায্য করল। তাঁর ভগবৎ প্রেম আরও নিষ্পাপ হল : শিশিরে-মাজা হয়ে তা আরও ফুল্ল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মধুময় পৃথিবীর পথে সাধু চলে গেলেন। যা মনে হয়েছিল বিয়োগান্ত তা হয়ে উঠল মিলন-মধুর।

বিগ্রহটি রামকৃষ্ণের কাছে রয়ে গেল। তিনি সে বিগ্রহের সেবাপূজা করতেন। তারপরও বহুদিন চলেছিল রামলালার সঙ্গে রামকৃষ্ণের দেবলীলা। মন্দির থেকে জগদম্বার বাল্যভোগ এলে রামলালাকে দিতেন তিনি—তারপর মন্দিরেই রাখলেন তাকে। কোনো কোনোদিন মন্দির থেকে কোলে করে রামলালাকে এনে নিজের ঘরে বিছানায় শোয়াতেন। বাৎসল্যভাবে দেখতেন

যে রামলালা তাঁর স্তন্য পান করছে, কখনো বা উঠেছে কাঁধে—কখনো রোদে ছুটোছুটি, কখনো গঙ্গায় নেমে হুল্লোড়। সে অনেক পরের কথা—তখন রামকৃষ্ণের বালক-যুবক ভক্তরা যাতায়াত করছে। তারা দেখত রামকৃষ্ণ ব্যগ্র হয়ে কাউকে বলছেন : ওরে জলে মাতিসনে, রোদে ছুটিসনে, অসুখ হবে, খেতে পারবিনে। এরকম কত কথা বলে তিনি যেন কাউকে আদর করে কাছে আনছেন—উপস্থিত ভক্তরা দেখত। তারপর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বিগ্রহটি দিয়ে আবার মন্দিরে পাঠিয়ে দিতেন!

রামলাল তখন ভবতারিণীর পূজারী। সে রামলালার পূজা-ভোগ দিত। একদিন সে ভুলে গিয়েছিল রাতে রামলালাকে শয়ন দিতে। রামকৃষ্ণ সেকথা জানতেন না। কিন্তু কিছুতেই সে রাতে তাঁরও ঘুম আসেনি। কেন ঘুম আসছে না তা বুঝতে পারেননি। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি করতে গিয়ে রামলাল তার ভুল দেখতে পায় ও রামলালার শয়ন দেয়। আপন ঘরে রামকৃষ্ণও সে মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়েন। প্রেম এত তাদাত্ম্য ঘটায়।

রামকৃষ্ণ-রামলালা লীলা চিরস্থায়ী হয়েছিল।

কিন্তু বহুকাল পর, ১৯৩৫ সাল নাগাদ ভবতারিণীর মন্দির থেকে ভবতারিণীর অলঙ্কারাদির সঙ্গে এই রামলালার অষ্টধাতুর মূর্তিটিও চুরি যায়। সে মূর্তি ফিরে পাওয়া যায়নি। তবে চোররা ধরা পড়েছিল, তাদের সশ্রম কারাদণ্ডও হয়। রামকৃষ্ণভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, যিনি রামকৃষ্ণ—রামলালার লীলার একজন সাক্ষী, তিনি এই বিগ্রহ চুরির সংবাদও জানিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে।

রামচন্দ্রের বালগোপাল রূপ দর্শন করেই রামকৃষ্ণের দেখা শেষ হয়নি। তিনি দেখলেন ওই রামই সর্বব্যাপী, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, রূপও বটে অরূপও বটে। তাই উত্তরকালে বলতেন :

> যো রাম দশরথ কা বেটা
> ওহি রাম ঘটঘটমে লেটা।
> ওহি রাম জগৎ পশেরা
> ওহি রাম সবসে নেয়ারা॥

রামচন্দ্র দশরথের পুত্র, আবার প্রতি জীবদেহে তাঁর অধিষ্ঠান। জগতে প্রবেশ করে তিনি জগৎ রূপে প্রকাশিত, আবার নির্গুণ স্বরূপে নিত্যই বর্তমান।

কথামৃতে বারবার পাই রামচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব কথন। আবার কৃষ্ণের বালগোপাল রূপের দর্শনেও আহ্লাদিত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। একদিন

ভক্তবৃন্দ সমক্ষে হরিনাম গাইতে গাইতে তিনি বলেন: ওমা, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করে রাখিসনি। ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা! আমি আনন্দ করব, বিলাস করব! কৃষ্ণ রে, তোরে বলব, খা রে—নে রে বাপ! কৃষ্ণ রে, বলব, তুই আমার জন্যে দেহ ধারণ করে এসেছিস বাপ!

জটাধারী চলে যাবার পর আরও একজন রামায়েৎ সাধু এসেছিলেন। তাঁর ছিল রামনামে একান্ত বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গে কিছুই ছিল না, ছিল শুধু একটি লোটা ও একখানি বই। বইখানিতে ছিল তাঁর অতিশয় আদর ও শ্রদ্ধা; ফুল দিয়ে রোজ পূজা করতেন ও এক একবার খুলে দেখতেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবার পর একদিন রামকৃষ্ণ বইখানি দেখতে চাইলেন। সাধু রাজি হল না, অনেক বলে রাজি করানো হল। বইখানি খুলে রামকৃষ্ণ দেখেন তাতে প্রতি পাতায় লাল কালিতে বড় বড় হরফে লেখা আছে: ওঁ রামঃ। ব্যাপার কী জানতে চাইলে সাধু বললেন: মেলা গ্রন্থ পড়ে কী হবে? এক রাম থেকেই তো বেদ পুরাণ সব বেরিয়েছে; আর নাম ও নামী অভেদ! তাই চার বেদ, আবার পুরাণ আর নিখিল শাস্ত্রে যা লেখা আছে সবই নিহিত আছে এক রাম নামে। তাই রাম নাম নিয়ে আছি! নামমহিমায় বিশ্বাসের বিগ্রহ সাধু।

রামায়েৎ সাধুদের কাছ থেকে রামকৃষ্ণ কয়েকটি রামভজন শেখেন। যেমন:

(মেরা) রামকো না চিনা হ্যায়, দিল, চিনা হ্যায় তুম্ ক্যারে।
আওর জানা হ্যায় তুম্ ক্যারে।
সন্ত ওহি যো রাম-রস চাখে
আওর বিষয়-রস চাখা হ্যায় সো ক্যারে
পুত্র ওহি যো, কুলকো তারে
আওর যো সব পুত্র হ্যায় সো ক্যারে॥

এবং

সীতাপতি রামচন্দ্র	রঘুপতি রঘু রাঈ
ভজলে অযোধ্যানাথ	দুসরা ন কোঈ॥
হসন বোলন চতুর চাল,	অয়ন বয়ান দৃগ-বিশাল।
ভ্রূকুটি-কুটিল তিলক ভাল	নাসিকা শোভাঈ॥
কেশরকো তিলক ভাল,	মানো রবি প্রাতঃকাল।

মানো গিরি শিখর ফোড়ি, সুরসরি বহিরাঈ ॥
মোতিনকো কণ্ঠমাল, তারাগণ উর বিশাল।
শ্রবণ-কুণ্ডল-ঝলমলাত রতিপতি-ছবি-ছাঈ ॥
সখা সহিত সরযূতীর, বিহরে রঘুবংশবীর।
তুলসীদাস হরষ নিরখি, চরণরাজ পাঈ ॥

রামকৃষ্ণ আরও গাইতেন :

রাম ভজা সেই জিয়ারে জগমে
রাম ভজা সেই জিয়ারে ॥

কিংবা

মেরা রাম বিনা কোহি নাহিরে তারণ-ওয়ালা !

সাধুদের কাছে শেখা এইসব ভজন ও দোঁহা রামকৃষ্ণ নিজ ভক্তদের শোনাতে ভালোবাসতেন। বলতেন সাধুরা চুরি, নারী ও মিথ্যা এই তিনের হাত থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচাতে উপদেশ দেয়। বলতেন :

তুলসীদাস এই দোঁহাটিতে কী বলছে শোন :

সত্যবচন অধীন্‌তা পরধন-উদাস।
ইস্‌সে না হরি মিলে তো জামিন তুলসীদাস ॥
সত্যবচন অধীন্‌তা পরস্ত্রী-মাতৃসমান।
ইস্‌সে না হরি মিলে, তুলসী ঝুট জবান ॥

ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন রামকৃষ্ণ : অধীনতা কী জানিস—দীনভাব। ঠিক ঠিক দীনভাব এলে অহঙ্কারের নাশ হয় ও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কবীরদাসও সে কথা বলছে গানে :

সেবা বন্দি আওর অধীন্‌তা, সহজ মিলি রঘুরাঈ।
হরিষে লাগি রহোরে ভাই ॥

নানা সম্প্রদায়ের, নানা মতের ও নানা যোগপন্থার সাধকরা দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। এঁদের মধ্যে হঠযোগীরাও ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে রামকৃষ্ণ হঠযোগ শেখেন। হঠযোগে সিদ্ধিলাভের পর হঠযোগের ফলাফল তিনি পছন্দ করেননি। হঠযোগ অবশ্য রাজযোগের সোপান হতে পারে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সে সোপান। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ বলতেন: হঠযোগের সাধনা এযুগের জন্য নয়। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অন্নগতপ্রাণ ; এখন

মথুর

হঠযোগের সাধনা করে শরীর দৃঢ় করা, তারপর রাজযোগের পন্থায় অদ্বৈতের ধ্যান—এত কাণ্ডের সময় কোথায় ?

হঠযোগ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মন করায়। তাতে মনঃসংযোগ সম্ভব হয়। হঠযোগ ও রাজযোগের মধ্যে পার্থক্য এই যে হঠযোগ শ্বাস নিয়ন্ত্রণকেই বড় করে দেখেছে, রাজযোগ চেয়েছে মনের নিয়ন্ত্রণ। মন শ্বাসপ্রশ্বাসের তুলনায় অধিক শক্তিশালী, তাই মন নিয়ন্ত্রণ করা গেলে শ্বাস-প্রশ্বাস আপনিই নিয়ন্ত্রিত হয়। রামকৃষ্ণ বলতেনঃ হঠযোগের সাধনক্রিয়া অভ্যাস করতে হলে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে নিরন্তর থাকতে হয় এবং আহার বিহার সব বিষয়ে গুরুর উপদেশ মতো কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়। নিয়ম পালনে সামান্য ব্যতিক্রম হলে শরীরে ব্যাধি আসে, এমনকি মৃত্যু হয় সাধকের। তাই এখন ওসবের দরকার নেই। প্রাণায়াম, রেচক কুম্ভক ইত্যাদির সাহায্যে বায়ুনিরোধ করার উদ্দেশ্য মননিরোধ। কিন্তু ভক্তিময় চিত্তে ঈশ্বরকে ধ্যান করলে মন ও বায়ু স্বতই নিরুদ্ধ হয়। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অল্পশক্তি; তাই ভগবান কৃপা করে ঈশ্বরলাভের পথ সুগম করে দিয়েছেন। স্ত্রী-পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যে ব্যাকুলতা ও অভাববোধ আসে, তেমন ব্যাকুলতা ঈশ্বরলাভের জন্য যদি কারও মনে আসে ও চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হয় তাহলে ঈশ্বর তাকে দেখা দেবেনই।

হঠযোগ দেহকেন্দ্রিক সাধনার কথাই বলেছে। নেতি-ধৌতি, অর্থাৎ শরীরের অভ্যন্তর ও বাইরের মল পরিষ্কার করার ওপর তার খুব ঝোঁক। এসব নিয়ে মেতে থাকলে দেহচেতনাই বাড়ে, ঈশ্বরে মন যায় না। দীর্ঘায়ু লাভ, নীরোগ স্বাস্থ্যলাভ এসব হয় প্রধান লক্ষ্য। রামকৃষ্ণ একথাও বলতেন।

বাংলায় অবশ্য হঠযোগ থেকেও বেশি প্রভাব তন্ত্রের এবং তন্ত্রাশ্রিত বৈষ্ণব সাধনার। বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্ব ও তন্ত্রের মৈথুন তত্ত্ব সাধকরা নিজেদের সুবিধা-মতো মিশিয়ে নিয়েছে, সহজিয়া দেহতত্ত্ব সাধনও মিশেছে তার সঙ্গে। ঈশ্বরলাভ উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু জীবনসম্ভোগও এই সাধকরা চায়। এদের অনেকেই আবার হয়ে ওঠে দুরাচারী, অসংযত ভোগলোলুপ—সাধনার নামাবলী গায়ে দিয়ে গোপন ভোগেই এরা তৃপ্তি খোঁজে।

রামতারক ওরফে হলধারী অবশ্য ভণ্ড ছিলেন না, ভক্তিমান বৈষ্ণবই ছিলেন এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার অধিকারীও ছিলেন—কিন্তু পরকীয়া

প্রেমতত্ত্ব ভাবমার্গে সাধন ছাড়াও বাস্তব দেহমার্গে সাধনও করেছিলেন তিনি। সাধকের গোপন স্ত্রীসংসর্গ লোকে ভালো চোখে দেখেনা, কারণ এ সাধনা নির্দোষ থাকেও না সব সময়, স্খলন পতন ঘটে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ও আশপাশের লোক সমাজে হলধারীর এবম্বিধ আচরণে কিছু কানাঘুষা উঠেছিল। কেউ তাঁকে ভয়ে কিছু বলতে পারতনা, কারণ লোকটি রাশভারী ও ক্রোধী। বাকসিদ্ধ বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল; যাকে যা বলবেন তাই ঘটবে। কে তাঁর কোপভাজন হবে?

হলধারী রামকৃষ্ণের খুড়তুতো দাদা, মন্দিরের বিষ্ণুপূজারী। তাঁর কুখ্যাতি রামকৃষ্ণ চাইলেন না। তাছাড়া অকল্যাণ থেকে হলধারীকে রক্ষা করার অভিপ্রায় ছিল তাঁর। ফলে একদিন তিনি হলধারীর কাছে কথাটা পাড়লেন। যা শুনেছেন খুলে বললেন, সতর্কও করে দিলেন কিছুটা। কিন্তু কোপনস্বভাব হলধারীর এতে কোপই বেড়েছিল। নিজ দুর্বলস্থানে অপর কেউ হাত দিলে সহ্য করা শক্ত হয় আমাদের পক্ষে। হলধারীরও তাই হল। তিনি ক্রোধভরে রামকৃষ্ণকে বললেনঃ কনিষ্ঠ হয়ে তুই আমাকে অবজ্ঞা করলি? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে!

অভিশাপ বাক্য। কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠের অভিশাপ, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের অভিশাপ। রামকৃষ্ণ হলধারীকে অবজ্ঞাও করেননি, কটুও বলেননি। তাঁরই হিতার্থে বিষয়টির প্রতি নজর আকর্ষণ করেছিলেন মাত্র। তাতেই এই অভিশাপ। বোঝা যায় হলধারী ভিতরে ভিতরে অসংযত অহঙ্কারী হয়ে উঠেছিলেন। রামকৃষ্ণ নানা মিষ্ট বাক্যে তাঁকে প্রসন্ন করতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

কয়েকদিন পর একদিন রাত আটটা-নটার সময়, হঠাৎ রামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। তালুদেশ থেকে সড়সড় করে রক্ত নামছে, মুখ দিয়ে পড়ছে ধারা। রক্তের রং কালচে, নিমপাতার রসের মতো মিশকালো; রক্ত তরলও নয়, বেশ গাঢ়। কতক মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল, কতক মুখের ভিতরেই জমে গিয়ে সামনের দাঁত বেয়ে ঝুলতে লাগল বটের ঝুরির মতো! রামকৃষ্ণ মুখের ভিতর কাপড় পুরে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করলেন, বন্ধ হল না। তখন ভয় হল তাঁর। [illegible] না কি এ রক্তস্রোত?

খবর শুনে ছুটে এল লোকেরা: ছোট ভটচাজের মুখ থেকে হল হল করে রক্ত বেরোচ্ছে! ছুটে এলেন হলধারী নিজেও। তিনি বিষ্ণু মন্দিরে বিগ্রহ

সেবার কাজ করছিলেন তখন—খবর পেয়ে শশব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একদিন সাময়িক ক্রোধ ও উত্তেজনায় অভিশাপ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তা কি এমন করে ফলতেই হবে! গদাই তাঁরই ছোট ভাই—তদুপরি সে মহা সাধক, সিদ্ধ! তাঁর অমঙ্গল তো হলধারী চাননি।

হলধারী সামনে আসতেই রামকৃষ্ণ বললেন: দাদা, শাপ দিয়ে তুমি আমার একি অবস্থা করলে বলো দেখি। কেঁদে ফেললেন হলধারী। মনের গোপনে হয়তো বা অহঙ্কারও উঁকি দিয়েছিল তাঁর। তাহলে আমার বাক্য সত্যই ফলে, বাকসিদ্ধ আমি? সে অহঙ্কার ধুয়ে গেল চোখের জলে।

বিধাতার বিধান, সেসময়ে মন্দিরে একজন বৃদ্ধ বিজ্ঞ সাধু উপস্থিত ছিলেন। গোলযোগ শুনে তিনিও এগিয়ে এসেছিলেন ব্যাপার কী জানতে। তিনি রক্তের রং আর মুখের কোন স্থান থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছে তা পরীক্ষা করে এক অদ্ভুত রায় দিলেন। বললেন: কোনো ভয় নেই। এ রক্ত বেরিয়ে গিয়ে মঙ্গল হয়েছে। রামকৃষ্ণ, তুমি যোগসাধনা করে থাক, তা আমি দেখেই বুঝছি। হঠযোগের সিদ্ধিতে আসে জড়সমাধি। তোমার জড়সমাধি হচ্ছিল। সুষুম্নাদ্বার খুলে গিয়ে শরীরের রক্ত মাথায় উঠছিল। কিন্তু তোমার একবার জড়সমাধি হলে আর তা ভাঙত না। ফিরত না তোমার বাহ্য চেতনা। শরীর ঐ অবস্থাতেই চলে যেত। কিন্তু তোমার শরীর পাত হোক তা ৺জগদম্বা চান না। তোমার শরীর অবলম্বন করে তিনি কোনো বিশেষ কাজ করাতে চান। তিনিই আজ তোমার শরীর রক্ষা করলেন। রক্ত মাথায় না উঠে মুখের ভিতর দিয়ে বেরোবার পথ আপনা-আপনি করে নিয়েছে তাই। বেঁচে গেলে তুমি। নিশ্চিত দেহরক্ষা থেকে বাঁচলে।

শাপে বর হল। হলধারী বিবেকদংশন থেকে অব্যাহতি পেলেন। মাতৃপ্রেমিক রামকৃষ্ণ হলেন আশ্বস্ত। মায়ের কাজ আমাকে দিয়ে করাবেন, তাই শরীর রক্ষা? আমারও যে আশ মিটিয়ে মায়ের পূজা সাঙ্গ করা বাকি।

এই ঘটনায় রামকৃষ্ণের হঠযোগ-সাধনার কথা প্রমাণিত হয়।

সেদিন ঘটনাস্থলে মথুর উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু এ খবর পরে তাঁর কাছে পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই। ভালোবাসা মানুষের মনে প্রিয়ের বিপদ চিন্তাই আগে আনে। এক নাগাড়ে চব্বিশঘণ্টা মানুষ যদি তীব্র গভীর চিন্তা করে—তাও দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, তাহলে অনুরাগীজন ভাবে, এঁর মাথাটা একটু হাল্কা করে দেওয়া যাক। ফিরিয়ে আনা যাক একটু সহজ

অবস্থায়, সহজ ভাবে। তারপর এইসব হঠযোগ সাধন, যা বিপজ্জনক। কিসে কখন কী হয়ে যায়, কে জানে। মানুষের তো একটু স্থানপরিবর্তন, বায়ু-পরিবর্তনও দরকার হয়! মথুর এসব কথা ভাবলেন রামকৃষ্ণ সম্পর্কে। বাবা ভাবোন্মাদ, ঘোর উন্মাদবৎ কখনো কখনো। বয়সে যুবক, সংসারের সহজ রসগুলি ভোগ করাও তো ওঁর দরকার। ওঁর দেহ মন শান্ত ও স্বাভাবিক করার জন্য কামারপুকুরে কিছুদিন না হয় বাস করে আসুন, নিজের মায়ের কাছে। মন্দিরে কোনো অভাব নেই ওঁর, অভাববোধও নেই—তবু মা! তাঁর স্নেহপরিচর্যার কি কোনো তুলনা আছে! কোনো বিকল্প!

প্রীতির আধিক্যে মথুরও হয়ে গিয়েছেন মায়ের মতোই ব্যাকুল। কিসে বাবা ভালো থাকেন, সুখে থাকেন, স্বচ্ছন্দে থাকেন,—এই মথুরের চিন্তা। প্রিয়ের মঙ্গলের জন্য যদি সাময়িক প্রিয়বিচ্ছেদ মেনে নিতে হয় তবে তা মেনে নেবেন মথুর। বাবা সুস্থ দেহে প্রসন্ন চিত্তে আবার ফিরে এলেই হল!

করেছে। কেননা সিংহাসন তো আগে উগ্রসেনেরই ছিল—কংস আপন পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হয়। এখন যার ধন তাকেই ফিরিয়ে দেওয়া হল। এই তো ন্যায়বিচার। লোকে ধন্য ধন্য করেছে কৃষ্ণের রাজনৈতিক বিচারপারদর্শিতা দেখে।

তবু নিন্দুকের তো অভাব হয়না কোনো কালে। তারা বলল: হাঁ, হয়েছে, কালে কালে কত দেখব, হাতী ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে কত জল। অতবড় দুর্ধর্ষ মানী রাজা কংস চালাত যে রাজ্য তা চালাবে ঐ পুঁচকে ছোঁড়া, যার বিদ্যেবুদ্ধি নেই কণামাত্র, 'ক' অক্ষর যার কাছে গোমাংসতুল্য। ছিল তো গোয়ালাদের পাড়ায়, গরু চরাত, ক্ষীরমাখন বিক্রী করত, লেখাপড়া তো শেখেনি। কথা সত্য। কৃষ্ণ গেল আচার্য সন্দীপনি মুনির কাছে অধ্যয়ন করতে। সেখানে ছয় বছর পাঠে সে সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়েছে। শুধু তাই নয়, আশ্চর্য ক্ষমতাও দেখিয়েছে। গুরুদাক্ষিণা দিয়েছে যমালয় থেকে গুরুর মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে এনে। তারপর কৃষ্ণ ঋষি ঘোরের কাছে করেছে বারো বছর যোগসাধনা। ঘোর বলেছেন: কৃষ্ণ, জেনে রেখো, এই মানবজীবন, এর সবটাই যোগ। প্রথম চব্বিশ বছর প্রাতঃসবন, তারপর আটচল্লিশ বছর মাধ্যন্দিনসবন, শেষের চুয়াল্লিশ বছর সায়ংসবন—গোটা জীবন ভরে চলবে তোমার সোমযাগ। এই গুরু-উপদেশ শুনে কৃষ্ণ হয়েছে অপিপাস—সর্ববাসনামুক্ত।

অধ্যয়ন শেষে, সাধনা শেষে কৃষ্ণ ফিরে এসেছে মথুরায়। প্রথম দশ বছর আট মাস বৃন্দাবনে, তারপর কিছুকাল মথুরায়, তারপর আঠারো বছর অধ্যয়ন ও তপস্যায়—এখন তার বয়স উনত্রিশ-ত্রিশ, পূর্ণ যুবক। আর এত সুদীর্ঘকাল তার আশাপথপানে দুচোখ মেলে বসেছিলেন বসুদেব-দেবকী।

মথুরায় রাজপ্রাসাদের চন্দ্রশালিকায় দাঁড়িয়ে একদিন কৃষ্ণ দেখছেন যমুনা নদী। যমুনা, সেই নীল যমুনা! ওর বহমানা স্রোতোধারার কলতান যে এক অনির্বচনীয় ভাষা শুনিয়ে যায় কৃষ্ণকে। এ স্রোত কি কালস্রোতও নয়! সে স্রোতোধারা বেয়ে উজানগঙ্গায় মন যে ভাঁটিয়ে যেতে চায়। সে কোন দূর কালের স্মৃতিসম্পদ চূর্ণ চূর্ণ রেণুর মতো উড়ে এসে পড়েছে মনের হৃদয়ের দুয়ারে। হা হা ব্রজবাসী। হা ব্রজের গাছপালা লতা তৃণ, হা ধেনু ও ধেনু বৎস, হা সরলা ব্রজ পিতামাতারা, সখাবৃন্দ, বাবা নন্দ মা যশোমতী, আমার গোপকুমারী গোপীগণ, হা আমার প্রাণসর্বস্ব রাধা! যমুনা, এ কোন

স্মৃতি উদয় করালে চিত্তপটে! বিরহবেদনা লুকিয়ে রেখেছিলাম এতদিন সযত্নে, রাজকর্তব্যানুরোধে, জীবনের দায়-দায়িত্ব প্রতিপালনের তাগিদে। আজ স্মৃতির শায়ক যে আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। পাপী কংস একবার মরেছিল। আমি যে মরণযন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ছি বারবার। ব্রজ বিনা আমার জীবন শূন্য। নিরর্থক। ব্রজবাসী আমার প্রাণ।

প্রশ্ন জাগে। ওহে মথুরানাথ, তুমি তো সর্বক্ষমতাশালী, সব পার; এমনকি যমালয়ে গিয়ে মরা মানুষকে ফিরিয়ে আনতে পার তুমি, রাজার রাজা তুমি, এতদিন পারনি কি শুধু একবার ব্রজে যেতে? সে ব্রজ কতদূর? ব্রজ তো মথুরামণ্ডলের মধ্যেই এক গ্রামাঞ্চল। সেখান থেকে প্রতিদিন সকালে গোয়ালা-গোয়ালিনীরা মথুরা নগরে এসে দুধ দধি বেচে আবার ঘরে ফিরে যায় বেলাবেলি—দূর তেমন নয়। কেন যেতে পার না তুমি সে দুয়ার থেকে অদূরে মাঝে মাঝে? যদি এত বড় রাজা হয়ে থাক যে সময় মেলে না তবে এতদিন অন্তত একবারও কি যেতে পারনি? সময় পাওনি কে শুনবে সে কথা, ও তো লোক ভোলানো ছল মাত্র। আর তাও না হয় মানলাম রাজকার্য বিষম দায়, সময় নেই, বেশ, তবে ব্রজজনকে কেন নিয়ে আসো না মথুরা নগরে, রাখনা নিজেরই কাছাকাছি কোথাও বসতি দিয়ে? জানো তো, কৃষ্ণবিহনে ব্রজজনের প্রাণপ্রদীপ নিভু নিভু হয়ে এসেছে। ওরা মরবে এবার।

যেতে পারিনা কেন প্রাণব্রজে শুনবে আমার সে মরম বেদনা? কাকে শোনাই? সবাই রাজাকে ছাখে, খোঁজ তো নেয়না রাজার মাঝে যে কাঙালটি আছে তার। শোনো তবে। কংসের ছিল দুই স্ত্রী, অস্তি আর প্রাপ্তি। বিধবা হবার পর তারা চলে যায় বাপের বাড়ি, আমি আটক করিনি শোকগ্রস্তা রাণীদের। তাদের বাবা মগধরাজ মহাবলশালী জরাসন্ধ। দুই পতিহারা কন্যা বাবার কাছে গিয়ে বহু কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লাগিয়েছিল আমার নামে। কংস নির্দোষ, কৃষ্ণ দুষ্ট। ষড়যন্ত্র করে কূটকৌশলে কৃষ্ণ মেরেছে কংসকে—এসব কথা। বলেছে চোখের জল মিশিয়ে। মেয়েদের কথা একতরফা শুনে ক্রোধী জরাসন্ধ আক্রমণ করেছে মথুরা আমাকে মারতে। পারেনি। বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে সে। মথুরা হল রাজধানী। দুর্গ ও সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত। বৃন্দাবন পাড়া গাঁ। সৈন্য নেই, দুর্গ নেই। আমি যদি বৃন্দাবন যাই চর মারফত খবর পাবে কংস। সে বৃন্দাবন আক্রমণ করবে।

কী দিয়ে সে পাড়া গাঁয়ে ঠেকাব তাকে? সে পাড়া গাঁ হবে ছারখার। কমলবনে মত্ত হস্তী ঢুকলে যা হয়, ব্রজে সসৈন্য জরাসন্ধ ঢুকলে ফল হবে তার চেয়েও মারাত্মক।

এমনকি জরাসন্ধ যদি জানতে পারে যে ব্রজ আমার প্রাণপ্রিয় স্থান তাহলে আমি সেখানে না গেলেও নিছক আমাকে দুঃখ দিতেই সে তছনছ করে দেবে ব্রজমণ্ডল। জ্বালিয়ে দেবে ঘরবাড়ি। মেরে ফেলবে ব্রজের পশুপাখি মানুষ। তাই ব্রজের নাম ভুলেও উচ্চারণ করি না মুখে। যাকে ভালবাসি তার কল্যাণচিন্তাই সবার আগে। সেখানে না যেতে পারার দুঃখ আমার মনে, কিন্তু সেখানকার অমঙ্গল হতে দেব না কোনো মতে। ভালবাসার ঋণশোধ হয় দুঃখবরণে। দ্বিতীয় পথ নেই। যেন জগৎ না জানে, জরাসন্ধ না জানে ব্রজজন কৃষ্ণের কে, কত আপনার।

বাবা নন্দ ব্রজের রাজা। ব্রজের নিরাপত্তা তাঁরও ভাবনার বিষয়। তাই তিনি বোঝেন আমার বৃন্দাবন না যাবার রহস্য। নন্দ রাজার প্রজারা সব গোয়ালা, যোদ্ধা নয়। জরাসন্ধের সৈন্যদলের প্রতিরোধে একান্ত অসমর্থ তারা। নন্দ বাবা, তাই পিতৃহৃদয় কী বস্তু তাও জানেন। নন্দ তো কৃষ্ণকে দশ বছর আট মাস পর্যন্ত একান্ত কাছে পেয়েছিলেন—নিজ ঘরে পুত্ররূপে। বাসুদেব ও দেবকী তো তা পাননি। আজ এতকাল পর যদি তাঁরা কৃষ্ণকে কিছুটাও কাছে পেয়ে থাকেন তবে এখনই তাঁরা তাকে ছাড়তে চাইবেন কেন? তাও ছাড়তে পারেন যদি কাজের প্রয়োজনে কৃষ্ণ কোথাও যায়। কিন্তু সে যদি বৃন্দাবনে যাবার কথা বলে তবে বাসুদেব-দেবকী অনুমতি দেবেন না। কাজের প্রয়োজনে কোথাও গেলে কাজ শেষে কৃষ্ণ ফিরে আসবে মথুরায়। কিন্তু বৃন্দাবনে গেলে আর সে ফিরবে না। বৃন্দাবন কৃষ্ণের কর্মভূমি নয়। রসভূমি। বৃন্দাবন সে ভুলে আছে কিভাবে আমরা জানিনা। এ বিস্মরণ কাটিয়ে দেবার সাহস আমাদের নেই। কাজ শেষ হয়। কর্মী মানুষ ঘরে ফেরে। প্রেমাস্বাদনের শেষ হয় না। তা নিতুই নবীন। যত আস্বাদন তত তৃষ্ণা। তৃষ্ণার শান্তি নেই, আস্বাদনেরও। কৃষ্ণ রাজকার্যে আছে। তার হুঁশ আছে। প্রেমরসে ডুবলে হুঁশ হারাবে। আর ফিরবে না।

আবার বাবা মার বিনা অনুমতিতে অথবা তাঁদের সঙ্গে ছলনা করে কৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে আসে নন্দ-যশোদাও সুখী হবেন না। তাঁরাও বাবা মা। কৃষ্ণেরই বাবা মা। তাই পিতৃমাতৃত্বের মর্যাদা তাঁরা জানেন। পিতামাতার

হৃদয় কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ওঠানামা করে তাও জানেন। পুত্র তাঁদের প্রাণে ব্যথা দিলে সে ব্যথার মর্ম-বিদারণত্ব তাঁদের অজ্ঞাত নয়। ব্যথা তাঁরা পেয়েছেন। কৃষ্ণের কাছ থেকেই পেয়েছেন।

কৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়েছিল অক্রুরের রথে চেপে তখন তার পিছনে পিছনে নন্দও গিয়েছিলেন। কংস বধের পর কৃষ্ণ বাবা নন্দকে বিদায় দিতে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এই বলে :

জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্।

বাবা, আমার সুহৃদ যাদবগণের সুখ বিধান করে আবার ফিরে যাব আমি ব্রজের আত্মীয়স্বজনদের দেখতে। পুত্রের সে প্রিয় বাক্য হল নাকি উপহাস মাত্র। আঠারো-উনিশ বছর চলে গিয়েছে তারপর। কৃষ্ণ ফেরেনি ব্রজে। তাই বলি, যদি অমন ধারাটি সে করে বসুদেব-দেবকীর সঙ্গে তাঁরা তা সইবেন কেমন করে। আমি নন্দ, আমার সুখের জন্য আমারই ভাই বসুদেব দুঃখ পাক এতো আমি চাইতে পারি না। আর বসুদেব-দেবকী যদি পুত্রের কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তবে যে হবে পুত্রেরই মহা অকল্যাণ। নন্দ-যশোদা কৃষ্ণের অকল্যাণ চায় না। অদর্শনের দাবদাহে পুড়ি আমরা সেও ভালো। কিন্তু বাছা কানাইয়ের অকল্যাণ! তা মানতে পারি না। ব্রজজন তো শুধু কৃষ্ণ চায় না, চায় কৃষ্ণমঙ্গল।

তাঁদেরই কৃপালোকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমরা শুধু তো রামকৃষ্ণকে চাই না, চাই রামকৃষ্ণমঙ্গল।

বেশ বেশ, এত তত্ত্ব তো বুঝলাম, কিন্তু কৃষ্ণ কি লুকিয়ে একদিন, কি অন্তত একটি বেলা ব্রজবাসীদের দেখা দিয়ে আসতে পারেন না? কাতর প্রাণগুলি তাহলে তো একটু শান্তি ও ভরসা পেত।

মিছে কথা! একটুকু দেখা পেলে বাড়বে দেখার পিয়াস। আঠারো-উনিশ বছরের বিস্তীর্ণ ব্যবধানে অদর্শন যদি বা সহ্য হয়েছে ক্ষণিকের দর্শনে দপ করে জ্বলে উঠবে বিরহের আগুন। বাতাস ছোট প্রদীপকে নেভাতে পারে, বড় আগুনকে বরং আরও তাতায়। ব্রজবাসীর, ব্রজগোপীর কৃষ্ণবিরহ বাড়বানল। দর্শন-কৃপার বাতাস লাগলে তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে নতুন প্রাণবেগে।

আচ্ছা, ব্রজের লোকগুলিকে মথুরায় এনে বসতি করাতে পারেন নাকি রাজা কৃষ্ণ? না পারেন না। ব্রজবাসীর দ্বারে হার হয়েছে স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপ

কৃষ্ণের। তিনি সব পারেন, পারেন না ব্রজজনকে মথুরায় ঠাঁই দিতে। কৃষ্ণের রসিকশেখর নামে কলঙ্ক হবে তাহলে। তিনি রসভঙ্গকারী বলে চির কুখ্যাত হবেন। মথুরায় তিনি ক্ষত্রিয়, দণ্ডপাণি, রাজবেশধারী। বৃন্দাবনে তিনি গোপ, নাটুয়া, বাঁশি বাজিয়ে। মথুরায় তিনি বৃষ্ণিদের পরদেবতা, বৃষ্ণীনাং পরদেবতা। বৃন্দাবনের গোপদের তিনি স্বজন—গোপানাং স্বজনঃ। আবেশে তফাৎ হয়ে যায় দুই স্থানে। মথুরায় রাজা-আবেশ, বৃন্দাবনে গোপ-আবেশ। মথুরায় যাদবরা নেয় তাঁর পদধূলি নিজেদের মাথায়। বৃন্দাবনে গোয়ালার ছেলেরা তাঁর কাঁধে চড়ে "হঠ ঘোড়া হঠ" করে। তারা দেয় নিজ পায়ের ধূলি কৃষ্ণের শিরে কৃষ্ণেরই রোগমুক্তির আশায়। কৃষ্ণ প্রণাম করলে জননী দেবকী ভয় পেয়ে যান—বৈকুণ্ঠেশ্বর প্রণাম করছে ক্ষুদ্র আমি মানবীরে? আর ওদিকে যশোদা কৃষ্ণের কোমরে শক্ত করে দড়ি কষে বাঁধেন! বাবা বসুদেব পুত্রকে আলিঙ্গন করার সাহস পান না—কারাগারে জন্মেই বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন কিনা! বাবা নন্দ নিজ পায়ের জুতা কৃষ্ণের মাথায় তুলে দিয়ে অনায়াসে বলেন—বাড়ি নিয়ে যা তো বাছা, আমি বনের পথে গোরু চরাতে যাই খালি পায়ে! কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসে ধন্য মানে মথুরাজন। কৃষ্ণপ্রসাদ পেয়ে হয় তারা সফলজন্ম। ব্রজজন কৃষ্ণের গলা জড়িয়ে ধরে নিজেদের মুখের উচ্ছিষ্ট দিয়েছে তার মুখে পুরে!

মথুরায় ঐশ্বর্যের খরস্রোত। ব্রজে মাধুর্যের স্বচ্ছ সলিল। দুই তো মেশে না। মেশাতে গেলে হয় রসভঙ্গ। প্রতিটি রসই আপন মহিমায় মর্যাদাবান। কারও মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ করেন না রসিকেন্দ্রচূড়ামণি! প্রতিটি রসকেই স্ব স্ব ধারায় বিকাশের পথ করে দেন তিনি।

রসরাজ জানেন বনের ফুলগুলিকে রাজধানীর গৃহ-অলিন্দের টবে এনে বসালে ফুলের জাত যায়। ব্রজকুঞ্জবনেই ব্রজরসের উচ্ছলন সম্ভব, রাজধানীর পাষাণবেদীতে তা হবে মলিন, শীর্ণ, শ্রীহীন, আহত।

কৃষ্ণের মনে আরও নিখুঁত বিচার আছে। তিনি ঘোর ঋষির যোগ্য শিষ্য, অপিপাস। অকামহত সূক্ষ্মতম তুলাদণ্ড নিয়ে তিনি বিচারে বসেন, অপক্ষপাতী তিনি। গীতায় তিনিই বলেছেন, চার রকম ভক্ত আছে তাঁর: আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী। জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আর্ত বা ফল-কামনাযুক্ত ভক্তও ভক্ত তো বটে। যে ভক্ত যেভাবে তাঁকে চায় তিনি সেভাবেই সে ভক্তের ভজনা করেন। বড় ভক্ত আছে বলে ছোট ভক্ত ফ্যালনা

নয় তাঁর কাছে। ব্রজজন যত প্রাণপ্রিয় হোক, মথুরাজনও তাঁর আদরের। তাদের উপেক্ষা করলে তাঁরই ভক্তবৎসল নাম যে লাঞ্ছিত হবে।

মথুরার ভক্তরা ছোটই বা কিসে! বাসুদেব-দেবকীর ভক্তিব্রত সাধনার কি তুলনা আছে! যমুনাতটে বংশীবটে কুঞ্জে কুঞ্জে মঞ্জুবঞ্জুল প্রেমগীতির মাধুর্য ভেদ করে ওঠে মথুরার অমানিশার কারাকক্ষের দীর্ঘ তপ্ত শ্বাস! কংসের শত অত্যাচারেও কত ভক্ত মথুরায় মাথা নোয়ায়নি, সন্ধি করেনি কৃষ্ণবিমুখ দুর্জনের সঙ্গে—কবে কৃষ্ণ আসবেন সেই প্রতীক্ষায় গোপন সংকল্প বুকে বয়ে কাটিয়েছে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘতর রাত। তারা কি ভক্ত নয়! যাদবগণ কি যদুপতির স্বজন নয়!

সত্য এ বিচার; যুক্তিতে ফাঁক নেই। তবু কৃষ্ণের মন আজ বিহ্বল। যমুনায় স্নান করতে গিয়ে একি হল! রাজসভায় বসে আজ রাজকার্য করতে পারছেন না কৃষ্ণ। কাজ অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়লেন তিনি। ইঙ্গিতে ডাকলেন সখা উদ্ধবকে। একান্তী কৃষ্ণভক্ত উদ্ধব। নিজের গুপ্ত কক্ষে গিয়ে উদ্ধবের হাতে হাত দিয়ে বসলেন কৃষ্ণ—গৃহীত্বা পাণিনা পাণিম্। বেদনায় টল টল কৃষ্ণের ভাবগম্ভীর মুখ। বৃষ্টিভারাবনত মেঘের মতো জলভরা কৃষ্ণের নয়ন দুটি। উদ্ধব অবাক। এমন রূপ কখনো দেখেননি কৃষ্ণের। উদ্ধবের আবাল্য বিশ্বাস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্। ভগবানের জন্য কেঁদে আকুল হয় বিশ্বনিখিল। আজ ভগবান এত ক্রন্দনোন্মুখ কাদের জন্য। কোন সে সুভগের দল। বিশ্বে এমন কোন ভক্ত আছে যে অলক্ষিতে থেকে ভগবানকেও ব্যাকুল করে তোলে? মথুরার ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের তেমন ভক্তের ঠিকানা জানা নেই।

ওগো বন্ধু দরদিয়া, আমি ব্রজবিরহকাতর। শুধু আজ নয়, সদাকাল! কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারিনা সেকথা কাউকে। বুকের ব্যথা বুকে চাপি। মথুরায় কেউ নেই যে ব্রজভাব সহৃদয়ে অনুধাবন করবে। অরসিককে রস নিবেদন করতে নেই। তুমি উদ্ধব, জগদ্বাসী তোমাকে জানে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত বলে। একমাত্র তুমিই হতে পার ব্রজভাবের অনুভাবী, যদি স্বচক্ষে গিয়ে একবার দেখে জেনে এসো যে ভক্তিরসে ব্রজবাসী অতুলন। তুমিও ন্যূন তাদের কাছে! আমি যে স্বপ্ন-সুষুপ্তিতেও তাদের নাম ধরে কাঁদি। জাগ্রতে সে কান্না রাজবেশে রাজকর্তব্যের নিচে লুকোই। তুমি যাও, যাও উদ্ধব—আমার খবর তাদের গিয়ে একবার দিয়ে এসো।

রামকৃষ্ণের উদ্ধব রামকৃষ্ণ নিজে। তাঁর ব্রজভূমি, তাঁর কামারপুকুরের লোকরা কবে থেকে তাঁকে ডাকছে। গোপনে, চোখের জলে অহর্নিশ আহ্বান করছে তারা প্রাণের দেবতাকে। আরও একজন ডাকছে অতি গোপনে, গূঢ় আকুতিতে। সে আকুতির ভাষা সে নিজেও জানেনা, বোঝেনা, স্ফুট করতে পারেনা। ক্ষীণা বালিকা। কিন্তু স্বরূপে রাধা। ব্রহ্মের ব্রহ্মময়ী। অগ্নির যথা দাহিকা। রামকৃষ্ণের সারদা। সম্পর্কটি কেমন? সেকথাও ব্রজে রওনা করাবার আগে উদ্ধবকে বলে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ:

বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥

ব্রজবল্লবীরা আমার আত্মা। ব্রজবল্লবীদের কৃষ্ণপ্রেমের নির্যাসমূর্তিই রাধা। এ যুগে, আমাদের ঐতিহাসিক কালে, সারদা।

বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি গ্রামের সাবেক বাসিন্দা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কার্তিকরাম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র) ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর (শিহড়ের হরিপ্রসাদ মজুমদারের মেয়ে) বড় মেয়ে সারদা! বাবা মাকে আগেভাগে জানিয়ে রেখে স্বয়ং ভগবতী বালিকা সারদা রূপে এসেছিলেন। গ্রামের রামহৃদয় ঘোষাল জাগ্রতচৈতন্যে বালিকা সারদাকে দেখেছিলেন জগদ্ধাত্রী রূপে। সেই জগদ্ধাত্রী ভগবতী সারদা জগৎপতিকে গোপনে ডাক পাঠাচ্ছিলেন। সে আহ্বান লঙ্ঘনের সামর্থ্য স্বয়ং পরব্রহ্মেরও ছিল না। রামকৃষ্ণকে আসতেই হল অনুত্তমা ব্রজবল্লবীর কাছে।

কামারপুকুর-জয়রামবাটি রামকৃষ্ণের ব্রজমণ্ডল একথা না হয় মানলাম, কিন্তু কলকাতা-দক্ষিণেশ্বর যে তাঁর মথুরা একথা বলল কে? তোমাদের রামকৃষ্ণ কি সেখানে কংসের মতো কোনো দুরাচারী পরাক্রমী রাজাকে বধ করেছে? হাতে নিয়েছে রাজ্য-পরিচালনভার? মথুরা-ব্রজের গতাগতির তুলনা রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে আনা কেন?

শুধু কলকাতা-কামারপুকুরে রামকৃষ্ণের গতাগতির সন তারিখ লক্ষ্য করলেই এ রহস্য ভেদে হয়ে যাবে। কলকাতায় তিনি এসেছিলেন ১৮৫০ সালে। কামারপুকুরে এবার ফিরলেন ১৮৫৮ সালের অক্টোবর মাসে।

এই কয় বছরে ভারতের ইতিহাস, জগতেরই ইতিহাস কোন খাতে বয়েছে তা আগেই কিছু কিছু আলোচনা করেছি। আরও একটু স্মরণ করা যাক।

১৮৫০ সালে ইয়োরোপে বাল্টিক থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। ওয়াটারলু যুদ্ধে নেপোলিয়ন হেরে যাবার পর ইয়োরোপে

যে প্রতিক্রিয়াশীলদের শাসন কায়েম হয়—মেটারনিক যার মধ্যমণি—ছত্রিশ বছর পর এই সময় তার মূল নড়ে যায়। করাসী বিপ্লব খতম হয়েছিল; রাজত্ব করছিলেন রাজা লুই ফিলিপ আর তার অতি রক্ষণশীল মন্ত্রী গুইজোট। বিপ্লবী জনতার তাড়া খেয়ে তাঁরা করাসী দেশ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ইংলণ্ডে—ফ্রান্সে দ্বিতীয় রিপাবলিক স্থাপিত হয়েছে।

ক্ষুদ্র হাঙ্গেরির এক অনামা ব্যক্তি লুই কেসুথ হাঙ্গেরির জনগণের মুখপাত্র হয়ে উঠলেন রাতারাতি—তিনি দাবী করলেন গণতন্ত্র ও অস্ট্রিয়ার শাসন থেকে মুক্তি। হাঙ্গেরিতে দেওয়া তাঁর ভাষণ ঢেউ তুলল অস্ট্রিয়ায় আর অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়। অস্ট্রিয়ায় গণউত্থান ঘটে গেল—গদি ছেড়ে পালিয়ে গেলন উনচল্লিশ বছর একটানা শাসনের পর প্রচণ্ড ধূর্ত ও ক্ষমতাশালী শাসক মেটারনিক, স্বদেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে। হাঙ্গেরি পেল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র।

অস্ট্রিয়ার শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল ইতালি। স্বাধীন হল জার্মাণী। গণতন্ত্র পেল বোহেমিয়া। এ সব ঘটনা ১৮৪৮ সালের, যে বছর কার্ল মার্ক্স লণ্ডন থেকে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' নামক যুগবিপ্লবের শ্রেষ্ঠ দিকনির্দেশিকা বাণী প্রকাশ করেন ও স্বয়ং ছুটে যান জার্মাণীতে আসন্ন বিপ্লব পরিচালনা করতে। এক বছরের মধ্যেই হাওয়া ঘুরে যায়, প্রতিক্রিয়া আবার জয়যুক্ত হয়, আবার অস্ট্রিয়া দখল করে হৃত রাজ্যগুলি। হাঙ্গেরি পরাস্ত ও কেসুথ নির্বাসিত, বোহেমিয়া দলিত, ইতালির ফ্লোরেন্স, ভেনিস ও রোমের রিপাবলিকগুলি খতম। জার্মাণীর ঐক্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র সবই শেষ হয়ে গেল। পুরনো শাসকরা ফিরে এলেন একে একে, প্রতিক্রিয়া আবার যেন গেঁড়ে বসল ইয়োরোপে। এসবই ১৮৪৯ সালের কথা।

কিন্তু যা যায় তা আর আসে না! দ্বিতীয় রিপাবলিককে খতম করে তারই প্রেসিডেন্ট লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্টি যখন তৃতীয় নেপোলিয়ন নাম ধারণ করে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য পত্তন করলেন তখন মার্ক্স লিখলেন ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে নিজেকে। কিন্তু প্রথম বার যা থাকে ট্রাজেডি দ্বিতীয়বার তাই হয়ে দাঁড়ায় প্রহসন। মূল নেপোলিয়ন বোনাপার্টি আর এই তৃতীয় নেপোলিয়ন এক নয়; প্রথম ও দ্বিতীয় সাম্রাজ্যও এক নয়। ইয়োরোপেও নব প্রতিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়াশীলতা আর মান পেল না। পরিবর্তনের ধারাকে রোখা গেলনা। প্রতিটি নবীন ও প্রগতিশীল সম্ভাবনা, ১৮৫০-৫৮ সাল কালে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যেমন করে বাড়ে তেমন করে বেড়ে উঠল, কালপতি যেন অতি

যত্নে তাদের রক্ষা ও বর্ধন করলেন। ১৮৪৮ সালে উত্থিত কিন্তু ১৮৪৯ সালে চূর্ণিত প্রতিটি নতুন শক্তি পরের দশকে বলসঞ্চয় করে আবার মাথা তুলেছিল। প্রতিটি শক্তিই সফল ও সার্থক হয়েছিল তারও পরবর্তী দশকে. ইয়োরোপের কংসরা পরাস্তই হয়।

ভারতে আর সব ঘটনা ছেড়ে দিলেও ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫০-৫৮ কাল সময়ে উদযাপিত হয়। সে সংগ্রামও তখনই সফল হয়নি, কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব খতম হয়ে যায়। তার চেয়েও বড় কথা, গোপনে গোপনে ভারতের স্বাধীনতার শক্তি আবার বলসঞ্চয় করে চলে। ইংরেজ রাজত্ব অবসানের নিশানা ১৮৫৮ সালের মধ্যেই মিলে গিয়েছিল।

রামকৃষ্ণই কি এসব ঘটিয়েছেন? ঘটিয়েছেন কালপতি, কালেশ্বর। রামকৃষ্ণই সেই পুরুষ—তাই তাঁকে বলে যুগদেবতা। যুগাবতারত্ব, যুগদেবতাত্ব তাঁর স্বরূপ নয়, তাঁর একটি বিভাব মাত্র। পুরুষোত্তমের এমন কত বিভাব থাকে!

রামকৃষ্ণ যখন কলকাতায় ঝামাপুকুর এলাকায় প্রথম এসে ওঠেন ও ঠনঠনিয়ায় নিত্য মা কালীকে গান শোনাতেন তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের তুঙ্গ অবস্থা। সে একদিন গিয়েছে যখন বার্মার ক্ষুদ্র আভা রাজ ভারতে কোম্পানীর গভর্ণর জেনারালকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজার উপঢৌকন রূপে তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে। পিণ্ডারি যুদ্ধে ব্যস্ত হেস্টিংস উপায়ান্তর না দেখে কাল হরণ করার উদ্দেশ্যে শুধু একথাই মাত্র লিখতে পেরেছিলেন যে রাজামশাই, এরকম একখানি পত্র পেলাম বটে, কিন্তু এ পত্র কি আপনার লেখা, না এ পত্র জাল!

জবাবে বর্মী সেনাপতিরা জয় করে নিয়েছে আসাম। জয় করেছে চট্টগ্রামের ব্রিটিশ এলাকা! তারপর চাকা ঘুরল এবং ১৮৫২ সাল নাগাদ বার্মার একটা বড় অংশই চলে এল ইংরেজদের দখলে। বার্মা ফ্রন্ট ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তার সামান্য আগে, ১৮৪৯ সালে, পাঞ্জাব এসে গিয়েছে ইংরেজের দখলে। শিখরা এখন ইংরেজানুগত। আফগানিস্থান শান্ত হয়েছে, আফগান-সিংহাসনে দোস্ত মহম্মদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, তিনি ইংরেজের বন্ধু। বৃথাই তাঁর সঙ্গে গোল পাকিয়ে ইংরেজ ক্ষতি স্বীকার করেছে অনেক। যাহোক এখন পরিস্থিতি সেখানে শান্ত ও অনুকূল। সিন্ধু প্রদেশ এসেছে ইংরেজের দখলে! আসমুদ্রহিমাচল ভারতে কোম্পানী-রাজের পতাকা উড়ছে পত পত করে।

সে রাজত্ব খতম হয়ে গেল চোখের নিমেষে! হোক সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতের প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ; কিন্তু তত ব্যর্থ নয়, কেননা কোম্পানীর রাজত্ব উচ্ছেদ হয়েছিল সে সংগ্রামের ফলেই। কংসপুরী কলকাতায় বা তার হাতার মধ্যে বসেই এই ক্রীড়াকৌতুক শেষ করে রামকৃষ্ণ পা বাড়ালেন তাঁর শৈশব-বাল্যের বৃন্দাবন পানে!

এবারের অবতরণে ভগবানের গোপন ইচ্ছা ভক্তহৃদয়ের রাজা হবার। তিনি দেশের রাজা হতে আসেননি। তাঁর হাতে না আছে অস্ত্র, না অঙ্গে রাজবেশের চিহ্ন। মাধুর্যে গড়া সত্তা এবার—শুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ! তায় একান্ত দীন ভাব। আমি সকলের দাসের দাস, দীনের দীন, সকলের নিচে, সকলের পিছে আমার ঠাঁই—রামকৃষ্ণের এই হল স্বভাব; 'আমি' বোধের অবশেষটুকুও না রেখে জীবন কিভাবে যাপন করতে হয় তা দেখাতেই তাঁর আসা। তাই ইংরেজ রাজত্ব উৎখাত করে নিজের রাজ্য-পরিচালনা-ভার হাতে নেওয়া তাঁর কাজ ছিল না—তিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষরা রাজবৃত্তের লোক নন। উপরন্তু পার্থিব বিষয় ও পার্থিব রাজত্ব তথা ঐশ্বর্য স্পর্শই করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। ধাতু ও টাকা স্পর্শ করতে পারতেন না তিনি, বিষয়ী লোক প্রণাম করলে তাঁর পা জ্বলত, গা জ্বলত। রামকৃষ্ণ কৃষ্ণাবতারের নকল তো নন—অভিনব, অচিন তিনি। তাঁর সঙ্গে উপমা দেবার কেউ নেই বলেই তো তিনি নিরূপম!

তবু মাধুর্যময়ের এক নিজস্ব মাধুর্যভূমি ছিল। সেখানে আছেন মা, বাল্যসহচর-সহচরীগণ, ধনী কামারণী, শ্রীনিবাস শাঁখারী—আর ওই যে অপরিচয়ের ঘেরাটোপে লজ্জাপটাবৃতা এক স্নিগ্ধা বালিকা। উনি শিবগেহিনী, কৃষ্ণবক্ষবিলাসিনী, গৌরী-রাধা-সারদা!

বাংলা ১২৬৫ সনের আশ্বিন বা কার্তিক মাসে (ইংরেজি ১৮৫৮, অক্টোবর) রামকৃষ্ণ ফিরলেন দেশে। ঠিক স্বাভাবিক মানুষটি নয়। চঞ্চল অথচ উদাসীন।

জগৎ ব্যাপারেই উদাসীন, তাই কোনো কাজে স্থির নয়, ঘরোয়া পরিবেশের বৈষয়িক কথা ও কাজ যেন তাঁর জন্য নয়। আবার এখানে যেমন মা চন্দ্রাদেবী, সেই দক্ষিণেশ্বরে ফেলে এসেছেন তেমনই আর এক মাকে, আদরিণী শ্যামা মাকে। তাই মা মা বলে মাঝে মাঝে কাঁদেন ব্যাকুল কণ্ঠে, চোখের জলে ভেজে অঙ্গ।

ব্যাকুলিতা হলেন চন্দ্রাদেবী। আমার এই নবীন যৌবনধারী পুত্র, কী

হল ওর? এ কোন রোগ, কোন ভাব—অজানা, তাই দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এল কুপিত বায়ু ঠাণ্ডা করার ঔষধ, হল শান্তি স্বস্ত্যয়ন ঝাড়ফুঁক। চন্দ্রার যা সাধ্য আর যা গ্রাম্যভাবে জ্ঞাত উপায় সে সবের আয়োজনে ত্রুটি হল না। কিন্তু গদাই যেমন তেমনই রইল। ভালো মানুষ, প্রকৃতিস্থই থাকে, কিন্তু কেন কেঁদে ওঠে মা মা করে তারই মধ্যে। আর এমন ভাবাবেশ যে বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। তখন সে বেহুঁশ। সুস্থ অবস্থায় সে কথা কয়, হাসে, রসিক, সখাদের বয়স্য, চন্দ্রার সেই সাবেক বালকটি। মায়ে-পোয়ে কত ভাব, কত আদর আবদার, কত মন জুড়োনো হাসি আনন্দ। সরল, সত্যপরায়ণ, মাতৃভক্ত, দেবদ্বিজে ভক্তি সম্পন্ন, বান্ধবদের সঙ্গে খোলামেলা। আবার ওই দেখ,—গম্ভীর, লজ্জাঘৃণাভয়শূন্য, স্থির পদক্ষেপে চলেছে ইস্ট-অভীষ্টের পানে, ধ্যানে-সমাধিতে বিলীন। পাড়া গাঁর লোকরা রায় দিল, উপদেবতা ভর করেছে আমাদের গদাইয়ের ওপর!

তাহলে উপদেবতা নামাও কাঁধ থেকে। আনো ওঝা। চন্দ্রা উদ্যোগ নিলেন। একদিন এক ওঝা এসে এক মন্ত্রপূত পলতে পুড়িয়ে শুঁকতে দিল। বলল, ভূত হলে পালাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু হলনা কিছুই। যথা পূর্বং তথা পরং।

এবার চট্টোপাধ্যায় বাড়িতে এলেন ঐ অঞ্চলের কয়েকজন প্রধান ওঝা। রাত্রিকাল। তাঁরা পূজা ও যথাযোগ্য অনুষ্ঠানাদি করে চণ্ড নামালেন। আবির্ভূত চণ্ড গ্রহণ করলেন পূজা ও বলি। প্রসন্ন হলেন। চণ্ড বললেন: গদাইকে ভূতে পায়নি, কোনো রোগব্যাধি নেই ওর। সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ ও—কিছু গোল নেই। তারপর সবার সামনে গদাধরকেই সম্বোধন করে চণ্ড বললেন: গদাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত সুপারি খাও কেন? বেশি সুপারি খেলে কাম বাড়ে।

গদাধর সত্যই বড় সুপারি-অনুরাগী ছিলেন। যখন তখন তাঁর মুখে সুপারি থাকত। কারণ তামাক তখনো ধরেননি, নেশার একটা দ্রব্য থাকে সাধকদের। কিন্তু চণ্ডের ঐ কথা শোনার পর সুপারি ছেড়ে দিলেন তিনি।

সুপুরি ছাড়লেন, কিন্তু সাধনা নয়। জগন্মাতা এখন সব সময়ই দর্শন দেন, বিচ্ছেদ নেই। তাই রামকৃষ্ণের মা-মা ব্যাকুলতাধ্বনি স্তিমিত হয়ে গেল। মা আর নয়নের ওপারে যাননা, মাকে সর্বদা পেয়েই আছেন রামকৃষ্ণ, তাই নিশ্চিন্ত, প্রসন্ন, পরিতৃপ্ত তিনি। সবল, সুস্থ, স্বাভাবিক, বয়স তেইশ বছর পূর্ণ হতে চলল।

ভূতির খাল ও বুধুই মোড়ল শ্মশান দুটির নির্জনতায় দিনরাতের বহু সময় কাটিয়ে আসেন রামকৃষ্ণ। সেখানে তিনি কী করেন? লোকেরা দেখেছে যে নতুন হাঁড়িতে রসগোল্লা ইত্যাদি মিষ্টান্ন রেখে শিবা ও উপদেবতাদের উদ্দেশে বলি নিবেদন করেন তিনি। শিবা শ্মশান-কালীর সহচর, উপদেবতারাও তাই হবে। শিবা অর্থ শৃগাল। বলি নিবেদন করা মাত্র তারা দলে দলে ছুটে এসে খেয়ে যায়। উপদেবতারাও আসেন। তাঁদের উদ্দেশে নিবেদিত মিষ্টান্নের হাঁড়িগুলি মুহূর্তে শূন্যে উড়ে যায়—যেন বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর সেই হাঁড়িগুলি মিলিয়ে যায় শূন্যে—আর দেখাই যায় না। রামকৃষ্ণ উপদেবতাদের দেখতে পান।

এক একদিন রাত হয়ে যায় দুপুর, ঘরে ফেরেন না রামকৃষ্ণ। মেজদাদা রামেশ্বর খোঁজ নিতে এগিয়ে যান শ্মশানের কিনার পর্যন্ত—পাড়াগাঁর নিশুতি রাত, শ্মশানে যেতে গা ছমছম করে। রামেশ্বর হাঁক পাড়েন: গদাই, গদাই—। রামকৃষ্ণ দাদার বিপদ-সম্ভাবনা এড়াতে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন উচ্চৈঃস্বরে: যাচ্ছি গো দাদা; তুমি এদিকে আর এগিও না, তাহলে ওরা তোমার অপকার করবে। এই 'ওরা' হল উপদেবতাগণ।

ভূতির খালের শ্মশানে রামকৃষ্ণ নিজের হাতে এ সময় একটি বেল গাছ লাগিয়েছিলেন। শ্মশানে ছিল একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। অশ্বত্থের নিচে বসে তিনি জপ ও ধ্যান করতেন।

সাধক রামকৃষ্ণের জীবনের এ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ গুরু জগজ্জননী স্বয়ং। তিনি সর্বদাই দর্শন দিয়ে রামকৃষ্ণের সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, সব কূট আন্তর সমস্যার মীমাংসা করছেন ও সাধন বিষয় উপদেশ দিচ্ছেন। তদনুযায়ী রামকৃষ্ণ প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলছিলেন।

এখন চন্দ্রা দেবী নিশ্চিন্তা। চণ্ডবাণী শুনেছেন, তা ছাড়া দেখতে পাচ্ছেন যে গদাই এখন স্বাভাবিক মানুষ। হাঁ, সে সব সময় ঠাকুর-দেবতা নিয়ে থাকে, শ্মশানে ঘোরে, গাত্রবস্ত্র ফেলে দিয়ে নগ্ন দেহে পূজা-উপাসনা ধ্যান করে, এ বিষয়ে শোনে না কারও মানা—কিন্তু এ সব তো নতুন নয়, এ গদাইয়ের চিরকেলে স্বভাব। এসব আচরণ বায়ুরোগজনিত নয়, স্বভাবজাত। এ ছাড়া সে আছে আমার সেই সরল বালকটি। নম্র, রঙ্গরসপ্রিয়, গ্রামীণ জন। তবু মায়ের বুক ঈষৎ টনটন করে যখন দেখেন যে ছেলে তাঁর সাংসারিক বিষয়ে উন্মনা, উদাসীন।

পুরুষের সংসার-ঔদাসীন্য কাটাবার একটাই চলতি ওষুধ আছে : বিয়ে দাও। বউ ঘরে এলে, বউয়ে মন বসলে কেমন না সংসারে উন্নতি করবে। করতেই হবে। ভাবতেই হবে টাকা পয়সার কথা।

কিন্তু বাড়িতে নতুন বউ আনার কথা যত আলোচনাই হোক, যেন গদাই না জানতে পারে। জানতে পেলে সে হয়তো বেঁকে বসবে। সে সন্ন্যাসী মানুষ, বিয়েতে মত দেবেনা সহজে। আগে পাত্রী ঠিক করো, পাকা কথা দিয়ে দাও পাত্রীপক্ষকে, তারপর মায়ের বচন গদাই ফেলতে পারবে না। মায়ের জবান সে রাখবেই, মাকে ছোট হতে দেবেনা লোকসমাজে, দেবেনা সে মায়ের মনে দুঃখ।

চন্দ্রা জানতেন না, তাঁর ছেলের অগোচর কিছু থাকে না ত্রিজগতে, তাঁর দৃষ্টি ও শ্রুতির আড়ালে কিছু নেই। গদাই সব জানলেন। এবং মা-দাদাকে অবাক করে দিয়ে, নিজের বিয়ের প্রস্তাবে তিনি রাজি তো বটেই, আগ্রহী। উৎসাহী। হবেন না? গৌরী আমাদের ফ্যালনা নয়। শিব-গৌরীর মিলনের জন্য একা গৌরী তপস্যা করেননি। তপস্যার প্রেরণা জুগিয়েছেন শিব স্বয়ং।

মা-দাদা ভাবলেন, যাক তাহলে তো আর কোনো বাধা নেই, এবার পাত্রী স্থির করা যাক। চারদিকে বলা-কওয়া হল, ঘটক আনল পাত্রীসংবাদ, কিন্তু পাত্রী আর স্থির হয় না। হয় মনোমত হয় না, নতুবা পাত্রীপক্ষ বেশি পণ দাবী করে! তখন ও অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পাত্ররাই পণ দিয়ে বউ ঘরে আনত। কোনোমতেই যখন পাত্রী-সমস্যার সমাধান হল না, চন্দ্রা ও রামেশ্বর কুণ্ঠিত বিরস চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন।

মুস্কিল আসান করলেন রামকৃষ্ণ নিজে। তিনি বললেন: মা, অত খোঁজা-খুঁজি কিসের, জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখুজ্জের মেয়ে যে কুটো বাঁধা আছে। সেখানে দেখ তো।

কুটো বাঁধা কথাটির একটি অর্থ ছিল সেকালে। পাড়াগাঁয়ে কারও ক্ষেতে শশা ইত্যাদি কোনো ফল ফললে সবচেয়ে ভালো ফলটি ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে রাখত। ফলটি বড় হলে যথাসময়ে পেড়ে দেবোদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা হত। পাছে উৎসর্গিত ফলটি চিনতে ভুল হয়ে যায় তাই কাঁচ অবস্থায় কুটো বেঁধে রাখা হত। এক্ষেত্রে, কথাটির তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে জয়রামবাটির রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা পূর্ব থেকেই রামকৃষ্ণের জীবনসঙ্গিনী নির্বাচিতা। ঐ উদ্দেশ্যে সে উৎসর্গিতা। দেবতারাই তাঁকে ঐভাবে রক্ষা করে এসেছেন।

চন্দ্রা ও রামেশ্বর লোক পাঠালেন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। খবর এল, হাঁ, আর সব একরকম, কিন্তু পাত্রীর বয়স বড় কম। বয়স পাঁচ। গদাইয়ের এখন চব্বিশ চলছে। এ বিয়ে যে বড় বেমানান হবে।

কোনো ওজর টিঁকলনা। এ ভগবান-ভগবতীর প্রাক-নির্ধারিত বিবাহ। তাঁদের স্বতঃই মিলন, বিচ্ছেদ নেই। তাই অল্প কথায় সব স্থির হয়ে গেল। বিবাহে কন্যাপক্ষকে তিনশত টাকা পণ দিতে হয়েছিল। এই উপলক্ষে পাত্র ও পাত্রীপক্ষের বংশলতিকা দেওয়া গেল:

পাত্রপক্ষ

মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়

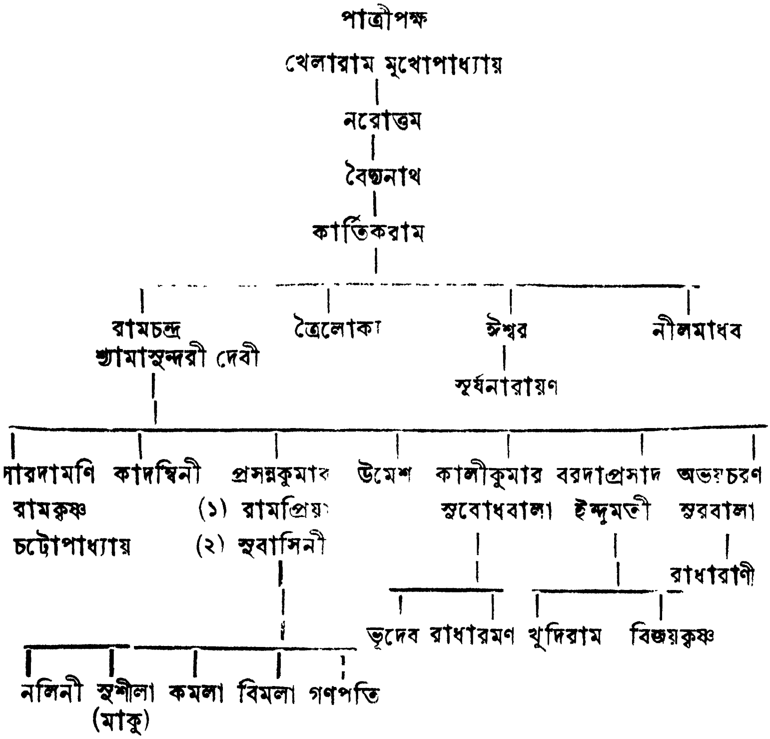
- ক্ষুদিরাম — চন্দ্রমণি দেবী
- রামশীলা — ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়
  - রামচাঁদ
  - হেমাঙ্গিনী — কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
    - রাঘব
    - রামরতন
    - হৃদয়রাম
    - রাজারাম
- নিধিরাম
- রামকানাই
  - রামতারক ওরফে হলধারী
  - কালিদাস
    - দীননাথ
    - রামদাস
    - হরমণি

ক্ষুদিরাম
চন্দ্রমণি দেবী

- রামকুমার
  - অক্ষয়
- রামেশ্বর — শাকম্ভরী দেবী
  - রামলাল
    - নকুলেশ্বর
    - জগদীশ্বর
    - হরিহর
  - লক্ষ্মী
  - শিবরাম
- কাত্যায়ণী — কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়
  - সারদাচরণ
  - শীতলমণি
- রামকৃষ্ণ — সারদামণি
- সর্বমঙ্গলা — রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের বংশ জয়রামবাটি গ্রামের অতি প্রাচীন বংশ। বিষ্ণুপুরের রাজার দানপত্র ছিল তাঁদের নামে। তা দেখে এইচ. ডসন তাঁদের নিষ্কর জমি ভোগ করার জন্য ছাড় ও তায়দাদ দেন। এই গ্রামেই মুখোপাধ্যায়দের দৌহিত্র বংশ বন্দ্যোপাধ্যায়রা আছেন।

জয়রামবাটি গ্রামেই রামকৃষ্ণ-সারদার শুভ পরিণয় হয়। ১২৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে এই বিবাহ হয়। অর্থাৎ বৈশাখের শেষার্ধে বিবাহ হয়েছিল। সঠিক তারিখ জানা নেই। পাত্রের বয়স তেইশ বছর তিন মাস, পাত্রীর বয়স পাঁচ বছর চার মাস :



বিবাহের কাল সম্পর্কে সারদার স্মৃতিতে শুধু এই কথাটুকু ধরা ছিল : "খেজুরের দিনে আমার বিয়ে হয়, মাস মনে নেই। দশ দিনের মধ্যে যখন কামারপুকুর গেলুম তখন সেখানে খেজুর কুড়িয়েছি। ধর্মদাস লাহা (কামারপুকুরের লাহাদের বাড়ির কর্তা) এসে বললে, এই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ? সুষ্যুর (জ্ঞাতি ভাই) বাপ (এঁর নাম ঈশ্বর মুখোপাধ্যায়) কোলে করে আমাকে কামারপুকুর নিয়ে গিয়েছিলেন।"

আর বিবাহের দিন রামকৃষ্ণকে জয়রামবাটি এনেছিলেন রামেশ্বর।

এই জয়রামবাটি গ্রামের জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কালীর সঙ্গে

রামকৃষ্ণের বিবাহের কথা উঠেছিল। ঘটক ছিলেন হৃদয়ের দাদা। পাত্র পাগল বলে জয়রাম রাজি হননি। তাঁরই খুড়তুতো ভাই রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এরপর পুরা বিবাহের বর্ণনাটি অক্ষয়কুমার সেন রচিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" থেকে উদ্ধৃত করছি। সে বর্ণনা অতি মনোহর:

বিবাহের সব কথা করি স্থিরতর।
রামেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন খবর॥
পুলক অন্তর তেঁহ শুভ সমাচারে।
দিন করি স্থিরতর কুটুম্বের ঘরে॥
পাঠাইল নিমন্ত্রণ লিখন করিয়া।
আই ঠাকুরাণী কন ঘরে ঘরে গিয়া॥

[পুঁথির কবি সর্বত্র চন্দ্রামণি দেবীকে আই ঠাকুরাণী লিখেছেন। আই অর্থে ঠাকুমা। রামকৃষ্ণের শিষ্য সন্তান অক্ষয়কুমার। তাই চন্দ্রামণি তাঁর ঠাকুমা বই কি!]

প্রতিবাসী নরনারী খুশি অতিশয়।
সর্বাধিক খুশি প্রভু হবে পরিণয়॥
আনন্দ সাগরে ভাসে গ্রামের রমণী।
মহানন্দে আত্মহারা আই ঠাকুরাণী॥
মেজ ভাই রামেশ্বর বনিতা তাঁহার।
প্রভুরে দেখেন যেন পুত্র আপনার॥
বড় সাধ বিবাহেতে হয় বাদ্য-ঘটা।
দৈবক্রমে কিন্তু না ঘটিয়া উঠে সেটা॥

[কারণ টাকা কোথায়? চাটুজ্যে বাড়ির তো কোনো সঞ্চিত অর্থ ছিল না। অর্থোপার্জনও শূন্যের কোঠায়। তায় পণই তো দিতে হয়েছে তিনশত টাকা।]

ঘরে ঘরে পড়ে গেল আনন্দের ধুম।
রাত্রিকালে কারো চোখে নাহি আসে ঘুম॥
ক্রমে বিবাহের দিন হৈল উপনীত।
প্রতিবাসী রমণীরা সবে উপস্থিত॥
পরম সুঠাম প্রভুদেবে সাজাইতে।
কেহ বা চন্দন ঘষে কেহ মালা গাঁথে॥

যতনে রচনা কৈল বেশ মনোহর।
মন হরে হেরে পরা সুন্দর কাপড় ॥
গ্রাম্য রমণীরা করে মাঙ্গলিক ধ্বনি।
আহ্লাদে কাঁদেন মেজ ভাজ-ঠাকুরাণী ॥
বাদ্য-ঘটা না হইল বড় দুঃখ মন।
অন্তরেতে বুঝিলেন প্রভু নারায়ণ ॥
সান্ত্বনা-কারণ তবে বলিলেন তাঁয়।
দেখ শুন কিবা বাদ্য বাজিছে বিয়ায় ॥
এত বলি দেন মুখে বোল পরিপাটি।
ডেলে গু ডেলে গু ডেলে ডেলে কাটি ॥
ঢোলের স্বরূপ হাতে পাছা বাজাইয়া।
বাজান ডোমের বাদ্য নাচিয়া নাচিয়া ॥
মহারঙ্গকর প্রভু অতুল ভুবনে।
নকলে সুপটু হেন নাহি শুনি কানে ॥
বাদ্যাপেক্ষা রঙ্গাধিক প্রভুর বাজন।
নাড়ি ফাটে হেসে লুটে দর্শকের গণ ॥
কোনই সরম লজ্জা নাহি শ্রীপ্রভুর।
সরল সহজ সোজা গদাই ঠাকুর ॥
বিবাহেতে লজ্জাহীন যত হোক নর।
তথাপি সলজ্জ বাহ্যে জড় জড় স্বর ॥
প্রভুর দেখহ লজ্জা গন্ধ মাত্র নাই।
বুঝিতে এ সব কথা বাল্যভাব চাই ॥
চাই দিব্য মুক্ত খোলা সরল নয়ন।
সরল বিশ্বাস আর হরি লুব্ধ মন ॥
সুসরল মন স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রায়।
তার মধ্য দিয়া যত লীলা দেখা যায় ॥

রঙ্গে মাতি বরযাত্রী জুটিয়া সকলে।
আগে পাছে শ্রীপ্রভুর বিয়া দিতে চলে ॥

শুনা কথা শিবের বিবাহ মনে পড়ে।
উমা সহ যেইবার অচল-আগারে ॥
বিয়া দিতে যত ভূতে মহা মেতে চলে।
যেতে পথে নানা মতে জাতি-খেলা খেলে ॥
মহারঙ্গী নন্দী ভৃঙ্গী ভৈরব বেতাল।
দৈত্যদানা ধূর্তপনা ধরা আলথাল ॥
ছুটাছুটি হুটপাটি মাটি ফাটে দাপে।
মহাফণী ত্রস্ত প্রাণী কোটি শিরে কাঁপে ॥
ভূতদলে আলো জ্বালে মুখের ভিতর।
চারি ধারে যায় ঘেরে ষাঁড়ে দিগম্বর ॥
সেই মত বরযাত্রী শ্রীপ্রভুর সাথে।
খোলা পায় খোলা গায় ঠেঙ্গা লাঠি হাতে ॥
গামছা কাঁধেতে বাঁধা কোমরে চাদর।
কৌতুক রহস্য মুখে হাজার রগড ॥
যেতে পথে কত রঙ্গ কব আমি কটি।
উতরিল সন্নিকটে জয়রামবাটী ॥

জ্বালিয়া সাতাশ কাঠি বিবাহের কালে।
ঘুরে যবে বরে ঘেরে রমণীসকলে ॥
জ্বালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সুতা ॥
হরিদ্রা-মাখান সুতা ছিল বাঁধা হাতে ॥
অপূর্ব প্রভুর খেলা দেখিতে শুনিতে ॥
চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ।
ছলে পুড়াইয়া দিলা অবিদ্যা-বন্ধন ॥

অক্ষয়কুমার সেনের কাব্যগ্রন্থ থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেবার হেতু এই যে রামকৃষ্ণ-সারদার বিবাহ প্রসঙ্গ তিনি যত প্রামাণ্য ও বিস্তৃতভাবে দিয়ে গিয়েছেন তেমন আর কেউ দিতে পারেননি। অক্ষয়কুমার আনুষঙ্গিক তথ্যাদি নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করেছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা এই যে তাঁর কাব্যের এই বিবাহ-বর্ণনা তিনি স্বয়ং সারদা মাকে পাঠ করে শুনিয়ে-

ছিলেন। বর্ণনা যে সত্য তা মায়ের অনুমোদনেই বোঝা যায়। শুধু অনুমোদন নয়, বর্ণনাটি শ্রীশ্রীসারদা মাতা উপভোগ করেছিলেন।

কবির বর্ণনা থেকে জানতে পারি যে বাসর ঘর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে হয়নি স্থানাভাবের দরুণ। হয়েছিল পাশের এক ব্রাহ্মণ বাড়িতে। সেকালের গ্রাম্য বাসর: গাঁয়ের কৌতুকপ্রিয়া রমণীরা ভীড় করেছিল বাসরে। তাদের নানা রঙ্গ দেখে রামকৃষ্ণের মনে জাগল রঙ্গময়ী জগজ্জননীর লীলারঙ্গের কথা। মা মা বলতে বলতে ভাবাবেশ হল তাঁর। ভাবাবেশেই ধরলেন তাঁর মধুভরা কণ্ঠে মাতৃসঙ্গীত। গানের পর গান: মুগ্ধ স্তব্ধ হয়ে গেল সমবেত রমণীরা। তখনো নিমন্ত্রণ-পর্ব শেষ হয়নি। পুরুষরা ভোজন করতে করতে থেমে গেল। হাত ওঠেনা মুখে। প্রাণমন এক করে শুনছে নব বরের গান। অন্তর্হিত হল নারীদের রঙ্গবোধ। মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো যে যার স্থানে নত মুখে বসে।

শ্যামাগুণ গানে মাতোয়ারা রামকৃষ্ণের গায়ের বস্ত্র খসে পড়ল। দিগম্বর। শিবের বিবাহ সভায় শিবের কটিবস্ত্র খসে পড়ার মতোই ঘটনা। আমাদের গৌরী বালিকা মাত্র। ঘটনার তাৎপর্য তাঁর বুঝে ওঠার কথা নয়।

শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরী ব্যস্ত ছিলেন হেঁশেলে। জামাইয়ের গান তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে তাঁকে বিবশ করে রেখেছিল। তবু এক দুর্নিবার আকর্ষণে তিনি এসে পড়লেন। বাসবসজ্জার মাঝে দাঁড়িয়ে দিগম্বর যুবক জামাতা। বহু নারীবেষ্টিত। কিন্তু কারও মনে নেই কামভাব, লজ্জা, ভয় বা ঈষৎ চাঞ্চল্যও। স্বয়ং শ্যামাসুন্দরীও অত্রস্তা।

নিখিল সৌন্দর্যের বাঙ্ময় মূর্তি। সুঠাম সুন্দর; কিন্তু এ নরদেহ নয়, দিব্য জ্যোতিঃপুঞ্জ। বাসর হয়ে উঠেছে পার্থিব সম্পর্কশূন্য! বৈকুণ্ঠলোক এসেছে ধরায় নেমে। তাই কোনো নরনারীর মনে পার্থিব ভাবের ছাপই নেই!

রামকৃষ্ণের মুখে ফুটে উঠেছে করুণা ভরা হাসি। বিশ্বজন আশ্বাস পায় সে হাসির অমৃতকণায়। আজ মর্ত্যে নারায়ণ-লক্ষ্মীর বাসর—তাই পাত্রপাত্রীর স্বরূপের উদ্ভাস ঘটে যায়। অঙ্গে এত রূপ, কণ্ঠে এত মধু! আর ধুলি-মালিন্যের উর্ধে এ কোন অপার্থিব পরিবেশ। পুঁথির কবির অনুভবে:

শিল্পকলা বিধাতার নাহি এতদূর।
আপনারে গঠিয়াছে আপনি ঠাকুর॥

কেন? কেন রামকৃষ্ণ অপরূপ রূপময় হয়ে ধরা দিয়েছিলেন সেদিন? কবি বলেন, কামনাপ্রভাবিত জগজ্জনের কল্যাণে, তাদের সর্বকাম নাশ করতে, হরি আপন সৌন্দর্য অবগুণ্ঠনমুক্ত করেন। হরি মদনমোহন।

বিয়ের পরদিন বিকালে বরপক্ষ কামারপুকুর যাত্রা করলেন নববধূকে সঙ্গে করে। গাড়ি ঘোড়া পাল্কি কিছুই জোটেনি। ঈশ্বর মুখোপাধ্যায় বালিকা বধূকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রামে পৌঁছালে চন্দ্রামণি পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে তুললেন। স্ত্রী-আচার, ফুলশয্যা ও বৌভাত একে একে হল। বধূ পেয়ে চন্দ্রা খুশি।

কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা ছিল তাঁর মন জুড়ে গোপনে। তাঁর মাতৃহৃদয় ব্যথাকাতর হয়ে পড়ছিল। নববধূকে যে স্বর্ণালঙ্কারে সাজানো হয়েছিল বিবাহের দিন সেগুলি চন্দ্রাই পাঠিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলি তাঁর নিজস্ব গয়না নয়। সামাজিক সম্ভ্রম রাখতে গয়নাগুলি জোগাড় করা হয়েছিল লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে দু-একদিনের জন্য চেয়ে। এখন বিয়ে পর্ব মিটেছে, গয়নাগুলি ফেরৎ দিতে হবে। কিন্তু ঐ অবুঝ মেয়েটি এসেছে আমার বুক-জুড়ানো হয়ে, ওর অঙ্গ থেকে এখনই গয়না খুলে নিয়ে কী করে ওকে কাঁদাই?

মায়ের গোপন মনোব্যথা ও সমস্যা গদাইয়ের মনে ভেসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। মাকে আশ্বস্ত করে বললেন: মা ভাবছ কেন, ও ঘুমোক, আমিই খুলে দেব ওর গা থেকে গয়নাগুলি। দিলেনও। সারদার ঘুমের মধ্যে এত কোমল হাতে ও কৌশলে গয়নাগুলি খুললেন রামকৃষ্ণ যে ঘুম ভাঙেনি বালিকা বধূর। কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠে সে সরলা বালা কাঁদতে লাগল। কোথায় গেল আমার একরাশ গয়না? এই যে হাতে, গলায়, বাহুতে সব ছিল? কোথায় গেল?

মেয়ের কান্নায় মাও কাঁদেন। চন্দ্রা কাঁদতে কাঁদতেই সারদাকে কোলে তুলে নেন সাদরে। বলেন: কেঁদো না মা, গদাই তোমাকে এর চেয়েও কত ভালো সব গয়না গড়িয়ে দেবে পরে। শুনে সারদার মুখে ফিরে এল হাসি।

যার ব্যথা সে শান্ত হল। কিন্তু পরজনের ক্ষোভ পড়ল ফেটে। সারদার কাকা এলেন কামারপুকুরে সেদিনই। তাঁর চোখে পড়ল যে ভাইঝির গা খালি, একটিও গয়না নেই। জানতে চাইলেন ব্যাপারটি কী। বেয়ান সব বললেন।

কাকামশাই নতুন বেয়ানের সরল স্বীকারোক্তিতে খুশি হননি। তিনি

তাঁর ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। অসন্তোষ জাহির করতে সারদাকে নিয়ে তিনি সেদিনই ফিরে গেলেন জয়রামবাটি। বেদনায় কাতর হলেন চন্দ্রা।

গদাধর কিন্তু অম্লান। তিনি জানেন এ লৌকিক বিবাহমাত্র নয়। সারদার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চিরকালের। যুগে যুগে মিলনে-বিরহে এ মর্ত্যধামে তাঁরা আসেন। তাঁদের সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ সবটাই মিলন দিয়ে গড়া নয়। বিরহ আছে। বিরহই বেশি। অন্তরে অনুস্যূত চিরমিলনের সূত্র দিয়েই বিরহ দহনের মালাখানি গাঁথা। প্রাণপতি রামচন্দ্রের সঙ্গে বিরহ এড়াতে সীতা গিয়েছিলেন রাজপুরীর নিরাপত্তা ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে বনে। এড়াতে পারেননি বিরহ। রাক্ষস রাবণের কলুষহস্তস্পর্শে রামসীতার জীবনে কখনোই আর মিলনের শান্তি নিবিড় হতে পারেনি। সীতা-উদ্ধারের পরও আবার সীতার বনবাস। সর্বশেষে সীতার পাতালপ্রবেশ।

বৃন্দাবনের কুঞ্জতলে রাধাকৃষ্ণের মধুর মিলন লীলা অল্পকালই স্থায়ী হয়েছিল। যেন পলকপাতেই নেমে এসেছিল চিরবিরহ।

লক্ষ বিরহের আক্রমণেও মিলন তবুও অটুটই থাকে। পার্বতী কি কোনোদিন হতে পারে শিব-ছাড়া? রামহারা হয়েও সীতা থাকেন রামময়-জীবিতাই। বিরহের অতল বেদনায় রাধার যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে। কৃষ্ণভাবময়ী রাধা।

রামকৃষ্ণ হেসে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: যাক মা যাক, কোথায় আর যাবে ও? ওর পক্ষের লোকরা এখন যাই বলুক আর যাই করুক, ফিরবে না তো আর এ বিবাহ।

সে অবশ্য সত্য কথা, কিন্তু সদ্য লব্ধ কন্যাকে হারিয়ে চন্দ্রার মনে শান্তি আসেনি। পাঁচ ছয় বছরের মেয়েটিকে এক রাতেই তিনি নিজের বুকে ঠাঁই দিয়েছিলেন। এক দিনের মধ্যে তাকে আকস্মিক বিদায় দিয়ে বুক খালি লাগল তাঁর।

শান্তি শুধু এই যে গদাই তখনই ফিরে গেলেন না দক্ষিণেশ্বরে। কোন ভাবনায় তিনি কামারপুকুরেই থেকে গেলেন। গদাই কাছে থাকলে কার প্রাণেই বা অভাব থাকে? চন্দ্রা তো যেন পূর্ণ থেকে পূর্ণতরা হয়ে বাস করেন সে দিনগুলিতে।

বিয়েপর্ব মিটে যাবার পর আরও এক বছর সাত মাস গদাধর কামারপুকুরে

ছিলেন। তারপর ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গদাধর আর একবার গেলেন জয়রামবাটি। কুলাচার মানতে এই গমন। সারদার সাত বছর বয়স তখন পূর্ণ হবার মুখে।

সেই বালিকাকে কেউ বলে দেয়নি, সে নিজেই এসে স্বামীর পা ধুইয়ে দিল জলে, নিজের মাথার চুল দিয়ে মুছল পা। সযত্নে আসন পেতে বসতে দিয়ে পাখার বাতাস করেছিল স্বামীকে

এইটুকুন একরত্তি মেয়ে কেমন স্বামী চিনেছে,—পাড়ার মেয়েরা বলেছিল মুচকি হেসে। সারদা চিনেছিল জগৎস্বামীকে—সে হয়তো তত বিস্ময়ের কথা নয়। উনি আমার চিরযুগের চিরচেনা মানুষ। কিন্তু ক্ষুদ্র বালিকা সারদাকে যে চিনেছিল হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়—সেটাই আশ্চর্য কথা। হৃদয়ও মামার সাথী হয়ে এসেছিল জয়রামবাটি। স্বগ্রাম শিওড়ের মেয়ে শ্যামাসুন্দরীকে সে পাত্তা দিতনা। কিন্তু শ্যামাসুন্দরীর সাত বছরের বালিকা কন্যাকে হৃদয় পূজা করেছিল।

হৃদয় কোথা থেকে জোগাড় করে আনল কতগুলি নীল পদ্ম। বালিকা মামীকে সে খুঁজতে লাগল। সংকোচে মামীটি রইলেন গৃহকোণে লুকিয়ে। কিন্তু হৃদয় খুঁজে আনল তাঁকে। তারপর মামীর পায়ে পদ্মফুল দিয়ে পূজা করল। জানোনা, আমি এখন নিত্য হর সহচর। গৌরীপূজা আমার কর্তব্য।

গদাধর জয়রামবাটি গিয়েছিলেন কুলাচার মেনে স্ত্রীকে নিয়ে জোড়ে ফিরতে। সেবার তাঁরা ফেরেন পালকিতে। পালকির মধ্যে গদাধর সারদাকে বলেন: কেউ যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করে, কবছর বয়সে তোমার বিয়ে হয়েছিল, তুমি পাঁচ বছর বলবে, সাত বছর বোলোনি।

বালিকা বধূ পাছে জোড়ে ফেরাকেই বিবাহ মনে করে বসে, তাই এই সতর্কতা।

বালিকা সারদা স্বামীর পা ধুইয়ে দেওয়ার মতো অনুরূপ আর একটি ঘটনা পরেও ঘটেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন সেকথা: জয়রামবাটিতে যখন ছিলুম তখন উনি এলেন; আমাকে বললেন, সাজিমাটি দিয়ে পা-টা ধুয়ে দাও তো। তা দেওয়াতে অন্য মেয়েরা বলাবলি করতে লাগল—ওমা, সারদার কী গো, স্বামীর সঙ্গে কিছুই হল না, তবু দেখ!

জোড়ে ফেরা উপলক্ষে সারদার সঙ্গে পুনর্মিলনের পর গদাধর আর বেশিদিন থাকেননি কামারপুকুর। মা-দাদা আরও কিছুদিন থাকতে

বলেছিলেন। কিন্তু কামারপুকুরের সংসারে তখন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই। সেও এক কথা, আর দুবছরের অধিককাল হয়ে গেল এখানকার বাস। দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীকে ছেড়েই বা কতদিন থাকা যায়? গদাধর দক্ষিণেশ্বর ফিরে গেলেন ঐ ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণেই। ইংরেজি ১৮৬০ সাল তখন শেষ হয়ে আসছে।

কেন রামকৃষ্ণ বিবাহ করলেন? তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখে গিয়েছেন:

দারপরিগ্রহ ভগবান-লাভের অন্তরায় হয় না, ইহাই আমাদিগকে দেখাইতে, অথবা সনাতন মতের আশ্রম-মর্যাদা রক্ষা করিতে গদাধর ভার্যা গ্রহণ করিলেন। কোনো কারণবশতঃ একদিন কহেন—দশবিধ সংস্কারসম্পন্ন না হইলে মনোবৃত্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না এবং পূর্ণতা লাভ না করিলে, প্রকৃষ্ট-রূপে ধর্মপ্রবর্তক ও আচার্য হওয়া যায় না। ইহাই বা চিন্তা করিয়া বিবাহ করেন। এই বিবাহ আমাদের উদ্বন্ধনের মতো বিভ্রাটজনক নহে। ইহা জগতের মাতা-পিতা গৌরীশঙ্করের মিলন। কাব্য-নাটক আলোচনায় ভোগসুখলালসায় স্ত্রীযুত, সুতরাং উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আমরা যেমন উৎসন্ন যাই, তদ্বিপরীতে ঠাকুর পত্নীকে শ্রীভগবতীর মূর্তিবিগ্রহ জ্ঞানে ভক্তিপূজা করিতেন। বলিতেন, দেবী মহাশক্তি-স্বরূপিণী, বাগদেবতা সরস্বতী-অংশসম্ভবা। রূপ-দর্শনে মোহিত হইয়া হীনচেতা ব্যক্তি পাছে অপরাধগ্রস্ত হয়, তাই এবার বাহ্যরূপ লুকাইয়া অন্তরে দিব্যরূপের সজ্জা করিয়াছেন। নিত্যসম্বন্ধবশতঃ আমার শরীর পালনে যুগে যুগে আগমন করিয়া থাকেন। দেবী আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; উঁহারই বুদ্ধির আশ্রয়ে পাগল আমি কার্যক্ষম হইয়াছি।